part 4

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রবন্ধ সমগ্র

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৪

—একশ পঞ্চাশ টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন ঃ প্রবীর সেন
মুদ্রন ঃ ইম্প্রেশন হাউস
পিছনে লেখকের আলোক চিত্র
রবি দত্ত

PRABANDHA SAMAGRA
A Collection of Essays by Annadasankar Ray
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta 73

Price Rs. 150/-

ISBN : 81-7293-439-4

© ১৯৯৩, পুণ্যশ্লোক রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ নিরালা প্রেস, ৪ কৈলাস মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৬ হইতে ধীরেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধ সমগ্র

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

লেখকের ভূমিকা	vii
সম্পাদকের ভূমিকা	ix
রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২)	১
গান্ধী (১৯৬৯)	১২৯
টলস্টয় (১৯৮০)	২৮৯
লালন ও তাঁর গান (১৯৭৮)	৩৬৭
গ্রন্থপঞ্জী	৪৩০

লেখকের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই আমি তাঁর 'মুকুট' নাটকে অভিনয় করেছিলুম। তখন জানতুম না যে তিনি একজন কবি। তারপর একদিন তাঁর 'চয়নিকা' আমার হাতে আসে। আবিষ্ট হয়ে পড়ি। সেটাও বোধ হয় নোবেল-পূর্ব। 'সবুজপত্রেই' তাঁর সম্যক পরিচয় পাই। তখন আমার বয়স বারো। 'প্রবাসী'তেও তাঁর অনেক লেখা পড়ি। স্কুল লাইব্রেরিতে অজিতকুমার চক্রবর্তী'র লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' ছিল। আর ছিল কবির 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক পুস্তিকামালা। তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রথম রচনা 'রক্তকরবীর তিনজন'। সেটি প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'য় আমার তেইশ বছর বয়সে। ১৯২৭ সালে। ইতিমধ্যে আমি তাঁর প্রথম দর্শন লাভ করেছিলুম ১৯২৪ সালে। কিন্তু তার কোনো বিবরণ লিখিনি সে সময়। 'জীবনশিল্পী' নামক প্রবন্ধ সংকলনে 'চোখের দেখা' প্রবন্ধে তার বিবরণ আছে। সেটি প্রবন্ধ সমগ্র প্রথম খণ্ডে সংকলিত। এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়নি এমন অনেক প্রবন্ধ পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। সেগুলি অন্যান্য খণ্ডে যাবে।

গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে লেখা আমার চোখে পড়ে 'গৃহস্থ' পত্রিকায় ১৯১৬ সালে। তখন আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। চিনতে পারি ১৯১৯ সালে রাওলাট বিল বিরোধী সত্যাগ্রহের সময়। তাঁকে প্রথম দর্শন করি পাটনায় ১৯২৪ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন কালে। তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজিতে দু'একখানা লিখলেও বাংলায় কবে প্রথম লিখি মনে পড়ছে না। 'দেশকালপাত্র'তে কিছু লেখা আছে। প্রবন্ধ সমগ্রের প্রথম খণ্ডে সেটি সংকলিত।

টলস্টয়ের তেইশটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ স্কুল থেকে পুরস্কার পাই ১৯২০ সালে। 'তিনটি প্রশ্ন' অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠাই সেই সালে। প্রকাশিত হয় সেই বছরই। 'টলস্টয়' শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে আমার সব রচনাই সংগৃহীত।

লালন বিষয়েও এ-বইয়ের বাইরে আর কোনো লেখা নেই। এই সব।

২৮ নভেম্বর ১৯৯৬

অন্নদাশঙ্কর রায়

সম্পাদকের ভূমিকা

কথামুখ

প্রবন্ধ সমগ্রের চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লেখকের জীবন-কাহিনীমূলক বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। জীবনকাহিনীমূলক হলেও এই সমস্ত রচনায় শুধু জীবনের কথাই নেই, আছে কর্মের কথাও ও তার মূল্যায়ন। চতুর্থ খণ্ডের মূল গ্রন্থ তিনটি হলো টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে খুচরো কয়েকটি প্রবন্ধ পঞ্চম খণ্ডেও স্থান পেয়েছে। এই তিন মহামানব ছাড়া আর কোন্-কোন্ মহামানব, শিল্পী বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই দুই খণ্ডে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত আলোচনা আছে, তা সূচীপত্রের ওপর চোখ বোলালেই বোঝা যাবে, তবু কয়েকজনের নামোল্লেখ করছি। গোটে, লালন ফকির, প্রমথ চৌধুরী। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র। পাস্তেরনাক, টোমাস মান, রাসেল।

লেখকের জীবনকাহিনীমূলক আর কিছু প্রবন্ধ, অন্যান্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত —এই হিশেবে, প্রবন্ধ সমগ্রের পূর্বতন খণ্ডে ইতিমধ্যেই স্থান পেয়ে গেছে। যেমন জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, ফাউস্ট, সমর ও শান্তি, বীরবল, রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন, চোখের দেখা প্রভৃতি রচনা জীবনশিল্পী গ্রন্থের ; শরৎচন্দ্র, বিনুর অ্যাডভেঞ্চার ও রবীন্দ্রনাথ ঃ বিনুর সাক্ষ্য ইশারা গ্রন্থের ; রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান এবং রম্যাঁ রলাঁ জীয়নকাটি গ্রন্থের ; গান্ধীজী—গান্ধীজীর লক্ষ্য—গান্ধীজীর পরীক্ষা, রবীন্দ্রনাথের পরিচয়-রবীন্দ্রাদিত্য, বার্নার্ডশ প্রভৃতি দেশ-কালপাত্র গ্রন্থের আর গান্ধীজন্ম-গান্ধীজীর সংগ্রাম-৩০শে জানুয়ারি প্রভৃতি প্রত্যয় গ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। যেমন টলস্টয়, গান্ধী ও আমি-শান্তিনিকেতনে কেন থাকি-প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে কণ্ঠস্বর গ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডে। কবিগুরু গোটে-গোটে ও তাঁর দেশকাল, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা-প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি ; রবীন্দ্র-নাথ ও আমরা আধুনিকতা গ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে ইত্যাদি। প্রবন্ধ সমগ্রের চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও এই জাতীয় প্রবন্ধ যে কয়েকটি করে স্থান পাবে না এমন নয়। কিন্তু এই দুই খণ্ডের ষোড়শোপচারের পাশে সেসব উভয়ার্থেই নিতান্ত কণাভোজ মাত্র।

মূলকথা

এবার এই দুই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাদি, আলোচিত ব্যক্তিবর্গ ও লেখকের রচনাশৈলী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথমে গোটে। তাঁর প্রতি লেখকের আগ্রহ বহুদিনকার, প্রায় শুরু থেকেই। নারী যে রহস্যময়ী তা লেখককে বই পড়ে শিখতে হয়নি। গোটের ভিলহেল্ম

মাইস্টারের শিক্ষানবিশির মতো তাঁর শিক্ষানবিশিও ছেলেবেলা থেকেই শুরু হয়। কিন্তু তাঁর নিজের অজান্তে। পরে লেখক সচেতন ভাবেই গ্যেটের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর কাছ থেকে তিনি দুটি জিনিশ শিক্ষা করেন—সত্যান্বেষণের গুরুত্ব ও নারীর মহিমা। নারীর প্রকৃত মূল্য কী তা গ্যেটের কাছ থেকেই তিনি জানেন—

দেবী নয়, নারী, তবু ঊর্ধ্বে নিয়ে চলে
ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠ যেথায়
কবিপ্রিয়া বিয়াত্রিস সরণি দেখায়
কবি তার সঙ্গ রাখে একা নভস্তলে।

সেই নারীর উদ্দেশেই লেখকের এই প্রণিপাত—

যে নারী পুরায় বাঞ্ছা অন্তরযামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় বিভবলুব্ধা সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।
প্রণাম হাসিয়া লয় যে ঊর্ধ্বগামিনী
তাহারে প্রণাম।

গ্যেটের কাছ থেকে তিনি আর পান সত্যান্বেষণের শিক্ষা—

গ্যয়টে

ঋষি, তব স্থির দৃষ্টি উদ্বেগ কাতর।
সত্যের গোধনগুলি আসে নাই ঘর;
রজনী গভীরা হলো। ভীরু নিরাশ
হেরিতে লেগেছে যেন ঊষার আভাস।
অসমাপ্ত অন্বেষণ নিতে হবে তুলে
কাল প্রত্যূষেই। আসন্ন সুপ্তিরে ভুলে
যেতে হবে আজিকার মতো। দৃষ্টিশিখা
জ্বলে তাই খরতর। ধূম মসী লিখা
নয়ন প্রদীপতল স্ফীত হয়ে উঠে;
সংকল্প প্রহর জাগে বন্ধ ওষ্ঠপুটে।
হে ঋষি, সতোরা তব অদূরেই আছে
তিমির বিভিন্ন, সুপ্ত। সাড়া দেবে কাছে
রজনী পোহালে কাল।—তাও তুমি জানো,
তবু তব শূন্য মুখ চিন্তা জ্বরে ম্লান।

১৯২৯

এই কবিসূর্যের প্রগাঢ় আলো ও তাপ লেখকের জীবনে তার নিত্য ছাপ রেখেছে। কিন্তু শাশ্বত সৃষ্টির ভার সরিয়ে রেখে সাহিত্যিককে কখন দেশের ও কালের ভাবনার ভাগ নিতে ও দিতে হবে, কীভাবে কণ্ঠক্ষেপ ও হস্তক্ষেপ করতে

হবে—এই প্রশ্নের উত্তর লেখক গ্যেটের কাছে পান না। তারজন্য লেখককে যেতে হয় টলস্টয়ের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে।

টলস্টয়ের কাছ থেকে লেখক দুটি শিক্ষা পান। তার একটি সৃষ্টিশীলতার শিক্ষা, অন্যটি দায়িত্ববান হওয়ার শিক্ষা। টলস্টয়ের কাছ থেকে লেখক আরও পেয়েছিলেন সত্যের প্রতি অনুরাগ, এপিকের প্রতি আকর্ষণ। তাঁর শৈলীতে যে সরলতা ও বিশুদ্ধি, উচ্চারণের সেই প্রবণতা টলস্টয়ের জগতের শিল্পাদর্শ থেকেই আহৃত। তাঁর নিজের ভাষায়, 'টলস্টয় বলেছিলেন, সাহিত্যে ব্রিলিয়্যান্স পরিহার করতে হবে। দরকার হল ট্রুথ আর বিউটির। এর চেয়ে সত্য কথা আর হয় না। তিনি তার সঙ্গে আরও জুড়ে দিয়েছিলেন—গুডনেস, এটা আমি অতটা মানি না। আমি চাই শিল্পী টলস্টয়কে, নীতিবাদী টলস্টয়কে নয়।'

টলস্টয় তাঁর অন্যতম গুরু। কী জীবনে কী শিল্পে। টলস্টয়ের টেলগুলির ভিতর দিয়ে তিনি পান জীবনের মূলনীতি ও জীবনদর্শনের কথা। আর আনা কারেনিনা প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পান রস ও আনন্দ। কী করে আর একটি আনা কারেনিনা লেখা যায় সে তাঁর বহুদিনের জিজ্ঞাসা। পরে তিনি যখন রত্ন ও শ্রীমতী লেখেন তখন বলা হয় এই তাঁর আনা কারেনিনা। বস্তুত অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে এ-কথা প্রচলিত আছে যে, সত্যাসত্য হচ্ছে তাঁর সমর ও শান্তি, রত্ন ও শ্রীমতী তাঁর আনা কারেনিনা ও ক্রান্তদর্শী তাঁর রেজারেকশন। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারেও তিনি টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

টলস্টয় গ্রন্থে লেখক টলস্টয়ের মূল্যায়ন ও তাঁর ওপর টলস্টয়ের প্রভাবের ব্যাখ্যা করেছেন অতি চমৎকার ভাবে। তাঁর মহান ও ধ্রুপদী শিল্পসম্ভার পরিচয়ের পাশাপাশি দিয়েছেন যুদ্ধবিরতি ও শোষণবিরতির জন্য তাঁর অবিশ্রান্ত লেখনী চালনার প্রয়াসের বর্ণনা। টলস্টয়ের এই সামাজিক ও নৈতিক ভূমিকা তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের চেয়ে কিছু কম মূল্যবান নয়। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে অন্নদাশঙ্কর যে প্রতিনিয়ত লেখনীক্ষেপ করেছেন ও করে থাকেন তার অনেকটাই টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

মনস্তত্ত্বে বলে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকেও আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাশাপাশি কিছুটা স্নেহও করে থাকি। টলস্টয়ের প্রতি অন্নদাশঙ্করের সেই শ্রদ্ধার এক সস্নেহ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছড়ায়—

ঋষি টলস্টয় / একে একে সকল নেশাই / করেছিলেন জয়। //
মদ, জুয়া, শিকার / পঞ্চ ম'কার বলে যাকে / সব ক'টাতেই বিকার। //
রইল শুধু বাকী / সবার সেরা কোন্ নেশাটি / বলতে হবে তা কি? //
রাত্রে বারো মাস / পরিজনের সঙ্গে বসে / ঋষি খেলেন তাস।

এখানে টলস্টয়ের এই নির্দোষ ব্যসনের প্রতি লেখকের সস্নেহ প্রশ্রয়ই আছে।

টলস্টয়ের পরে টলস্টয়ের উত্তরাধিকার একদিকে গান্ধীতে ও অন্যদিকে রলাঁয় বর্তায়। গান্ধী নিজেই টলস্টয়কে তাঁর অন্যতম শিক্ষক ও আত্মিক গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। টলস্টয়ের ঈশ্বরের রাজ্য তোমারই অন্তরে নামক রচনাটি —যাতে তিনি তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক চিন্তাভাবনার

এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন—বহুবছর ধরে গান্ধীর নিত্যসঙ্গী হয়ে ছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এই রচনাটি আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ও তাঁর মনের উপরে একেবারে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল এর স্বাধীন যুক্তিবিস্তার, সুগভীর নৈতিকতা ও সত্যনিষ্ঠার জোরে। গান্ধীজী টলস্টয়ের অন্তত তিনটি কাহিনী—ঈশ্বর সত্য প্রত্যক্ষ করেন কিন্তু তক্ষুনি সেটা প্রকাশ করেন না, মূর্খ ইভানের কাহিনী ও একজন মানুষের ঠিক কতটা জমি দরকার—তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটিতে অনুবাদও করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এও বলা দরকার যে টলস্টয়ের কিংডম অভ্ গড কল্পনাটিই গান্ধীজীর অনুবাদে হয়েছিল রামরাজ্য।

টলস্টয় ও গান্ধীর সঙ্গে লেখকের গভীর সাযুজ্য এই যে, তাঁদের মতো তিনিও ছিলেন অহিংস নৈরাজ্যবাদী এবং গুরুতর মতভেদ এখানে যে, প্রথমত লেখকের কাছে আর্ট হচ্ছে নিজেই নিজের লক্ষ্য। মহত্তর লক্ষ্যের উপলব্ধ হতে গেলে আর্ট তার আত্মাকে হারায়, লেখকের বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত প্রেম বলতে লেখক মানবপ্রেমের সঙ্গে ও পাশাপাশি নরনারীর প্রেমও বোঝেন। তৃতীয়ত যদিও টলস্টয় ও গান্ধী উভয়ই আধুনিক সভ্যতার সন্তান, তাঁরা কেউই আধুনিক সভ্যতায় বিশ্বাস করতেন না, লেখক কিন্তু করেন ও সচেতনভাবেই।

অন্নদাশঙ্করের জীবনে একদিকে বিশুদ্ধ শিল্পের প্রতি টান ও অন্যদিকে গান্ধীর প্রভাবে পড়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হওয়ার বাসনা—এই টানাপোড়েন দেখা গেছে। তা লেখকের সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যচেতনা ও গদ্যরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর শৈলীতে গান্ধীর বাকরীতির যে প্রলেপ তার উৎস ওইখানে।

লেখক গান্ধী বইটিকে বলেছেন গান্ধীজী ও ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য। তাঁর এই সাক্ষ্য ও ভাষ্যের এক দূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকাশ ঘটেছে ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালায়, গান্ধী বইটি যে মহোপন্যাসের প্রস্তুতিপর্ব। লেখকের রচনাবলীর নির্দিষ্ট খণ্ডের ভূমিকায় আমি লেখকের সেই গান্ধীভাষ্যের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ফলে এখানে আর অল্প ক'টি কথা বলে গান্ধী প্রসঙ্গে ইতি টানবো।

গান্ধীর কার্যসূচি ও কর্মধারা একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, অন্যদিকে ভারতের অতীতের সঙ্গে এক বৈপ্লবিক ছেদ। গান্ধীর রুশ মূল্যায়ন এই। গান্ধীর ইঙ্গ-মার্কিন মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলতে হয় অ্যাটেনবরোর গান্ধী চিত্রের কথা। ছবিতে গান্ধীকে কিছুটা মিথিফায়েড করা হয়েছে ও ছবিটির লক্ষ্য হলো দর্শকের স্মৃতিকে কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যর দিকে চালিত করা—এই বলে ভারতীয় চিত্র সমালোচকরা অনেকেই ছবিটির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর বলছেন, 'মহাত্মা গান্ধী ও আলবার্ট শোয়াইৎসারের সঙ্গে সঙ্গে নীতির ধ্রুবতারাদেরও অন্তর্ধান হয়েছে। সংস্কৃতির সহিত নীতিরও গভীর সম্বন্ধ। নীতির দিক থেকে আমরা এতদূর নেমে গেছি যে অ্যাটেনবরার ফিল্মেরও তাৎপর্য বুঝিনে। যাঁরা পারমাণবিক বিনষ্টির সম্মুখীন

তাঁরা কিন্তু বোঝেন।'

রবীন্দ্রনাথ যদি পরমাণু অস্ত্রের যুগ অবধি বাঁচতেন ও তাঁর শেষ জবানবন্দী সভ্যতার সঙ্কট আগে না লিখে এই সময়ে লিখতেন তাহলে আর যেই হোক না কেন ইংরেজ হতো না তাঁর চোখে ভিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি গান্ধীর অনুরূপ নয়। তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপিয় সভ্যতাকে মেলাতে। টলস্টয় ও গান্ধীর মতো তিনি আধুনিক সভ্যতায় অবিশ্বাসী নন। তিনি তাকে বিচারসাপেক্ষ ভাবে গ্রহণ-বর্জন করবেন এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে মেলাবেন। এই মিলনের প্রয়াসে তিনি যখন যেদিক থেকে বাধা পেয়েছিলেন তখনই সেদিকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বা অভিমান করেছিলেন। আর তার প্রকাশ সভ্যতার সঙ্কট-এরও অপেক্ষা রাখেনি। নৈবেদ্য-তেই তা যথেষ্ট তীব্র।

আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন আধুনিক ও বিবেকী মনীষী। টলস্টয়ের পরে ইউরোপের বিবেক রূপে পরিচিত রলাঁকে যদি গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হতো তিনি সম্ভবত বেছে নিতেন রবীন্দ্রনাথকেই। তাঁর যথার্থ তুলনা হয় য়ুরোপিয় রেনেসাঁসের নায়কদের সঙ্গে। এবং বোধ করি এই যোগসূত্রেই লেখকের ওপর রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি প্রভাব।

সত্যজিজ্ঞাসা ও রূপজিজ্ঞাসার তাগিদে লেখক যে ত্রয়ী সাধক, মনস্বী ও শিল্পীর কাছে সবচেয়ে বেশি গেছেন তাঁরা হলেন টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে লেখক পেয়েছিলেন সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ, বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণ। প্রথম যৌবনের বহিঃসৌন্দর্য তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে অন্তঃসৌন্দর্যেও ডুব দেয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি আর পান জীবনশিল্পের ধারণাও—'জীবনটাই যাঁর কাছে একটা শিল্পকর্ম তাঁকেই বলি জীবনশিল্পী। তিনি হয়তো শিল্পীই নন। যেমন গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিল্পী তথা জীবনশিল্পীর মিলন দেখেছি। এরকম কদাচিৎ চোখে পড়ে। আমার কথা যদি বলেন, আমারও আদর্শ তাই, কিন্তু একদা এ নিয়ে যেমন যত্নবান ছিলুম এখন তেমন নই। অকল্পনীয়, অপ্রত্যাশিত ঢেউ এসে আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, জীবনটাকে ঠিক করতেই আমি ব্যতিব্যস্ত। সেই সঙ্গে সাহিত্যপ্রয়াসকেও। জীবনকে জীবনের মতো, শিল্পকে শিল্পের মতো করি আগে। তারপরে জীবনকে শিল্পকর্মের মতো করার কথা ভাবব।'

লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবনকে চার অধ্যায় বলেছেন। তাঁর জীবন ছোট একটি বই নয়, মহাগ্রন্থ, তাই অধ্যায় না বলে পরে বলেছেন পর্যায়। দেখিয়েছেন বিশ বছর অন্তর অন্তর তাঁর জীবনে এক একটি নব পর্যায় এসেছে। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর ওপর ক্রিয়াশীল বিভিন্ন প্রভাবের ও শেষদিন পর্যন্ত কবিমানসে বহমান বিভিন্ন ধারা বা প্রবাহের বর্ণনাও দিয়েছেন। এইসব প্রবাহের মধ্যে একটি হলো বাউল ধারা বা মার্গ।

রবীন্দ্রনাথের একসময়ে বিরাট বিশ্বাস ছিল পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মণদের উপর। কিন্তু নোবেল প্রাইজের পর তাঁর হিন্দু রিভাইভালিস্ট মনোভাবের

অবসান হয়। ধীরে-ধীরে তাঁর ধর্ম হয় মানুষের ধর্ম। তাঁর উপর বেশকিছু বাউল প্রভাব পড়ে। বাউলরা প্রার্থনা করে না, উপাসনা করে না, পূজা করে না, ধ্যান করে না, মানত করে না, কিন্তু গান করে। গানের ভিতর দিয়েই মনের মানুষের অন্বেষণ করে। তাদের কোন জাতপাত নেই, তা বলে তারা সন্ন্যাসী নয়। নারীসঙ্গও করে থাকে।

অন্নদাশঙ্করের উপরও বাউল প্রভাব পড়েছে। বাউল বৈষ্ণব সহজিয়ার প্রতি তাঁর একটি সহজ আত্মীয়তাবোধ আছে। তাঁদের কাছেও তিনি গেছেন নিজের জিজ্ঞাসা নিয়ে। উত্তরও পেয়েছেন মিস্টিক ভাষায়। তাঁর শৈলীর পেছনে যে স্নিগ্ধতা ও সরলতা তা ছড়া বাউল গানের সংসর্গেরও ফল, লোকসাহিত্যেরও উত্তরাধিকার। সুতরাং স্বাভাবিক যে তিনি লালন ফকিরকে নিয়ে বই লিখবেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন এবং তা নিয়ে আলোচনাও করেন।

লালনের গানের ভাষা যত সহজ তার মর্ম তত সহজ নয়। তাতে কখনো কখনো এমন সব দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা হয়েছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেসব তত্ত্বের মর্মভেদ করা অসম্ভব, যদি তত্ত্বদর্শীরা ব্যাখ্যা না করেন। অন্নদাশঙ্করকে আগ্রহী করেছিল লালনের গানের এসোটেরিসিজম তেমন নয়, যতটা তার মিস্টিসিজম ও সাহিত্যগুণ। সাহিত্যের বিচারে লালনের যে গানগুলি উত্তীর্ণ তেমন গানের উপরেই তাঁর পক্ষপাত।

বাউল গানকে লোকসঙ্গীত বলা যায় কিনা এ নিয়ে দ্বিমত আছে। কারণ বাউল গান সেই অর্থে ততটা লোকসঙ্গীত নয় যতটা সাধনসঙ্গীত। তাই বাউল গান সংগ্রহ করার সময়ে টীকা সমেত করতে হবে। আধুনিক জীবনের চাপে কোণঠাসা লোকসংস্কৃতিকে এরকম ভাবেই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায়। লালন সম্পর্কে লেখকের আগ্রহের আর একটা কারণ হলো, লালন একটা সমন্বয়ী ধারা এনেছিলেন। লালনের গানের এটা একটা সামাজিক দিক।

লালনের গান হিউম্যানিজম বা মানবিকবাদের সঙ্গেও একদিক থেকে যুক্ত। সেই মানবিকবাদ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পরম্পরাগত বাউল সহজিয়া সাধনার মর্মবাণী। এ সাধনা মানুষের উপরে বা মানুষের বাইরে কারো অস্তিত্ব আছে কিনা, জানতে চায় না। যদি কেউ থাকে তবে 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ।' তাকে খুঁজতে হবে মানুষের নিজের ভিতরেই।

আমরা একে-একে দেখছি কীভাবে অন্নদাশঙ্কর তাঁর জিজ্ঞাসা নিয়ে গেছেন নানা জনের কাছে ও তাঁদের কাছে যে উত্তর পেয়েছেন তার সাহিত্যিক বর্ণনা রেখেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে বা নিবন্ধে।

গ্যেটে, টলস্টয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির আর প্রমথ চৌধুরী—এঁদের ছাড়াও আরও কত যে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক প্রবন্ধ সমগ্রের এই দুই খণ্ডে! বস্তুত আর কোন বাঙালি লেখক দেশি ও বিদেশি, সমসাময়িক বা চিরকালীন এত বেশিসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে লেখেননি। নিবন্ধগুলি সরস, সুন্দর, সপ্রাণ করে লেখা। ছোট ছোট রচনা, কিন্তু মর্মস্পর্শী।

রচনাশৈলীর উদ্দেশ্য হলো সবচেয়ে কম কথায় সবচেয়ে বেশি ভাব সবচেয়ে সহজভাবে প্রকাশ।

মিনিয়েচার পেন্টিং-এর মতো এই স্মৃতিচিত্র বা রূপচিত্রগুলি। দেশকাল-পাত্রের নানা রূপ ও সত্তা রচনাগুলি থেকে উদ্ভাসিত ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সুতরাং এইসব রচনা উল্লেখযোগ্য শুধু সাহিত্যমূল্যের জন্য নয়, এদের সামাজিক-ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

শুধু নিজের আলোটুকু জ্বালানোই নয়, অন্যের আলোটুকু দেখানোও এই লেখক নিজের এক কৃত্য রূপে গ্রহণ করেছেন। উদারচরিত এক মনীষীর লক্ষণ এই। আর এভাবেই অন্নদাশঙ্করের মধ্যে আবার ঔদার্য ও মনীষার মিলন ঘটে। অন্নদাশঙ্কর জীবনে ও সাহিত্যে যে বহুমুখী সমন্বয় ঘটিয়েছেন এটি তার আরেকটি দিক।

লেখক-কর্তৃক-আলোচিত ব্যক্তিবর্গ প্রায় প্রত্যেকেই বীর—কর্মবীর বা জ্ঞানবীর। আর এই রচনাগুলি যেন তাঁদের উদ্দেশে লেখকের প্রণতি—

যেখানে বীর যত আছে
প্রণাম সকলের কাছে।

কথাশেষ

চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের গ্রন্থ ও নিবন্ধগুলি পড়া শেষ হলে পাঠকের চোখে ও মনে প্রথমেই যা ধরা পড়ে তা হলো একদিকে রুরোপিয় মননের সঙ্গে বাঙালি আবেগের মিলন, অন্যদিকে লেখকের প্রসন্ন দৃষ্টি, স্নিগ্ধ কৌতুক এবং নিরাসক্ত কিন্তু সম্পৃক্ত মনোভঙ্গি। লেখক-এর 'আমি'-কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ সাবজেকটিভ রচনা এগুলি নয়, এখানে লেখক তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাক্ষ্যকে মোটেই উপেক্ষা করেন নি। 'প্রত্যেকটি ব্যক্তিই এক একটি বিশ্ব। কবিরা যাকে আমি বলেন সে আমি কি দৃশ্যমান একটি মানুষ যাকে ফোটোগ্রাফে ধরা ছোঁয়া যায়? সে আমি অসীম, অপার্থিব, অবর্ণনীয়।' তার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়েই এইসব Personal Essays লেখা হয়েছে।

পাঠক আরও দেখবেন, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে লেখক কোন চূড়ান্ত রায় দেন নি। কেননা, সহজে বিচার করে না শিল্পী/মানুষের দোষগুণে//নীতিবোধ তার জাগ্রত, তবু / নয় সে নীতিনিপুণ।

এইসব সহজ, সরল, প্রসন্ন ও মিতাক্ষর রচনার মধ্যেও লেখকের রূপ ও বাণী নিহিত।

১·২·৯৩.

বীমান দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

রবীন্দ্রশতপূর্তি উপলক্ষে কিছু লিখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করতে চাইনি। ভেবেছিলুম কবির রচনাবলী আদ্যোপান্ত পড়ব। সেই হবে আমার কৃত্য। কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত। টলস্টয়ের মৃত্যুর অর্ধশতক পূর্ণ হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ পূরণের মাস ছয়েক পূর্বে। আমার উপর ভার পড়ে উভয়ের সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি 'পেপার' লিখে আলোচনার সূত্রপাত করণের। সেই রচনাটির সন্ধান পেয়ে বন্ধুবর শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় সেটির তর্জমা করতে উৎসুক হন। আমি অনুমতি দিই। অনুবাদটি যখন "সপ্তর্ষি"তে প্রকাশিত হয় তখন লক্ষ করি যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সেটি যে অনুবাদ এমন কথাও কোনোখানে মুদ্রিত হয়নি। লোকে মনে করবে আমিই বাংলায় লিখেছি। এ নিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ খেয়াল হলো যে মূল নিবন্ধটিকে ইংরেজী থেকে ভাষান্তরিত করা আমারি তো দায়িত্ব।

তার থেকে এলো শতপূর্তি উপলক্ষে আমার একখানি বই বার করার সংকল্প। প্রথমে মনে করেছিলুম পুরোনোর সঙ্গে নতুন মিলিয়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আমার যাবতীয় রচনা একত্র করব। কিন্তু পুরোনো রচনাগুলি গোছানো হচ্ছে অপর একটি গ্রন্থে। প্রবন্ধ সংকলনে। প্রকাশক বললেন, পুরোনো রচনা দুই জায়গায় ছাপা চলবে না। সংকলন থেকে তুলে নিলে সংকলন কানা হয়ে যাবে। অগত্যা নতুন রচনা দিয়েই শতপূর্তির সাজি ভরাতে হলো। যাঁরা আমার পুরোনো রচনাগুলিও পড়তে চান তাঁরা সেগুলি পাবেন সংকলনে।

শরীর মন প্রসন্ন থাকলে "টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ" নামক সেই নতুন রচনাটিও হেতো এই শতপূর্তি প্রবন্ধমালায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাল ছেড়ে দিতে হলো। নইলে এ বই বেরোবার আগে শতবার্ষিকী পেরিয়ে যাবে। যার থেকে বই তাই গেল বাদ। দুঃখিত। কিন্তু নিরুপায়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শান্তিনিকেতন,
২৫শে মার্চ ১৯৬২

সম্প্রতি আমি টলস্টয়ের জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে অনেক জায়গায় আশ্চর্য মিল লক্ষ করলুম। যে মিলটি আমাকে বিশেষভাবে দোলা দিল সেটি তাঁদের প্রয়াণের পরেই প্লাবন।

রুশ গুরুর তিরোভাবের পর সাত বছর যেতে না যেতেই ঘটে গেল বিপ্লব। তাঁর নিজের পুত্রকন্যাদেরই পালিয়ে যেতে হলো বিদেশে। যতদূর জানি আজ অবধি তাঁরা স্বদেশে ফেরেননি। আর টলস্টয়ের ভাবধারাও বৌদ্ধধর্মের মতো নিজ বাসভূমে বিলুপ্ত।

তেমনি ভারতীয় ঋষির অন্তর্ধানের সাত বছর পরেই—প্রায় কাঁটায় কাঁটায় —ভারতবর্ষ হয়ে গেল দু'ভাগ। এক ভাগ চলল ভারতবর্ষের বাইরে। বাংলাদেশ হয়ে গেল দু'খানা। একখানার নাম থেকে "বাংলা" শব্দটাই মুছে গেল কিছুদিন পরে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে, অন্যান্য জমিদারির সঙ্গে তাও হলো রাষ্ট্রসাৎ। যেখানে তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছিল সেখানে তাঁর পুত্রকন্যাও আজ বিদেশী নাগরিক। বেঁচে থাকলে তিনিও হতেন "এলিয়েন"।

আর তাঁর সেইসব বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত? "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।" "আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি।" "বাংলার মাটি বাংলার জল।" কেউ গায় না এসব গান পাকিস্তানে। গাইলে দেশদ্রোহ হবে। এপারেও কি গায়? গাইবে কোন মুখে? কেউ বিশ্বাস করে না যে আবার সেসব দিন ফিরবে। বা আবার বাংলাদেশ এক হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনাও করতে পারে না যে, "এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!"

অথচ টলস্টয়ের মতো রবীন্দ্রনাথও সারা জীবন সাধনা করেছিলেন যাতে এ রকমটি পরে না হয়। করেছিলেন তাঁর নিজের সীমাটুকুর মধ্যে। শান্তিনিকেতনের কথা, রবীন্দ্রসাহিত্যের কথা সকলেই জানেন। আমি আজ বলব জমিদারির কথা।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার আগে আমি যখন লণ্ডনে প্রোবেশনার আমার এক বাঙালী বন্ধু আমাকে বলেন, "ওহে, তুমি তো দেশে ফিরে গিয়ে শাসক হবে। একটু খোঁজ নিয়ো তো। রবীন্দ্রনাথ কি সত্যি একজন প্রজাপীড়ক জমিদার?"

আমি তো অবাক। জানতে চাই কোথায় তিনি শুনলেন ও কথা।

তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, "কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।"

মনে আঘাত লাগল। বন্ধু সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, "দ্যাখ, জমিদার-মাত্রেই প্রজাপীড়ক। নইলে জমিদারি রাখা যায় না।"

প্রসঙ্গটা আমি ভুলে যাই। বছর কয়েক পরে আমাকে দেওয়া হয় আমার প্রথম মহকুমা। রাজশাহী জেলার নওগাঁও। বন্ধুরা রসিকতা করে বললেন, "বার বেথা স্থান। সরকার বাহাদুর মানুষ চেনেন। নইলে এত লোক থাকতে

তোমাকে কেন পাঠাবেন গাঁজামহলে ?"

গাঁজার চাষের জন্যে নওগাঁর সুগন্ধ বহুদূর প্রসারিত। সেখানে গিয়ে সত্যি সত্যি গাঁজার গন্ধে আমার নেশা ধরে গেল। বাতাসে গাঁজার গন্ধ। তাছাড়া গাঁজাচাষীদের একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আরো কয়েকটা উপপ্রতিষ্ঠান ছিল। এইসব নিয়ে থাকাও এক জাতের নেশা। মহকুমা শাসকের জীবনটা এমনিতেই বিচিত্র। যেন একটা ষোলো ফলা ছুরি। জমিদারের জন্যে বিখ্যাত উত্তরবঙ্গ। বহু জমিদারের সঙ্গে আলাপ হলো। ঘুরে ঘুরে দেখলুম তাঁদের জমিদারি। খেয়াল ছিল না যে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিও আমার মহকুমায়। একদিন পতিসর থেকে আমন্ত্রণ করতে এলেন ঠাকুর এস্টেটের এক প্রতিনিধি।

হাতে অন্য কাজ থাকলেও রাজী হয়ে গেলুম। কিন্তু পতিসরে যাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। যেতে হয় নৌকায় করে। কিংবা পালকিতে চড়ে। কিংবা হাতীর পিঠে। এক এক বার এক এক ভাবে সেখানে গেছি। কিন্তু প্রথম বারটা পালকীতে চেপে। সে যে কী যন্ত্রণা! আমি ঢুকি তো আমার শরীর ঢোকে না। শরীর ঢোকে তো হাত পা মুড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকতে হয়। বেরিয়ে আসাটা আরো শক্ত।

পতিসরে পৌঁছিয়ে মনটা খুশিতে ভরে যায়। রবীন্দ্রনাথের পতিসর। তীর্থবিশেষ। আরো কয়েকবার সেখানে যেতে হয়েছে। পরবর্তীকালে রাজশাহী জেলার কালেকটার রূপেও। আমার ব্যবহারের জন্যে কোনো কোনো বার হাউসবোটও পেয়েছি পতিসরের জমিদারি থেকে। হাউসবোটেও রাত কাটিয়েছি কবির মতো। তবে নাগর নদীটা একটা খালের মতো অপ্রশস্ত। তেমন স্রোতও নেই তাতে। আত্রাই তার চেয়ে অনেক চওড়া ও বহতা। আত্রাই ঘাট স্টেশন থেকে যেতে হয় আত্রাই নদী হয়ে। সেইটুকুই আরামের।

জমিদারি দেখার কাজ রবীন্দ্রনাথ অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। যখন থেকে তিনি আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে মহালে আসতেন। তাও বহুদিন থেকে বন্ধ। যাঁকে টানছে চীন থেকে পেরু, তাঁকে টানবে পতিসর শিলাইদা! ইতিমধ্যে একসময় তাঁদের জমিদারি ভাগ হয়ে যায়। কবির ভাগে পড়ে পতিসর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল। শিলাইদা তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের ভাগে। আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক হয়ে শিলাইদা দেখতে যাই, তার আগে দেনার দায়ে সেখানকার জমিদারি বিকিয়ে গেছে। মালিক তখন ভাগ্যকুলের রায়রা।

পতিসরের যে দশা আমি দেখলুম তা পড়তি দশা। পাটের বাজার মন্দা, তাই চাষীদের হাতে টাকা নেই। জমিদারি কোনো রকমে চলছে, কিন্তু প্রজাদের অল্প সুদে কর্জ দেবার জন্যে যেসব ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন দরদী রবীন্দ্রনাথ সেসব প্রায় অচল। বহু টাকা খাতকের ঘরে আটকে রয়েছে। অতি ক্লেশে চলছে কল্যাণবৃত্তি তহবিল। অন্য কারো জমিদারিতে এর মতো কিছু দেখিনি। এটি রবীন্দ্রনাথের কীর্তি। এই তহবিলে প্রজারা দিত অর্ধেক চাঁদা, বাকীটা দিতেন

জমিদার। সরকারী সাহায্য না নিয়ে নিজেদের অর্থে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা চালানো প্রজা ও জমিদার উভয়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু ওই যে বলেছি, পাটের বাজার মন্দা। সেই থেকে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানারও মলিন দশা।

জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সহযোগিতাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তিনি যখন প্রথম যৌবনে মহর্ষির আদেশে জমিদারির কাজ দেখতে বেরোন তখন থেকেই এই আদর্শ ছিল তাঁর মানসে। শিলাইদায় গিয়ে তিনি লক্ষ করেন তাঁর জন্যে দরবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু দরবারে মুসলমানদের আসন নিচে ফরাস পেতে আর হিন্দুদের আসন চেয়ারে বা বেঞ্চিতে। লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের পিত্ত জ্বলে যায়। তিনি জানতে চান এই বৈষম্য কেন। সকলের জন্যে একই প্রকার ব্যবস্থা হয়নি কেন।

এর উত্তরে শুনতে পান, "এই তো বরাবর চলে আসছে, বাবুমশায়। প্রিন্সের আমলেও এই রকম ব্যবস্থা ছিল, মহর্ষির আমলেও। হুজুর কি এই প্রাচীন ব্যবস্থা রদ করতে বলেন ? তা হলে যে শাসন করা যাবে না।"

রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন যে অমন দরবারে তিনি যোগ দেবেন না। সবাইকে সমান শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। তাই শেষ পর্যন্ত হলো। তাঁর মুসলমান প্রজারা তখন থেকেই তাঁর বিশেষ অনুগত। এ ঘটনাটা শিলাইদার। আমার জন্মের পূর্বের। আমি এটা পড়েছি শিলাইদার এক জমিদারি কর্মচারীর গ্রন্থে। কিন্তু এর পরে যেটার কথা বলছি সেটা আমার চোখে দেখা।

রাজশাহীতে থাকতে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলুম রবীন্দ্রনাথ এসেছেন পতিসরে। আমি যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি সেইদিনই কলকাতা ফিরবেন। সময় একেবারেই ছিল না। ছুটলুম মোটরে করে নাটোর, তার পরে ট্রেন ধরে আত্রাই ঘাট। ট্রেন থেকে নেমে নৌকায় করে যাই রবীন্দ্রনাথের হাউসবোটে। তিনি পতিসর থেকে ফিরছেন। বোট ঘাটে ভিড়লে পরে চেয়ার পেতে প্ল্যাটফর্মে তাঁর পাশে আসন নিলুম।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওই লোকগুলিকে দেখছ ? ওরা সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে আমার সঙ্গে এসেছে। পতিসরে এ সময় আসার কথা ছিল না। ওরাই আমাকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়েছিল। কতকাল দেখেনি।"

তা তো চাইবেই। দুনিয়ার লোক দেখল। আর দেখতে পেলো না ওরাই! কবি বোধ হয় পনেরো বছর ও-মুখো হন নি। তাঁর বয়স তখন ছিয়াত্তর। স্বাস্থ্যেও ভাঙন ধরেছে। পতিসরে যাতায়াত তো চারটিখানি কথা নয়। তাঁর সেই হাউসবোটটিরও অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসছে। বোধ হয় আদায়পত্র সুবিধের নয়।

"ওরা কী বলছে, শুনবে ?" রবীন্দ্রনাথ বলতে থাকলেন। "বলছে, পয়গম্বরকে তো স্বচক্ষে দেখিনি। আপনাকে দেখেছি।"

পয়গম্বরকে আমিও কি স্বচক্ষে দেখেছি ? কিন্তু গুরুদেবকে তাঁর সেই পরিপক্ক কেশশ্মশ্রুমণ্ডিত পরিণত বয়সে কোনো এক পয়গম্বরের মতোই দেখতে।

মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় হয়ে এসেছিল। তিনি আমাদের মধ্যে থাকলেও আমাদের একজন নন।

ইয়া ইয়া দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো মুসলমান। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল শিষ্যজনের মতো। কলকাতাগামী ট্রেন এলো। এক মিনিট কি দু'মিনিট থামল। গুরুদেবকে তুলে দেওয়া হলো ধরাধরি করে। তাঁর প্রজাদের চোখে জল। শেষবারের মতো তাঁকে তারা সালাম করল। তিনি তো কেবল জমিদার নন। তিনি পয়গম্বরের কাছাকাছি যান।

সেবার আমি তাঁর একমাত্র সহযাত্রী হয়ে নাটোর পর্যন্ত যাই। প্রধানত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। কিন্তু আমাকে তিনি সেইজন্যে ডেকে পাঠাননি। ছিল একটা বৈষয়িক অনুরোধ। নাটোর ট্রেন থেকে নেমে তাঁকে বিদায় দিয়ে রাজশাহী ফিরে যেতেই আমার বৃদ্ধ মুসলমান জমাদার আমাকে ছেঁকে ধরল। "হুজুর বাহাদুরের কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

আমি বললুম। জানতুম না যে সে বুঝবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে।

এই লোকটি কালেক্টারের কাছে তরুণ বয়স থেকে চাপরাশীগিরি করে এসেছে। সরকারী কানুন এর জন্যে নয়। এর বয়সের আর সবাই কবে অবসর নিয়ে ভূত হয়ে গেছে। একে ছাড়ানোর সাহস কোনো কালেক্টারের হয়নি। আমি তো এর নাতির বয়সী। এ যে দয়া করে বেঁচে আছে এতেই আমার সম্মান।

শফি জমাদার আমাকে বকুনির সুরে বলল, "আহা, ঠাকুরবাবু এসেছিলেন! আমাকে কেন নিয়ে গেলেন না, হুজুর? আমি তাঁকে দেখিনি কতকাল। দেখে আসতুম।"

"তুমি তাঁকে দেখেছ?" আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলুম। "কবে?"

"সেই যেবার তিনি এসেছিলেন রাজশাহীতে। পালিত সাহেব তখন এখানকার জজসাহেব। জজসাহেবের কুঠিতে ছিলেন। আহা, ঠাকুরবাবু কী সুন্দর মানুষ! কী সুন্দর গান করেন! আমার এখনো মনে আছে।" তার মন চলে গেল কোন্ অতীতে।

আমি হিসেব করে দেখলুম সে বলছে চুয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা, কবির বয়স যখন বত্রিশ! পদ্মার বুকে হাউসবোটে বাস করতেন।

পরে শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবকে আমি একথা বলেছিলুম। তিনি সকরুণ ভাবে বলেন, "তখন আমার গানের গলা ছিল।"

আর একবার পতিসরে যেতে যেতে পথে এক জায়গায় হাতীর পিঠ থেকে নামি। হাতী জল খেতে যায়। সেই ফাঁকে আলাপ হলো এক গ্রাম্য গৃহস্থের সঙ্গে। ঠাকুরবাবুদেরই হিন্দুপ্রজা। সে আপনার থেকে শোনাতে আরম্ভ করে তার ছেলেবেলাকার গল্প। বাবুমশায় এসেছিলেন পতিসরে। বোট থেকে নামলেন না। প্রজারা তাঁকে সেইখানে গিয়ে ভেট দিয়ে এলো। তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল। শ্রাদ্ধের ভেট।

প্রথম দিন তিনি গ্রহণ করলেন। কিছু বললেন না। পরের দিন আবার

সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, "আমার বাপের শ্রাদ্ধ! আমি নেব তোদের কাছ থেকে ভেট! ছি ছি! কী লজ্জার কথা! যা, যা, ফিরিয়ে নিয়ে যা।" এই বলে সব ফিরিয়ে দিলেন। প্রজারা তো হতভম্ব। কোনো জন্মে এমন জমিদার দেখেনি।

পতিসরের চেয়ে শিলাইদা আমার ভালো লেগেছিল। ঠাকুরবাবুদের পরিত্যক্ত কুঠিবাড়ীতে আমি কয়েক রাত ছিলুম। তেতলায় একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে ওরা বলে, "বাবুমশায় এই ঘরে বসে 'গীতাঞ্জলি' লিখেছিলেন।" অনেক গল্পই শোনা গেল সেখানে। যদিও তিনি তখন আর সেখানকার জমিদার নন, তবু কেউ তাঁকে ভোলেনি। তাঁর স্থান আর কাউকে দেয়নি। তিনিই তখনো সেখানকার প্রিয়তম প্রভু।

জমিদারি কাছারিতে পুরোনো কাগজপত্র তখনো কিছু কিছু ছিল। দেখতে চাইলুম গুরুদেবের হাতে লেখা জমিদারি হুকুম। খান দুয়েক চিঠি ওরা আমাকে দেখায়। পড়ে দেখি রবীন্দ্রনাথের আর এক রূপ। কে বলবে যে তিনি একজন কবি! উপমাবহুল অলঙ্কৃত গদ্য নয়। রাশভারি মেজাজে লেখা নীরস নিরাভরণ বৈষয়িক লিপি।

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি কৃষিবিদ্যা শিখতে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। এবার তাঁর জন্যে শিলাইদার কাছে চর জমি কিনে ফার্ম করে দিতে চান। নোবেল প্রাইজের আগের পর্যায়ের কথা। বিশদ উপদেশ ছিল জমিদারির কর্মচারীটির প্রতি। যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটাও জমিদারি সেরেস্তার বাংলা। আরম্ভটা সংস্কৃত সম্বোধন দিয়ে। আহা, কেন যে তখন নকল করিয়ে রাখিনি!

না, "কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।" সেই শিলাইদাতেই তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার খবর পাওয়া গেল। কবিতার টেকনিক নিয়ে নয়। মণ কয়েক ইলিশ মাছ যোগাড় করে মাটিতে পুঁতেছিলেন। জমি সারবান হবে। গন্ধে মানুষ পাগল হয়ে যায় আর কী!

কুষ্টিয়ায় থাকতে তাঁর সেই পাটের কারবারের একমাত্র স্মরণচিহ্ন নজরে পড়েছিল। একটা বাড়ীর গায়ে লেখা ছিল "টেগোর অ্যান্ড কো।" ততদিনে তার হাত বদল হয়েছে। কারবার তো তিনি নিজেই গুটিয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান। নিজের শক্তির বা বুদ্ধির অভাব ছিল না। বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারীরই অভাব। নইলে তাঁকে বিরাট এক দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে শিলাইদার কর্মস্থল ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে তপোবনে বাস করতে হত না। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে বানপ্রস্থ নিতে হতো না।

তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র তাঁর কর্মস্থলে বসে তাঁর কর্মধারা অনুসরণ করবেন। তাও ঘটে উঠল কই? নোবেল প্রাইজের পর সব ওলটপালট হয়ে যায়। এমন কি জমিদারির সদর কার্যালয় পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি আদর্শের প্রথম কথা ছিল জমিদার হবেন না অনুপস্থিত উপস্বত্বভোগী, প্রজাদের ছেড়ে দেবেন না জমিদারি আমলাদের হাতে। শেষপর্যন্ত আমলাতন্ত্রেরই জয় হলো।

রাশিয়া বেড়াতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন তিনি যে জমিদার এর জন্যে তিনি লজ্জিত। টলস্টয় যেমন স্ত্রীর উপরে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি পুত্রের উপরে জমিদারি চালানোর ভার ন্যস্ত করে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী যখন তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে যাবার আগে তিনি যেন তাঁর জমিদারি নেশনকে দান করে দিয়ে যান তখন তিনি নারাজ হন। পুত্রকে তিনি বঞ্চিত করবেন না।

কয়েক বছর পরে বঞ্চিত করল ইতিহাস।

(১৯৬১)

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ

যে বছর বৈশাখমাসে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সেই বছরই ফাল্গুনে মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রায়পুর গ্রামে এসে সেখানকার জমিদার ভুবনমোহন সিংহ মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা, চৈত্রমাসেও দ্বিতীয়বার ব্রহ্মোপাসনা। পরবর্তী চৈত্রে ভুবনবাবুর পুত্রদের কাছ থেকে তিনি ভুবনডাঙা গ্রামে কুড়ি বিঘা জমির মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। এই জমি তখন জনমানবহীন তরুলতা-হীন তেপান্তরের মাঠ। দুটিমাত্র ছাতিম গাছ ছিল বাতিঘরের মতো দাঁড়িয়ে। সেই ছাতিমতলায় বসে তিনি ধ্যান করতে ভালোবাসতেন।

প্রথম দিকে তাঁবু খাটিয়ে গুসকরা প্রভৃতি অঞ্চলে নির্জনবাস ছিল মহর্ষির অভ্যাস। কিন্তু জমি খরিদ করার পর তাতে একখানি একতলা ইমারত উঠল। তার পরে সেটি হলো দোতলা। তার চার দিকে আম কাঁঠাল আমলকী শাল দেবদারু ইত্যাদি গাছ লাগানো হলো। ফুলগাছ লাগিয়ে ফুলবাগান করা হলো। এই যে উদ্যানগৃহ এর নাম রাখা হলো "শান্তিনিকেতন"। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর দুই। মহর্ষি তাঁর আপন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে এই নির্জন প্রান্তরা-বাস নির্মাণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন থাকতেন ও ছাতিম-তলায় বসে ধ্যান করতেন। বোলপুর স্টেশন থেকে অনতিদূরে বলে কলকাতা থেকে অনায়াসেই যাতায়াত করা যেতো।

প্রায় বারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়ে যাবার পথে এখানে কয়েক দিন থামেন। সেই তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতন দেখা। প্রথম দর্শনেই প্রেম। "সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।" লিখেছিলেন কবি পরবর্তীকালে তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে।

এটা হলো ১৮৭৩ সালের ঘটনা। এর বছর দশেক পরে মহর্ষি শেষবারের মতো শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর পরেও তিনি আরো বাইশ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে নির্জনবাসের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তাঁর

ফুরিয়েছিল। উদ্যানগৃহটি পোড়োবাড়ির মতো পড়ে থাকে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ধর্মপিপাসু যুবক বোলপুর থেকে মাঝে মাঝে এখানে এসে প্রেরণালাভ করতেন। তিনি দেখতেন, "প্রকাণ্ড প্রাসাদ মেরামতের অভাবে শ্রীভ্রষ্ট, আসবাবপত্রও যৎসামান্য, উদ্যানের বৃক্ষলতাদি যত্নের অভাবে অধিকাংশ শুষ্ক ও শ্রীহীন।" অঘোরবাবু ও তাঁর বোলপুরের ধর্মোৎসাহী বন্ধুরা বৎসরান্তে একবার শান্তিনিকেতনে এসে উপাসনা করতেন। বছর তিনেক পরে তিনি কলকাতা গিয়ে মহর্ষিকে দর্শন করেন। মহর্ষির শরীর তখন খুব দুর্বল, "কিন্তু আত্মার তেজ যেন দুর্বল শরীর ভেদ করিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে। ...তাঁহাকে পরমাত্মাতে নিমগ্নচিত্ত দেখিলাম। যোগসমাধিধ্যানের সাক্ষাৎ প্রতি-মূর্তি বলিয়া বোধ হইল।" অঘোরবাবু লিখেছেন।

মাস কয়েক পরে অঘোরবাবু পুনরায় মহর্ষির দর্শন লাভ করেন। "মহর্ষি বলিলেন, লোকে বলে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া মিছা ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি ফল? লোকে বোধ হয় তোমাদিগকে এই সব কথা বলিয়া থাকে। যে মানের উপাসনা করে সে মানী হয়, যে যশের উপাসনা করে সে যশোবান হয়, যে ব্রহ্মের উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও সেই মহানের উপাসনা করিয়া মহান হই।" অঘোরবাবু দেখেন "মহর্ষি সর্বদাই হাফেজের শ্লোক বলিতেছেন। ঈশ্বর প্রেমে যেন সদাই মগ্ন।...তিনি বলিলেন, উপনিষদে ঈশ্বরকে প্রজ্ঞানঘন—ঘনীভূত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ প্রজ্ঞার ডেলাস্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞার উপাসনাতে প্রজ্ঞান লাভ হয়।... কিন্তু আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে তিনি সৌন্দর্যঘন—জগতের সকল সৌন্দর্য একত্র করিয়া দেখ, সকল সৌন্দর্য যেন একত্র হইয়াছে—সকল সৌন্দর্য তাঁহারই, তিনি সৌন্দর্যঘন।"

এসব উক্তি উদ্ধার করার উদ্দেশ্য মহর্ষি ছিলেন সৌন্দর্যঘন ব্রহ্মের উপাসক। তাঁর সেই সাধনা তাঁর পুত্রদের জীবনেও বর্তায়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের জীবনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের উত্তরসাধক।

এর পরে মহর্ষি একদিন অঘোরবাবুকে ডেকে পাঠান। বিস্তর আলোচনার পর ১৮৮৮ সালের গোড়ার দিকে মহর্ষি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও শান্তি-নিকেতন ট্রাস্ট ডিড সম্পাদন করেন। ট্রাস্টীরা কলকাতায় থাকবেন, সুতরাং শান্তিনিকেতনে অবস্থানকারী একজন আশ্রমধারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আশ্রম শব্দটি সেই উপলক্ষে প্রথম ব্যবহার করা হয়। পঁচিশ বছর কাল যা ছিল তা মহর্ষির একান্তবাসের জন্যে নির্মিত শান্তিনিকেতন উদ্যানগৃহ। তার পরে যা হলো তা নিরাকারবাদী উপাসকদের জন্যে রক্ষিত শান্তিনিকেতন আশ্রম। "নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রাস্ট ডিডের লিখিত কার্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক, ঐ সমুদয় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রস্টী নিযুক্ত করিতেছি..." এই হলো দলিলের বয়ান।

তিন হাজার বছর আগে আমাদের দেশে ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের আশ্রমও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্বে আবার ফিরে এল সেই যুগ। ঋষিরা এলেন, আশ্রম আসবে না? ভারতবর্ষ ছেয়ে গেল আশ্রমে। তপোবন সৃষ্টি হলো কেবল হিমালয়ে নয়, শহরের আশেপাশে, রেল স্টেশনের অনতিদূরে, বৃক্ষবিরল প্রান্তরে। শান্তিনিকেতন যে সময় আশ্রম আখ্যা নেয় সে সময় আশ্রম কথাটা পুঁথির পাতা থেকে সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার রূপ তখনো স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু নাম স্থির হয়ে যায়। অন্নপ্রাশনেরও ব্যবস্থা হয়। বার্ষিক আয় ছিল ১৮০০ টাকা। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম নির্বিশেষে নিরাকার উপাসনায় বিশ্বাসী যে কোনো অতিথি এখানে কিছুদিন বাস করতে পারতেন। খরচ বহন করত আশ্রম।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৪ঠা কার্তিক ১২৯২ সনে (ইংরেজী ১৮৮৫ সালে) এক সভা হয়। এই সভার বিবরণী "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। "শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, যিনি ধর্মালোচনা ও ধর্মোন্নতির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইঁহারা দুইজনে উপাসনায় আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন। মোহিনীবাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ এবং রবীন্দ্রবাবুর প্রাণস্পর্শী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চব্বিশ বছর।

পরে ৯ই কার্তিক সন্ধ্যার পূর্বে শান্তিনিকেতনে সাপ্তাহিক উপাসনার সূত্রপাত হয়। মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন এক নম্বর ট্রাস্টী। তাঁর অনুরোধে অঘোরবাবু আচার্যের কার্য নির্বাহ করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে উপাসনার কার্য সম্পাদিত হয়। বোলপুর থেকে চার পাঁচ জন ভদ্রলোক যোগ দিয়েছিলেন। এর পরে ১১ই কার্তিক আশ্রমে আসেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তিনি তখন "কাণ্টের দর্শন ও বেদান্ত দর্শন" নিয়ে তন্ময়। সেই মাসেই মহর্ষি অঘোরনাথকে ডেকে পাঠান ও আশ্রমধারী নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর বোলপুরের বাসস্থান ছেড়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করতে আরম্ভ করেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে ব্রহ্মোপাসনা হতো। আশ্রমে আমিষভোজন নিষিদ্ধ। অঘোরবাবু সে সময় নিরামিষাশী। অসুবিধা হলো তাঁর পরিবারের। আশ্রমের বাইরে "নিচু বাংলা" নামে একটি খড়ের বাংলা ছিল। এখনো আছে, কিন্তু খড়ের নয়। তাঁদের যেদিন মাছ খাবার ইচ্ছা হতো সেদিন সেখানে গিয়ে খেতেন। পরবর্তীকালে এটি হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের আবাস।

ক্রমে ক্রমে নানা স্থান থেকে ব্রাহ্মরা আসতে লাগলেন। তাঁদের সম্বন্ধে অঘোরবাবু লিখেছেন, "তাঁহারা জাতীয় বা কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া সার্বজনীনতা প্রদর্শনের জন্য বিচিত্র উপাধিযোগে আপনাদের নাম উল্লেখ করিতেন। কেহ হইলেন সৈয়দ মুকুন্দ গডসন (Godson), কাহারও উপাধি "ব্রহ্মসন্তান"। বিনোদবাবু "লেডি ফ্রেন্ড" (Lady Friend) উপাধিতে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।"

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় মন্দির ছিল না। মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ সালের শেষের দিকে। স্থাপন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। উপাসনা করেছিলেন তিনি, বক্তৃতা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ আর গান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদাই করা হয়। সেই ফলক, সেইদিনের স্টেটসম্যান পত্রিকা, সেই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে প্রোথিত হয়। আশ্রমধারী অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতির সাহায্যে লিখেছেন, "তখন আমার বয়স পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। নির্জন আশ্রম বহু কর্মীতে ভরে গেছে, পাথর কাটা হচ্ছে, তার বিচিত্র শব্দ, তার পর রং-এর কাজ, টিন-টিন রং এসেছে, স্ত্রীলোকেরা তা শিলে বাটছে, ছাঁকছে, তার পর মিস্ত্রীরা লাগাচ্ছে। বহু-রং-এর কাচ কাটা হয়ে লাগানো হচ্ছে।..."

এক বছর পরে মন্দিরের কাজ সারা হয়। তখন এই পৌষ মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন। তাতে ছিল, "অদ্য সর্বসাক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্বক এই শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থ নূতন ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইল।" সেদিনকার প্রাতঃকালীন উপাসনায় বেদী গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও অদ্ভুতানন্দ স্বামী। বক্তৃতা করেন শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। সন্ধ্যাকালের উপাসনায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একাকী বেদী গ্রহণ করে উৎসব সমাধা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করার জন্যে তিনি মহর্ষির কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। শান্তিনিকেতনের মন্দির শুধুমাত্র ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের ঘরোয়া জিনিস হয়ে থাকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কখনো তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দিত না। এ মন্দির নিরাকারবাদী ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই আপনার জিনিস। পরের বছর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একাকী উপাসনা করেন প্রাতঃকালে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সন্ধ্যাকালে। প্রতাপচন্দ্র ছিলেন কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তথা নববিধান সমাজের আচার্য। মহর্ষির দেখছি অব্রাহ্মণে আপত্তি ছিল না ১৮৯২ সালের শেষে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বেদীগ্রহণে।

জ্ঞানবাবুর জবানীতে "তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম আতসবাজি প্রদর্শন করা হয়, এবং পঞ্চম বার্ষিকে সর্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়। ক'এক বছরই ভক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর যাত্রার দল নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর দল এখানে ক'একবার গান করে গেছে। অনেক উৎসবেই গুরুদেব গানের ভার নিয়েছিলেন। তিনি উপস্থিত থাকলে দু'একখানা গান একলাই গাইতেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় উৎসবে কীর্তন করতেন, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণাকুমার সেন একবার খোল বাজিয়েছিলেন।"

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ তখনো গুরুদেব হননি। তখনকার দিনে তিনি শিলাইদায় জমিদারি দেখছেন আর "সাধনা" সম্পাদনা করছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর আসা নিয়মিতভাবে পৌষোৎসবের সময়। অন্য সময়ও তিনি আসতেন। অন্য সময় শান্তিনিকেতন ভবনের একতলার বড় ঘরে জাজিম বিছিয়ে উপাসনা হতো। জ্ঞানবাবু তাঁর মাতৃদেবীর পাশে বসে উপাসনায় যোগ দিতেন। তাঁর পিতৃদেবই উপাসনা করতেন। প্রায়ই বাইরের সাধকরা কেউ না কেউ আসতেন, আর এরূপ কেউ এলে তিনিই উপাসনা করতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই আসতেন। আশ্রমে একখানি বৃহদাকার বাইবেল গ্রন্থ ছিল, তিনি সেখানি সম্মুখে নিয়ে উপাসনায় বসতেন। জ্ঞানবাবু অন্যান্য সাধক অতিথিদের নামের তালিকা দিয়েছেন। তাতে দেখতে পাই অনেকেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি অনেকবার এখানে দেখেছেন। অঘোরবাবুর ডায়ারিতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে বসে এখানে উপাসনা করতেন।

জ্ঞানবাবুর পিতৃদেব অঘোরবাবু প্রায় দশ বছর আশ্রমধারী ছিলেন। তাই তাঁর নিজের স্থিতিও দশ বছর কাল। তার পরেও তিনি বোলপুর থেকে আসা যাওয়া করতেন। তিনি লিখেছেন, "অনেকে মনে করেন কেবল উৎসবের সময়েই এখানে কিছু হতো, অন্য সময় স্থানটি এমনই পড়ে থাকত। একথা ঠিক নয়। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা এখানে নিয়মিত হতো। তা ছাড়া, বিশেষভাবে সাধনভজনের জন্যে অতিথি সমাগম সারা বছর চলতো।" আরো লিখেছেন, "বাইরের উপাসকরা এলে আশ্রমে সঙ্গীত, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি প্রায় সমস্তক্ষণই চলতো। এখানকার আবহাওয়া এমনি ছিল যে আমি বালককালেই অনুভব করেছি এ স্থান বোলপুর কিম্বা আমাদের গ্রামের ন্যায় নয়, এ ধর্মকর্মের স্থান।"

অঘোরবাবুরা চলে যাবার পর শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজ অচ্যুতানন্দ স্বামী নামক এক উত্তরভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি সংস্কৃত উচ্চারণ করতেন নির্ভুল আর বাংলা বলতেন ভাঙা ভাঙা।

সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্তৃক শুদ্ধভাবে উপনিষদ্ মন্ত্র পাঠ মহর্ষিকে পরম তৃপ্তি দিতে থাকল। যদিও তিনি শান্তিনিকেতনের ত্রিসীমানায় বাস করেন না। এদিকে আশ্রম আর ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার সাধকদের টানতে পারছিল না। ঐ মন্দিরই পৌষোৎসবের সময় যতটুকু সম্ভব দর্শক আকর্ষণ করত। মহর্ষি যেমন জীবন্মৃত, তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ যেমন জীবন্মৃত, তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমও তেমনি জীবন্মৃত।

এই অচল অবস্থা দূর করার জন্যে বলেন্দ্রনাথ এক ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করেন। আশ্রমের ট্রাস্ট ডীডে ব্রহ্মবিদ্যালয় কথাটির উল্লেখ ছিল, কিন্তু সংজ্ঞা ছিল না। ব্রহ্মবিদ্যালয় কি ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে, না ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি অনুসারে শিক্ষাদানের জন্যে? বলেন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে রূপ দেবার আগেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদার তাঁর সন্তানদের

সাহেব ও বাঙালী শিক্ষক রেখে নিজের ইচ্ছামতো শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যের সন্তানদের দায়িত্ব নিয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনার কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি। শান্তিনিকেতনে বসবাস করাও তখন তাঁর ধারণার বাইরে। পাটের কারবারে লোকসান দিয়ে দেনায় জড়িয়ে পড়ার পর তাঁর জীবন একটা সংকটের সম্মুখীন হয়। সংকটটা আর্থিক তো বটেই। তার চেয়েও বড়, পারমার্থিক।

কবিগৃহিণী আর শিলাইদায় থাকতে চাইছিলেন না, মেয়েদেরও বিবাহের বয়স হয়ে যাচ্ছিল সেকালের নিরিখে। কবি সপরিবারে কলকাতা চলে আসেন, পর পর দুই মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু শিলাইদায় ফিরে যান না। কলকাতায়ও তাঁর মন লাগে না। তাঁকে তাঁর আভ্যন্তরিক সংকট থেকে উদ্ধার করে শান্তিনিকেতন। বোধহয় ঋণগ্রস্ত গৃহস্থেরও প্রয়োজন ছিল জমিদারি স্টাইলে না থেকে কম খরচে থাকার। মহর্ষির কাছ থেকে তিনি যে মাসোহারা পেতেন সেই ছিল তাঁর সম্বল। বই থেকে বিশেষ কিছু আয় হতো না।

এর আগে রবীন্দ্রনাথ যতবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন গান করেছেন। ভাষণ দান করেননি। দশম বার্ষিক উৎসবে তাঁকে আচার্য হতে বলেন মহর্ষি। ততদিনে "নৈবেদ্য" লিখে মহর্ষিকে উৎসর্গ করা হয়ে গেছে। কবির জীবন ঋষির জীবনের অভিমুখে যাচ্ছে। তাই ১৯০০ সালে মন্দিরের বেদীগ্রহণ করার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ১৯০১ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাস। ছেলেদের শিক্ষার জন্যে শিলাইদার সেই গৃহ-বিদ্যালয়ই শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু আশ্রমের ট্রাস্ট ডীডের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ছিল না। অথচ তাকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নাম দেওয়াই যথেষ্ট নয়। রূপও দিতে হবে। এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রভাবে পড়ে কবি আরম্ভ করে দেন প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রম। দুটিমাত্র ছাতিম গাছ গত চল্লিশ বছরে বহুসংখ্যক বৃক্ষলতার পরিণত হয়ে তপোবনের স্বপ্ন জাগাচ্ছিল। পাঁচটিমাত্র বালক ব্রহ্মচারী নিয়ে শান্তিনিকেতনের নবপর্যায় শুরু হয়।

(১৯৬১)

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ

আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "জানো তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তেমনি পীরিলির সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে পীরিলি হয়ে যায় পরিবারসুদ্ধু সকলে। এবং সেই পরিবারের সঙ্গে যাদের কুটুম্বিতা তারাও। এবং তাদের সঙ্গে যাদের কুটুম্বিতা তারাও। শুধু এক পুরুষ নয়, পীরিলি হতে হবে পুরুষানুক্রমে আবহমানকাল।"

বাঘে ছুঁলেও আঠারো ঘা একদিন শুকিয়ে যায়, কিন্তু পীরালি হলে তার দাগ কোনো কালে মিলিয়ে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে, তবু

কামদেব ও জয়দেব কুশারীর বংশধরদের পীরালি কলঙ্ক ঘুচে যায়নি। রবীন্দ্রনাথকেও বৃদ্ধবয়সে এর জন্যে দুঃখ করতে শোনা গেছে। কবি ভোলেননি, কারণ তিনি ভুলতে চাইলেও সমাজ তাঁকে ভুলতে দেয়নি। তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তোমরা আমার নাম আচার্য রাখিয়াছ। আমরা বহুদিনের প্রধান আচার্য। পীর অর্থ আচার্য বা গুরু, এবং আলী শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আমরা পীরালি, সুতরাং আমরা বহুদিনের প্রধান আচার্য।" এই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের আশ্রমধারী হন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "নানা অজ্ঞাত কারণে কুলাচার্যগণ যবনদুষ্ট পরিবারসমূহের কাহাকেও মর্যাদা দিয়া সমাজে চালাইয়া দিয়াছিলেন, কাহাকেও বা 'পতিত' করিয়া সমাজে অচল করিয়া রাখিয়াছিলেন। যেসব পরিবার কুলাচার্যগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সমাজে 'পতিত' থাকিয়া গেল, তাহাদেরই অন্যতম হইতেছে 'পীরালি' ব্রাহ্মণগণ।"

প্রভাতবাবু যে কিংবদন্তী বর্ণনা করেছেন তা মানুষের বুদ্ধির প্রতি অপমানকর। কিন্তু "মানুষ" আর "বুদ্ধি" সে সময় আমাদের দেশে ছিল বলে বিশ্বাস হয় না, থাকলে নিষিদ্ধমাংস জোর করে খাইয়ে দেওয়ার ফলে দুটি ব্রাহ্মণসন্তানের পতিত দশা সবান্ধবে ও পুরুষানুক্রমে বর্তায় না। এঁরা যে ইসলাম অবলম্বন করে অন্যায়ের হাত থেকে পলায়ন করেননি, এর জন্যে এঁদের ধন্যবাদ দিতে হয়। সমাজে থেকেই এঁরা সমাজের মনুষ্যত্ব ও সুবুদ্ধির জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছেন।

সমাজে পতিত হওয়াটা নিশ্চয়ই একটা দুর্ভাগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যকেও চেষ্টা করলে সৌভাগ্যে পরিণত করা যায়। পীরালিরা মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করে মানসিক প্রশস্ততার অধিকারী হয়। তাই অনায়াসেই তারা ইংরেজদের সঙ্গে মিশতে পারে। মিশে আরো উদার হয়। সমাজে যাদের পতন ঘটেছে, কী ধরে তাদের উত্থান ঘটবে? পীরালিরা এর উত্তর দিয়েছে ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে, কোম্পানী গড়ে, ব্যাঙ্ক গড়ে। জমিদারিও আর একটা দড়ি যা ধরে উপরে ওঠা যায়। লক্ষ্মীর আরাধনা করে পঞ্চানন কুশারী হন পঞ্চানন ঠাকুর বা 'টেগোর'। সেকালে ইংরেজদুষ্ট পরিবারগুলির নাম লাহা থেকে হয় 'ল'। সাহা থেকে হয় 'শ'। দত্ত থেকে হয় 'ডাট'। তেমনি ঠাকুর থেকে হয় 'টেগোর'। এবার কিন্তু কুলাচার্যগণের সাহস হলো না এদের পতিত করতে। লোকে ঠাকুরকে যত সম্মান করত তার চেয়ে বেশী করল 'টেগোর'কে। চাটুজ্যের চেয়ে 'চ্যাটার্জি'কে। বাঁড়ুজ্যের চেয়ে 'ব্যানার্জি'কে। ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু বাংলা খবরের কাগজে এখনো লেখা হয় 'মুখার্জি'।

একে যবনদুষ্ট, তার উপর ইংরেজদুষ্ট, দ্বারকানাথ ঠাকুরের শুদ্ধির জন্যে গঙ্গানদীতে অত জল ছিল না। তিনি করলেন সমুদ্রযাত্রা। বার বার দুবার। কোথাও লেখে না যে তিনি গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। যার সমুদ্রে

বাস সে শিশিরকে ভয় করে না। যারা অতি সামান্য দোষে পুরুষানুক্রমে পীরালি হয়েছে তাদের ভয় কিসের? আর কত নিচে তাদের নামানো হবে? দ্বারকানাথের মনের জোর ছিল রামমোহনের মতো। সেইসঙ্গে ছিল ধনের জোর। বিজাতীয় শহর কলকাতায় কার কোন্ জাত তার চেয়ে কার কত টাকা সেইটেই বেশী সম্মানের। ইংরেজ আমলে বিত্ত হলো নতুন সামাজিক মর্যাদার মাপকাটি। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ইত্যাদি ভেদবিভেদে উনবিংশ শতাব্দী-তেই আমদানি হয়। ঠাকুরবাড়ীর ওঁরা ব্রাহ্মণ হিসাবে পতিত কি না সেটা ব্রাহ্মণদের উপর ছেড়ে দিয়ে সাধারণ লোকে জানল যে ওঁরা ধনী, ওঁরা অভিজাত। তার চেয়ে বড় কথা ওঁরা রাজার জাতের কাছে খাতির পান। রানীর দেশের ইংরেজরা নাকি বাবু দ্বারকানাথকে 'প্রিন্স' বলে ডাকতেন।

তরুণ বয়সে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের হাতে ঈশোপনিষদের একখানি পাতা উড়ে এসে পড়ে। তিনি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র লাভ করেন। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তার নাম ছিল 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম'। ব্রাহ্মধর্ম এই নাম অবলম্বন করা হয় আরো চার বছর পরে। বেদ অভ্রান্ত বলে এতকাল স্বীকৃত হয়ে আসছিল। সেই সংস্কার পরিত্যক্ত হলো। ইতিমধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হয়েছিল অপৌত্তলিক ভাবে। বৃহৎ প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারে বাস করে তিনি প্রতিমাপূজা সম্পর্কিত যাবতীয় অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে বর্জন করলেন। এমন এক দিন এলো যেদিন গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের সেবা রহিত হলো। এর পরে তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বেদীতে বসে আচার্যের কাজ করেন। কন্যা সুকুমারীর বিবাহ নিষ্পন্ন হলো অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে।

আজকের দিনে আমাদের কাছে এসব খুব সোজা মনে হতে পারে। কিন্তু একশ' বছর আগে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বৈপ্লবিক ছিল। অথচ তিনি হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না। করা অনুচিত বোধ করলেন। এক পরব্রহ্মে বিশ্বাস করা, বহু দেবদেবী ও তাঁদের প্রতিমায় বা প্রতীকে অবিশ্বাস করা লোকাচারবিরুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু হিন্দুত্ববিরোধী নয়। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজেরই অঙ্গ। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সারবস্তু। দেবেন্দ্রনাথ যেমন খাঁটি ব্রাহ্ম ছিলেন তেমনি খাঁটি হিন্দুও ছিলেন। সে সময় হিন্দুর উপরে খ্রীস্টীয় প্রচারকদের তরফ থেকে আক্রমণ আসছিল। কালে অনেকেই খ্রীস্টান হয়ে যেতেন। দেবেন্দ্রনাথ অন্য একটি পন্থা নির্দেশ করে হিন্দুসমাজের রক্ষী হন। যেমন হয়েছিলেন নানক, চৈতন্য।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাঁর একটি মানসিক সংরক্ষণ ছিল। ব্রাহ্ম হলেও তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্ম হলেও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ইতর জাতি। বাঙালী হলেও ইতর জাতির সঙ্গে তিনি কুটুম্বিতা করবেন না। অবাঙালী হলেও ব্রাহ্মণের সঙ্গে কুটুম্বিতার দ্বার খুলে দেবেন। তাঁর পরিবারের কন্যাদের অবাঙালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহ ঘটেছে, অথচ তাঁর জীবদ্দশায় বাঙালী অব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘটেনি, ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হলেও। তা হলে 'সমাজ' কথাটার মানে কী? ব্রাহ্ম 'সমাজ' তা হলে কোন্ অর্থে সমাজ? হিন্দু 'সমাজ'ই বা সমাজ কোন্ অর্থে? পৃথিবীতে এই

অর্থে 'সমাজ' কি আর একটিও আছে ?

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রীতি ক্রমে মতবিরোধে পরিণত হয়। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বড় একদল ব্রাহ্ম পৃথক হয়ে যান ও "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ তখন থেকে "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে পরিচিত হয়। ইতিমধ্যে সবাই মিলে তাঁকে "মহর্ষি" আখ্যা দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবান। ধর্ম-সাধনায় তিনি ব্রাহ্মদের সকলের চেয়ে অগ্রসর। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ সদস্য যেসব সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছেন সেসব তাঁর পক্ষে সমর্থন করা শক্ত। উপবীত বর্জন, অব্রাহ্মণদের বেদীগ্রহণের অধিকার, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীপুরুষের সাম্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা চঞ্চল, তিনি অটল। হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্মের ভিতরে থেকে বিদ্যাসাগর যে বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মহর্ষির তাতেও সায় ছিল না। হিমালয়ে ঘোরা ও তার পরে কলকাতায় হিমালয়ের মতো নিশ্চল হয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটানো এই হলো তাঁর হিমালয়সদৃশ ব্যক্তিত্বের পরিণতি।

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। কী একটা তুচ্ছ কারণে যারা একবার পতিত হয়েছে তারা যে দ্বিতীয়বার পতিত বা সরাসরি জাতিচ্যুত হতে চাইবে না এটা স্বাভাবিক। অথচ যুগ বদলে গেছে। ইউরোপ থেকে এসেছে কেবল খ্রীস্টধর্ম নয়, আরো কয়েকটি ভাবধারা। রেনেসাঁস, হিউমানিজম, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, লিবারল মতবাদ, ডেমোক্রেসী। এসব কি কেবল পাশ্চাত্যদের জন্যে ? প্রাচ্যদের জন্যে নয় ? ভারতীয়দের জন্যে নয় ? হিন্দুদের জন্যে নয় ? সর্ব মানবের জন্যে নয় ? কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা ভারতকে বা হিন্দুত্বকে অস্বীকার করতে চাননি। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন তাঁদের মানবিক উত্তরাধিকার বুঝে নিতে ও তাঁদের যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে। চলতে গিয়ে হয়তো কিছু বাড়াবাড়ি কারো কারো দিক থেকে ঘটেছিল। কিন্তু অচল হয়ে নির্ভুল হওয়াটাই বা কোন্ কাজের হতো ?

ব্রাহ্মদের মধ্যে আরো এক দফা ভাঙন ধরে। কেশবচন্দ্র যেমন একদিন মহর্ষিকে ত্যাগ করে চলে যান তেমনি শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা কেশবচন্দ্রকে ছেড়ে পৃথক এক ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। তখন কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের নাম বদলিয়ে রাখা হয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। এই বিভেদের উপলক্ষ ছিল কুচবিহার বিবাহ। কুচবিহার রাজার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে গিয়ে কেশবচন্দ্র কন্যার ন্যূনতম বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না। নিজেরি প্রবর্তিত আইন নিজে লঙ্ঘন করেন। নিজের কর্মের সাফাই দেন ঈশ্বরের "আদেশ" বলে। এই ভাঙনের ফলে তাঁর হৃদয়ও ভেঙে যায়। তিনি অকালে দেহত্যাগ করেন।

এর পরে ব্রাহ্মসমাজকে মোকাবিলা করতে হয় পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুদের সঙ্গে। এঁদের প্রায় সকলেই ইংরেজীশিক্ষিত, অনেকে সমুদ্রযাত্রা করে গোবর খেয়েছেন, অথচ এঁদেরি ঝাঁজ সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুর চেয়ে বেশী ! এঁদের

মতে হিন্দুও যা ভারতীয়ও তাই। যে হিন্দু নয় সে ভারতীয় নয়। সুতরাং মুসলমান খ্রীস্টানের জন্যে এঁদের সমাজতত্ত্বে বা ভারততত্ত্বে স্থান নেই। এঁদের জাতীয়তাবাদ হিন্দু "জাতি" মূলক, অতীতভিত্তিক ও বর্ণাশ্রমী। এঁরা সদর্পে অবতারবাদী ও সাকার উপাসক। গুরুকে এঁরা অবতারজ্ঞানে বা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। সব অনাচার এঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করেন। আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। ইউরোপীয় সভ্যতাকে আক্রমণ করেই এঁরা ভারতীয় আর্য সভ্যতাকে রক্ষা করবেন। বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই শেখবার নেই তার কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথও পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। পরে "গোরা" লিখে তিনি তাঁর সাবেক মনোভাবকেই বিশ্লেষণ করে দেখান ও তার থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন। তাঁর আক্ষেপ ছিল এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মরা যেমন হিন্দুসমাজের অঙ্গ নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মরা তেমন নন। হিন্দু বলে পরিচয় দিতে তাঁদের কুণ্ঠা। "গোরা" যখন তিনি আরম্ভ করেন তার পূর্বে তিনি আক্রমণশীল হিন্দু। তথা ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন দেবদেবীর সাকার উপাসনা ইত্যাদিতেই তাঁর যা কিছু আপত্তি, নইলে হিন্দুধর্মে ও সমাজে তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো তাঁরও স্থান আছে। তাঁর সেই স্থান থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না। বিধর্মীর ও বিদেশীর নিন্দাবাদ প্রতিহত করবেন। বরং উলটে নিন্দাবাদ করবেন। ব্রাহ্মদেরও তিনি ছাড়বেন না, যদি তাঁরা হিন্দু বলে পরিচয় না দেন, যদি প্রতিপক্ষের শিবিরে আনাগোনা করেন।

এই মনোভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল ভারতীয় জাতীয়তার সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুমাত্রেই ভারতীয়, ভারতীয়মাত্রেই হিন্দু। মুসলমান, খ্রীস্টান ইত্যাদি কেবল যে হিন্দুত্বের বাইরে তাই নয়, ভারতীয়ত্বেরও বাইরে। কিন্তু তাঁর নিজের মনেই একটা খটকা ছিল। ভগিনী নিবেদিতা তা হলে কী ? জন্মত তিনি ভারতীয় বা হিন্দু নন, অথচ তাঁকে অহিন্দু বা অভারতীয় বলা যায় না। তাঁকে মেনে নিলে ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব জন্মনির্ভর নয়। যে কেউ হিন্দু হতে পারে, ভারতীয় হতে পারে। কিন্তু তা হওয়া কি এত সোজা ? কেউ কি খুলে দেবে হিন্দু দেবমন্দিরের দ্বার তেমন হিন্দুর জন্যে, ভারতীয়ত্বের সমস্ত অধিকার তেমন ভারতীয়ের জন্যে ? কোথায় নিবেদিতার স্থান ? না, রবীন্দ্রনাথের স্থান যেমন অবিসংবাদিত নিবেদিতার তেমন নয়।

"গোরা" লেখার আগে এই বিষম সত্যকে তিনি উপলব্ধি করলেন। তাই গোরাকে হিন্দুর শ্রাদ্ধের অধিকারী করতে পারলেন না। হিন্দুর দেবমন্দিরের দ্বারও তার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। তখন সেই অগতির গতি ব্রাহ্মসমাজের—আদি ব্রাহ্মসমাজের নয়—একটি কন্যাকেই বিবাহ করে সে একপ্রকার স্থিতি পেলো। কবি না লিখলেও বেশ ধরে নিতে পারা যায় যে বিয়েটা ব্রাহ্মমতেই হলো, কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত সিভিল ম্যারেজ আইন অনুসারে। ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখায় খ্রীস্টান ও মুসলমান সন্তানেরও প্রবেশ ছিল। তাঁরাও ব্রাহ্ম

হতে পারতেন। হিন্দু নাই বা হলেন। কিন্তু তা বলে কি তাঁরা ভারতীয় হিসাবে কারো চেয়ে কম? না, গোরাও হিন্দুর ঘরে ঠাঁই না পেলেও ভারতের কোল থেকে বঞ্চিত হলো না। সে ভারতীয়ই রয়ে গেল। কারণ ভারতবর্ষের নতুন সংজ্ঞা হিন্দু অহিন্দু সকলকেই স্বীকার করে। কাউকেই বর্জন করে না। পুনরুজ্জীবনবাদীদের থেকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক হয়ে গেলেন।

"গোরা কহিল, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।

'মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।'

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতবর্ষকে পেলেন। যে ভারতবর্ষের জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই। যে শুধু কল্যাণের প্রতিমা। এর পরে যে কবিতা লিখতেন তাতে এটা আরো স্পষ্ট হলো। সবাইকে ডাক দিলেন "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

"এসো হে আর্য এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।"

তাঁর ডাক দেবার আগেই যারা এসেছে তারাও তাঁরই মতো ভারতীয় হয়ে গেছে।

"হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।···
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূরে—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।"

এই যে ভারতদর্শন এ যেন গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শন। ভারতবর্ষকে যিনি নতুন করে দর্শন করেছেন তাঁরই কণ্ঠে মানায় এই নতুন বন্দনা—

"অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।"

কবির ভারতদর্শন এইখানেই থামল না। ওই যে "পূরব পশ্চিম" বলা হয়েছে তাদের মধ্যে পশ্চিমকে দেওয়া হয়েছে সমান স্থান। পশ্চিমও আসবে পূর্বের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে। পশ্চিমকেও স্বীকার করে নিতে হবে, আপন করে নিতে হবে। সে যে আগে মাথা মুড়িয়ে গৈরিক নেবে বা হিন্দু হবে বা জন্মাবধি হিন্দুর ঘরে হিন্দুর মতো শিক্ষা পাবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সে যেমন আছে তেমনি থাকবে, ইংরেজ হয়ে থাকলে ইংরেজ, খ্রীস্টান হয়ে থাকলে খ্রীস্টান, তা সত্ত্বেও সে সমান স্থান পাবে। নাই বা হলো ভারতীয়, নাই বা হলো হিন্দু বা ব্রাহ্ম, তা সত্ত্বেও সে আসবে। প্রেমহার গাঁথা হবে।

এরই নাম বিশ্বভারতী।
(১৯৬১)

মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

হিউমানিজম কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে অনেকে মানবতাবাদ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মানবতা হলো হিউমানিটি। আমাদের আলোচ্য হিউমানিটি নয়, হিউমান। তাই হিউমানিজমের যথার্থ প্রতিশব্দ মানবিকবাদ। রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম" মানবিক শব্দটি বার বার প্রয়োগ করা হয়েছে।

মানবতা বললে ঝোঁক পড়ে সমগ্র মানবজাতির উপরে। মানবতাবাদীরা শাদা কালো, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সব রকম মানুষের জন্যে ভাবেন, সকলের ভালো চান, সবাইকে ভালোবাসেন। আর মানবিক বললে চোখ পড়ে যে-কোনো একটি মানুষের উপরে। একটির বেলা যা ঠিক সব ক'টির বেলাও তাই ঠিক। যা কিছু মানবসম্পর্কীয় তাই নিয়ে মানবিকবাদীদের কাজ। মানব থেকে আরম্ভ করে সেই সূত্রে তাঁরা ঈশ্বরেও পৌঁছতে পারেন, কিন্তু মানবের সঙ্গে নিঃসম্পৃক্ত ঈশ্বর নিয়ে তাঁদের কারবার নয়। ব্যক্তিগতভাবে একজন মানবিকবাদী খ্রীস্টান বা বৈষ্ণব বা ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে মানবিকবাদীরা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না, যদি না ধর্ম হয় নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের মতো মানবসম্পর্কীয় একটা জ্ঞাতব্য বিদ্যা। অর্থাৎ মানুষকে জানতে হলে যেমন দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব জানতে হয় তেমনি তার ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়।

আসলে হিউমান কথাটাকে আসরে নামানো হয়েছে ডিভাইন কথাটার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। এ জগৎ ঈশ্বরকেন্দ্রিক বা ঈশ্বরের সৃষ্টি, মানুষ ঈশ্বরের হাতে গড়া তাঁরই প্রতিমা, মানুষ এ পৃথিবীতে থাকতে আসেনি, এটা দু'দিনের সরাইখানা, মানুষের বিশেষভাবে চিন্তনীয় হচ্ছে ইহকাল বা ইহলোক নয়, পরলোক বা পরকাল—এই ধরনের তত্ত্বকথার পালটা হচ্ছে হিউমানিজম বা মানবিকবাদ। এর সার বক্তব্য হলো মানুষই হচ্ছে সব কিছুর মান, পরিমাপ করার আধার। ঈশ্বর থাকলে তাঁকেও মানুষের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জ্ঞান বুদ্ধি অনুভূতির আমলে আসতে হবে। এ জগৎ মানবকেন্দ্রিক। মানুষ একে প্রত্যহ সৃষ্টি করে চলেছে। এর যদি কোনো অর্থ থাকে তবে তা মানুষের কাছে ও মানুষের জন্যে।

তার পর ঈশ্বরের মতো মানুষেরও অসীম অনন্ত বিচিত্র শক্তি। সেসব শক্তির বিকাশ ও ব্যবহার চাই। মানুষ যে আজ মহাশূন্য পরিক্রমা করে এসেছে এ সেই মানবিক শক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের ফলে। কিন্তু আধুনিক যুগের পূর্বে মানুষকে ক্রমাগত শোনানো হয়েছে যে মানুষের শক্তি সামান্য। শক্তি চাইতে হয় ঈশ্বরের বা দেবতাদের বা শয়তানের বা অপদেবতাদের কাছে। দৈবী শক্তি বা আসুরী শক্তি কোনোটাই মানবিক বা প্রাকৃতিক নয়। দুটোই অতিপ্রাকৃত। সারা মধ্যযুগটা জুড়ে অতিপ্রাকৃতের রাজত্ব। অতিপ্রাকৃতের কাছে মাথা নোয়াতে

নোয়াতে মানুষের মানবিকতা খর্ব ও অথর্ব। শক্তির সম্যক ব্যবহার না করলে শক্তিমানও দুর্বল হয়ে পড়ে। অপব্যবহার করলে প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটে। মানুষের বাহু যদি সমস্তক্ষণ ঊর্ধ্বে প্রসারিত হয় তা হলে তাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব বাহু। খুব বাহাদুর বলে তাকে তারিফ করতে পারা যায়, কিন্তু সে মানুষ নয়, মানুষের বিকৃতি। গোটা মধ্যযুগে বিকৃতিকে বাহাদুরি মনে করা হয়েছে। যিনি যত বেশী অস্বাভাবিক, যিনি যত বেশী অপ্রাকৃতিক তিনি তত বড় সাধু বা সাধ্বী বলে বন্দনা পেয়েছেন।

আধুনিক যুগের সঙ্গে সঙ্গে নব মানবিক যুগেরও শুরু হলো। অথবা নব মানবিক যুগের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগেরও শুরু হলো। এ যুগে প্রকৃতিকে যত সম্মান করা হয় অতিপ্রাকৃতকে তত নয়, অপ্রাকৃতিককে তত নয়। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার জন্যে মানুষ অবিরাম পরিশ্রম করছে, প্রাণপাত করছে। তাই প্রকৃতিও কতক পরিমাণে তার বশে এসেছে। তার নিজের প্রকৃতির পরিচয় নেওয়াও বন্ধ থাকেনি। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যা মানুষকেও প্রকৃতির মতো চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে চিনছে। এ দেখার শেষ নাই। অচেতন ও অবচেতন স্তরেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের প্রকৃতির উপর ফ্রয়েড, য়ুং প্রভৃতি মনোবিশ্লেষক যে আলোকপাত করেছেন তার ফলে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। হঠাৎ মনে হতে পারে এর চেয়ে সেই পুরাণ ছিল ভালো। কিন্তু এ যুগের মানুষ অতিপ্রাকৃতের মধ্যে শান্তি খুঁজবে না। তার চেয়ে এই অশান্তি ভালো। এর থেকেই আসবে আত্মজয়।

হিউমানিজম একটি নতুন ধর্ম নয়। একটি নতুন সমীক্ষা। একে বিজ্ঞানের সঙ্গে একাকার করা ঠিক নয়। এ সমীক্ষা বিজ্ঞানকেও বিচার করার দাবী রাখে। এরও এক প্রস্থ 'মূল্য' আছে। একটি মূল্যের নাম স্বাধীনতা। আধুনিক মানুষ কায়মনোবাক্যে স্বাধীন হতে চায়। স্বাধীনভাবে বিশ্বাস করবে, বিচার করবে, সিদ্ধান্ত নেবে, কাজ করবে। করার মতো না করার স্বাধীনতা দাবী করবে। সে বরং স্বাধীনভাবে ভুল করবে ও ভুল করতে করতে শিখবে তবু গুরু পুরোহিত শাস্ত্র পূর্বপুরুষ বা রাজন্যদের দ্বারা ভ্রান্তপথে চালিত হবে না। এই স্বাধীনতাটি ছিল না বলেই মধ্যযুগের মানুষ নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেনি। কেবল শোনা কথা মেনে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেনি, সাহিত্যও চক্রাকারে ঘুরেছে। মধ্যযুগের মানুষের জীবনে শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা হয়তো ছিল বেশী। সৌন্দর্য যে বেশী ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রসেরও আধিক্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অভাবে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়নি। তাই প্রকৃতির কাছে সে একান্ত অসহায় বোধ করেছে ও ধর্মকে অসহায়ের মতো আঁকড়ে ধরেছে। প্রকৃতির দুরন্তপনার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সামন্তদের ঔদ্ধত্য, ধনিকদের শোষণ, পুরোহিতদের প্রতারণা, সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামি।

মানবিকবাদ এলো বিদ্রোহের ধ্বজা বহন করে। মানুষকে দাও তার যথোচিত স্থান। এ বিশ্বে মানুষের স্থান কোথায় তার পুনর্বিচার হোক। নতুন করে

ভাবার অধিকার দাও, বলার অধিকার দাও, সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দাও, পর্যবেক্ষণের অধিকার দাও, পরীক্ষণের অধিকার দাও। ফলে যদি প্রচলিত ধারণায় আঘাত লাগে, যদি চিরাচরিত প্রথা টলমল করে, যদি পুরোনো খুঁটি কেঁচে যায়, যদি শক্ত খুঁটি নড়বড় করে, তা হলে উপায় কী? উপায় পরিবর্তন। পরিবর্তনই মানুষের ধর্ম। সহস্র পরিবর্তন সত্ত্বেও যদি কিছু অপরিবর্তনীয় থাকে তবে সেই অপরিবর্তনীয় সত্তাও মানুষের ধর্ম। সে যদি ঈশ্বর কি অমৃত হয়ে থাকে তবে তাকে কষ্ট করে রক্ষা করতে হবে না। সে আপনি আপনাকে রক্ষা করবে। "গেল ধর্ম", "গেল নীতি", "গেল সমাজ", "গেল রাষ্ট্র" বলে হৈ চৈ যারা বাধায় তারা পরিবর্তনযোগ্যকে অপরিবর্তনযোগ্য অপরিবর্তনীয় বলে জাহির করে ও পরিবর্তনের স্রোতকে রোধ করে দাঁড়ায়। এসব ঐরাবতের কপালে আছে ভেসে যাওয়া। তবু এরা যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করে যায়। গালিলেওকে শাস্তি দেয়, ব্রুনোকে পোড়ায়। ইটালীতে যখন নবযুগের সূচনা হয়, তা দেখে কর্তারা এমন রুষ্ট হন যে ইটালিয়ান ভাষায় নূতন ধরনের লেখা এক শতাব্দীর জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। যাঁরা লিখতেন তাঁরা ল্যাটিনে লিখতেন ও বাঁচিয়ে লিখতেন। জার্মানীতে যেমন এক ঝাঁক বিশ্ববিদ্যালয় উদয় হলো তেমনি পরবর্তীকালে এক ঝাঁক বিশ্ববিদ্যালয় রাজার আদেশে রুদ্ধদ্বার হলো। স্বাধীন চিন্তা সহ্য করা হবে না।

স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন বাক্যের জন্যে সংগ্রাম ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে অবিরাম চলে এসেছে। দুঃখ বরণ করতে হয়েছে বহু সাহিত্যিককে, শিল্পীকে। স্বাধীন কল্পনার জন্যে, স্বাধীন প্রকাশের জন্যে। মানবিক অধিকার একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো পুরোপুরি হয়নি। ইউরোপের লোক সংগ্রাম করেছে, আমরা সুফল ভোগ করছি। দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, অভিনয়ে ও জীবনের অন্যান্য বিভাগে গত পাঁচ ছয় শতাব্দী ধরে যে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলে এসেছে তার প্রধান ধাক্কাটা পড়েছে ইউরোপের বুকে। সেই রয়েছে সামনে, আমরা রয়েছি পিছনে। ইউরোপ যে আমাদের পায়ে বেড়ী পরিয়েছে এইটেই আমরা বড় করে দেখেছি। সে যে নিজের মনের বেড়ী খুলতে গিয়ে আমাদেরও মনের বেড়ী খুলে দিয়েছে সেটা মানতে আমাদের পৌরুষে বাধে। তাই সেটাকে আমরা ছোট করে দেখি কিংবা দেখেও দেখিনে। যেন মানবিক অধিকার বিনা উদ্যমে মেলে।

আধুনিক যুগের আলো আপনি আপনি জ্বলেনি। তাকে যত্ন করে জ্বালাতে হয়েছে। যেখানে এ চেষ্টা আগে দেখা দিয়েছে সেখানে মধ্যযুগের অবসান আগে ঘটেছে। আমাদের মধ্যযুগ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এলো নবযুগের সূচনা। মানবিকবাদ তখন ইউরোপের আকাশে বাতাসে। ইউরোপের আকাশ বাতাস ততদিনে ভারতেরও আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত। তা বলে ভারত যে ইউরোপ বনে গেল তা নয়। ভারত ভারতই রইল। শুধু তার রূপান্তর লক্ষিত হলো। এ রূপান্তর জলে স্থলে ও আরো কিছুকাল পরে অন্তরীক্ষে। এ রূপান্তর অশনে বসনে আচারে অভ্যাসে। এ রূপান্তর জীবন-

ধারায়, জীবনের মূল্যসমূহে। বলা যেতে পারে এ রূপান্তর এখনো একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনগণের দিকে তাকালে তেমন কোনো রূপান্তর স্পষ্ট নয়। কিন্তু দু'দিন বাদে তাদেরও নবযুগ আসবে। একই আকাশে বাতাসে তারাও চোখ মেলছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তারা তো বিচ্ছিন্ন নয়। তারাও আধুনিক যুগের সন্তান হবে, এর দায়িত্ব বহন করবে, এর সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে। অথচ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবে।

আধুনিক যুগ তথা মানবিকবাদ ইউরোপ থেকে এসেছে বলে মূলত ইউরোপীয় নয়। এর মূল প্রাচীন গ্রীসে তো ছিলই, প্রাচীন চীনে প্রাচীন ভারতেও ছিল। এমন কি মধ্যযুগের ইউরোপ বা এশিয়াতেও বিলকুল বিলুপ্ত হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপের আকাশে নবযুগের অরুণরাগ ফোটে, তার আগে যেমন একটানা রাত ছিল, তেমনি সেই রাতের আকাশে চাঁদের আলোও ছিল। আরো আগে ছিল সূর্যের কিরণ। সেই সূর্যের নাম গ্রীস। কেবল ইউরোপ কেন, পৃথিবীতে বহু নতুন জিনিস, অজস্র নতুন তথ্য, নানা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে প্রাচীন গ্রীস। একদা প্রাচীন গ্রীসই বিশ্বসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। তার কারণ প্রাচীন গ্রীকরা ঈশ্বর ও দেবদেবী ও পরলোক স্বীকার করলেও তাদের মানবিক অধিকার ও মানবিক দায়িত্ব ষোলো আনা আদায় করে ও বুঝে নিয়েছিল। তাদের প্রভু ছিল তারাই। জীবন সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। নিত্য নতুন অনুসন্ধান, নিত্য নতুন পর্যবেক্ষণ, নিত্য নতুন পরীক্ষা, নিত্য নতুন সিদ্ধান্ত, নিত্য নতুন তর্ক তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজীব রেখেছিল। তেমনি দেহচর্চারও বিশ্রাম ছিল না। মানুষ যে দেহী এটা তাদের কাছে ছিল অলঙ্ঘিত সত্য। রসনহীন নারী বা পুরুষমূর্তি গড়তে তাদের শিল্পীদের উপর নিষেধ ছিল না। তার বদলে ছিল উৎসাহ। তা বলে তাদের সমাজে বিবেকী ব্যক্তির অভাব ছিল না। নীতি ও ন্যায় নিয়ে ভাবনা করারও লোক ছিল। স্বাধীনতার জন্যে প্রসিদ্ধি ছিল এথেন্স নগরের। গণতন্ত্রের আদিভূমি ঐ নগর বহিঃশত্রুর সঙ্গে বার বার লড়ে স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। সে স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, জীবনধারার স্বাধীনতা। তার জীবনধারায় মানবিকতার প্রাধান্য।

এই মানবিকতার প্রাধান্য প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধদের মধ্যেও দেখি। ঈশ্বর সম্বন্ধে তারা নীরব ছিল। দেবদেবী মানত। কিন্তু সব দেবতার উপরে মানুষ বুদ্ধের স্থান। কারণ তিনি তাঁর মানবজীবনটিকে এমন ভাবে যাপন করেছেন যার ফলে প্রথমে বোধিলাভ ও পরে নির্বাণলাভ করেছেন। কোনো দেবতা যা পারেননি। যে-কোনো মানুষ বুদ্ধের অনুসরণ করে বুদ্ধ হতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে ডাক দিয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হতে। এই মানবজীবনের ভিতর দিয়ে। বৌদ্ধদেরও কথায় কথায় যুক্তি, কথায় কথায় প্রমাণ, কথায় কথায় অনুসন্ধান। বুদ্ধ স্বয়ং যুক্তি দিয়ে মানুষের বুদ্ধিকে জাগ্রত করতেন। কোনো জিনিস মেনে নিতে বাধ্য করতেন না। আপ্তবাক্য দিয়ে ঘুম পাড়াতেন না। তাঁর কাছে নিম্ন অধিকারী বলে কেউ ছিল না। কাউকেই তিনি

বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ভক্তি বা বিশ্বাসের দ্বারা বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ পাবার সহজ পন্থা বলে দিতেন না। কঠিন পথ, সকলেই উচ্চ অধিকারী, কেউ না কেউ চূড়ায় পৌঁছে যাবে, যদি সাধনা করে। নরনারী নির্বিশেষে। ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে। এই জন্মেই। পুরুষকারের দ্বারা।

পুরুষকারের উপর এই যে জোর এইটেই মানবিকতার বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন ভারতও মানবিকতার মহিমা বুঝত। কিন্তু ঝোঁকটা ক্রমশই দৈবের উপরে, অতিপ্রাকৃতের উপর পড়ে। লোকে সহজ পন্থায় মোক্ষ লাভের জন্যে ভক্তির মার্গ ধরে। ভক্তির পাত্র প্রথমে ছিলেন দেবতা, তার পরে হলেন দেবতার অবতার। সহজ পন্থা আরো সহজ হলো। মানুষ তারই মতো একজনকে অবতার বলে পূজা করতে আরম্ভ করল। যিনি স্বয়ং জরামৃত্যুব্যাধির অধীন তিনি করবেন সবাইকে ত্রাণ। অগত্যা বিশেষ বিশেষ মানুষের উপর অতিপ্রাকৃত শক্তি আরোপ করতে হয়। কোথাও তিনি কৃষ্ণ, কোথাও তিনি খ্রীস্ট, কোথাও অমিতাভ বুদ্ধ। মধ্যযুগের ভারত, মধ্যযুগের ইউরোপ ও মধ্যযুগের চীন জাপান ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে বিশ্বাসের ঘোড়ায় চড়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু দর্শনে বিজ্ঞানে রাষ্ট্রবিধানে ও জীবনের বহুবিধ প্রকাশে স্থিতিশীল বা পশ্চাৎপদ হয়। তবে শিল্পে সুন্দরের আরাধনা করেছে। অন্তত ওই একটি জায়গায় ভক্তিমার্গের পথিকদের কৃতিত্ব চিরস্মরণীয়।

মধ্যযুগে প্রায় দেশেই বিজ্ঞানদৃষ্টি আচ্ছন্ন। মানুষ যদি যা পাবার তা অতিপ্রাকৃতের প্রসাদে পায় তবে প্রকৃতির দুর্গম পথে পা বাড়াবে কেন? সাগর গিরি লঙ্ঘনের কী প্রয়োজন? এরি মধ্যে বিজ্ঞানের বাতি টিম টিম করে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন আরব দেশের পণ্ডিতেরা। গ্রীক দার্শনিকদের ধারা তাঁদেরি দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যারও তাঁরা ব্যাপারী ছিলেন। তাঁদেরি মধ্যস্থতায় পশ্চিম ইউরোপ সংযুক্ত হয় প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে। মানবিক ঐতিহ্যের বহুমানতা চীনেও কতক পরিমাণে ছিল। চীন থেকেও ক্ষীণ একটি স্রোতে পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছয়। তাই মধ্যযুগের আবহাওয়া যদিও বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানসাপেক্ষ দর্শনের অনুকূল ছিল না, তথাপি বরাবরই এক আধজন বিদ্বান ছিলেন যাঁরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশ্বজগৎ সমীক্ষা করতেন। অবশ্য তাঁরা ধার্মিকদের ইন্‌কুইজিশন সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। তাই গোঁড়া খ্রীস্টানের ভেক ধারণ করে প্রাণ রক্ষা করতেন।

ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজন্ম প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানমার্গের প্রকাশ্য রাজপথে আবার বুক ফুলিয়ে হাঁটা। মাঝখানের হাজার বছর গলিঘুঁজিতে চোরের মতো লুকিয়ে চলাফেরা করতে হয়েছিল মানুষকে। সেইজন্যে ওটাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। তার পর জ্ঞানমার্গে বিচরণ যতই অবাধ হতে লাগল ততই স্বাধীনতার মূল্য বাড়তে থাকল। আধুনিক যুগের মানুষ কেবল যে জ্ঞানব্রত তাই নয়, সে মুক্তিব্রত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে মুক্তি চায়। পারত্রিক মুক্তি নয়, ঐহিক মুক্তি। সর্বমানবের ইতিহাসে এত বড় একটা ডাইনামিক যুগ আর কখনো আসেনি। মানুষ তার প্রত্যেকটি শক্তির চালনা করেছে, দূরবীন অনু-

বীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে শক্তিকে বহুগুণিত করেছে, আজ তাই মহাশূন্যে ধাবমান হতে পেরেছে। আরো পারবে। যদি না আপনার হাতে মরে। এ যুগ ইউরোপে আরম্ভ না হয়ে ভারতে বা চীনে আরম্ভ হতে পারত। একই ফল হতো। যার শক্তি বেশী সেই অপরকে জয় করত। চীন বা ভারত হতো সাম্রাজ্যবাদী। ইউরোপ বা আমেরিকা হতো পরাধীন। একে ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য প্রাধান্যের যুগ না বলে নব মানবিকতার যুগ বলাই সমীচীন। অথবা আধুনিক যুগ। তাতে সব মানুষের মান বাঁচে ও বাড়ে। অবশ্য নবলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শক্তিতে ভাঙিয়ে নিয়ে ভোগ করেছে কতক মানুষ, সব মানুষ নয়। কিন্তু একদিন না একদিন করবে সকল মানুষ। ভবিষ্যতে বঞ্চিত মানুষদের ভাগ্যেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদি জুটবে। আধুনিক যুগ সেই অভিমুখেই চলেছে।

এর থেকে মনে হতে পারে যে মানবিকবাদ হচ্ছে অভিনব জড়বাদ। বস্তুর উপরেই এর লক্ষ্য। আত্মার উপরে নয়। তাই যদি হতো তবে আত্মার স্ফূর্তি দেখা যেত না শিল্পে ও সাহিত্যে ও বিশুদ্ধ দর্শনে। আর বিজ্ঞানও কি শুধু ফলিত বিজ্ঞান? বিশুদ্ধ বিজ্ঞানও মানুষের আত্মার স্ফূর্তি। সে যেন একপ্রকার বিশ্বরূপ দর্শন। দিগন্তের পর দিগন্ত আলো হয়ে যায়, চেতনা প্রসারিত হয় দশ দিকে। রিয়ালিটির উপর দখল বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে যে মানুষ তাকে বদলে দেবার শুধরে দেবার কথাও জোরগলায় বলতে পারছে। এর পিছনে রয়েছে আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। আত্মশক্তি আত্মারই শক্তি। মানবিকবাদ জড়বাদ নয়। এটাও একপ্রকার অধ্যাত্মবাদ। যদিও এর থেকে অতিপ্রাকৃত বাদ পড়েছে। অতিপ্রাকৃত বলতে যদি ঐশ্বরিক বোঝায় কিংবা ঐশ্বরিক বলতে অতিপ্রাকৃত তা হলে এর থেকে ঈশ্বরও বাদ গেছেন। তা বলে যথার্থ আধ্যাত্মিকতা বাদ যায়নি। আসলে ঈশ্বরের কোনো সংজ্ঞা নেই। সংজ্ঞা আছে যাঁর তিনি ঈশ্বর নন। তেমনি আধ্যাত্মিকতারও কোনো সংজ্ঞা নেই। সংজ্ঞা আছে যার তা আধ্যাত্মিকতা নয়। মানবিকবাদীদের আপত্তি এইখানে যে অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে ঐশ্বরিককে সমার্থক করা হয়েছে। অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে মানবিকবাদের সন্ধি সম্ভব নয়। মানবিকবাদ প্রাকৃতিককে অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু অতিক্রম করলেও প্রকৃতির চৌহদ্দির ভিতরেই থাকে। মানুষ যদি অতিমানব হয়, দেবতা হয়, তা হলেও তাকে মানুষ বলে চেনা যায়। সে সশরীরে স্বর্গে যায় না।

তার পর মানবিকবাদের আরো একটা দিক আছে। এটা একটা জীবনযাপনের ধারা। এতে বৈরাগ্যের স্থান নেই। ইউরোপের তথা ভারতবর্ষের গোটা মধ্যযুগটা জুড়ে সন্ন্যাসী-প্রাধান্য। তাঁদের জীবনযাপনের ধারাকে তাঁরা সর্বজনের আদর্শ বলে ধরে নিয়েছিলেন। সর্বজনও তাই ধরে নিয়েছিল। সেকালের মূল্যগুলো সন্ন্যাসীপ্রধান সমাজের মূল্য। লক্ষ্য নির্বাণ বা মুক্তি বা ত্রাণ। পন্থা বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য। মানবিকবাদীরা এই লক্ষ্যও মেনে নিলেন না, এই পন্থাও মেনে নিলেন না। তাঁদের লক্ষ্য পূর্ণবিকশিত জীবন, পূর্ণতম জীবন।

একজনের জন্যে, সর্বজনের জন্যে। এইখানে। এক্ষণেই। পন্থা তাঁদের তদনুযায়ী।

সন্ন্যাসীপ্রাধান্যের পূর্বেই বর্ণাশ্রমী যুগ আরম্ভ হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে তথা ভারতবর্ষে একপ্রকার না একপ্রকার বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থা কায়েম থাকে। সন্ন্যাসীরা তাকে রদ করতে বা বদলে দিতে পারেননি। তার সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন। সেই কায়েমী সমাজব্যবস্থায় নারী ও শূদ্র ছিল সকলের অধম। সেবা করবার জন্যেই তাদের জন্ম। নারীর আত্মবিলোপের উপর, শূদ্রের আত্মনিমজ্জনের উপর প্রায় সব ক'টি সভ্যতারই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। নারী হবে পুরুষের ছায়ার মতো অনুগতা আর শূদ্র হবে উচ্চবর্ণের দাসানুদাস, নইলে সভ্যতার ভিৎ টলবে। অতএব তাদের মর্যাদার পরিবর্তন কাম্য নয়। কাম্য শুধু ইহকালে শুদ্ধজীবন ও পরকালে সদ্গতি। জন্মান্তরে প্রমোশন হবে যারা মানে তাদের। মানবিকবাদীরা নারী ও শূদ্রের সমানাধিকারে বিশ্বাসী। বর্ণাশ্রমী নীতি তাঁদের গ্রহণযোগ্য নয়। মানবিকবাদ প্রবর্তিত না হলে নারী ও শূদ্রের মর্যাদার পরিবর্তন হতো না। আর দাসপ্রথাও বর্ণাশ্রমের মতো সনাতন হয়ে রইত। যদিও মানবপ্রেমিক বুদ্ধ যীশু প্রভৃতি কেউ তার পক্ষপাতী ছিলেন না, কেউ তার সমর্থন করেননি।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা মানবিকবাদীদেরই ধ্বনি। আধুনিক যুগের ইতিহাস এই তিনটি ধ্বনিতে মুখর। অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির সমস্যা মিটলেও মানুষ সুখী হবে না, যদি সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ না হয়, মৈত্রী আন্তরিক না হয়। আধুনিক যুগ এখনো মানুষের অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির সমস্যা মেটাতে পারেনি। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাও সকলের করতলগত হয়নি। কিন্তু আশা দিয়েছে। লোকে আশা করতে, কল্পনা করতে, কামনা করতে পারছে। এ শতাব্দীতে যা সম্ভব হলো না আগামী শতাব্দীতে তা হবে। এই যে বিশ্বাস এটাই বড় কথা। মানবিকবাদ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলে, অতীতের দিকে নয়। আর বর্তমানকেও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে।

মানবিকবাদের বিবর্তন একদিনে হয়নি। প্রাচীন যুগেও এর অস্তিত্ব ছিল, মধ্যযুগেও এর বিলয় ঘটেনি। আধুনিক যুগেও একে বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। বার বার দীপ নিবে গেছে। তাকে জ্বালিয়ে নিতে হয়েছে। এই তো সেদিন ইটালীতে, জার্মানীতে ও জাপানে গেল নিবে। আবার জ্বলছে। তার পর মানবিকবাদের বীজ ধর্মের মধ্যেও ছিল। বৈদিক, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীস্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে তো নিশ্চয়ই, আরো আগে যেসব ধর্ম উদয় ও অস্ত যায় তাদের মধ্যেও। ধর্মের সঙ্গে এর জাতশত্রুতা নেই। কিন্তু ধর্ম যখনি স্থাণু হয়েছে আর মানবিকবাদ গতিশীল হয়েছে তখন বিরোধ বেধেছে।

মানবিকবাদ আমাদের দেশে বরাবরই একভাবে না একভাবে বহমান ছিল। সম্পূর্ণ অন্তর্হিত কোনো দিনই হয়নি। বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গেও না। কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় ও অতিপ্রাকৃতের দিকে মুখ করে

থাকায় প্রকৃত মানুষকে আমরাও ভুলে যাই, আমরাও তাকে দেবতার তুলনায়, অবতারের তুলনায়, সাধুসন্তের তুলনায়, ব্রাহ্মণাদির তুলনায় নিকৃষ্ট ভাবি। যে মানুষের দেহ আছে, মন আছে, হৃদয় আছে, আত্মা আছে তার আত্মার মোক্ষের কথাই শুধু গ্রাহ্য করেছি আর সব কিছু অগ্রাহ্য করেছি। বিচিত্র পরিপূর্তি, বিচিত্র পরিতৃপ্তির জন্যে ভাবিনি। বিচিত্র শক্তির বিকাশ খুঁজিনি, ব্যবহার খুঁজিনি। শক্তি আরোপ করেছি বাষ্পের বা বিদ্যুতের প্রতি নয়, বিবিধ দেবদেবীর প্রতি। সিদ্ধাই চেয়েছি। হয়তো পেয়েছি। আমাদের সাহিত্য দেব-দেবীদের হস্তক্ষেপে ভরা। কথায় কথায় অলৌকিক এসে লৌকিক সঙ্কট কাটায়। জীবনটা কি সত্যি তাই? মানুষকে খাটো করে, ঠুঁটো করে এ রকম ধারণা?

সেইজন্যে এ দেশেও একদিন বিদ্রোহী কবি ঘোষণা করেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" সহজিয়া ও বাউলদের মুখে "মানুষ" কথাটি বার বার শোনা যায়। সেইসঙ্গে দেহতত্ত্বের কথা। এই মানবদেহেই সব কিছু রয়েছে। বাউলরা বলে, "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" মানুষের ভিতরে—তার দেহে—এমন একজন আছেন যিনি মানুষই, মানুষের ঊর্ধ্বে নন। মানুষের থেকে ভিন্ন নন। তাঁকে নিয়ে যে মানুষ সেই সবার উপর সত্য। তাহার উপর নাই। এখানে এমন কারো কথা বলা হচ্ছে না যিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বা ইন্দ্রিয়াতীত। তাই যদি হতেন তবে তাঁকে মানুষ বলা হতো না। সরাসরি ঈশ্বর বলা হতো। ব্রহ্ম বলা হতো। বৌদ্ধ, জৈন, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি ধর্মমতে ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে টেনে আনা উচিত নয়। তাঁদের কাছে মানুষই একমাত্র প্রত্যক্ষ সত্য। অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের দ্বারা পরিমাপ করতে হবে। এটাই মানবিকবাদী বৈশিষ্ট্য।

যে মানবিকবাদ আমাদের দেশে ছিল ও যে মানবিকবাদ ইংরেজের সঙ্গে আমাদের দেশে এলো তাদের মধ্যে পার্থক্যও বড় কম নয়। বহিঃপ্রকৃতির উপরে আমাদের পুরাতন মানবিকবাদীদের দৃষ্টি ছিল না। ইউরোপের নতুন মানবিক-বাদীদের ছিল। প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়েই তারা ভারতকেও জয় করে। সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, সর্বপ্রকার বিদ্যায় তাদের মানবিকতা তাদের গতিশীল করেছিল। অপরপক্ষে আমাদের দেশের পুরাতন মানবিকবাদীরা হয়ে পড়েছিল স্থিতিশীল। তারা আধুনিক, এরা মধ্যযুগীয়।

এমন নয় যে পশ্চিম ছিল চিরটা কাল গতিশীল ও পূর্ব ছিল আবহমানকাল স্থিতিশীল। ইউরোপও দীর্ঘকাল স্থিতিশীল ছিল। ভারতও একদা গতিশীল ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের হাওয়াবদলের পর ইউরোপের চেহারা বদলে যায়। সে হয়ে ওঠে নওজোয়ান। দূর থেকে মনে হতে পারে গতিশীলতাই তার স্বভাব। অপরপক্ষে বন্ধ হাওয়ায় বাস করে ভারতের হাতেপায়ে খিল ধরেছিল। স্থিতি-শীলতাকেই সে মনে করেছিল তার স্বধর্ম। রেললাইনের একপাশে যে মালগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে তার নিজের ইঞ্জিন যদি অচল হয় তা হলে অন্য কোনোখান থেকে অপর এক ইঞ্জিন এসে তাকে টেনে নিয়ে যায়। ইতিহাসেরও সেই নিয়ম। গতি-

শীল এসে স্থিতিশীলকে পিছনে বাঁধল। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল কে জানে কিসের অভিমুখে। ইঞ্জিনের ধাক্কা এসে লাগল যখন তখন মালগাড়ী ঠাওরাল ওটা পশ্চিমের ধাক্কা। আসলে ওটা গতিশীলের ধাক্কা। মানবিকের ধাক্কা। আধুনিকের ধাক্কা। ওটাকে এড়াবার একটিমাত্র উপায় ছিল। আপনার ইঞ্জিনকে অচল হতে না দেওয়া। অনড় অবস্থায় লাইন জুড়ে থাকার অধিকার কোনো মালগাড়ীর নেই।

রিয়ালিটির একটি অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তা আছে। আমাদের দার্শনিক ও সাধকরা তা জানতেন। কিন্তু সেইসঙ্গে একটি পরিবর্তনশীল বিবর্তনশীল রূপও আছে। আমাদের জ্ঞানীরা তার সঙ্গে দৌড়তে ও পাল্লা দিতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছেন তাঁরা বসে থাকলে তাঁদেরি মতো রিয়ালিটিও বসে থাকবে। জাগতিক জ্ঞান দু'দিনেই বাসি হয়ে যায় বলে তাকে প্রত্যহ তাজা রাখতে হয়। ইনটেলেকচুয়ালদের কাজ হলো তাকে তাজা রাখা। সেই সঙ্গে নিজেদেরও তাজা রাখা। বাসি হতে না দেওয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা গেল আমাদের দেশে জাগতিক জ্ঞান কবে থেকে বাসি হয়ে রয়েছে। তামাদি বললেও চলে। ইনটেলেক-চুয়ালরাও তেমন বাসি। তেমনি তামাদি। যে জগতের সঙ্গে তাঁদের কারবার সে জগৎ আর রিয়াল নয়। ছিল এককালে রিয়াল। সেইজন্যে ইউরোপ এমন অনায়াসে এ দেশের দেহ ও মন অধিকার করতে পারল। এ দেশ যেন ইউরোপীয় শিক্ষার জন্যে চাতকের মতো সতৃষ্ণ হয়ে অপেক্ষা করছিল তিন শতাব্দী ধরে। সে শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা। মানবিক শিক্ষা। রিয়ালিটির সঙ্গে পরিচয় সাধনের শিক্ষা। অতি অল্পদিনের মধ্যে হাওয়া বদলে গেল। শিক্ষিত বলতে বোঝালো ইংরেজীশিক্ষিত। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও ইংরেজী শিখতে হলো। নইলে তাঁকে লোকে পণ্ডিত বলত, কিন্তু প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত বলত না। ইংরেজী শিক্ষার এই যে প্রতিপত্তি এটা ইংরেজ শাসনের জন্যে নয়। রিয়া-লিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হলে এই শিক্ষাই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

বাংলাভাষার সাহিত্যিকদের কি ইংরেজী শেখার লেশমাত্র প্রয়োজন ছিল? কই, আগে তো সেকথা কেউ ভাবেনি? মোগল আমলে ফারসী শিক্ষা ছিল, কিন্তু দু'একজন ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিক ফারসীনবিশ ছিলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল বাংলা লিখতে গেলেও ইংরেজী জানা দরকার। যাঁরা ভালো ইংরেজী জানেন না তাঁরাও ইংরেজী বুকনি দেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখেও ইংরেজী শব্দ। পরবর্তীকালে একে ইংরেজের সাংস্কৃতিক জয় বলে নিন্দা করেছি আমরা। জয় যদি কেউ করে থাকে সে মন জয় করেছে। আর মন জয় করা ব্লাইভ হেস্টিংসের কর্ম নয়। এ কাজ করেছেন শেকসপীয়ার মিলটন প্রভৃতি কবিরা, স্কট ডিকেন্স প্রভৃতি ঔপন্যাসিকরা, নিউটন ডারউইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা, রুশো ভলতেয়ার প্রভৃতি চিন্তানায়করা, কান্ট হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকরা, মাটসিনি গারিবলডি প্রভৃতি বিপ্লবীরা। একসঙ্গে চার শতাব্দীর ইউরোপ এসে হাজির হলো আমাদের মনোজগতের দ্বারে। যাঁরা দ্বার খুললেন তাঁরাই শিক্ষিত বলে গণ্য হলেন। বাংলাসাহিত্যের নেতৃত্ব চলে গেল তাঁদেরি

হাতে। তাঁরা বিজিত মনোভাব বিকীরণ করেননি। আধুনিক বাংলাসাহিত্য বিজিত মনোভাবের প্রতিফলন নয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে সাগরপারের মানুষের কাছে আধুনিক যুগের গতিশীল রিয়ালিটির বার্তা উৎকর্ণ হয়ে শুনেছেন। তার মূলে দাস মনোভাব নয়। স্থিতিশীলকে গতিশীল করে তুলতে হলে ও-ছাড়া আর কোনো পন্থা ছিল না।

পাঁচ শতাব্দীর পথ আমরা এক শতাব্দীতে অতিক্রম করতে পেরেছি এমনি কয়েকজন মন-অধিনায়কের নেতৃত্বে। তাই আমরাও ইউরোপীয়দের মতো বিংশ শতকের মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারছি। পরাধীনতায় আমাদের চরিত্রের ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়। না হয়ে পারে না। কিন্তু লাভলোকসানের খতিয়ানে লাভের দিকটাও নগণ্য নয়। আমরা আলো পেয়েছি, আলোকিত হয়েছি। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সন্ধান পেয়েছি, শক্তির সাধনা করে স্বাধীন হয়েছি। মানবিক মূল্য একদিনে নয়, দিনে দিনে আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়েছে ও জীবনকে রূপান্তরিত করেছে। ঐতিহ্যবাদীরাও নিজেদের অজ্ঞাতসারে সংস্কারবাদী ও বিপ্লববাদীদের কাছাকাছি এসেছেন। বর্ণাশ্রমের ও বৈরাগ্যের সে প্রেস্টিজ আর নেই। নারী ও শূদ্র সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। ব্যক্তি এখন সমাজের ও পরিবারের ইচ্ছায় চালিত পুতুল নয়। দেবদেবীরা সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সমগ্র জাতি চেয়েছে আধুনিক যুগে উপনীত হতে। কার্যত উপনয়ন হয়েছে ছোট একটি শ্রেণীর। এই নতুন দ্বিজদের উপহাস করে বলা হয় ইংরেজী-শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত। কিন্তু এরা কি কারো পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে? জনগণেরও উপনয়ন হোক। মালগাড়ীর প্রত্যেকটি ওয়াগন ইঞ্জিন হোক। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি গতিশীল হোক। স্বাধীন হোক। যে যার মানবিক অধিকার ও মানবিক দায়িত্ব বুঝে নিক। শাস্ত্র, পুরাণ, দেবতা, অবতার, গুরু, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, রাজা, সওদাগর, কোটাল প্রভৃতির একাধিপত্য থেকে মুক্ত হোক। দেবতার মধ্যে স্বামীদেবতাও পড়েন। মেয়েমানুষ কেবল মেয়ে হয়ে রয়েছে। এখন থেকে মানুষ হোক।

একজনের দীপ যেমন আরেকজনের দীপ জ্বালিয়ে দেয় তেমনি ইউরোপের মানবিকবাদীরা ভারতের মানবিকবাদীদের দীপ জ্বালিয়ে দেন। তার পর থেকে দীপাবলী উৎসবের আয়োজন চলেছে। ধীরে ধীরে জনগণের দীপগুলিও জ্বলবে। ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যের বর্তিকা উজ্জ্বল হয়েছে। ইংরেজী সাহিত্যের বর্তিকা যাদের নাগালের বাইরে তারা তাদের দীপ জ্বালিয়ে নিতে পারে বাংলাসাহিত্যের বর্তিকা থেকে। তবে কতক লোককে এখনো বহুকাল ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে। নইলে নিত্য পরিবর্তনশীল রিয়ালিটির থেকে বিযুক্ত হবার আশঙ্কা। এই বিযুক্ততার পূর্ব লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করছি। আবার এক আনরিয়াল জগতের দিকে পিছুটানকে মনে করা হচ্ছে স্বাদেশিকতা বা গণকল্যাণ। মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব খর্ব না

করে যে প্রগতি সেইটেই সত্যিকার প্রগতি। তা সে একজন মানুষই হোক আর এক কোটি মানুষই হোক। একজন মানুষকেই বা বঞ্চিত করা হবে কেন তার মানবিক উচ্চতা থেকে, বৃদ্ধি থেকে, পরিপূর্ণতা থেকে, পরমা পরিতৃপ্তি থেকে? সমাজের নামে ব্যক্তির উপরে জুলুমও গণকল্যাণ নয়। জনগণ কোনোদিন মানুষ হবে না, যদি ব্যক্তিগত মোক্ষের মতো ব্যক্তিগত সার্থকতার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। প্রত্যেকের দেহ মন হৃদয় বিবেক আত্মা স্বয়ংচালিত হলেই সে মানুষ হবে।

এর মধ্যে ধর্মেরও স্থান আছে। ধর্মের প্রচলিত সংজ্ঞায় যাঁদের আপত্তি তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো অপর একটি সংজ্ঞায় বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরকে বাদ দিলেও মানুষকে বাদ দিতে পারেন না, মানুষত্বকে বাদ দিতে পারেন না। মানুষকে রাখতে হবে। রাখলে তাকে পুরোপুরি রাখতে হবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাঁটলে চলবে না। তার হৃদয় মন বিবেক ছাঁটলে চলবে না। তার ইচ্ছাকে ছাঁটা উচিত নয়। তার আত্মাকে ছাঁটলে সর্বনাশ।

রামমোহনের মতো অগ্রগামীদের ভাবনা ছিল কেমন করে ধর্মের সঙ্গে মানবিকবাদের জোড় মেলানো যায়। ধর্ম সব দেশেই চিরকাল ছিল। মানবিকবাদও অন্তত কয়েকটি দেশে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কিন্তু মানবিকবাদ যেমন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কল্যাণে আধুনিক হয়, গতিশীল হয়, ধর্ম তেমন হয়নি। সেইজন্যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বড় একদল খ্রীস্টান পৃথক হয়ে যান। তাঁরা প্রোটেস্টাণ্ট, অর্থাৎ প্রতিবাদকারী। তাঁদের মধ্যেও মতভেদ লক্ষিত হয়। ছোট ছোট দলগুলিকে একত্র ভাবে বলা হয় নন্‌কনফর্মিস্ট। তাঁরা চোখ বুজে অনুবর্তন করবেন না। আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবেন। এমনি করে ধর্মের মধ্যেও কতকটা গতিশীলতা সঞ্চার করা হলো। নন্‌কনফর্মিস্টদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের নাম ইউনিটারিয়ান। এঁরা ঈশ্বরের ত্রিত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং খ্রীস্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলে মানেন না। এঁরা সোজাসুজি একেশ্বরবাদী। কোনো মানুষকেই এঁরা ঈশ্বরের আসনে বসাবেন না। ত্রিদেববাদে বা অবতারবাদে বিশ্বাস না থাকায় রামমোহনও নিজেকে ইউনিটারিয়ানদের একজন মনে করতেন।

ধর্মকে গতিশীল করাই রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল, সম্প্রদায় গঠন করা নয়। পরবর্তীকালে আপনাআপনি একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, তার কারণ প্রাচীনপন্থীদের আওতায় থেকে যথেষ্ট গতিশীল হতে পারা যেত না। যেই প্রাচীন ধর্মের অভ্যন্তরে গতিশীলতা সঞ্চারিত হলো অমনি ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা সারা হয়ে এলো। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে পশ্চিমে ও পূর্বে মানবিকবাদ যে রকম জোর কদমে এগিয়ে চলেছিল ধর্ম সে রকম নয়। ধর্মের পিছুটান অত্যন্ত বেশী। বৈজ্ঞানিকরা সত্যের বাঁধন ছাড়া আর কোনো বাঁধনে জড়িত নন। আর সেই সত্যেরও এক জায়গায় স্থিতি নেই। ধার্মিকরা হাজারো বাঁধনে বাঁধা। একেশ্বরবাদী হলেই বা কী? একই ব্যক্তি বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন, ধার্মিকও হতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এমন এক ব্যবধান দেখা দিয়েছে যার উপর সেতুবন্ধন করা যে কোনো মানুষের পক্ষে কঠিন।

বিজ্ঞানের জগতের জোড় মেলানো সম্ভব নয় দেখে বহু চিন্তাশীল এক পক্ষে না এক পক্ষে ভিড়েছেন। দু'পক্ষে যদি কেউ থাকেন তবে তিনি দুই নৌকায় পা রেখেছেন।

আধুনিক মানবিকবাদকে রামমোহন অকুণ্ঠিতভাবে বরণ করে নেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের উত্তরসাধক। কিন্তু রামমোহনের সময় যে ব্যবধান স্পষ্ট হয়নি পরে সে ব্যবধান উগ্র হয়ে ওঠে পাশ্চাত্য মনোলোকে ও তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মনীষায়। জগৎ কি মানবকেন্দ্রিক না ঈশ্বরকেন্দ্রিক? মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছে বলেই কি বিশ্ব আছে? না ইন্দ্রিয়াতীত ভাবে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ ভাবে আছে? কার ইচ্ছা বলবান? মানুষের না বিধাতার? এসব প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকরা এক ভাবে দেন, ধার্মিকরা আরেক ভাবে দেন। একের সঙ্গে অপরের মিল নেই। সাহিত্যের থেকে যেমন দেবদেবীদের নির্বাসন করা হয় তেমনি ঈশ্বরকেও, তাঁর ইচ্ছাকেও। ইংরেজী সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যের থেকেও। সেকালের কবিরা শ্রীমন্তকে বা সুন্দরকে বাঁচাবার জন্যে কালীকে মশানে নিয়ে আসতেন। একালের কবিরা অলৌকিকের সাহায্য নিয়ে তাঁদের নায়কনায়িকাদের সঙ্কট পার করে দিতে অনিচ্ছুক। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও অলৌকিকের প্রতি একটা টান ছিল। ঈশ্বরকে মানুষ ও মানুষকে ঈশ্বর করে তিনি একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে না ছিল অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ, না ছিল অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, না ছিল মানুষকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে মানুষ করার প্রয়াস, না ছিল সন্ন্যাসীদের ও সন্ন্যাসের সম্বন্ধে মোহ, না ছিল বিপদের দিনে ত্রাণকর্তার কাছে প্রার্থনা। তিনি তাঁর পূর্বগামীদের সকলের চেয়ে বেশী মানবিকবাদী। অথচ তিনি কারো চেয়ে কম ধার্মিক ছিলেন না। উপনিষদের উপর তাঁর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল আর ছিল বাউল বৈষ্ণব সাধনার উপর।

কী করে তিনি জোড় মেলালেন এ নিয়ে প্রচুর অনুসন্ধানের অবকাশ আছে। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে তিনিও জোড় মেলাতে পারেননি, যদিও আজীবন চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বরকে "তুমি" বলে অত যে গান লিখলেন তার পরে দেখি আর "তুমি" নেই। শেষবয়সের কবিতায় "তুমি"র সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। একদিন তাঁকে নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি আর ভগবানে বিশ্বাস করেন না?" তিনি একটু হাসেন। তার পর পাশ কাটিয়ে যান। বলেন, "দেখ হে, আমি কবি। আমি এক্সপ্রেসন দিই।" তার পরে যা বলেন তা আমার ঠিক স্মরণ নেই। মনে হলো তিনি তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ দিয়েই ক্ষান্ত। তত্ত্ব প্রচার করতে চাননি। মোট কথা তিনি আমাকে ধরাছোঁয়া দিলেন না। আর ও প্রসঙ্গ ওঠেনি।

ভগবানে তাঁর আগের মতো বিশ্বাস থাক আর নাই থাক মানুষের উপর ছিল। মানুষের আত্মশক্তির উপর, বিজ্ঞানশক্তির উপর। তার পর তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রকৃতির উপর, প্রকৃতির আপনাকে আপনি নতুন করে তোলার চিরন্তন শক্তির উপর। উপরন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল সত্যের উপর, শ্রেয়ের উপর, সৌন্দর্যের

উপর, প্রেমের উপর। মানবিকবাদী বলে তাঁকে চিনতে কোনো সন্দেহ হয়নি। নিরীশ্বরবাদী বলে চীনদেশের মানুষকে বা বস্তুবাদী বলে রুশদেশের মানুষকে তিনি আপনার চেয়ে ছোট ভাবেননি। ধার্মিকরা যা প্রত্যহ করে থাকেন।

ধার্মিকদের বিশ্বসমীক্ষায় কেবল যে ঈশ্বর বা দেবতা থাকেন তাই নয়, শয়তান বা অসুরও থাকে। মানুষের ভিতরেও তাঁরা শয়তানকে অথবা অসুরকে দেখতে পান। প্রকৃতির ভিতরেও। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন শয়তানের বা অসুরের বা অপদেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কোনোখানে এমন একটি চরিত্রের অবতারণা নেই যে মূর্তিমান মন্দ। খারাপ লোক তিনি নিশ্চয় দেখে থাকবেন। কে না দেখেছে? কিন্তু লোকটাকে পুরোপুরি কালো তুলিতে আঁকা তাঁকে দিয়ে হলো না। তাঁর মনের গড়নই এ রকম যে তিনি মানুষ দেখলে তার মনুষ্যত্বই দেখেন, তার দেবত্ব বা দানবত্ব নয়। নরদেবতাও তিনি আঁকেননি। এঁকেছেন মহৎ পুরুষ, মহীয়সী নারী। এঁরাও মানুষ। এঁরাও আছেন।

মানবিকবাদী সাহিত্যিকরা কেন যে এ জগতে মহৎ চরিত্র নিষ্কলুষ চরিত্র দেখতে পাবেন না এর অর্থ বোঝা ভার। কেন যে এত বেশী আধিব্যাধি বিকৃতি ও বিকার দেখবেন তারও অর্থ হয় না। ন্যাচারালিজম বা রিয়ালিজম অতিপ্রাকৃতকে অস্বীকার করতে গিয়ে অপর এক চরম প্রান্তে পৌঁচেছে। রবীন্দ্রনাথ এ রকম একটা চরম প্রান্তের যাথার্থ্য মানতেন না। মানবিকবাদকে বিশেষ একটা। সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করলে সে আর মানবিকবাদ থাকে না। হয়ে যায় মতবাদ। ধর্মের বেলায় যেমন সাম্প্রদায়িকতা মানবিকবাদের বেলাও তেমনি মতবাদ নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধতা। ঈশ্বর ও পরকাল নিয়ে মধ্যযুগের আবহাওয়া গরম ছিল। আধুনিক যুগের আবহাওয়াকে গরম করে তুলেছে মানুষ ও তার সত্যিকার প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিচিত্র নির্ণয়। বিজ্ঞানের উপর ঠিক সেই পরিমাণ ভক্তি লক্ষিত হচ্ছে যে পরিমাণ ছিল ধর্মের প্রতি। বহু ক্ষেত্রেই এটা অন্ধ ভক্তি। মানবিকবাদকে বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে, জোড় মেলাতে হবে। এ এক নতুন সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে বিজ্ঞানচর্চায় মনোযোগ দেখেছি। "বিশ্বপরিচয়" লেখার আগে তাঁকে দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের বই অধ্যয়ন করতে হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ১৯২৪ সালে। সে সময় লক্ষ্য করি তিনি আহারের পর বিশ্রাম করছেন হেলান দিয়ে। হাতে একখানি "সায়েন্টিফিক আমেরিকান"। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর রুচি ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটি আমার গৃহিণীর মুখে শোনা। কবির মহাপ্রয়াণের বছরখানেক আগে আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসি। কয়েক মাস থাকি। বিশ্বভারতীর একটি ছাত্র আমাদের কাছ থেকে হগ্‌বেনের বিখ্যাত বই "ম্যাথেমেটিকস ফর দি মিলিয়ন" পড়তে নেয়। প্রণালীটা কোথায় পেলে, জানতে চান অধ্যাপক। তখন সে বইখানা তাঁকে দেখায়। বই আর আমাদের বাড়ীতে ঘুরে আসে না। খোঁজ, খোঁজ! আমার গৃহিণী অবশেষে শুনতে পান বই চলে গেছে গুরুদেবের হাতে। তিনি

তন্ময় হয়ে পড়ছেন।

একেই বলেই "গৃহীত এব কেশেষু।" মৃত্যু যখন তাঁর কেশ স্পর্শ করেছে তখনো তিনি নিবিষ্টচিত্তে অঙ্কশাস্ত্র পড়ে নিচ্ছেন। মহর্ষিকেও নাকি অনুরূপ অবস্থায় ভূ-তত্ত্ব পড়তে দেখা যায়। শুধালে উত্তর দেন, যাবার আগে নিজেকে ভরিয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সে কেবল যে আপনাকে ভরিয়ে নিয়েছিলেন তাই নয়, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন করতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে অনুমান করলে অযথা হবে না। "মানুষের ধর্মে" তার আভাস আছে। "ল্যাবরেটরি"তে তার ইঙ্গিত আছে। আমার নিজের ধারণা তিনি চীনে গিয়ে দেখতে পান ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও একটা জাতি ধার্মিক হতে পারে, নীতিশীল হতে পারে। তেমনি রুশদেশে গিয়ে দেখতে পান একটা জাতি ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেও প্রকৃত ধার্মিক ও নীতিশীল। এইসব দেখেশুনে তাঁর বদ্ধমূল সংস্কার একটু একটু করে বদলায়। নিরীশ্বরবাদকে ও বস্তুবাদকে তিনি ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। অনুরূপ চেষ্টা গান্ধীজীর জীবনেও দেখা যায়। তিনি বলতেন, সত্যই ভগবান। তেমনি রবীন্দ্রনাথের "ল্যাবরেটরি" গল্পের নন্দকিশোরের নিষ্কাম ধর্ম ছিল বিজ্ঞানসাধনা। তাঁর ল্যাবরেটরি হলো তাঁর বিধবার পূজার দেবতা।

রবীন্দ্রনাথকে এই সময় আমি জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধ করব আমরা কী দিয়ে? হিংসা দিয়ে, না অহিংসা দিয়ে? তিনি উত্তর দেন, "গীতার অর্জুনের মতো।" অর্থাৎ ঈশ্বরের বা ইতিহাসের নিমিত্তমাত্র হয়ে, হিংসা দিয়ে। এই উত্তর আমার মন মেনে নিতে পারেনি। মানবিকবাদ মানুষকে আর কারো নিমিত্তমাত্র হয়ে নিজের দায়িত্ববোধ বিসর্জন দিতে বলে না। দায়িত্ববোধ যার আছে সে যদি সব দিক বিবেচনা করে হিংসার মার্গ ধরে, তা হলে তাকে আজকের দিনে মানবকুল বিধ্বংসেরও দায়িত্ব নিতে হবে। মানবিকবাদ যে চূড়ায় এসে ঠেকেছে তার থেকে পরিত্রাণ ঈশ্বরের বা ইতিহাসের নিমিত্তমাত্র হয়ে নয়। অর্জুনের নজীর বা গীতার বচন মানবিকবাদকে গতিশীল করতে পারে না। ধর্মের মতো মানবিকবাদও পরমাণবিক মহাযুদ্ধের দিনে অসহায়। যদি না মানুষ হিংসা প্রতিহিংসার দুষ্টবৃত্ত ভেদ করতে শেখে। না, মানবিকবাদও যথেষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথের ছিল মানুষের উপর অসীম বিশ্বাস, অনন্ত বিশ্বাস। শেষপর্যন্ত সেই বিশ্বাসই মানুষকে বাঁচাবে। কোনো একটা 'বাদ' বা 'ইজম' মানুষকে কিছু দূর এগিয়ে দিতে পারে, অনেক দূর এগিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সব সংকট পার করে দিতে পারে না। মানবিকবাদও সর্বক্ষম নয়। আমরা মানবসৃষ্ট 'বাদ'-এর উপর আস্থা হারাতে পারি, কিন্তু মানুষের উপর বিশ্বাস হারাব না। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো মানে আপনার উপর বিশ্বাস হারানো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নিজে ছেড়ে না দিলে এ বিশ্বাস আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তলিয়ে দেখলে এই বিশ্বাসই মানবিকবাদের অন্তঃসার।

(১৯৬১)

পাশ্চাত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ

সেদিন আমার এক গুজরাতী কবি বন্ধুকে বললুম, "সম্প্রতি ধরা পড়ে গেছে যে রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশযাত্রা' বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবোঁর কবিতা পড়ে লেখা।"

তিনি বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর গভীর পরিচয়। তিনি হেসে বললেন, "হতেই পারে না। বোদলেয়ার ও রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন মার্গের কবি। জীবনের প্রতি তাঁদের অ্যাপ্রোচ-ই আলাদা।"

তার পর তিনি বললেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে গুজরাতে অখো অর্থাৎ অক্ষয় বলে একজন কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ আমি সম্পাদনা করছি। লক্ষ করে অবাক হচ্ছি, জার্মান ভাষার কবি রিলকের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল আছে। একই রকম উপমা, একই রকম চিত্রকল্প।"

আমি হেসে বললুম, "তা হলে কে ধরা পড়েছেন? অখো না রিলকে?"

আমরা দু'জনে একমত হলুম যে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত হননি, সাদৃশ্যটা আকস্মিক। সাহিত্যের ইতিহাসে অমন হয়ে থাকে। বহুবার হয়েছে। কেন যে অমন হয় তা বলা যায় না। বোধহয় এইজন্যেই হয় যে মানুষ বিভিন্ন হলেও মানুষের মন অভিন্ন। অভিজ্ঞতাও অভিন্ন। দেশকালের সীমান্ত রেখার দ্বারা নিবদ্ধ নয়।

একবার আমি এ নিয়ে মহাবিপদে পড়েছিলুম। "রূপদর্শন" নামে আমার একটি গল্প আছে। গল্পটি পড়ে আমার সম্পূর্ণ অচেনা এক ভদ্রলোক আমাকে লেখেন, "এ তো আমার জীবনের গল্প। আপনি কার কাছে শুনলেন? নিশ্চয়ই আমার চিরশত্রু অমুকের কাছে শুনে থাকবেন। ছি ছি, এমন শত্রুতা কি করতে হয়! আমি আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি যে আপনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে গল্প লিখলেন?"

ও গল্প পরের মুখে শোনা গল্প নয়। ওটা লিখতে লিখতে কত রকম মোড় নেয় সে আমিই জানি আর জানেন আমার গৃহিণী। তেমনি আমার আর একটি গল্প—"মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না।" তখন যে ছিল শিশু সে সাবালক হয়ে বলল, "এ গল্প আপনি চেখভের ডায়রিং পড়ে লিখেছেন।" হা ভগবান! এসব পাঠকের সঙ্গে তর্ক করবে কে?

কিন্তু "রূপদর্শনে"র পাঠক সম্বন্ধে বলছিলুম। বলা শেষ হয়নি। একবার পাটনা গিয়ে শুনি এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে ব্যাকুল। আমার যদি সময় থাকে, তা হলে পাঁচ মিনিটের জন্যে এসে দেখা করে যাবেন। ইনিই তিনি যাঁর জীবনের গল্প আমি বাটপাড়ি করে পেয়েছি। বেশ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষটি। কিন্তু ওই যে একটি কমপ্লেক্স্, হাজার যুক্তি দেখালেও যাবার নয়। পাঁচ মিনিট কেন, এক ঘণ্টা কি আরো বেশী সময় আমি তাঁকে দিই। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন থেকে মুছে ফেলা গেল না

যে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার গল্পের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। সাদৃশ্য থাকতে পারে কিছু, কিন্তু আমি তার জন্যে দায়ী নই। তাঁর সেই শত্রুটিকেও আমি চিনিনে।

এ কাহিনীর কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক বললেন, "এই আপেলগুলি আমি আপনার সেবার জন্যেই এনেছি। ওঁরা পাঠিয়েছেন। নিতেই হবে।"

বড় বড় এক ঝুড়ি আপেল। আমি পথে খাবার জন্যে একটা কি দুটো নিতে রাজী ছিলুম। তিনি কিন্তু আস্ত ঝুড়িটাই আমার গাড়ীতে তুলে দিলেন। কোনো আপত্তি শুনলেন না। গল্প লিখে আমি সফল হয়েছি।

আর একটি ঘটনা বলি। "হাসন সখী" বলে আমার আর একটি গল্প আছে। এই গল্পটি যখন লিখি তখন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে হঠাৎ একটি মেয়ে এসে আমার বাড়ীতে উঠবে। টি বি হাসপাতাল থেকে অকালে ছাড়া পেয়েছে, কোথায় যাবে জানে না। অনেক দিন পরে শুনলুম সে মধুপুরে যায়, সেরে ওঠে, একজন তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে। কলকাতায় পরে একদিন ওরা এসে আমাকে প্রণাম করে গেল। সঙ্গে ওদের শিশু। তা হলে কি আমি "হাসন সখী" লিখেছিলুম ওদের গল্পটি স্বচক্ষে দেখে বা স্বকর্ণে শুনে? তা নয়। জীবনও অনেক সময় সাহিত্যের অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে তাও নয়। এটা পুরোপুরি আকস্মিক। এতে শুধু এই সত্যই প্রমাণ করছে যে মানুষের মন অভিন্ন। মানুষের মন দেশকালের সীমারেখা মানে না। মানুষের জীবনেরও অদৃশ্য প্যাটার্ন আছে।

সুতরাং কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত নাও হতে পারে। পরে জন্মালেও।

অথচ আমরা প্রায়ই শুনি যে অমুক অমুকের দ্বারা প্রভাবিত। আর সাধারণত প্রভাব যাঁর উপর পড়ে তিনি প্রাচ্য, যাঁর প্রভাব পড়ে তিনি পাশ্চাত্য। রিলকের উপর অখোর প্রভাব পড়তে পারে না। তিনি যে পাশ্চাত্য। সুতরাং অখোর উপরেই রিলকের প্রভাব পড়া উচিত ছিল। যদি না তিনি হতেন সপ্তদশ শতাব্দীর।

পশ্চিমের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ঐতিহ্য আজকের নয়। দেড় শতাব্দীর। আবার এর বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিক্রিয়ার ঐতিহ্যও আজকের নয়। এটাও কিছু কম দেড় শতাব্দীর।

ইংরেজ না এলে, ইংরেজী ভাষা প্রবর্তিত না হলে, ইংরেজী সাহিত্যের বা ইংরেজীর মারফৎ ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে বাংলা সাহিত্য সেই ভারতচন্দ্রের যুগেই পায়চারি করতে থাকত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবই হতো না। এ সাহিত্যের গঙ্গোত্রী ভারতের মানসসরোবর থেকে এসেছে। কিন্তু এর গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ইউরোপের ভূমধ্য সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর এরাও এসে মিলেছে। এদের সঙ্গে মেলানোর ভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রামমোহন রায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও নগণ্য নন। পূর্ব পশ্চিমের মিলন ঘটনার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা তাঁর কাছে পুরুষানুক্রমে

স্বতঃসিদ্ধ ছিল। কারণ তিনি ছিলেন রাজা রামমোহনের উত্তরসাধক ও "প্রিন্স" দ্বারকানাথের পৌত্র। এঁরা উভয়েই পশ্চিমের মাটিতে দেহরক্ষা করে সে মাটিকে আপনার করে নিয়েছিলেন।

পশ্চিম অপরের পক্ষে সুদূর হতে পারে, কিন্তু ঠাকুরবংশীয়দের কাছে নিবান্ধব ছিল না। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়েছিল ইংরেজের ঘরে। সত্যেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে থেকে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্যে তৈরি হন। রবীন্দ্রনাথ সতেরো বছর বয়সে লণ্ডনে পড়েছিলেন। পরে আবার সেখানে গিয়ে ব্যারিস্টার হতেন, এই ছিল তাঁর পিতার অভিপ্রায়। বিধাতার অভিপ্রায় অনারূপ হলো বলে কি তাঁর জীবনের পাশ্চাত্য পর্ব হাওয়া হয়ে গেল? বিস্তর ইংরেজী বই তিনি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে পড়েছিলেন। অনেক ইংরেজী কবিতা তিনি নিজের হাতে খাতায় তুলেছিলেন। লঘুচেতাদের মতো তিনি গণনা করেননি যে এটা আমাদের, ওটা ওদের। শেলী কীটস টেনিসন সুইনবার্ন স্বদেশী না বিদেশী এ প্রশ্ন তাঁর মতো কবি-প্রকৃতির মানুষের পক্ষে অবান্তর বা গৌণ। আর তিনিও তাঁদেরি মতো রোমান্টিক স্বভাবের বলে একই ভাবের ভাবুক। ধাত বলে একটা জিনিস আছে, সেটা জাতকুলের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

আর সেই রোমান্টিক ধারা কেবল যে একটিমাত্র দেশে নিবদ্ধ ছিল তা নয়, প্রবাহিত হচ্ছিল একটা মহাদেশের উপর দিয়ে, আটলান্টিকের ও-পারেও তার বিস্তার ছিল। তার সম্পর্ক বিশেষ একটা স্থানের সঙ্গে নয়, বিশেষ একটা কালের সঙ্গে। বিশেষ একটা কি দুটো শতাব্দীর সঙ্গে। ইতিহাস যে কেবল ইউরোপ আমেরিকাকে আধুনিক যুগে উপনীত করে দিয়ে ক্ষান্ত ছিল তা নয়, এশিয়াকে আধুনিক করাও তার কল্পনায় ছিল। আর ইতিহাস কাজ করে মানুষেরই মাধ্যমে। আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে একটি হলো রোমান্টিক পর্যায়। এই পর্যায়ই বা কেন ইংলণ্ডে ফ্রান্সে নিবদ্ধ থাকবে? একেও চারিয়ে যেতে হবে মহাদেশ থেকে মহাদেশে। মানুষেরই মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তেমনি তাঁর স্বকাল সম্বন্ধেও। যে কালে জন্মেছেন সেকালের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে হলে পশ্চিমযাত্রা না করে উপায় নেই। কারণ স্বদেশের রাজধানী যেমন কলকাতায়, স্বকালের রাজধানী তেমনি লণ্ডনে বা প্যারিসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই রকমই ছিল। ইদানীং বলা যেতে পারে নিউ ইয়র্কে বা মস্কোতে। পরবর্তী বয়সে তিনি নিউ ইয়র্ক ও মস্কোতেও যান স্বকালের নাড়ী টিপতে। তাঁর মতো টনটনে কালচেতনা বাংলাদেশে বিরল। তিনি যখন কলকাতা থেকে শিলাইদায় বা পতিসরে যেতেন জমিদারির কাজে তখন তাঁর সঙ্গে একরাশ ইংরেজী বই যেত। বিদেশী বলে নয়, স্বকালীন বলে। ও ছাড়া আর কোনো উপায়েই তিনি স্বকালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারতেন না। জমিদারি থেকে কলকাতায় ফিরলে ছুটে যেতেন থ্যাকার কোম্পানীর বইয়ের দোকানে। ইংরেজী বই কিনতেন। বৈদেশিক বলে নয়, আধুনিক বলে।

চিন্তার দিক থেকে আপ-টু-ডেট হবার জন্যে তাঁর মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তা ছাড়া তাঁর সিভিলিয়ান ও ব্যারিস্টার বন্ধুদের আড্ডায় বলতে পেতে হলেও তো হালফিল ইংরেজী বই পড়া চাই। নইলে তাঁরা ভাববেন অর্ধশিক্ষিত জমিদারনন্দন। যে সমাজে তিনি মিশতেন সে সমাজের কারো চেয়ে তিনি কম হালফ্যাশানের ছিলেন না। এমন কি পোশাকে প্রসাধনেও।

আমরা মনে মনে একটি স্বদেশী ঋষির ছবি এঁকে বসে আছি বলে তাঁর বেলা পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা উঠছে। অন্যের পক্ষে যেটা পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁর পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ তিনি স্বকালের সঙ্গে একাকার। আর স্বকাল তো সারা দুনিয়া জুড়ে। তার মূল স্রোত তো পশ্চিম ইউরোপে। অতি বাল্যকাল থেকেই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত। কেবল বই পড়ে নয়, গান শুনে, গান বেঁধে, বাজনা কিনে, বাজনা বাজিয়ে। তেমনি ছবি দেখে, ছবি এঁকে। এখানে আমি পরিষ্কার ভাবে বলে রাখতে চাই যে, ইউরোপেরও প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে সেটা তেমন প্রত্যক্ষ নয় যেমন ইউরোপীয়দের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগে যাত্রা করেননি, করেছিলেন ইউরোপের আধুনিক যুগে। আমরাও সাধারণত তাই করে থাকি। সেইজন্যে ইউরোপ বলতে আমরা বুঝি আধুনিক যুগের ইউরোপ। আমাদের কবিদের মধ্যে একমাত্র মাইকেলকেই দেখি প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ইউরোপ সম্বন্ধে সচেতন হতে। ইংরেজীতে না লিখে বাংলায় লিখলে আর একজনের নাম করতুম—শ্রীঅরবিন্দ। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এঁরা ঢের বেশী 'ইউরোপীয়'।

আসলে হয়েছে এই যে আমাদের কাছে দেশকাল গুলিয়ে গেছে। আমরা দেশকে ভাবি কাল, কালকে ভাবি দেশ। ইউরোপকে ভাবি আধুনিক, আধুনিককে ভাবি ইউরোপ। রবীন্দ্রনাথও এই মানসিক অভ্যাসের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। পূর্ব পশ্চিমের মিলন ঘটানোর জন্যে তাঁর মধ্যে যে উৎসাহ ছিল সে উৎসাহ হোমার ভার্জিল বা প্লেটো অ্যারিস্টটল বা দান্তে পেত্রার্কার প্রতি উন্মুখ ছিল না। ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্য যুগ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের অভাব। ইউরোপ তাঁর কাছে আধুনিক ইউরোপ। অথচ ভারতবর্ষ প্রাচীন। যখনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনা করতে গেছেন তখনি লক্ষ করি তিনি তুলনাটা করেছেন আধুনিক ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের নয়, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের নয়, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের। অর্থাৎ বুদ্ধের সঙ্গে বালকের। একজনের আছে শুধু অতীত, আরেকজনের আছে শুধু বর্তমান। এ ধরনের মিলন সমানে সমানে নয়। এ যেন একটি পুরোনো বোতল থেকে পুরোনো মদ ও আরেকটি পুরোনো বোতল থেকে নতুন মদ নিয়ে একপ্রকার ককটেল বানানো।

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ স্বকালকেই খুঁজতে বেরিয়ে ইউরোপে যান, ইউরোপকে খুঁজতে বেরিয়ে ইউরোপে যাননি। তাঁর ইউরোপ রেনেসাঁসের পরবর্তী আধুনিক ইউরোপ, তার পূর্বের প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ইউরোপ নয়।

সেইজন্যে ইউরোপকে এদেশে ইণ্টারপ্রেট করার ভার তাঁর উপরে পড়েনি। অথচ ভারতবর্ষকে ওদেশে ইণ্টারপ্রেট করার ভার তাঁর উপরে পড়ে ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" প্রকাশনের সময় থেকেই। সে ভারত প্রধানত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত। ইউরোপীয় পাঠকদের চোখে তিনি প্রাচীন, প্রাচীর বাণীমূর্তি। তারা তাঁর আধুনিক রূপ দেখতে চায়নি। বুঝতে পারেনি। তাই তাঁকে আবার যেতে হলো পশ্চিমের দরবারে। এবার তসবীর হাতে। এবার যেন মনে হলো চিনেছে তাঁকে আধুনিক বলে। আধুনিক বলে চিনুক এইটেই তিনি চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় বলে চিনুক এটা তো তিনি চাননি। ইউরোপীয় বলে তারাও তাকে চেনেনি। কোনো দিনই তিনি ইউরোপীয় বলে পরিচয় দেননি, দিতে চাননি। ইউরোপীয় হলে তো পরিচয় দেবেন, ইউরোপীয় তিনি কোনো কালেই ছিলেন না, সেদিক থেকে তিনি পুরোপুরি ভারতীয়।

তাঁর উপর পাশ্চাত্য প্রভাব যা পড়েছে তা একজন ভারতীয়ের উপর স্বকালের প্রভাব, যুগধর্মের প্রভাব। ধাতটা রোমাণ্টিক বলে ইউরোপীয় বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু সব ইউরোপীয় কবি রোমাণ্টিক নন। রোমাণ্টিক ধারার বহুপূর্বে ইউরোপ ছিল, বহু পরেও থাকবে। রোমাণ্টিকতা ও ইউরোপীয়তা একার্থক নয়, এককালীন নয়। সত্যিকার পাশ্চাত্য প্রভাব ঢের বেশী পড়েছে মাইকেলের উপর, শ্রীঅরবিন্দের উপর।

স্বদেশ ও স্বকাল একসঙ্গে উভয়কেই ভালোবাসা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতকে তেমনি আধুনিক যুগকে ও তার কেন্দ্রস্থল পশ্চিম মহাদেশকেও ভালোবেসেছিলেন। ইংরেজ জাতির উপরেও তাঁর ছিল অপার প্রীতি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে সেকালের বড় বড় সাহেবসুবোরা অভিনয় দেখতে বা সামাজিকতা করতে যেতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউরোপীয় বন্ধুদের জন্যে খোলা ছিল বাগানবাড়ীর দ্বার। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে একটা উলটো স্রোত বইতে শুরু করে। ইংরেজরাও আর সে ইংরেজ নয় যারা সমান ভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছুক, ভারতীয়দের শ্রদ্ধা করতে প্রস্তুত। ভারতীয়রাও আর সে ভারতীয় নয় যারা ইংরেজ রাজত্বকে বিধির বিধান বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। দেশীয় স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী স্বার্থের বিরোধ দিন দিন প্রকট হতে থাকে। সামান্য একটু চ্যালেঞ্জের ভাব দেখলেই ইংরেজ নিজ মূর্তি ধারণ করে। যেন আর একটা সিপাহী বিদ্রোহ বাধল বলে! সামাজিক সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে কী করে? ছিন্ন হয় না, কিন্তু তার মধ্যেও বিরোধের শনি ঢোকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ইংরেজরা একান্ত সাম্রাজ্যসচেতন, ভারতীয়রা একান্ত স্বদেশসচেতন। স্বদেশসচেতন থেকে অতীত-সচেতন। অতীত-সচেতন থেকে অতীত-উপাসক। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে কোথাও কোন মিল খুঁজে পায় না। আধুনিক ইউরোপের দিকে তাকালে কেবল

অসুরের প্রতাপ দেখে। তাদের শুক্রাচার্য বিজ্ঞানের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন। পশ্চিমের কাছে বিজ্ঞান ছাড়া শেখবার আর কিছু নেই। ইউরোপের শিল্প, ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন একদা আকর্ষণ জাগিয়েছিল। তখন তার দরুন কেউ লজ্জিত হয়নি। এখন এলো লজ্জিত হয়ে বিকর্ষণ বোধ করার যুগ। আধুনিক ইউরোপের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকে নিবদ্ধ করা হলো প্রাচীন ভারতের উপরে। আমাদের কী নেই যে আমরা পরের কাছে যাব! ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাই যেন আমাদের পরাধীন করেছে, বাড়তে দিচ্ছে না, বাঁচতে দিচ্ছে না। দাস মানসিকতার সৃষ্টি করে বিদেশী প্রভুত্বকে সহনীয় করেছে, দৃঢ়মূল করেছে। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হতে হলে সাংস্কৃতিক অর্থে নিঃসম্পর্কীয় হতে হবে। সমাজে যেমন তফাৎ থাকতে হবে, শিক্ষাতেও তেমনি। হৈ-হৈ করে যাঁরা একদিন ইংরেজী শিখে অগ্রগামী হয়েছিলেন তাঁদেরই বংশধরদের মধ্যে দেখা দিল ইংরেজীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংস্কৃতের উপর অচলা ভক্তি। অবিকল টুলো পণ্ডিতের মতো। যদিও ইংরেজী এঁরা কেউ ছাড়লেন না। "বিলেতফেরৎ টানছে হুঁকো সিগরেট খাচ্ছে ভটচায্যি।"

দুনিয়াটাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হলো। এক ভাগে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, নীতি, সমাজ। অন্য ভাগে আধিভৌতিকতা, বিজ্ঞান, কূটনীতি, রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ সমাজ গড়েছে, রাষ্ট্র গড়েনি। ইউরোপ রাষ্ট্র গড়েছে, সমাজ গড়েনি। এই ধরণের থীসিস ও অ্যান্টিথীসিস খাড়া করে একদল বললেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। মিলন কোনো দিন হবে না।" আরেকদল বললেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। মিলন ঘটাতেই হবে।" অর্থাৎ থীসিস ও অ্যান্টিথীসিসের সিন্থেসিস সম্ভব ও সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন, এ বিশ্বাস তিনি রাজনৈতিক সংঘাতের দিনেও ত্যাগ করেননি। কিন্তু যে দুটি পক্ষের সমন্বয় তাঁর অভিষ্ট ছিল, সে দুটি পক্ষ কি বাস্তব না মনগড়া? কেমন করে তিনি ধরে নিলেন যে ভারত আধ্যাত্মিক ও ইউরোপ তা নয়? কী দেখে তাঁর ধারণা জন্মাল যে ভারত গড়েছে সমাজ, ইউরোপ গড়েছে রাষ্ট্র?

থীসিসটাই ছিল ভুল, অ্যান্টিথীসিসটাও। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" যেই আবিষ্কৃত হলো অমনি ধসে পড়ল এই তাসের কেল্লা। মহাভারত না হয় কবিকল্পনা, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের ওই ঐতিহাসিক স্বরূপ তো নিরেট বাস্তব। হারিয়ে যাওয়া বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ ভারতের বাইরে পাওয়া গেল। বৌদ্ধ দর্শনও ইউরোপীয় দর্শনের মতো তথাকথিত জড়বাদী। প্রাচীন ভারতের যে ছবি ফুটে উঠল তা হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আঁকা ছবি নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবনে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, যদিও রামমোহনের ধারার থেকে সরে যাননি। দুই নৌকায় পা রাখতে তাঁর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছিল। "গোরা"র পর তিনি হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আওতার বাইরে চলে যান। কিন্তু তার পরেও পূর্বোক্ত

থীসিস তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়েনি, ছাড়ল আরো অনেকদিন পরে। নোবেল প্রাইজের পরেও তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিকতা বনাম বস্তুপরায়ণতার কথা বলে বেড়িয়েছেন। সমাজ বনাম রাষ্ট্র নিয়ে তাঁর চিন্তা পূর্বের জের টেনে চলেছে। বেশ একটা পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল রুশক্ষাণের পরে। ইতিমধ্যেই তার পূর্বলক্ষণ লক্ষ করা গেছল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকে পূর্ব পশ্চিমের থীসিস অ্যান্টিথীসিস অন্তর্হিত বা অদৃশ্য। তা বলে পূর্ব পশ্চিম এক হয়ে গেল বা উড়ে গেল তা নয়। শুধু বিরোধকল্পনাটাই প্রত্যাহৃত হলো। রামমোহনানুগ রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলসুরের সঙ্গে এর মিল আছে। আত্মপর বিরোধবুদ্ধি তাঁর মধ্যে যদি এসে থাকে তবে সেটা স্বদেশের পরাধীন দশার প্রেরণায়।

পরাধীনতার বেদনা অন্তরে নিত্য বহন করলেও মনের দরজা-জানালা তিনি নিত্য খোলা রেখেছিলেন। খোলা রাখার জন্যে তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড প্যাশন ছিল। দেশের নামে জাতির নামে যখনি দরজা-জানালা বন্ধ রাখার প্রস্তাব উঠেছে তখনি তিনি প্রচণ্ড প্যাশনের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর যত না বিরোধ স্বদেশের কূপমণ্ডূকদের সঙ্গে ততোধিক। তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে ভারতের পরাধীনতার কারণই হলো ওই কূপমণ্ডূকতা। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, মানবাত্মার অভিনব প্রকাশের প্রতি বিমুখভাব, যে জগতে জন্মেছি সেই জগতের পূর্ণ পরিচয় নিতে অনাগ্রহ, বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি সাগর গিরি লঙ্ঘনের জন্যে অহরহ যে আহ্বান জানাচ্ছে সে আহ্বানের প্রতি অসাড়তা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে পঙ্গু ও অন্ধ হতে হবে এমন কোনো বিধান তিনি মানতে রাজী ছিলেন না, কারণ অমনি করেই দেশ পরাধীন হয়েছিল। ওই শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করেই।

দরজা জানালা নিত্য খোলা রাখলে আলো বাতাস ঢুকবেই। সে আলো বাতাস প্রকৃতির আলো-বাতাসেরই মতো এক দেশ থেকে অপর দেশে যায়, যেখানে তার আধিক্য সেখান থেকে যায়, যেখানে তার ন্যূনতা সেখানে। একদা সে ভারত থেকে চীনে গেছল, জাপানে গেছল। ভারতে এসেছিল গ্রীস থেকে, ইরান থেকে। এই যে অবিরত যাওয়া আসা, একে বেড়া দিয়ে বন্ধ করতে গেলেই বিপত্তি। অপর পক্ষের যুক্তি হলো, বাঁধ না দিলে সব ভেসে যাবে যে। ভারতের আপনার বলতে আর কিছু থাকবে না। ভারত আর ভারত থাকবে না। হয়ে যাবে কালো ইংলণ্ড। ভারতীয়রা হবে কালো ইংরেজ। ভারতীয় সংস্কৃতি হবে নকল ইউরোপীয় সংস্কৃতি। পরাধীনতা যদি মানসিক হয়, আত্মিক হয়, তবে এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে? সুতরাং রোধ করো পাশ্চাত্য প্লাবন।

রবীন্দ্রনাথ যে অপর পক্ষের যুক্তিতে ভোলেননি তা নয়, তবু মোটের উপর রামমোহন দ্বারকানাথের পক্ষেই রয়েছেন ও তার দরুন নিন্দাবাদ সয়েছেন। সংকীর্ণতা প্রচার করে সুলভ প্রশংসা কুড়োতে যাননি। কিন্তু সেই

সঙ্গে তাঁকেও সতর্ক থাকতে হয়েছে যাতে পশ্চিম থেকে জোয়ার এসে সত্যি সত্যি ভারতের মহত্তম আদর্শকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। ভারতের অন্তরতম বাণীকে স্তব্ধ করে না দেয়। প্রতিপক্ষের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ রক্ষণযোগ্য ও রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু তাঁরা না করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ বর্ধনযোগ্য ও বৃদ্ধি করতেই হবে। তাঁদের ভারতীয়তা কোন্ অতীত শতাব্দীতে শেষ হয়ে গেছে। তাঁর ভারতীয়তা অশেষ। তাঁদের ভারতসত্তায় বিশেষ স্থান নেই। তাঁর ভারতসত্তা বিশ্বকে বরণ করে এনে আপনার করতে আত্মসাৎ করতে ব্যাকুল।

তা হলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল? রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে কি পড়েনি? পাশ্চাত্য প্রভাব পড়ে তাঁকে ভারতীয়তাভ্রষ্ট করেছে কি করেনি? এর উত্তর, জানালা দরজা খোলা রাখলে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়বেই। কিন্তু ভারতীয়তা হতে ভ্রষ্ট করবে এতখানি শক্তি কি তার আছে? বরং ভারতীয়তাকে পুষ্ট করবে, যদি ভারতীয় আত্মার শক্তি তার চেয়ে বেশী হয়। রবীন্দ্রনাথের সহজাত জারক শক্তি পাশ্চাত্য প্রভাবকে জীর্ণ করে তাঁর জীবনের তথা সৃষ্টির পুষ্টি সাধন করেছে।

হাঁ, পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে বইকি। আদিপর্ব থেকেই পড়েছে। অন্তিম পর্বেও তার রেশ আছে। তাঁর শেষ বয়সের জগৎ যে-কোনো একজন আধুনিক ইউরোপীয় কবি ও শিল্পীর জগৎ। আধুনিকতম পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান থেকেই তিনি তাকে লাভ করেছেন, উপনিষদ্ থেকে নয়। তা বলে উপনিষদ্ থেকে বাউলের গান থেকে ও আপনার ধ্যান থেকে তিনি যা পেয়েছিলেন তাকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তঃসার তো সেই। রবীন্দ্রনাথ একদিক দিয়ে যেমন শেলী কীটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতি রোমান্টিক ইউরোপীয় কবিদের পর্যায়ভুক্ত, তেমনি আরেক দিক দিয়ে বাল্মীকি, ব্যাসদেব, কালিদাস, বাণভট্ট, বিদ্যাপতি, মীরা, কবীর প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কবি কথাকার সাধক গায়কদের পরম্পরা-ভুক্ত। বাউল বৈষ্ণবদেরও। একটিকে বলা যেতে পারে স্বকালের ধারা, আরেকটিকে স্বদেশের ধারা। দুই বিচিত্র ধারায় এমন অনায়াস অধিকার ও বিহার ইতিহাসে অপূর্ব।

কিন্তু এহেন সব্যসাচীরও সীমাবন্ধন ছিল। প্রাচীন গ্রীস থেকে বহমান ইউরোপীয় ক্লাসিকাল ধারায় রবীন্দ্রনাথের আকণ্ঠ নিমজ্জনের প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে ভারতীয় ক্লাসিকাল ধারায় তিনি আজীবন মগ্ন। দ্বিতীয়ত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রোমান্টিকদের তিনি অন্তরঙ্গ হলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ জুড়ে যে রোমান্টিকবিরাগী বা রোমান্টিকবিরোধী মোহমুক্ত মেজাজ দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করা দূরে থাক বিকর্ষণ বোধ করেন। তাঁর অভ্যাসমতো দরজা জানালা খোলা যদিও তিনি রেখেছিলেন, সেই হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়া তাঁর মনে ফুল ধরাতে পারেনি, বরং ঝরিয়ে দিয়ে গেছে পরম কারুণিক বিশ্বপিতার উপর একান্ত নির্ভরতা।

ঈশ্বরের বদলে তিনি মানুষের দিকেই আরো বেশী করে ঝুঁকেছেন। প্রকৃতির দিকেও। মোটের উপর উত্তরসামরিক ইউরোপের বা আমেরিকার সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা ঘটেনি। এলিয়ট বা পাউণ্ড বা অডেন বা পরবর্তী বয়সের ইয়েটস কারো সঙ্গে তিনি তেমন সাযুজ্য অনুভব করেননি।

আধুনিক ইউরোপের স্বকালকেই যদি রবীন্দ্রনাথের স্বকাল বলি তবে লক্ষ করি প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি তার স্বকালের সঙ্গে তাল রেখে দৌড়তে পারছেন না। ব্রাউনিং থাকলে তিনিও কি পারতেন? উত্তরসামরিক যুগে ঘোষণা করতে ভরসা পেতেন কি যে,

"God's in His Heaven,
All's right with the world."

উত্তরসামরিক যুগ বলেছি, বলতে পারতুম উত্তরবৈপ্লবিক যুগ। মানুষের চেতনা ও প্রত্যয় ও আদর্শ ও নীতি সব কিছুতে ভাঙন ধরেছে। ভাঙনের পরে হয়তো গঠনের দিনও আসবে, কিন্তু গঠন ঠিক আগেকার ছাঁচে নয়। প্রাক্‌সামরিক ইংরেজ কবিসমাজ দিশেহারা। ফরাসী কবিসমাজও তাই। জার্মানীতে ও ইটালীতে ফাসিস্ট কমিউনিস্টের দ্বৈরথ কবিকুলকেও উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়ে মহামূল্য উপদেশ দিয়ে আসেন, কিন্তু সেইসঙ্গে নিয়ে আসেন না তাদের মোহমুক্তি ও হতাশা ও হতবিশ্বাস, তাদের উন্মত্ত মতবাদঘটিত দ্বন্দ্ব, যেসব উপাদান দিয়ে উত্তরসামরিক পাশ্চাত্য সাহিত্য রচিত। অবশ্য তিনি বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কী, কিন্তু সত্তা দিয়ে বোধ করেননি এর সমগ্রতা। যেমন করেছিলেন টলস্টয় তাঁর শেষজীবনে।

আসলে রবীন্দ্রনাথকে দেবার মত আর কিছু ছিল না ইউরোপের। বরং কিছু ছিল রাশিয়ার—সোভিয়েট রাশিয়ার। অথচ ইউরোপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হলো না। বহুকালের টান। ইউরোপের দৃষ্টিতে তিনি একজন প্রাক্‌সামরিক যুগের আদর্শবাদী মিস্টিক, একজন ঊর্ধ্বচারী স্বপ্নদ্রষ্টা। কিন্তু এই রক্তাক্ত ধরণীর ক্লেদকর্দমের বাণীমূর্তি নন, সাম্প্রতিক কালের প্রতিনিধি নন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথেরই ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হয়েছিল। তার থেকে গান নিয়ে গির্জায় গাওয়া হয়েছিল। গথিক ছাঁদের হরফে ছাপা সোনার জল দেওয়া কার্ড আমিও পরে দেখেছি। তিন-তিনজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবি বা কবিপত্নী তার অনুবাদ করেছেন বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আঁদ্রে জীদ, গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, Jimenez-জায়া। এমন ভাগ্য কবে কার হয়েছে? এমনি কত লোকের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বে।

রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে এটা আধখানা সত্য। বাকী আধখানা সত্য হচ্ছে পশ্চিমের উপরেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। কিছু নিয়েছিলেন বলেই তিনি কিছু দেওয়াতে পেরেছিলেন, নইলে ইউরোপ কি

আর কারো হাত থেকে কিছু নেয় ? সমন্বয় না ঘটুক, বিনিময় ঘটেছে।" "দেবে আর নেবে মিলিবে মেলাবে, যাবে না ফিরে" কবির এই মন্ত্র অমোঘ।

(১৯৬১)

কবির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার

"অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র—ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র—একদিন আমার প্রভাতভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। বলে ইংরেজিতে শুরু করলেন : Is Art too good to be human nature's daily food ? বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে সকল সাহিত্য বা শিল্প রচনার প্রয়াস আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আনুকূল্য করে, মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদক্ষ করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনোপ্রকার সমস্যাপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ কিনা। অর্থাৎ কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নটি আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে করে নিয়ে এসেছি। এই প্রশ্নের সূত্রটিকে অবলম্বন করে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা করে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।" (রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্যের পথে"র অন্তর্ভুক্ত "সাহিত্য" প্রবন্ধের বর্জিতাংশ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৪৭ ও ৫৪৮।)

এ হলো প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা। জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সালে আমি আচমকা কবির সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার নাম জানতেন না, আমিও জানাইনি। জানালে চিনতেন না। কদাচিৎ দুটো একটা রচনা "প্রবাসী"তে বা "ভারতী"তে বেরিয়েছে। আমার নাম নয়, আমার প্রশ্নটাই ছিল তাঁকে স্পর্শ করবার মতো। তিনি বললেন, "আচ্ছা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।" মুখে মুখেও একটা উত্তর দিয়েছিলেন, অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা দেওয়া হলো কলকাতায়। আমি তখন পাটনায়। তাই শোনার সুযোগ হয়নি। "বিজলী"তে একটি বিবরণী পড়েছিলুম, তাতেও আমার উল্লেখ ছিল। সেই অনুলিখনে কবির ভাষা আরো স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। পুনর্লিখিত হয়ে বক্তৃতাটির স্বাদ বদলে গেছে। এখন পড়ছি আর ভাবছি আমি বোঝাতে চাইলুম কী আর তিনি বুঝলেন কী! তর্কটা চিত্তবিনোদন বা জীবনযাত্রার আনুকূল্য বা মঙ্গলবিধান বা সমস্যাপূরণ নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হলো, আর্ট কি এমন মূল্যবান সামগ্রী যে তাকে নিত্য ব্যবহার করা যায় না, এমন শখের জিনিস যে তাকে আটপৌরে করতে নেই, এমন এক ভোজ যা শুধু উৎসবের জন্যে বা শুধু বিদগ্ধদের জন্যে ? যেমন

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসীনৃত্য। দেবতাই তার দর্শক। দেবতা-ব্যতীত একজন কি দু'জন পুরুষ—পূজারী কি রাজা। নৃত্যের শেষের দিকে দেবদাসী সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে রসে গলে যায়। সাধারণ লোক কি তার মহিমা বুঝবে ? সেইজন্যেই বলা হয়েছে, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

আমার প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি। কাজ চালানো গোছের একটা উত্তর সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছি। সেটা রবীন্দ্রনাথেরও নয়, রলাঁরও নয়, টলস্টয়েরও নয়। সেটা তাঁদের সৃষ্টির ভিতর থেকে নেওয়া। তাঁরা যা লিখেছেন বা বলেছেন তা নয়। তাঁদের সৃষ্টি যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তাই। সেইসঙ্গে তাঁদের জীবনও।

প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ১৯২৯ সালের শেষে। মাঝখানে প্রায় ছ'বছর ব্যবধান। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ "বিচিত্রা"য় আমার "পথে প্রবাসে" পড়েছেন, পড়ে সম্পাদকের কাছে তারিফ করেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তার উল্লেখ করে বললেন, "ওটা তুমি ইংরেজিতে অনুবাদ করছ না কেন ?"

এবারকার সাক্ষাৎ প্রভাতভ্রমণের সময় গোরালপাড়া যাবার রাঙা মাটির পথে নয়। এবার নবনির্মিত উদয়ন ভবনের দ্বিতলে। পৌষোৎসবের মেলা সাঙ্গ হয়েছে। আশ্রম নীরব। অচিন্ত্যকুমার আর আমি একসঙ্গে কবিসন্দর্শনে এসেছি। পুরাতন অতিথিশালায় স্থান পেয়েছি। অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে কবির আগেই পরিচয় ঘটেছিল। কলকাতায়।

কবিকে আমার সদ্যপ্রকাশিত কবিতার বই "রাখী" উপহার দিতেই বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যদি এমন করে চুরি কর তা হলে আমি আমার বইয়ের জন্যে নাম খুঁজে পাই কোথায় ?"

আমি বললুম, "বা! চুরি করলুম কবে! এ নাম তো আমারি আবিষ্কার।"

তিনি হেসে বললেন, "কিন্তু ওটা আমারি কল্পনায় ছিল।"

বইখানা নাড়াচাড়া করে কাছে রেখে দিলেন। কয়েকদিন পরে আমার কর্মস্থলে আমার বই আমার কাছে ফিরে আসে। খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর হাতের লেখায় সংশোধন। একখানি চিঠিও ছিল, "রাখী" প্রসঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে অসাহিত্যিক বিষয়েও আলাপ করলেন। বললেন, "তুমি বাংলাদেশ নিলে কেন ? আমি হলে ইউ পি নিতুম।"

তবে কি রবীন্দ্রনাথেরও সাধ ছিল আই সি এস হয়ে ইউ পি যেতে ?

কবিকে বললুম, "আমি বাঙালী সাহিত্যিক হতে চেয়েছি বলেই বাংলা-দেশ চেয়েছি। চাকরির দিক থেকে তেবে দেখিনি।"

কবি যুক্তপ্রদেশের গুণগান করলেন, বাংলাদেশ সম্বন্ধে উৎসাহ দিলেন না। বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে আমি সাহিত্যের জন্যে এসেছি।

তার পর কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বলতে পারো, ওদেশের লোক আমার কাব্য যেমন নিয়েছে আমার ছোটগল্প কেন তেমন নিল না? এদেশের সঙ্গে ওদেশের সমাজব্যবস্থার মিল নেই বলে? আমাদের সমাজ ওদের অজানা বলে?"

উত্তর খুঁজে পেলুম না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আমাদের চোখে অতুলনীয়। অথচ ইংলণ্ডে বা কণ্টিনেণ্টে ওর সমাদর হলো না। সমাজের জ্ঞান না থাকলে যদি গল্প উপভোগ করতে কষ্ট হয় তবে আমরা চেখভ এত পড়ি কেন?

কবি আমাদের আরো কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। আমি সদ্য বিলেত প্রত্যাগত বলে। একটি আমার মনে আছে, সেটি আইরিশ নাট্যকার Synge-এর নাটক সম্বন্ধে। সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁর কাছে বরাবরই বিশেষ কৌতূহলের বিষয় ছিল। চিঠিপত্রে উল্লেখ নেই বলে কেউ যেন না মনে করেন যে তিনি সে বিষয়ে উদাসীন বা অজ্ঞ ছিলেন। গ্রহণ করুন আর নাই করুন, লেখক ও লেখার খোঁজখবর তিনি রাখতেন। হালফ্যাশানের হলে তো কথাই নেই।

সামনের বছর কবি আমেরিকা যাবেন ভাবছিলেন, বললেন, "ওদের অগাধ টাকা। তার সামান্য অংশ যদি বিশ্বভারতীর জন্যে পাই তা হলেও আমার ঝুলি ভরে যায়।"

তিনি যে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরোবেন এটা আমার ভালো লাগেনি। বিশেষত কানাডা থেকে আমেরিকায় ঢুকতে গিয়ে সেই অপমানের পরে। আমি তখন লণ্ডনে। কাগজে পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলুম। আবার আমেরিকায়! পরে খবর পেলুম যে তিনি প্রথমে রাশিয়ায় ও তার পরে আমেরিকায় যান। জানতেন না যে রাশিয়ায় গেলে আমেরিকার কল্‌কে মেলে না। চাঁদা দূরের কথা, বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণও পেলেন না। রিক্তহস্তে ফিরলেন। যদি আগে আমেরিকায় যেতেন তা হলে এতখানি নিরাশ হতে হতো না। তবে কতকটা হতে হতো বইকি। আমেরিকার তখন জোর মন্দা। সেই অর্থনৈতিক সংকটে কেই বা পরের দেশের জন্যে মুক্তহস্ত হচ্ছে!

কবির সঙ্গে দেখা করতে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী এলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আমি বললুম, "আলাপ হয়েছে।"

শান্তিনিকেতনে আসার আগে বালীগঞ্জে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিলুম। তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গেও। এঁরা দু'জনেই আমার সঙ্গে আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করেছিলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে "পথে প্রবাসে"র ভূমিকা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। অনুরোধটা আমার দিক থেকে যায়নি, তাঁর দিক থেকেই এসেছিল। সাহিত্য জগতে এটি একটি আশ্চর্য ব্যাপার।

কবি বললেন, "ওহে, বিবি একটা তাবলো (tableau) প্রয়োজনা করছেন। ভারত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কয়েকজন নারীর নাম করতে পারো?"

চাঁদবিবি, দুর্গাবতী প্রভৃতি বীরাঙ্গনার নাম করলুম। মীরার নাম বোধহয় তিনি নিজেই করলেন। ঝাঁসীর রানীর নামও উঠেছিল মনে হয়।

অচিন্ত্যকুমার আর আমি আরো দিন দু'তিন থেকে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু আর সে রকম নিরিবিলি পাইনে। আমাকে যেতে হয় চৌধুরীদের কাছে। তাঁরা উঠেছিলেন উত্তরায়ণেরই অন্য কোনোখানে। একদিন সন্ধ্যায় তো তাঁরা আমাকে ডেকে বৈঠক করলেন। অমিয় চক্রবর্তী তখন কবির প্রাইভেট সেক্রেটারী। তিনিও একদিন ডেকে চা খাওয়ালেন। তাঁর সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হলেও আগে তাঁকে আমি শান্তিনিকেতনে দেখেছিলুম বছর চারেক আগে ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়ার ঘরে। গুহায় নির্জনবাস করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। পরনে রেশম।

একদিন অতিথিশালায় ফিরে অচিন্ত্যকুমার বললেন, "তুমি আজ গেলে ভালো করতে। কবি আজ মন খুলেছিলেন। যা বললেন তা অপূর্ব।"

আমি জানতে উৎসুক হই। "কী বললেন, শুনি?"

"কবি বললেন, অচিন্ত্য, সব সময় মনে রাখবে লোকলক্ষ্মী গর্ভিণী।" অচিন্ত্যকুমার উত্তর দেন, স্তব্ধ হয়ে থাকি আমরা দু'জনে।

এই উক্তির ব্যাখ্যা কবির মুখে শুনিনি। শুনেছিলুম অচিন্ত্যকুমারের মুখে। এতকাল পরে ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। মর্ম এই যে, সাহিত্যিক দীর্ঘকাল ধরে এক-একটা স্বপ্নকে বা আইডিয়াকে গর্ভে ধারণ করেন, একটু একটু করে অবয়ব দেন। তার পর যথাকালে প্রসব করেন। যতদিন না প্রসবের সময় হয়েছে ততদিন অন্তরালে থেকে অতি যত্নে গর্ভরক্ষা করেন। গর্ভিণীর এর বাড়া কর্তব্য নেই। লোকের প্রতি সাহিত্যিকেরও কর্তব্য এই। লোকসমাজে অকালে তাড়াহুড়ো করে আত্মপ্রকাশ করতে গেলে লোকের ক্ষতি করা হয়, লেখারও।

এই বাণীটি যদিও অচিন্ত্যকুমারকে দেওয়া তবু আমিও এটিকে আপনার করে নিই।

(১৯৬১)

সর্বমানব ও রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যের সমস্তটা বাঙালীমাত্রেরই উত্তরাধিকার। এর বেশ কিছু অংশ ভারতীয়মাত্রেরই উত্তরাধিকার। এর অল্প কিছু অংশ মানবমাত্রেরই উত্তরাধিকার। চীন থেকে পেরু, আইসল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া যেখানে যত মানুষ আছে সকলে বলতে পারে যে বাংলাভাষায় লেখা এই কবিতাটি বা গল্পটি আমাদেরও সম্পদ। আমরাও একে জন্মসূত্রে বা অন্যসূত্রে পেয়েছি। আমরাও একে ভোগ করব।

বাংলাভাষা সম্পর্কে যা বলা হলো, বিশ্বের যে কোনো ভাষা সম্পর্কে তা

বলা যায়। ইংরেজী ফরাসী রুশ জার্মান ইটালিয়ান ভাষা সম্পর্কেও তা বলা যায়। আরবী ফারসী চীনা জাপানী মালয় ভাষা সম্পর্কেও তা বলা যায়। সমস্তটা যার যার নিজের, কিন্তু কতক আমাদের সকলের। আমাদের ভাষায় রচিত হয়নি বলে একে আমরা পরকীয় ভাবতে পারিনে। এক্ষেত্রে স্বদেশী বিদেশীর প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ইংরেজরা বিদেশী, সুতরাং শেক্সপীয়ারও বিদেশী, এটা ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ঠিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুল। কারণ শেক্সপীয়ার বিদেশী হলেও তাঁর সৃষ্টির একাংশ আমাদেরও উত্তরাধিকার।

এই রকমই বরাবর হয়ে এসেছে। বুদ্ধের বাণী চীন-জাপানের আপনার হয়ে গেছে। বুদ্ধকে তারা বিদেশী বলে ভাবতেই পারে না। তেমনি যীশুকেও বিদেশী বলে ভাবতেই পারে না ইউরোপের লোক। তাঁর বাণী তাদের নিজস্ব হয়ে গেছে। ধর্মের মতো বিজ্ঞানের সত্যগুলোও দেশ থেকে দেশান্তরে যায়, সব দেশের আপনার সম্পদ হয়ে যায়। আর্টের বেলা, সাহিত্যের বেলাও এই নিয়ম খাটে। যদিও সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে স্থানিক বর্ণ অত্যধিক বলে এ নিয়ম পুরোপুরি খাটে না। কেউ যদি শেক্সপীয়ারকে ইংরেজের মতো করে পেতে চান তাঁকে ইংলণ্ডে গিয়ে স্থানিক বর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। তেমনি বাংলাদেশে এসে বাঙালীর জীবনে প্রবেশ না করলে রবীন্দ্রনাথকেও বাঙালীর মতো করে পাওয়া যাবে না। সাহিত্যের দাবী বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী। এমন কি ধর্মের চেয়েও বেশী। কিন্তু ইংরেজী না জেনেও অনুবাদের সাহায্যে "হ্যামলেট" বা "রোমিও জুলিয়েট" উপভোগ করতে বাধে না। তেমনি বাংলা না জেনেও "গীতাঞ্জলি"।

বরাবর এই হয়ে এসেছে। আগেকার যুগের মানুষ আমাদেরি মতো বিভিন্ন দেশে বাস করত। রেল স্টীমার এরোপ্লেন না থাকায় আমাদের চেয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু যতটা বিচ্ছিন্ন সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে ততটা নয়। গোরুর গাড়ী ছিল, ঘোড়া ছিল, উট ছিল, পালতোলা নৌকা ছিল। কিছু না হোক মানুষের পা ছিল, জেলেদের ডিঙি ছিল। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্য হাজার হাজার বছরের পুরোনো। বাণিজ্যের ছলে, রাজ্য জয়ের ছলে, ধর্ম প্রচারের ছলে মানুষ দেশ ছেড়ে দেশান্তরে গেছে রামায়ণ মহাভারতের চেয়েও আরো প্রাচীন যুগে। রাজপুত্রের অ্যাডভেঞ্চার মানবাত্মার জগৎজিজ্ঞাসার প্রতীক। মানুষ কোনো দিন এক দেশে সন্তুষ্ট হয়নি। আর একটা দেশ তার চাই। সেটা পেলে আরো একটা দেশ তার চাই। যতক্ষণ না বিশ্বের সব ক'টা দেশ তার আপনার হচ্ছে ততক্ষণ সে রাজপুত্রের মতো কেবলি চলেছে, কেবলি লড়েছে। এই নিয়ে তার রূপকথা। এই নিয়ে তার ইতিহাস।

সেইজন্যে মানুষে মানুষে একান্ত বিচ্ছিন্নতা কোনো কালেই ছিল না। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বেও আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। মানুষ যেমন করেই হোক যে পথ দিয়েই হোক সেখানে গিয়ে বসবাস করেছিল, কিংবা সেখান থেকে এখানে এসেছিল। একটা চলাফেরার ঐতিহ্য, আদান-

প্রদানের ঐতিহ্য স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল। যখনকার ইতিহাস নেই, পুরাণ নেই, রূপকথা নেই তখন থেকেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। সেইজন্যে আমরা দেখতে পাই খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসদেশের লোক যা ভাবছে চীনদেশের লোকও তাই ভাবছে, ভারতবর্ষের লোকও তাই ভাবছে। কে যে কার কাছ থেকে ধার করল তা জানবার কোনো উপায় নেই। বলা যেতে পারে কেউ কারো কাছ থেকে ধার করেনি। ভাবনাগুলো আকাশে বাতাসে ঘুরছিল। আকাশ বাতাসের মতো সর্বমানবের সম্পত্তি ছিল। সব দেশই কিছু না কিছু দিয়েছে। সব দেশই কিছু না কিছু নিয়েছে।

বিচ্ছিন্নতার কথা যখন বলি তখন আপেক্ষিক অর্থেই বলি, ঐকান্তিক অর্থে নয়। এক কালে গ্রীক চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল, আদান-প্রদান ছিল। গ্রীকবংশীয়রা কাবুলে রাজত্ব করত। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে তাদের প্রভাব ছিল। তেমনি ভারতীয়দের আধিপত্য ছিল গান্ধারে ও গান্ধার ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়ায়। রুশদেশে এখনো দুটি একটি গ্রাম আছে, যেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু। শুনেছি একজন রাশিয়ানের মুখে। রুশভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার মিল দেখিয়ে দিয়েছেন একজন ভারতীয় সুধী। এই যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য যোগসূত্র, এ যে কতদূর লম্বিত হয়েছিল তার একটি নিদর্শন ভারতের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডের সাদৃশ্য। আইরিশ রূপকথার সঙ্গে বাংলা রূপকথার মিল আগেই লক্ষ করেছিলুম, এখন শুনছি আয়ার-ল্যাণ্ডেও চাতুর্বর্ণ্য ছিল। আমার এক আইরিশ বন্ধু একদিন এসেছিলেন দেখা করতে। বললেন তাঁর পূর্বপুরুষ ফিনিসিয়া থেকে আয়ারল্যাণ্ডে যান। সুতরাং তিনি প্রাচ্য। বাস্তবিক কে যে কার বংশধর তা এক কথায় আইরিশ বা ভারতীয় বা চীনা বলে বোঝানো যায় না। এমন কি বাঙালী বলে বা কায়স্থ বলেও বোঝানো যায় না। পার্শীদের মধ্যেও আমি ব্রাহ্মণ দেখেছি। পাণ্ডে ছিল একজনের পদবী। প্রাচীন ইরানী ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য মিল। একজন ইরানী বন্ধু আমাকে বলেন, "জোরাআস্টার আসলে জরদ উষ্ট্র। পীতবর্ণ উট।"

এমন যে মানব জাতি তার মধ্যে ন্যাশনালিজম নামক তত্ত্ব গত দুই শতকের অর্বাচীন। ভারতে এ জিনিস ছিল না, জার্মানীতে ছিল না, ইটালীতে ছিল না। ভারতে এলো ইংলণ্ডের দাপটে ও ইংরেজের দেখাদেখি। জার্মানীতে ও ইটালীতে এলো নেপোলিয়নের দাপটে ও ফ্রান্সের দেখাদেখি। ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সেও ছিল না রেনেসাঁসের আগে। যত দূর বোঝা যায় এটির উদ্ভব ভাষাগত ঐক্যবোধ তথা দ্বৈপায়নতা থেকে। তারই উপর পরে আরোপ করা হয়েছে জাতিগত ঐক্যবোধ ও অবিমিশ্রতা। গত শতাব্দীতে জার্মানী ও ইটালী নেশন হয়ে ওঠে, আয়ারল্যাণ্ড ও ভারত নেশন হবার সংকল্প নেয়। বর্তমান শতাব্দীতে আরবরা নিয়েছে সেই সংকল্প। ইহুদীরাও। আফ্রিকাতেও ন্যাশনালিজমের ক্রিয়া চলেছে। সব আফ্রিকান মিলে এক নেশন হবে কি না তা

নিয়ে মতভেদ আছে। দেখা তো গেল সব ভারতীয় মিলে এক নেশন হলো না। ধর্ম অনুসারে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলো।

ন্যাশনালিজম যদি নিজের সীমায় সন্তুষ্ট হতো তা হলে কী হতো তা এখনো অমীমাংসিত। প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে যারাই নেশন হয়েছে তারাই যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। গোড়া থেকেই ন্যাশনালিজম একটা অসহিষ্ণু মতবাদ। আমরাই বড়, ওরা বড় নয়। আমরাই ভালো, ওরা ভালো নয়। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যের কাছ থেকে আমাদের নেবার কী আছে? নেবার আছে শুধু কাঁচামাল আর সস্তা শ্রম। পরিবর্তে দেবার আছে তৈরি পণ্য আর শাসনশৃঙ্খলা। এর জন্যে আমরা চক্রান্ত করব, যুদ্ধ করব, রাজ্যবিস্তার করব। সেইসঙ্গে যদি কিছু শিক্ষাবিস্তার ঘটে, সাহিত্যের প্রসার হয়, ধর্মের প্রচার হয় তবে সেটা অধিকন্তু ন দোষায়।

এমনি করে ইংরেজ এ দেশে এলো। জাগিয়ে দিল পাল্টা ন্যাশনালিজম। লাগল ঠোকাঠুকি। বিরোধ ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন করল আর সব। মানুষে মানুষে ভাবনার আদান-প্রদান, সর্বমানবিক সম্পদ, অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র, আবহমান-কালের আলোবাতাস। ওরা বিদেশী, ওরা শত্রু, সুতরাং ওদের সংস্রব বর্জনীয়। সেইসঙ্গে ওদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। হুঁ, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ব্যাটারা বর্বর!

যুদ্ধবিগ্রহের দিনে এই মনোভাব সর্বত্র লক্ষ করা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা তাদের জ্ঞাতিভাই জার্মানদের বলতে আরম্ভ করে হুন। তাই বেঠোফেন বাজাবে না, শুনবে না। ও যে "হান মিউজিক"। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফর্স্টার বেঠোফেন ভালোবাসতেন বলে তাঁকেও মনে করা হয় ঘরের শত্রু বিভীষণ। তখন তাঁর কে এক বন্ধু আবিষ্কার করেন যে বেঠোফেনের পূর্বপুরুষ বাস করতেন বেলজিয়ামে। অমনি বেঠোফেন হলেন মিত্রপক্ষের। এই মানসিকতা থেকে আমাদের দেশে এলো ইংরেজী শিক্ষায় বিরাগ। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, অতএব ইংরেজী পড়া হারামী। পলাশীর পরে মুসলমানদের ছিল এই মানসিকতা। এটা সিপাহী বিদ্রোহ অবধি গড়ায়। তার পরে ওরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে ইংরেজ থাকতে এসেছে, বাদশাহী আমল চিরকালের মতো গেছে। তখন কোমর বেঁধে ইংরেজী শিখতে শুরু করে দেয়। হিন্দুরা ততদিনে পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়ে গেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই দেখা দিল এই মানসিকতা। এখনো এ মানসিকতা দূর হয়নি। ইংরেজ যদিও দূর হয়েছে।

দেশকে ভালোবাসতে চাও, উত্তম। কিন্তু বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশকে বর্জন করতে যাও কেন? সেটাও কি তোমার নিজেরি মানবিক উত্তরাধিকার নয়? মানবিককে বর্জন করলে মানুষ হিসাবে তুমি নিজেই কি দরিদ্র হবে না? দুর্বল হবে না? বিজাতীয় আখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করলে আলো বাতাসকেও বিজাতীয় বলতে হয়। সেটা যখন কেউ করে না তখন মাটিকেই বা

বিজাতীয় বলবে কেন, মাটির ফসলকেই বা কেন বলবে বিজাতীয়? সব কাব্যই মানুষ লিখেছে মানুষের জন্যে, সব শিল্পই মানুষ গড়েছে মানুষের জন্যে, সব দর্শনই মানুষ ভেবেছে মানুষের জন্যে, তোমার দ্বারা যেটা হয়নি তোমার জন্যেও সেটা হয়েছে, যদি আপনার করে নিতে পারো। অমনি করে কত দ্রব্যই না হাত বদল করেছে, কত তত্ত্ব আর কত আইডিয়া। মানুষে মানুষে বিরোধ সব দিন হয় না। ওই যে জার্মান আর ইংরেজ, তারা অধিকাংশ দিনই সহযোগিতা করে। বিরোধটা সাময়িক, মিশ্রণটা দৈনন্দিন। তেমনি ইংরেজ আর বাঙালী, ইউরোপীয় ও ভারতীয়।

ন্যাশনালিজমের সঙ্গে বর্জনশীল সংকীর্ণতা না থাকলে হিংসাদ্বেষ না থাকলে ওর উপর রবীন্দ্রনাথের অরুচি ধরে যেত না। ন্যাশনালিজম যেখানে বিশুদ্ধ দেশপ্রেম সেখানে, বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে তার স্বতোবিরোধ নেই। একই মানুষ একই কালে সব দেশের প্রেমিক হতে পারে। সে বুকে হাত রেখে বলতে পারে, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি বলে বিদেশকে কম ভালোবাসিনে। বিদেশ কেন বলব? সেও আমার স্বদেশ। মানবাত্মা একই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একই ক্ষণে সমগ্র বসুধা থেকে বিদায় নেবে। এটা আমার দেশ, ওটা আমার দেশ নয়, এ গণনা মানবাত্মার মুখে মানায় না। এ দেশ আমার দেশ, ও দেশও আমার দেশ। মানুষ মাত্রেরই পক্ষে এই উপলব্ধিই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হচ্ছে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির মতো জাতীয়তাবাদী অন্ধতা। কিন্তু তারও হেতু আছে। এক দেশের লোক যদি অপর দেশের উপর প্রভুত্ব ফলাতে যায়। বিদ্রোহী মানুষ অবশেষে বিদেশীকে বিতাড়ন করতে রুখে দাঁড়ায়, তখন তাকে জোর দেয় বর্জনশীল সংকীর্ণ একটা মতবাদ। সেটাও একপ্রকার হাতিয়ার। কতকগুলো ভয়ানক কাজ আছে, মদ খেয়ে বিবেককে ঘুম না পাড়ালে যা করা যায় না। যুদ্ধ-বিদ্রোহও সেই রকম কাজ।

রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন মত্ততার ধার ধারেননি। তাই দেশপ্রেম যেই মত্ততার দিকে মোড় নিল তিনি তার থেকে আপনাকে সরিয়ে নিলেন ও উপহাস সহ্য করলেন। তেমনি দেশপ্রেম যেদিন ইউরোপে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ল, সেদিনও তিনি ন্যাশনালিজমের প্রতিবাদ করলেন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিন্দিত হলেন। তেমনি দেশপ্রেম যেদিন অহিংস অসহযোগ ঘোষণা করে বিদেশী বসন দাহ করল ও ইংরেজী শিক্ষা পরিহার করতে গেল, সেদিনও তিনি অসহযোগের সঙ্গে অসহযোগ করলেন ও বহু লোকের আস্থা হারালেন। ইতিমধ্যে নাইট উপাধি ত্যাগ করে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে না থাকলে সরাসরি দেশদ্রোহী বলে গণ্য হতেন। সেই সংঘর্ষের দিনে সর্বমানবের সংস্কৃতিমিলনের আদর্শ উচ্চে তুলে ধরা জনপ্রিয়তার পন্থা ছিল না। ছিল ক্ষুরধার পন্থা। সত্যাকারের দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই তিনি জনসাধারণের রোষ থেকে রক্ষা পান। বিশ্বপ্রেমিক বলে যারা তাঁকে ব্যঙ্গ করত তাদেরকেও গাইতে হতো তাঁরই স্বদেশী গান। নইলে প্রেরণা পাবে কেন?

ইংরেজকে বিদায় করার আয়োজন যখন চলেছে, সর্বমানবকে বরণ করে আনার পাল্টা আয়োজনও চলেছে তখনি। এর নেতৃত্ব নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে। সেদিন মনে হয়েছিল এটি একটি সামান্য শান্তি। আজ এই আদর্শ জাতীয়তাবাদকেও অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছে। বিশ্বময় রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব তারই একপ্রকার স্বীকৃতি।

এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে গান্ধীজীর উপর যে নেতৃত্ব পড়েছিল সেটা ইংরেজ বিতাড়নের নয়। তাঁর অসহযোগ অন্যায়কারীর সঙ্গে নয়, অন্যায়ের সঙ্গে। তাঁর সত্যাগ্রহ অসত্যাচারীর বিরুদ্ধে নয়, অসত্যের বিরুদ্ধে। মানুষকে তাড়িয়ে দিলে সে আবার একদিন ফিরে আসতে পারে, কিন্তু তার মতি বদলে দিতে পারলে সে আপনি সরে যায়, কিংবা বন্ধুরূপে থাকে। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল ইংরেজের মনের উপর অহিংসার প্রয়োগ, সেইজন্যে তিনি শুধু অসহযোগ করেননি, করেছিলেন অহিংস অসহযোগ। বিশেষণটি বিশেষ্যের আগে বসেছিল। সেটি অধিকাংশ লোকের নজর এড়িয়ে যায়। তারা অহিংস থাকে না তাঁর মতো কায়মনোবাক্যে। তারা মনে বাক্যে হিংসা পুষে রেখে কায়ায় কতকটা অহিংস হতে চেষ্টা করে ও আপনাকে আপনি ছলনা করে। ইংরেজের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। তেমনি রবীন্দ্রনাথও অত সহজে ভোলবার পাত্র নন। গান্ধীজীর কাছে অন্যায়কারীতে ও অন্যায়ে অত সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণের কাছে তেমন কোনো প্রভেদ না থাকায় আন্দোলন চলে অন্ধ আবেগে। চৌরিচৌরার পর রাশ টেনে না ধরলে ঘোড়া আর বাগ মানত না। নির্ঘাত খাদে পড়ত।

তা বলে কি আন্দোলন চিরকালের মতো বন্ধ করতে হবে? গান্ধীজীর সমস্যা হলো এই। তা তিনি কিছুতেই করতেন না, কারণ তাঁর অহিংসা নিভৃত তপোবনের জন্যে নয়। মানুষে মানুষে যেখানে স্বার্থের সংঘাত বা কল্পিত স্বার্থের সংঘাত, মানুষে মানুষে যেখানে মতবাদের সংঘাত, সেই জনাকীর্ণ মল্লক্ষেত্রের জন্যে। যেখানেই কুরুক্ষেত্র সেখানেই অহিংসার ধর্মনির্দিষ্ট নীতিনির্দিষ্ট ইতিহাসনির্দিষ্ট ভূমিকা। গান্ধীজীর কার্যকলাপ এই বিশ্বাস থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যা আরম্ভ হয়েছিল ভারতবর্ষের অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন তারই অনুবৃত্তি ও সম্প্রসারণ। গান্ধীজীর দিক থেকে একটি অপরটির পরবর্তী পদক্ষেপ। কিন্তু আর সব নেতা বা নেত্রীদের দিক থেকে তা নয়। তাঁরা জের টানছিলেন গান্ধীপূর্ব স্বরাজ আন্দোলনের। সে আন্দোলন অহিংসানিরপেক্ষ। অহিংসার জন্যে জীবনের একটি কুলুঙ্গী স্মরণাতীত কাল থেকে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। অহিংসা তার সেই কুলুঙ্গীতেই থাকুক। রাজনীতির আসরে তাকে টেনে আনতে চাওয়া কেন? গান্ধীজীকে না বুঝে অহিংসার প্রয়োজন ও প্রয়োগ না বুঝে তাঁকেই তাঁরা নেতা বরণ করেছিলেন ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে অন্য পন্থায় ফল না পেয়ে।

গান্ধীনেতৃত্বও সর্বমানবিক। অহিংসার প্রয়োগ যদি একটি পরিস্থিতিতে

কার্যকর হয় তা হলে অন্য দেশের অন্য একটি পরিস্থিতিতেও হবে। সব মানুষের কাছে তার মূল্য আছে। ভারতীয়রা জিতলে সব মানুষ জিতল। এমন কি ইংরেজরাও জিতল।

এক জাতি আরেক জাতিকে শাসন করবে, শোষণ করবে, এটা অবশ্যই অন্যায়। কিন্তু এক জাতি আরেক জাতিকে পরিপূরণ করবে, তার দ্বারা পরিপূরিত হবে, এর মধ্যে অন্যায় কিছু আছে কি? আমাদের সভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তবু ইউরোপের সভ্যতা এসে তার চোখ ফুটিয়ে না দিলে সে এক অন্ধকার যুগে বন্ধ থাকত। সে আধুনিক যুগে উপনীত হতো না। বৃহত্তর স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করত না। আমাদের সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে গতানুগতিকভাবে বিবর্তিত হতো। তার গঙ্গাস্রোতে সমুদ্রের জোয়ার এসে আবর্তন সৃষ্টি করত না। ইউরোপ নিয়ে এলো গতানুগতিকের সঙ্গে ছেদ। ডিস্‌কন্টিনিউইটি। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলো বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমকালের সঙ্গে অন্বয়। কন্‌টিনিউইটি। বাংলাসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করল। আধুনিক কালের আর দশটা সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল। ছুটতে ছুটতে ধরে ফেলল অগ্রসরদের সারি। অগ্রসরদের সঙ্গে সারিবদ্ধ হলো।

তা হলে বলতে হবে যে এক সভ্যতা আরেক সভ্যতাকে পরিপূরণ করতে এসেছিল। প্রথমে বণিকের মানদণ্ড হাতে। পরে শাসকের রাজদণ্ড হাতে। পরিপূরণ করতে এসে সে পরিপূরিত হয়েছে কি না অতটা স্পষ্ট নয়। তবু ইংরেজদেরও অনেকে স্বীকার করে যে বাংলার সোনা না গেলে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটত না। ইংরেজ জাতীর জীবন রূপান্তরিত হতো না। জীবন রূপান্তরিত না হলে সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটত না। কিন্তু ভারতবর্ষের সান্নিধ্যে এসে ইংলণ্ড কি শুধু পার্থিবভাবে লাভবান হয়েছে? কোনোরকম আত্মিক পরিবর্তন কি তার ঘটেনি? বলা যায় না। তবে বহুদূরে আটলাণ্টিকের অপর পারে থোরো এমার্সনের উপর উপনিষদের প্রভাব পড়েছে। যাদের সঙ্গে শাসক শাসিতের সম্বন্ধ নেই, শোষক শোষিতের সম্বন্ধ নেই, সেসব পাশ্চাত্ত্য দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা জাত হয়েছে। একই আর্য জাতির ভারতীয় ও ইউরোপীয় শাখা সম্বন্ধে চেতনা জেগেছে। ভারতকে তারা আত্মীয় বলে জেনেছে। পরাধীন জাতির প্রতিনিধিদেরও সমান মর্যাদা দিয়েছে। গান্ধী রবীন্দ্রনাথের বেলায় মাথা নত করেছে। তাঁরা যে খ্রিস্টান নন, হিন্দু, এতে তাঁদের গৌরবহানি হওয়া দূরে থাক বৃদ্ধিই হয়েছে। তেমনি বিবেকানন্দের বেলায়।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পরিপূরণের দিন এখনো যায়নি। খ্রীস্টের কাছে সে যা পেয়েছে তারই মহিমা উপলব্ধি করুক জীবন দিয়ে। তার পরে পাবে বুদ্ধের কাছ থেকে, উপনিষদের কাছ থেকে, কালিদাসের কাছ থেকে, অজন্তার কাছ থেকে, গান্ধীর কাছ থেকে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

সাহিত্যমাত্রেই এক অপরের পরিপূরক। বাংলাসাহিত্যে এমন কিছু আছে

যা পৃথিবীর আর কোনো সাহিত্যে নেই। বাঙালীর জীবনে এমন কিছু আছে যা মানবপরিবারের আর কোনো শাখার জীবনে নেই। বাংলাভাষার লেখকদের এমন কিছু দেবার আছে যা আর কোনো মানবীয় ভাষার লেখকদের দেবার সাধ্য নেই। আমরাও মানুষ, কিন্তু সেইসঙ্গে আমরাও বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতা হারাবার নয়, হারাবেও না কোনো দিন। পশ্চিম একে মোটের উপর সাহায্যই করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। পশ্চিম না এলেই বরং ক্ষতি হতো বেশী। পশ্চিম না এলে আমাদেরকেই যেতে হতো তার দ্বারে। যুগের সঙ্গে যোগ রাখার জন্যে। রিয়ালিটির সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে। যে অবস্থায় আমরা ছিলুম সে অবস্থায় থাকা চলত না। হিন্দু রাজত্বেও না। হিন্দু রাজত্বেও তো মরাঠারা ছিল। কী এমন উন্নতি করেছিল? কী এমন প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করেছিল? তারাও ছিল এক আনরিয়াল জগতে। যে জগৎ কবে তামাদি হয়ে গেছে পশ্চিম প্রান্তে।

শাসন শোষণের কথা বাদ দিলে ইউরোপ যা করেছে তা সর্বমানবের জন্যেই করেছে। তার সাধনা সর্বমানবিক। সুতরাং তাকে বর্জন করা মানে আপনাকেই বঞ্চিত করা। এটা জাতীয়তাবাদীদের বোঝানো দায়। রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে গিয়ে জনপ্রিয় হননি। কিন্তু দেশের ইনটেলেকচুয়ালরা আপনি বুঝেছেন। তা বলে জাতীয় সংগ্রামের প্রতি উদাসীন থাকেন নি। রবীন্দ্রনাথও উদাসীন ছিলেন না। পরে তিনিও স্বীকার করেছিলেন যে গান্ধীজীর মনে একখানি ছবি আছে। সেই ছবিখানি সামনে রেখে গান্ধীজী কাজ করে যাচ্ছেন। সে ছবি শুধুমাত্র বিদেশী শাসন শেষ করেই শেষ নয়। সে ছবি সুদূরপ্রসারী। সে ছবি কিন্তু তুলসীদাসের রামরাজ্য নয়। টলস্টয় রাস্কিন থোরো না জন্মালে সে ছবির সৃষ্টি হতো না। গান্ধীজী যদি সর্বমানবিক না হতেন সে ছবির দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন না। টলস্টয় রাস্কিন থোরো তিনজনেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আধুনিক হিংস্রতা ও মিথ্যাচার দেখে তার প্রতি বিদ্রোহী হন। সে বিদ্রোহ সর্বমানবের জন্যে। টলস্টয় ও রাস্কিন পাঠ গ্রহণ করেন সাক্ষাৎভাবে যীশুর কাছে। থোরো যতদূর জানা যায় উপনিষদের থেকে প্রেরণা পান।

পূর্ব পশ্চিমের দেওয়া নেওয়ার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভগবানকে পিতা বলে ভাবা। একই পিতার সন্তান বলে সব মানুষকে ভাই বলে ভাবা। উপনিষদে "পিতা নো হসি" ছিল। কিন্তু পরবর্তী ভারতীয় সাধনায় ভগবানকে পিতা বলার রেওয়াজ ছিল না। এতদিনে আমরা সবাই এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সেইসঙ্গে সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বে। কিন্তু আইডিয়াটা আসে পশ্চিম থেকেই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যস্থতায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ।

(১৯৬১)

রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ

আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে রেনেসাঁস ঘটে গেছে, কিন্তু ইদানীং কেউ কেউ এতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সংশয়ীদেরও দুই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী। এক দিকের কথা হলো রেনেসাঁস কখনো পরের উপনিবেশে ঘটতে পারে না। অতএব ওটা রেনেসাঁস নয়। আরেক দিকের বক্তব্য হলো রেনেসাঁস যদি ঘটে থাকত তা হলে আমাদের সংস্কৃতির এ দেউলে দশা কেন? রবীন্দ্রনাথের পরে এমন নিঃশেষিত অবস্থা কেন? অতএব ওটা রেনেসাঁস নয়। রেনেসাঁসের দীপমালা অত অল্প সময়ের মধ্যে নিবে যায় না।

এ ছাড়া আরো একটা মত শোনা যায়। রেনেসাঁস ঘটেছিল বটে, কিন্তু তার মেয়াদ ফুরোবার আগেই কাউণ্টার রেনেসাঁস ঘটে। সুতরাং কাটাকুটি হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমরা যে তিমিরে আমরা সে তিমিরে। রবীন্দ্রনাথ থাকতেই কাউণ্টার রেনেসাঁস শুরু হয়। যদিও তিনি তার ঊর্ধ্বে।

এসব কথা শুনলে কার না বুকটা দমে যায়? কিন্তু অন্য রকম কথাও শুনেছি। শুনে উদ্দীপনা পেয়েছি। একবার এক ব্যারিস্টার আমাকে তাঁর মোটরে করে বাড়ী পৌঁছে দেন। বলেন বাধ্য হয়ে আইনকে পেশা ধরতে হয়েছে। আসলে তাঁর নেশা হলো গণিতশাস্ত্র। রাশিয়ানরা স্পুটনিক উদ্ভাবন করার অনেক আগেই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে স্পেস বিজয়ের দিন আগত ওই। ভারত তবু কই? তাই তিনি একাই এ বিষয়ে গবেষণায় লেগে যান। কাজেই স্পুটনিক সম্বন্ধে তিনিই এ দেশে সব চেয়ে বেশী জানেন। এখন তিনি স্লাইড তৈরি করিয়ে তাই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আপিসে আপিসে যান। লোকের আহ্বানে। বাবুরা ছুটির পরেই ছুটে দেন না, তন্ময় হয়ে ডায়াগ্রাম দেখেন ও লেকচার শোনেন। সম্প্রতি ডাক আসছে মফঃস্বলের স্কুল-কলেজ থেকে। সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও। এই তো সেদিন তিনি সুন্দরবনের দিকে গিয়ে গ্রামের স্ত্রীপুরুষের ভিড়ে স্লাইড দেখিয়ে ও বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। অন্ধকার রাত্রে খোলা আকাশের নিচে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিল। ব্যাটারির গোলমাল।

ভদ্রলোক বলেন, "দেশে এখন রেনেসাঁস এসেছে। অন্তহীন কৌতূহল। লোকে সব কিছু দেখতে চায়, শুনতে চায়, জানতে চায়, বুঝতে চায়।"

হাঁ। এই হচ্ছে রেনেসাঁসের পূর্বলক্ষণ। অন্তহীন কৌতূহল। নতুন চোখে দেখা। নতুন কানে শোনা। নতুন মন দিয়ে জানা। নতুন মগজ দিয়ে ভাবা। নতুন বুদ্ধি দিয়ে বোঝা। নতুন হাত দিয়ে করা। নতুন হাতিয়ার দিয়ে গড়া।

এ রকম লক্ষণ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়ে না থাকে তবে আমাদের দেশে রেনেসাঁস এর আগে ঘটেনি, সবে ঘটতে আরম্ভ করেছে।

আমাদের রেনেসাঁস তা হলে পিছনে নয়, সামনে। কিন্তু গত দেড়শ' বছরে যা দেখা গেল সেটা তবে কী? কোন্ নামে তাকে অভিহিত করব? এতকাল যে আমরা রেনেসাঁস বলে তার পরিচয় দিয়ে এসেছি সেটা কি নিতান্তই ইউরোপের নকলনবিশী?

তার আগে বলি ইউরোপে কী ঘটেছিল। সংক্ষেপেই সারতে হবে।

প্রাচীন গ্রীকদের জগৎজিজ্ঞাসা, জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যসৃষ্টি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁদের নিজেদের দেশ থেকেই। শূন্য আসন পূর্ণ করে ইহুদীস্থান থেকে সমাগত খ্রীস্টীয় জগৎসমীক্ষা, জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যধ্যান। খ্রীস্টধর্ম গ্রীস থেকে রোমে যায়, সেখান থেকে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে। গ্রীস থেকে উত্তর মুখেও যায়। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলও খ্রীস্টান হয়। সেই থেকে বাইবেল হলো একাধারে ধর্মশাস্ত্র, নীতিসার, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, আয়ুর্বেদ। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই ধরাতলে। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আছে তাতে। প্রশ্ন করাটাই তো অহমিকা। মাথা নত করে মেনে নাও যা বলা হচ্ছে। এমন কি বাইবেল খুলে দেখতেও চেয়ো না। পড়াশুনা সকলের জন্যে নয়। যারা পড়বে তারা মাতৃভাষায় পড়বে না। ল্যাটিন গ্রীক শিখতে হবে। তাও শুধু বাইবেল বা তার ভাষ্য অধিগত করার জন্যে।

ধর্মযাজকরা যে কেবল আত্মার পাপমোচন নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন তাই নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন। সেইজন্যে রাষ্ট্রকেও তাঁরা আনতে চান সঙ্ঘের এক্তারে। তাঁদের জুরিসডিকশন জীবনের যাবতীয় বিভাগে পরিব্যাপ্ত। মানুষ কী বিশ্বাস করবে, কী চিন্তা করবে, কী বলবে, কী লিখবে, কী আঁকবে, কী গড়বে এ সমস্ত তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করবেন। রাজার উপর তাঁরাই অধিরাজা। তাঁদের যিনি পোপ তিনি দুনিয়ার মালিক। তাঁরও একপ্রস্থ সৈন্যসামন্ত, বিচারালয়, কারাগার, মশান। মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে না মারলে নাকি তার আত্মা অনন্তকাল নরকে পুড়তে থাকবে। সুতরাং পাপ দেখলেই পোড়ানো। পাপের সংজ্ঞাও অতি ব্যাপক। কোনো একটি আপ্তবাক্য যদি চোখ বুজে মেনে না নাও তবে তুমি পাপী, তোমাকে অনন্তকাল নরকে পুড়তে হবে, তার চেয়ে এখানেই শরীরটাকে দগ্ধ হতে দিয়ে আত্মাকে বাঁচাও।

হাজার বছর ধরে চলে এই সর্বাত্মক ধর্মানুসরণ। ভালো কাজও বড় কম হয়নি। যেখানে সভ্যতা ছিল না সেখানে সভ্যতার প্রসার হয়। যাজকরা কৃষকের সঙ্গে জমি চাষ করেন, শ্রমিকের সঙ্গে কায়িক শ্রমে লেগে যান। নতুন ধরনের কমিউনিটি গড়ে ওঠে। সেখানে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর জন্যে অকাতরে ত্যাগ স্বীকার করে। মানবপ্রেমের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখান সাধুরা। অত্যাচারী রাজারাজড়াদের সায়েস্তা করা হয়। বুনো জমিদারদের পোষ মানানো হয়। বহুগামী পুরুষদের একগামী করা হয় বিবাহসূত্রে। নারীর সতীত্বের আদর্শ কঠোর হয়। সুন্দর সুন্দর উপাসনামন্দির নির্মিত হয়। বারো মাসে তেরো

পার্বণ জীবনের দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়ে দেয়। সঙ্ঘ হয় গরিবের মা বাপ। আপদে বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা পরিবার পরিজন ছেড়ে বৃহত্তর মান-পরিবারের ভার কাঁধে তুলে নেন। প্রেমের সঙ্গে গলিত কুষ্ঠরোগীর পরিচর্যা করেন। সন্ন্যাসিনীরাও তেমনি সেবাব্রত বরণ করে মানবের দুঃখ-মোচনে জীবনের সার্থকতা লাভ করেন।

সাধুদের ধারণা ছিল তাঁদের মেষপালের আর কোনো অন্বিষ্ট নেই। কিন্তু যারা একবার গ্রীস রোমের সভ্যতার আস্বাদন পেয়েছে তারা আরো কিছু চায়। সে জিনিস গ্রীস রোমেই পাওয়া যেতো, পেতে হলে গ্রীস রোমের উত্তরাধিকার মেনে নিতে হয়। তার আগে খোঁজ নিতে হয় গ্রীস কী রেখে গেছে। খ্রীস্টীয় সঙ্ঘ সমাজের সম্পত্তিব্যবস্থায় হাত দেয়নি। সম্পত্তি থাকলে দেওয়ানী ফৌজদারী আইন থাকে। আইন পড়তে হয়। তাই রোমান আইন পড়ার রেওয়াজ বরাবর বহাল ছিল। আইন পড়ার জন্যে যারা ল্যাটিন পড়ত তারা ভাষা শিখতে গিয়ে সাহিত্য পড়ত। ল্যাটিন ক্লাসিকগুলি কোনো দিন অচলিত হয়নি। সেইসূত্রে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে একটা ধারাবাহিকতা ছিল। গ্রীক সাহিত্যকেও পাওয়া যেত ল্যাটিনের মাধ্যমে। অবশ্য ক্ষীণ ভাবে। ওদিকে বৈদ্যবৃত্তির জন্যেও কতক লোক কবিরাজী পড়ত। আরবী ভাষায় পেতো গ্রীক আয়ুর্বেদের বই। আরবরা উত্তর আফ্রিকা অধিকার করে স্পেনে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। আরবী ভাষার মাধ্যমে গ্রীক দর্শনেরও খোঁজখবর পাওয়া যেতো। ল্যাটিনে তর্জমা হয়ে গ্রীকদর্শন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ করে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হতো আইন, কবিরাজী আর থিওলজি। একটু একটু করে গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞানও কৌতূহল জাগালো। সাধুদের মধ্যেও ধীরে ধীরে এ কৌতূহল সঞ্চারিত হলো। বাইরে তাঁরা কড়া, ভিতরে তাঁরা নরম। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে কেই বা হাজার বছর ধরে চায়!

বহির্জগৎ সম্বন্ধেও কৌতূহল দুর্বার হয়ে ওঠে। জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কত লোক ভারত আবিষ্কার করতে। ভারত বলে ভুল করে আমেরিকা আবিষ্কার করে। তার পর জলপথে ভারত আবিষ্কৃত হয়। ভারতকে চিনত প্রাচীন গ্রীকরা রোমানরা। খ্রীস্টীয় ইউরোপ চিনত না। কারণ স্থলপথ দখল করে আগলে বসেছিল আরব ও তুর্ক মুসলমানরা। তুর্করা অবশেষে কন্‌স্টান্টিনোপল অধিকার করে। সেখানে তখনো গ্রীক বিদ্যার টোল ছিল। টোলের পণ্ডিতরা বুঝুন না বুঝুন পুঁথিগুলো যত্ন করে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এবার বিজ্ঞ পৃষ্ঠপোষকের অভাবে প্রাচীন বিদ্যার টোল বন্ধ করে দিয়ে পুঁথিপত্রসমেত সরে পড়তে হলো। বলা বাহুল্য খ্রীস্টান তাঁরাও হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান হতে তাঁদের আপত্তি ছিল। চললেন তাঁরা ইটালী। সেদেশে তাঁদের ও তাঁদের পুঁথিপত্রের সমাদর হলো। মনে রাখতে হবে যে সঙ্ঘ এতে বাদ সাধেনি। রেনেসাঁসের প্রথম অধ্যায়ে সঙ্ঘ বুঝতে পারেনি যে মানুষের মন গ্রীকভাষার লেখা দুর্বোধ্য পুঁথি পড়ে প্রশ্ন করতে শিখবে, তর্ক করতে

শিখবে, ভোগপ্রবণ হবে। দেহসৌষ্ঠব চাইবে। রূপদীক্ষা নেবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা দাবী করবে। প্রকৃতির রহস্য ভেদ করবে। পৃথিবীকে গোল বলে গতিশীল বলে সব গোলমাল করে দেবে। তা হলে খ্রীস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বই যে টলমল করে!

সত্যি, এই ভাবেই একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল। ঘটতে সাহায্য করে নব উদ্ভাবিত মুদ্রাযন্ত্র। খ্রীস্টধর্মের যা সারবস্তু তা কাঁপবার নয়, কিন্তু খোলসটাকেই তো লোকে ধর্ম বলে জানে ও মানে। এক-একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয় আর এক-একটা পাথর খসে পড়ে। রেনেসাঁস এসে হাজার বছরের কারাপ্রাচীর নড়িয়ে দিল। সবটা একদিনে ধূলিসাৎ হলো না, আজো হয়নি। কিন্তু মানুষ এখন যে জগতে বাস করে সে জগৎ মধ্যযুগের মনগড়া জগৎ নয়। সে মানুষের মনকেও গড়েপিটে ছাঁচে ঢালাই করে নেয় না। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ বহুক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে। তার অন্তঃপ্রকৃতিও এখন প্রকৃতির মতো বিজ্ঞানের কৌতূহলী চক্ষুর সম্মুখে দ্রৌপদীর শাড়ী উন্মোচন করেছে। আগেকার দিনে যাকে শয়তানের দ্বারা অনুপ্রাণিত মারাত্মক পাপ মনে করা হতো, একালে সেসব প্রকৃতির দেওয়া সহজাত প্রবৃত্তি বা ইনস্টিংট অথবা অবচেতনের ক্রিয়া। পাঁচশ' বছরে মানুষের স্বভাব অবশ্য বদলায়নি, কিন্তু ভালোমন্দ সম্বন্ধে তার ধারণা খুব বেশী বদলেছে। সেইজন্যে দাসপ্রথা রহিত হয়েছে, নারী ও শূদ্রের মর্যাদার উন্নতি হয়েছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে, গণতন্ত্র বিবর্তিত হয়েছে। আর্টে সাহিত্যে পরীক্ষার নিরীক্ষার অন্ত নেই। দর্শন আর থিওলজির ধার ধারে না।

এর কালো দিকও আছে। ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির ভয় ভেঙে যাওয়ায় মানুষ নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। যেমন প্রাইভেট জীবনে তেমনি পাবলিক জীবনে। তার ফলে এসেছে নৈতিক তথা অর্থনৈতিক তথা রাজ-নৈতিক অরাজকতা। অরাজকতা এলে তার পালটা ডিকটেটরশিপ আসে। একাধিক ডিকটেটরের দাপটে মানুষ আবার ভেড়া বনে গেছে। এদের হুকুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে, নির্বাসনে গেছে, কারাগারে পচেছে। বিজ্ঞান এখন পরমাণু বোমা বানিয়ে মনুষ্যবংশ ধ্বংস করতে সাহায্য করছে। প্রকৃতি মানুষের কাছে বিভীষিকা ছিল, এখন মানুষই প্রকৃতির কাছে বিভীষিকা। কারণ পরমাণু বোমা ফাটলে কেবল যে মানুষই নিশ্চিহ্ন হবে তাই নয়, পশুপাখী গাছপালা কীটপতঙ্গও মুছে যাবে। রেনেসাঁস যদি না ঘটত দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটত না, তৃতীয়টার আশঙ্কা দেখা দিত না। সেইজন্যে রেনেসাঁসের উপর বহু লোকের ঘেন্না ধরে গেছে। তারা আবার ক্যাথলিক চার্চের কোলে ফিরে যাচ্ছে। ধর্মের মধ্যে শান্তি খুঁজছে।

এই তো ইউরোপ আমেরিকার অবস্থা। এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক আমাদের দেশে রেনেসাঁস হয়েছে কি হয়নি কি হচ্ছে। হলে তার দৌড় কত দূর। আমাদের ইতিহাস ঠিক ইউরোপের অনুরূপ নয়। তবে আমাদেরও একটা প্রাচীন যুগ ছিল, আমাদেরও একটা মধ্যযুগ এলো। মধ্যযুগের

গোড়ায় এলো অবতারবাদী পৌরাণিক ধর্ম। বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেই। মধ্যযুগের মাঝখানে এলো অবতারবিরোধী ইসলাম ধর্ম। বাইরে থেকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কোনোটাই একচ্ছত্র হয়নি, সংঘবদ্ধ হয়নি। ইসলাম যদি না আসত, পৌরাণিক ধর্ম বৌদ্ধধর্মকে ভাগিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতো। একচেটে অধিকার পেলে কার না মাথা ঘুরে যায়? কে না সর্বশক্তিমান হতে চায়? পৌরাণিক ধর্মেরও ক্ষমতা অভ্রভেদী হতো। ইসলাম এ দেশে প্রোটেস্টাণ্ট মার্গের কাজ করেছে। অপরপক্ষে পৌরাণিক ধর্ম যদি না থাকত, যদি শক্তিমান না হতো, ইসলাম এসে সর্বেসর্বা হয়ে বসত। তার আজ্ঞাধীন হয়ে মানুষ মাথা তুলতে পারত না। পৌরাণিক ধর্ম থেকে তাকে সংযত করেছে।

না। ভারতের মধ্যযুগ ইউরোপের মধ্যযুগের সঙ্গে হুবহু মেলে না। এ দেশের মানুষকে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু সব দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখাও হয়নি। এটা মনোপলি না থাকার সুফল। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা চিরটা কাল ছিল, অন্বয় রক্ষা করেছিল মহাভারত ও রামায়ণ। ইউরোপে ইলিয়াড অডিসি কে পড়ত? তার কাহিনী কে শুনত? তার অভিনয় কে দেখত? প্রাচীন ভারতের দর্শনচিন্তাও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, যদিও লোকে ভুলে গেছল যে আরো ছ'টি দর্শনও ছিল। নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্তও ছিল। আধ্যাত্মিকতা বলতে মধ্যযুগে বোঝাত সাধারণত দেবদেবীবাদ বা অবতারবাদ বা ঈশ্বরবাদ। কদাচিৎ ব্রহ্মবাদ বা শূন্যবাদ। মধ্যযুগের ইউরোপের সঙ্গে হুবহু মিল ছিল না সেটা ঠিক, কিন্তু মধ্যযুগের যেটা বৈশিষ্ট্য বা যুগধর্ম সেটা ভারতকেও ইউরোপের সঙ্গে একাকার করেছিল। বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। অতএব তর্ক কোরো না বাছা। বা বলছি তাই প্রামাণিক বলে মেনে নাও। যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস মানুষকে নিজের চেষ্টায় বিশ্বরহস্য ভেদ করতে শেখায় না। তার মনে কৌতূহল জাগায় না, জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে না, অনুসন্ধানের প্রবর্তনা দেয় না। সে চোখ কান বন্ধ করে কেবল নাম জপে আর ধ্যান করে। অমন লোকের কাছে প্রকৃতি তার রহস্য-অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবে কেন? অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষে প্লাবনে মহামারীতে সে শুধু কাতরকণ্ঠে রোদন করে, "হা রাম। ইয়া আল্লাহ্।" কিন্তু ঈশ্বর তাকে যেসব ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করে না, করতে জানে না, করতে চায়ও না। সমুদ্র পড়ে রয়েছে দেশের তিন দিকে। সে সমুদ্রযাত্রা করবে না। কারণ কী? কারণ কিছু নেই। শুধু জানে, নিষেধ। কেন নিষেধ মানবে? ওরে বাপ রে! না মেনে উপায় আছে? জাত যাবে যে? ইহকাল পরকাল যাবে। জন্মালে নীচকুলে জন্মাতে হবে। না জন্মালে নরকে দগ্ধ হতে হবে। আপাতত ধোপা নাপিত বন্ধ। হুঁকো চলবে না। শেষে কি অস্পৃশ্য হতে হবে?

হাঁ, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধনও ছিল। জাতের অত্যাচার এমনটি কোথাও কেউ

দেখেনি। জাত যাবার ভয়ে মানুষ কেঁচো হয়ে রয়েছিল। শুধু যে ইহজন্মে যাবে তা নয়, জন্ম-জন্মান্তরে যাবে। জাতের সংখ্যা নেই। এক এক করে নিম্নতর জাতে জন্মাতে হবে। চাঁড়াল হতে হবে, ডোম হতে হবে, মুচি হতে হবে। সমাজকে জাতিবর্ণহীন করার লেশমাত্র অভিপ্রায় বা উদ্যম ছিল না। সে কল্পনাই ছিল না। নিজের তৈরি গোলোকধাঁধায় নিজেরই ঘুরে মরার ভয়ে যুক্তিহীন বিধিনিষেধ মানতে মানতে জান অস্থির। ইসলাম গ্রহণ করে হয়তো একপ্রস্থ ভয়ের হাত থেকে বাঁচা যেতো, কিন্তু আরেক প্রস্থ ভয়ের খপ্পরে পড়া যেতো। যাহা নাই কোরানে তাহা নাই জগতে। উহাই দর্শন, উহাই ইতিহাস, উহাই সাহিত্য, উহাই অর্থনীতি, উহাই রাজনীতি। নাচতে পারবে না, গাইতে পারবে না, আঁকতে পারবে না, বারো মাসে তেরো পার্বণ নেই, হোলিখেলা নেই, রামলীলা নেই, ঝুলন নেই, দুর্গাপূজা নেই, কালী-পূজা নেই, মেয়েলি বার ব্রত স্নান নেই, যা আছে তাতে নারীর স্থান নেই বা থাকলে পর্দার আড়ালে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে মুসলমান হলেও আরবরা গ্রীকদর্শন গ্রীক বিজ্ঞান বর্জন করেনি। তারাই বরং ইউরোপে চালান দিয়ে প্রাচীন গ্রীক জীবনধারাকে ফল্গু নদীর মতো বহতা রাখে। কিমিয়া বা আলকেমি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন কেমিস্ট্রির উদ্ভব হলো। আমাদের দেশে রসায়ন অনেক আগেই সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু মাটির উপর থেকে লুপ্ত হয়ে যাবার পর কেউ তাকে মাটির তলায় বহতা রাখেনি। এ দেশে যারা ইসলাম নিয়ে এলো তারা প্রধানত পাঠান তুর্ক মোগল। নিজেরাই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। তাদের মাদ্রাসা মক্তবের ত্রিসীমানায় গ্রীকদর্শন বা গ্রীকবিজ্ঞান বা কিমিয়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল না। কদাচ কখনো দু'চার ঘর সুধী আরব ইরান থেকে আসতেন। এসে এ দেশের ইসলামের মরুভূমিতে হারিয়ে যেতেন। একে উর্বরা করা দুরূহ ছিল। সে মন নেই, সে মেজাজ নেই। প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যই ছিল প্রকৃতি।

তবে সৌন্দর্যধ্যান ছিল। না থাকলে তাজমহল হতো না, ফতেপুর সিক্রী হতো না, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হতো না, মোগল মিনিয়েচার চিত্রকলা হতো না, শালিমার উদ্যান হতো না, কাশ্মীরী গালিচা হতো না, অসংখ্য প্রকার কারুশিল্প হতো না, এত রকম ফুল এত রকম ফল এত রকম আম থাকত না। এত রকম রান্না থাকত না। মধ্যযুগের ভারত ইউরোপের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। বিবিধ অর্থে। তাই ভারত আবিষ্কারের জন্যে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তার ফলে পশ্চিমের রেনেসাঁস সুগম হয়। পরোক্ষভাবে ভারত তার এক কারণ। ভারতের বিচিত্র সমৃদ্ধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ভারত দুর্বল ছিল না। দীন ছিল না। বাদশারা তাকে দীনদুর্বল হতে দেননি। তবে শেষের দিকে তাঁদের অশুভবুদ্ধি যেমন তাঁদের পক্ষে কাল হলো তেমনি তাঁদের রাজ্যের পক্ষেও। তাঁদের দেশের পক্ষেও। সমুদ্রপথ অন্বেষণ করতে যারা প্রাণ হাতে করে বেরিয়েছিল ইতিহাস

হলো তাদেরি প্রতি অনুকূল। সমুদ্রযাত্রা ছেড়ে দিয়ে যারা পাঁজি দেখে গোরুর গাড়ীতে চড়ত ইতিহাস হলো তাদের প্রতি বিমুখ। মোগলরাও সমুদ্র সম্বন্ধে সজাগ ছিল না। মধ্য এশিয়ায় সমুদ্র কোথায় যে তাদের সমুদ্রভয় ভাঙবে! আমার এক মুসলমান সহকর্মী নদীর ভয়ে পূর্ববঙ্গে বদলি হতে চাইতেন না। আরব হলে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় থাকত। কিন্তু পাঠান মোগলদের ঐতিহ্য অন্যরূপ।

সী পাওয়ার যার দুনিয়া তার। এই হলো অষ্টাদশ শতকের অলিখিত নিয়ম। ইংলণ্ড ছিল অগ্রগণ্য সী পাওয়ার। নেপোলিয়ন তার সঙ্গে বল-পরীক্ষায় হেরে যাওয়ার পর তাকে রুখবে এমন শক্তি পৃথিবীতে ছিল না। ভারতে থাকত কী করে? ভারত দু'দিন আগে না হোক দু'দিন পরে ইংলণ্ডের ছত্রাধীন বা প্রভাবাধীন হতোই। এটার যদি অন্য কোনো কারণ নাও থেকে থাকে তবে সমুদ্র অধিকারই ভারত অধিকারের অর্ধেক কারণ। তাও যদি ফরাসীদের মতো সেকালের পক্ষে আধুনিক স্থলসৈন্য থাকত! যুদ্ধবিদ্যার অগ্রগতির খবর মোগলরাও রাখত না, মরাঠারাও না, শিখরাও না, রাজপুতরা তো নয়ই। কিন্তু আরো গভীরে গেলে দেখা যাবে সব কারণের তলায় ছিল রেনেসাঁসের ছায়া ইউরোপের বলাধান ও তার অভাবে ভারতের বন্ধ্যাত্ব। আমাদের জগৎ-জিজ্ঞাসায় জীবনদর্শনে ও প্র্যাকটিকাল ক্রিয়াকর্মে বার্ধক্য এসেছিল। আর ইউরোপের এসেছিল যৌবন। প্রাচীন সভ্যতা কি কেবলমাত্র গৌরবের বিষয়? সে যদি প্রকৃতির মতো পুরাতন হয়েও নিত্য নূতন না হয়, যদি শীতের পরে বসন্তের স্ফূর্তি অনুভব না করে, যদি রাত্রির পরে দিনের আলোর পরশ না পায়, তবে সে মানুষকে দুর্বল করে, পরবশ করে, শোষিত ও লাঞ্ছিত করে।

ইউরোপের রেনেসাঁস তাকে দিগ্বিজয়ী করে, এটাই মূলগত সত্য। কিন্তু দিগ্বিজয়ী নাও যদি করত তা হলেও কিছু এসে যেতো না। সেই অভিনব শক্তি জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে স্পন্দন নিয়ে আসে। কিছুই তার আওতা থেকে বাদ পড়ে না। ধর্মেরও নবযুগ আসে। সমাজেরও। সব একদিনে নিখুঁৎ হয়ে গেল তা নয়। মানবিক কখনো নিখুঁৎ হতে পারে না। প্রাকৃতিক কখনো নিখুঁৎ হতে পারে না। নিখুঁৎ হলে তার আর অদলবদল চলে না। আর অদলবদলই তো প্রকৃতির নিয়ম। অদলবদল নেই শুধু নির্গুণ ব্রহ্মের। রেনেসাঁসের মানব হলো প্রকৃতির নিয়মে চালিত। প্রকৃতিকে জয় করবার অভিলাষ পোষণ করে সে প্রকৃতির নিয়ম অধ্যয়ন করে। অনুসন্ধান করে। আয়ত্ত করে। তার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সে পায় প্রাচীন গ্রীস থেকেই। সেই-জন্যে ইউরোপের রেনেসাঁস গ্রীসেরই পুনর্জন্ম। কৌতুকের কথা গ্রীস ততদিনে তুর্কের পদানত হয়েছে। তাই তার নাম করে অপরের পুনর্জন্ম হলো, তার নিজের হলো না। তাকে অপেক্ষা করতে হলো ঊনবিংশ শতক অবধি। তার মতো আরো কয়েকটি দেশকেও।

রেনেসাঁস ইউরোপে এলো গ্রীস থেকে। আর আমাদের দেশে এলো

ইউরোপ থেকে। কথা হচ্ছে আমরা কি তাকে দুই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলুম, না দুই হাত দিয়ে ঠেলা দিলুম, না তার নাম করে ঘরোয়া একজাতের রেনেসাঁস খাড়া করে ভাবলুম এই তো কেমন রেনেসাঁস! তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর, হাঁ, হাঁ, হাঁ। আমরা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে গ্রহণও করেছি, দুই হাত দিয়ে ঠেলাও দিয়েছি, তার নামে নাম রেখে ঘরোয়া একটি জিনিসকেও রেনেসাঁস ভেবেছি। অর্থাৎ নাম আর বস্তু কখনো অভিন্ন, কখনো বিভিন্ন।

রেনেসাঁস চান না এমন লোক দেড়শ' বছর আগেও ছিলেন, এখনো রয়েছেন। এঁদের বাদ দিলেও যাঁরা চান তাঁদের মধ্যেই দোটানা ছিল। এখনো কি নেই? প্রথম অবধি রেনেসাঁসের পক্ষপাতীরা দ্বিধাগ্রস্ত। রেনেসাঁস কি এদেশে ইউরোপের অনুরূপ হবে, না ভারতের স্বকীয় রীতির হবে? রেনেসাঁস কি হবে গ্রীসের পুনর্জন্ম, না ভারতের পুনর্জন্ম? গ্রীক সভ্যতার বড় বড় দানগুলো কি বিশ্বজনীন ও চিরন্তন, না ইউরোপনিবদ্ধ ও তৎকালীন? কেন আমরা গ্রীসের দ্বারস্থ হব? কোন দুঃখে? কিসের অভাবে? গ্রীসকে বর্জন করলে এমন কী ক্ষতি যার পূরণ এ দেশের মধ্যেই নেই? ভারত কি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়? ভারত কি সংস্কৃতির দিক থেকেও পরমুখাপেক্ষী? না হয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা গেছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছে, তা বলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিতে হবে? রেনেসাঁসের শর্ত কি সাংস্কৃতিক আত্মসমর্পণ?

যুক্তি যদি এক দিকে আঙুল বাড়ায় আর সেন্টিমেন্ট অন্য দিকে তা হলে মানুষ দেড়শ' বছরেও মনঃস্থির করতে পারে না। একবার যুক্তির পথ ধরে চলে, একবার হৃদয়াবেগের। এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এর খেসারৎ আছে। যেখানে হৃদয় আর মস্তিষ্ক মিলেমিশে কাজ করে সেখানে যেমন প্রগতি হয় অন্যত্র তেমন নয়। আমাদের প্রগতি কেন আশানুরূপ হয়নি তার কারণ আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের পা মিলছে না। ভারতীয় স্বামী স্ত্রী যখন হাঁটে তখন স্বামী লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়, স্ত্রী পিছনে পড়ে থাকে। তখন স্বামীকেই থামতে হয়। ইংরেজ স্বামী-স্ত্রী যখন হাঁটে তখন একসঙ্গে পা তোলে পা ফেলে। কেউ পিছিয়ে থাকে না, কাউকে থামতে হয় না। প্রগতি যদি হয় হৃদয় ও মস্তিষ্কের একসঙ্গে পা তোলা পা ফেলা তা হলে নৈরাশ্যের হেতু থাকে না।

এখন যুক্তি কী বলে শোনা যাক। যুক্তি বলে, আমাদের জগৎজিজ্ঞাসা যদি দেড় হাজার বছর আগে যেখানে ছিল সেইখানে থমকে থাকে আর জগৎ যদি ঐ দেড় হাজার বছরে অনেক লক্ষ যোজন অতিক্রম করে থাকে, তা হলে আমরা কি নতুন জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন জগৎজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হব, না নতুন জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পুরাতন জগৎজিজ্ঞাসারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকব? কার অনুগত হব আমরা? নতুন জগতের, না পুরাতন জগৎ-জিজ্ঞাসার? যদি নতুন জগতের দিকে মুখ ফেরাতে হয় তা হলে ইংরেজী শিখতে হবে, আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে, বিশ্বসাহিত্যের

সাগরজলে স্নান করতে হবে, যা বিশ্বজনীন তাকে সাদরে বরণ করতে হবে, যা বিজাতীয় তাকেও গ্রহণ করতে হবে আপনার পরিপূরকতার জন্যেই, বাংলা ভাষায় এনে দিতে হবে সমুদ্রের জোয়ার। এর ফলে জীবনদর্শনও বদলে যাবে। যাক না? ক্ষতি কী? আমরা নতুন যুগের মানুষ। যে জীবনদর্শন দেড় হাজার বছর আগে তখনকার নতুন যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছিল সে জীবনদর্শন আমাদের জীবনের সঙ্গে কি খাপ খেতে পারে? জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন জীবনদর্শন বানিয়ে নেব, না জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে কবেকার পুরাতন জীবনদর্শনের জের টেনে যাব? কার প্রতি আমাদের আনুগত্য? জীবনের প্রতি, না গতানুগতিক জীবনদর্শনের প্রতি? মানছি সেকালের সৌন্দর্যসৃষ্টি অপূর্ব। কিন্তু কেমন করে মানব যে তার পুনরাবৃত্তি করলেই তেমনি সৌন্দর্যসৃষ্টি হবে? নতুন সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে নতুন ধ্যান চাই। প্রকৃতির দিকে তাকাতে হবে। নারীর দিকে তাকাতে হবে। দেহের দিকে তাকাতে হবে। অনুরাগ সাধন করতে হবে। বৈরাগ্যসাধনে আর যাই হোক সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় কি?

হৃদয়াবেগ কর্ণপাত করতে চায় না। তার কথা হলো, আমি সতী। আমি পতিব্রতা। আমি এককালে যার হাত ধরেছি সে অতীত হতে পারে, পুরাণ হতে পারে, গতানুগতিক হতে পারে, কিন্তু সেই আমার ও আমি তার। আমি বন্ধ্যা হতে পারি, মূর্খ হতে পারি, দীন হতে পারি, কিন্তু আমি তাকেই চিনি ও মানি, আর কারো দিকে তাকাব না। তোমার এই জগৎবাবু অতি বদ লোক। দেখছ না কেমন করে বণিকের বেশ ধরে পরের ঘরে ঢুকে পড়েছে, এখন পরেছে রাজবেশ! জীবনবাবুও তার দোস্ত হয়েছে। এসব বহুরূপীর কাছে কী আছে শেখবার? না আছে এদের আধ্যাত্মিকতা, না নৈতিকতা। বোঝে শুধু শাসন ও শোষণ। পার্থিব ধনসম্পদ ও সামরিক শক্তি এই দুটি এদের অন্বিষ্ট। এর জন্যে এরা না করতে পারে হেন কাজ নেই। সৌন্দর্য? ছি ছি! তোমার কি লজ্জাসরম নেই? যা শিব তাই সুন্দর। নাই বা হলো সত্য। হলোই বা অতিপ্রাকৃত, অপ্রাকৃতিক। মোট কথা আমি প্রকৃতির মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব না। ও নাগী আজ এক রকম, কাল এক রকম। কিছুতেই ওর মন ভরে না। ফের যদি তুমি ওর দিকে তাকাও আমি অন্নজল ত্যাগ করব। আমাকে আমার আত্মসম্মান নিয়ে মরতে দাও।

ঐ যে প্রকৃতির মতো পরীক্ষা করা, পদ্মা নদীর মতো এক কূল ভাঙা আরেক কূল গড়া, ওটা কুলবতী নারীর কর্ম নয়। অথচ ওইটেই রেনেসাঁসের মূল সূত্র। ওটা বাদ দিলে রেনেসাঁস একটা কথার কথা। ধরতাই বুলি। দ্রোণাচার্য ছেলেবেলায় পিটুলি গোলা জল খেয়ে ভাবতেন দুধ খেলেন। একেই বলে, ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল! যে কারণেই হোক রেনেসাঁস শব্দটা মনে গেঁথে গেছে। কিন্তু তার জন্যে কুলবতী নারী কুল ছাড়তে পারে না। আমাদের এই পাঁচ হাজার বছরের কুলবতী সভ্যতা নদীর কূলে লালিত। সমুদ্রের অকূলে ভাসতে তার আন্তরিক অনিচ্ছা। পশ্চিম মহাদেশ

ও আধুনিক যুগ যদি হুড়মুড় করে তার ঘাড়ে এসে না পড়ত তা হলে সে স্বেচ্ছায় এতটুকুও বদলাত না। তাকে বদলে দিতে হলে তার উপর জোর খাটাতে হয়। তা সে গায়ের জোরই হোক আর অবস্থার জোরই হোক। তেমন অবস্থায় পড়লে সে অনিচ্ছার সঙ্গে বদলায়। ওইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। বদলাব না বলে সে যদি সত্যি সত্যি অন্নজল ছাড়ত তা হলে এতকাল সে ইহলোকে টিকে থাকত না। বহু প্রাচীন সভ্যতার মতো তারও পরলোকপ্রাপ্তি হতো। আমাদের সভ্যতার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়নি, হয়েছে সাগর সন্দর্শন।

মনে রাখতে হবে যে রেনেসাঁস হচ্ছে লুপ্তপ্রায় স্রোতকে আবার বহতা করা। গ্রীস শুকিয়ে এসেছিল। তাকে ইউরোপের খাতে বইয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ভারত চিরকালই বহমান ছিল। কোনো কালেই শুকিয়ে যায়নি। ভারত যা হয়েছিল তার নাম কানা গোরু। তাঁর ভিন্ন গোঠ। আর সব গোরু যেদিকে যাবে সেদিকে তিনি যাবেন না। তাঁর একার একটা গোচারণভূমি। তা না হয় হলো। কিন্তু তাঁর জন্যে আলাদা একটা মহাকাল, আলাদা একটা যুগ, আলাদা একটা শতাব্দীমালা কেমন করে সম্ভব? স্পেস না হয় স্বতন্ত্র, টাইম স্বতন্ত্র হবে কী করে? পশ্চিমকে না হয় গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখল, কিন্তু আধুনিককে রুখবে এমন শক্তি কি তার আছে? অথচ পশ্চিমের উপর অভিমান করে আধুনিকের সঙ্গে অসহযোগ করতেও তার বাধেনি।

ভারতের রেনেসাঁস ঠিক ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো নয়। রেনেসাঁসের মূল সূত্র যে প্রকৃতির মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, নির্মমভাবে এক হাতে ভাঙা আরেক হাতে গড়া, এইখানে তার আন্তরিক কুণ্ঠা। পরের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল সে বাধ্য হয়ে আত্মসাৎ করবে, তা বলে চন্দ্রগ্রহণের সময় হাঁড়ি ফেলতেও ভুলবে না। পুরোনো বোতলে যদি নতুন মদ ভরতে হয় সে হাজার বার "না" বলে অবশেষে "হাঁ" বলবে, কিন্তু বোতলের তলার দিকে যে পুরোনো মদ আছে সে মদও ফেলবে না। ধুতির উপরে প্যাণ্ট পরতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। প্যাণ্ট পরতে হবে বলে ধুতী খুলতে হবে? ছি ছি! ক্ষণকালের জন্যেও উলঙ্গ হতে নেই।

ভাঙার কাজ হয়নি বললেও চলে। যা আপনা হতে ভেঙে পড়েছে বা পড়ো-পড়ো করছে তারই গায়ে গায়ে গড়ার কাজ চলেছে। প্রকৃতির মতো ভাঙতে সাহস নেই, ইচ্ছা নেই। তবে গড়তে মন গেছে। এই যা লাভ। কৌতূহল জেগেছে, পাশ্চাত্য বলে বিরাগ নেই, আধুনিক বলে অসহযোগ নেই, উপরোধে ঢেঁকি গেলাতে হয় না। কিন্তু পিছুটান এখনো এত তীব্র যে হঠাৎ কোনো কারণে যদি এ দেশ আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা হলে পুরাতন অভ্যস্ত আচারে ফিরে যাবে। পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার প্রচ্ছন্ন এক নিশির ডাক আছে। রবীন্দ্রনাথের "ল্যাবরেটরি" গল্পের শেষ ক'টি লাইনে এর ইঙ্গিত নিহিত।

"হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, রেবি, চলে আয়।

সুড়সুড় করে রেবতী পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।"

বলা যায় না কবে কোন্ পরিস্থিতিতে মধ্যযুগের পিসিমার ছায়া পড়বে দেয়ালে। আধুনিক যুগের রেবতী তাঁর পিছন পিছন চলে যাবে। একবার ফিরেও তাকাবে না। যেখানে যুক্তির সঙ্গে সেণ্টিমেণ্টের স্বতোবিরোধ সেখানে যুক্তি দু'চার পা এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেণ্টিমেণ্টকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি তার নেই, বরং তাকেই পিছনে টেনে রাখার শক্তি আছে তার পশ্চাদ্‌বর্তিনীর। এ সমস্যার সমাধান গত দেড়শ' বছরেও হয়নি, স্বাধীনতার চোদ্দ বছরেও হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ও হয়নি। তাঁর শতবার্ষিকীতেও হয়নি। পিসিমা এখনো অবুঝ, তাই রেবতী এখনো নাবালক। পিসিমাকে অমান্য করার মতো মুরোদ সেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকের নেই। সে আইন অমান্য করতে পারে, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারে, কঙ্গোতে গিয়ে চোম্বেকে হটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু পিসিমাকে "না" বলতে পারে না।

রাজনীতিক্ষেত্রে স্বরাজ এসেছে, অর্থনীতিক্ষেত্রে "টেক অফ" অচিরে আসবে, কিন্তু ভারতের হৃদয় এখনো সেইখানেই রয়েছে যেখানে ছিল দেড় হাজার বছর আগে। বিপ্লব যদি ঘটে তার পরেও দেখা যাবে পিসিমা বলবান, রেবতী দুর্বল।

ছেলেবেলায় আমার বিশ্বাস ছিল যে পিসিমাকে বোঝানো যায়। এখন আমার বয়স হয়েছে। আমি আর বিশ্বাস করিনে যে রেবতী তার পিসিমাকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পারবে। পিসিমার মৃত্যু কামনা করা পাপ। তাঁর উপর জোর খাটাতে যাওয়া অপরাধ। তা হলে কি তাঁর ইচ্ছার কাছেই আত্মবলি দিতে হবে? না। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলতর করতে হবে। এমন এক অবস্থাকে ডেকে আনতে হবে যা পিসিমাকেও বিপর্যয়ে লাফ দিতে বাধ্য করবে। লাফ না দিলে মরণ। শিল্পবিপ্লবের থেকেই সে অবস্থার উদ্‌ভব হবে। ইউরোপেও তাই হয়েছিল। নইলে রোমের পিসিমাকে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস প্রোটেস্টাণ্টদের থাকলেও ক্যাথলিকদের ছিল না। হাজার বছরের পিসিমা। আদরযত্ন বড় কম করেননি। যদিও রাগ করে গায়ে ছাঁকাও দিয়েছেন। এখন তিনি মানসম্মান নিয়ে কাশীবাস করেন। ভক্তির পাত্র, কিন্তু ইউরোপের রেবতী তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় অটল। সে কখনো ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, কখনো ভুল সিদ্ধান্ত। কষ্ট পায়, পশতায়, ভুল সংশোধন করে, ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে দেউলে হয়, কিন্তু ভুলটা তার নিজের ভুল। ভুল করার অধিকার সে অর্জন করেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তার নিজের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সে সংগ্রাম করে আদায় করে নিয়েছে। কেবল পোপের কাছ থেকে নয়, রাজার কাছ থেকেও। নেবে একদিন ডিকটেটরের কাছ থেকেও। না, এ দায়িত্ব ডিকটেটরকেও সঁপে দেওয়া যায় না। প্রগতির বিনিময়েও না।

রেনেসাঁসের মূল সূত্র যেমন প্রকৃতির মতো হওয়া তেমনি তার প্রধান

কীর্তি হলো মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব তার নিজের হাতে নেওয়া। গোড়ায় কম মানুষের জন্যে। পরে বেশী মানুষের জন্যে। পরিশেষে সব মানুষের জন্যে। সব মানুষ সমান আর সব মানুষ স্বাধীন এই প্রতীতিতে উপনীত হতে পাঁচশ' বছর লেগে গেল। এর মধ্যে গুটি দুই রাজার মাথা কাটতে হলো, গোটাকয়েক গৃহযুদ্ধ লড়তে হলো, গোটা দুই তিন বড় বড় বিপ্লব ঘটাতে হলো, দু' দু'টো মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হলো। আরো একটার জন্যে পরমাণবিক বোমার পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। বোঝা যাচ্ছে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মধ্যে সাম্য আর স্বাধীনতা অধিগত হয়েছে, মৈত্রী এখনো সুদূর পরাহত। রেনেসাঁসের পালা এখনো সাঙ্গ হয়নি। ভারতের মৈত্রীসাধনার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ এবং গৌরবময়, তার থেকে মনে হয়েছিল ভারতই এর অগ্রণী হবে। এখন আমি অতটা নিশ্চিত নই। কিন্তু মনের কোণে বিশ্বাস করি যে দেড় হাজার বছরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলে ভারতই হবে মানবমৈত্রীর অগ্রদূত। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সে দুর্বলতা অবিলম্বে কাটিয়ে ওঠা যায়। মানুষের অসাধ্য কী আছে! ইচ্ছা থাকলেই উপায় থাকে।

রেনেসাঁসকে যদি একটা অবিভাজ্য ঐতিহাসিক প্রোসেস বলে ধরে নিই, যদি একটা দেশের ধারা না বলে একটা যুগের ধারা বলে মেনে নিই, তা হলে বুঝতে পারব রবীন্দ্রনাথ কোন্‌খান থেকে কেমন করে অবতীর্ণ হলেন। যে প্রাণপ্রবাহ ইউরোপকে প্লাবিত করে পরে ভারতকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারই একটি ঢেউয়ের নাম লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, আর একটির নাম শেক্সপীয়ার, আর একটির নাম গ্যেটে, আর একটির নাম রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য আরো অনেকগুলি ঢেউয়ের নাম করতে পারা যায়। স্বদেশের শিল্পীপরম্পরায় এঁদের যথাবিহিত স্থান আছে, কিন্তু কেবল সেইটুকু দেখেই এঁদের যথার্থ স্থান নির্দেশ করা যায় না। চিলিতে সেদিন ভূমিকম্প হলো, তার দরুন প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্তের জল উদ্বেল হয়ে উত্তর প্রান্তে তরঙ্গিত হলো, তার ফলে জাপানের সাগরতীরে অবস্থিত শহর গ্রাম ডুবে গেল। শস্যহানি, প্রাণহানি হলো জাপানীদের। একেই বলে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! এর রহস্য না জানলে ইতিহাসের রহস্য বোঝা যায় না। রেনেসাঁসও তেমনি একটি আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প বা প্লাবন। পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুনকে গড়বার সুযোগ দিল সেই প্রোসেস। গড়ার ভার যাঁদের উপর বর্তাল রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরি একজন কারিগর। তাঁর দেশ ভিন্ন, দেশের অবস্থা ভিন্ন, কিন্তু যুগ অবিভাজ্য।

লেওনার্দো প্রভৃতির সঙ্গে একনিঃশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করা নতুন কথা নয়। যাঁরা করেন তাঁরা এই ভেবে করেন যে ওদেশের রেনেসাঁসে লেওনার্দো বা গ্যেটে যেমন বিচিত্রকর্মা মহাবাহু, এদেশের রেনেসাঁসে তেমনি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ওদেশে যদি রেনেসাঁস আদৌ না ঘটত তা হলে কি এদেশে রেনেসাঁসের কোনো আশা ছিল? আর এদেশে যদি রেনেসাঁস না ঘটত তা হলে রবীন্দ্রনাথের অনন্য প্রতিভা কি তাঁকে বিচিত্রকর্মা মহাবাহু করত? একজোড়া

রেনেসাঁসই একসূত্রে গ্রথিত। সমুদ্র পার হয়ে আসতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। তাই দুটো আলাদা রেনেসাঁস বলে মনে হচ্ছে। দেশভেদে দুই স্বতন্ত্র রূপ। যেমন রুশী কমিউনিজম ও চীনা কমিউনিজম। দেশের ইতিহাস ভেদে দুই স্বতন্ত্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব। হাজার বছরের খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ইউরোপীয় শিল্পী ও কবিরাও চাননি। লেওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো ইত্যাদি পাশ্চাত্য রেনেসাঁস নায়করা গভীরভাবে খ্রীস্টান ছিলেন। যদিও নিবিড়ভাবে বিজ্ঞানসিদ্ধ। পুরোনো বোতল ও নতুন মদ নিয়ে এদিকে যা হয়েছে ওদিকেও তাই হয়েছিল। পুরোনো মদ ফেলে দিতে গোড়ার দিকে কেউ রাজী হননি। এ অধ্যায় এলো ফরাসী বিপ্লবের কিছু আগে। অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দী পরে।

ইংরেজীতে একটা বচন আছে। স্নানের পরে ময়লা জল ফেলে দিতে গিয়ে বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না। রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপের বিজ্ঞজনরা বলে আসছেন, পুরাতনের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনকেও ফেলে দিয়ো না। তা ছাড়া পুরোনো মদেরও দাম কম নয়। লোকে তো বেশী দামই দেয়। বোতল খালি করতে ইউরোপের সুধীদের আপত্তি ভারতের সংরক্ষণশীলদের মতোই দৃঢ়। না, ইউরোপও মধ্যযুগের প্রভাবমুক্ত হয়নি। গ্রীক চেতনার পুনর্জাগরণ খ্রীস্টীয় চেতনার সুষুপ্তি নয়। ইউরোপ এখনো হাড়ে হাড়ে খ্রীস্টান।

রেনেসাঁসকে আবাহন করেছিলেন খাঁটি খ্রীস্টানরাও। তার থেকে মনে হতে পারে যে দুই চেতনার মধ্যে স্বতোবিরোধ নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল বিরোধ আছে ও সেটার নিষ্পত্তি আজো সম্ভব হয়নি। রেনেসাঁস অনুরাগীরা প্রকৃতির বাইরে বা ঊর্ধ্বে পা বাড়াবেন না। মানুষই জগতের শেষ কথা। অপরপক্ষে খ্রীস্টধর্মের অনুরাগীরা প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করবেন। খ্রীস্ট তাঁদের চোখে ঈশ্বর তথা মানব। সমাজের ও নীতির বুনিয়াদ এক পক্ষের মতে মানবিক। অপর পক্ষের মতে ঐশ্বরিক। বিভেদ শুধু পুরাতনের সঙ্গে নূতনের নয়, তার চেয়েও গভীর এবং মৌল। বিভেদ থাকলে যে বিরোধ থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু বিরোধ ধীরে ধীরে বাধল। ছেলেদের কার মতো করে মানুষ করা হবে? বিদ্যালয়গুলো সেকুলার হবে, না খ্রীস্টান হবে? প্রজাদের কার মতো করে পালন করা হবে? রাষ্ট্র সেকুলার হবে, না খ্রীস্টান হবে? এ ধরনের বহু প্রশ্ন একে একে ওঠে। তর্ক করে যখন মীমাংসা হয় না তখন বাহুবল প্রয়োগ করতে হয়। যার গায়ের জোর বেশী সেই জেতে। কিন্তু অপর পক্ষ তাকে নৈতিক জয় বলে স্বীকার করে না। আজো করেনি। বহু শতাব্দীর পরে হল্যাণ্ডের ক্যাথলিকরা যেই রাজ্যের ভার পেলো অমনি শুরু হলো ক্যাথলিক ছেলেদের জন্যে আলাদা স্কুল, ক্যাথলিক শ্রমিকদের জন্যে আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন, ক্যাথলিক খেলোয়াড়দের জন্যে আলাদা ক্লাব, ক্যাথলিক শ্রোতাদের জন্যে আলাদা রেডিও ইত্যাদি। বিরোধ অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমাদের নিজেদের মধ্যে এ জাতীয় বিভেদ বা বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয়নি। হলে তিনি কোন্ পক্ষে যেতেন বলা দুঃসাধ্য। তবে তাঁর শেষ জীবনের লেখা পড়লে ও কথাবার্তা শুনলে মনে হতো বিরোধের দিন তিনি রেনেসাঁসের পক্ষেই রায় দিতেন। সেকুলারের পক্ষে। প্রাকৃতিকের পক্ষে। মানবিকের পক্ষে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে অপরপক্ষে তাঁর সায় নেই। তার মানে তিনি যুক্তির দ্বারাই চালিত, হৃদয়াবেগের দ্বারা নয়। তিনি রেবতী নন—তিনি অবাধ্য সন্তান।

(১৯৬১)

আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকালেও ছিল। সেই আলেক-জাণ্ডারের সময় থেকেই কিংবা তারও আগে থেকে। মধ্যযুগে একটা ছেদ পড়ে যায়, কারণ স্থলপথ হয় বিপৎসঙ্কুল। জলপথের সন্ধান একান্ত আবশ্যক হয়। এই কাজটি ভারতের দিক থেকে না হয়ে ইউরোপের দিক থেকে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইউরোপ ভারতকে বহু শতকের পর আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কারও করে। তার ধারণা ছিল ওটাই ভারতবর্ষ। ওখানকার আদিবাসীরাই ভারতীয়।

এদিক থেকেও একটা পালটা আবিষ্কার বকেয়া ছিল। চার শতাব্দী পরে ভারতও করে জলপথে আবার নতুন করে ইউরোপ আবিষ্কার। রামমোহন রায় করেন ইংলণ্ডে পদার্পণ। তাঁর আগে আবু তালিব। সেই যে ইউরোপ আবিষ্কার সেটা শুধু ভৌগোলিক অর্থে নয়। তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ছিল। সেটা কেবল স্পেসের দিক থেকে নয়, টাইমের দিক থেকেও। ইউরোপ যখন জাহাজে করে ভারতে এলো তখন এলো আধুনিক যুগ থেকে মধ্যযুগে। আর ভারত যখন জাহাজে চড়ে ইউরোপে গেল তখন গেল মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে। রামমোহন রায় দেশে থাকতেই আধুনিক যুগের বার্তা পেয়েছিলেন। বিদেশে গিয়ে আধুনিক যুগের স্বরূপ দেখলেন। পশ্চিমকেও দেখতে পেলেন তার স্বস্থানে। কলকাতার ইংরেজকে দেখে ইউরোপের ইউরোপীয়কে চেনা সম্পূর্ণ হয় না। রামমোহনের জীবনে এই সম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল।

একই কারণে মাইকেল মধুসূদনও যেতে ব্যাকুল হয়েছিলেন সেদেশে। এ ব্যাকুলতা ব্যাপকভাবে ছিল সেকালের শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরে। কিন্তু অতি অল্পক্ষেত্রেই তৃপ্ত হয়েছিল। যাঁরা ইউরোপে যেতে পারেননি তাঁরাও আধা বিলিতী শহর কলকাতায় বসে বিলেতের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। কিংবা বম্বেতে বসে। কিংবা মাদ্রাজে বসে। এগুলিও আধা বিলিতী শহর।

বা সিকি বিলিতী শহর। এদের মধ্যে মাদ্রাজ যদিও জ্যেষ্ঠ তবু কলকাতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কলকাতা ছিল রাজধানী। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের। ইংরেজ আমলের আগে হাজার হাজার বছর কেটেছে, পৌরাণিক মতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ ও কলিযুগের একাংশ। কিন্তু ভারতের রাজধানী এর আগে কখনো ভারতের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রের এত কাছে ছিল না। সমুদ্রের এক পারে লণ্ডন, আরেক পারে কলকাতা, মাঝখানে জাহাজ চলাচল—অবাধ যাতায়াত।

জাহাজ যখনি কলকাতায় ভিড়ত তখনি তার থেকে নামত আধুনিকতম বইপত্র, খবরের কাগজ, যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য, সাজপোশাক, মনিহারি, অসংখ্য কৌতূহলপ্রদ সামগ্রী যা কস্মিন্‌কালে ভারতে উৎপন্ন হয়নি বা হতো না। দেশ একটু একটু করে আধুনিক হয়ে উঠল। এবং কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য। যেমন গথিক ধরনের গির্জায় বা কলোনিয়াল শৈলীর বাসভবনে। কলকাতার ধনী ও অভিজাতদের জীবনধারা দুই খাতে প্রবাহিত হলো। একটি আধা হিন্দু আধা মোগলাই, অপরটি তৎকালীন অর্থে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। লাট-বেলাটরা যে ধারার বাহক। মধ্যবিত্ত বলে আস্ত একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। এঁরা হাফ শহুরে, হাফ গ্রাম্য। পরিবার পড়ে থাকে গ্রামে। এঁরা রোজগার করেন শহরে। মনটা মধ্যযুগে, চোখ দুটো আধুনিক যুগে। বুঝতে পারেন না ব্যাপারখানা কী? কারা সব এসেছে, কেন এসেছে, কী নিয়ে এসেছে, কী নিতে এসেছে? ওরা কি রাজা, না সওদাগর, না ধর্মপ্রচারক, না পণ্ডিত, না সৈনিক? সমুদ্রের ওপারেও দেশ আছে? সে দেশও মাটির? গায়ের রং অমন কেন? ওরা কী ভাবে?

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলো। ইংরেজীর মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হলো। নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ছাপাখানার সূচনা হয়েছিল। বাংলা হরফে ছেপে বই বেরোল, পত্রিকা বেরোল। যারা ইংরেজী ভালো জানে না তারা বাংলা পড়ে জগতের সঙ্গে যুক্ত হলো। ভারতও সে জগতের অন্তর্গত। তার আগে ভারত সম্বন্ধেই বা কে কতটুকু জানত! এমন কি বাংলাদেশ সম্বন্ধেও জানবার উপায় ছিল না তেমন। ঐ লোকমুখে শোনা বা স্বচক্ষে দেখা। সংস্কৃত বা আরবী শিখে সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হতো না। ফারসী শিখে যা হতো তাও হাতে লেখা ফারসী কেতাব পড়ে। সেও কতকালের পুরোনো। আধুনিক জগৎ তখনকার দিনের সংস্কৃত আরবী ফারসী ভাষায় পরম বিদ্বানদেরও জ্ঞানগম্য ছিল না। অথচ একটি সাধারণ ইংরেজেরও ছিল। মানুষমাত্রেরই প্রাণে জ্ঞানের জন্যে আকুলতা আছে, গাছের প্রাণে যেমন আছে আলোর জন্যে আকুলতা। গাছকে যদি ঢেকে রাখা হয় তবে শুধু রস টেনে সে বাড়ে না। বেঁচে থাকতে পারে। এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো পায়নি বলে বাড়েনি। পণ্ডিতরাও মাথায় খাটো বহরে বড়। তাঁদের মনটা পৌরাণিক। তাঁরা যে কোন্ যুগে বাস করছেন তাই তাঁরা জানতেন না। শুধু জানতেন যে সেটা কলিযুগ। সুতরাং অবজ্ঞেয়। নেতৃত্ব অনায়াসেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে চলে গেল।

এঁরাই হলেন সমাজের ভ্যানগার্ড।

কলকাতা ভারতের রাজধানী না হলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু বারো মাস ত্রিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা ভারতশাসনের কেন্দ্রস্থলে বাস করে শিক্ষিত মানুষ হলো ভারতমনস্ক। তার চেতনা যেমন একটা রেখা ধরে পূব থেকে পশ্চিমে যাতায়াত করতে থাকল তেমনি আর একটা রেখা ধরে ভারতবর্ষের বর্তমান থেকে সুদূরে অতীতে। সে অতীত পুরাণ পারাবারের ও-পারে উপনিষদ্ প্রান্তে অবস্থিত। যেমন সে পশ্চিম মহাসিন্ধুর ও-পারে ব্রিটেন দ্বীপে আবর্তিত। মাঝখানে ইরান, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি কত না দেশ। শিক্ষিত মানুষের সেসবে আগ্রহ নেই। মাঝখানে তেমনি কত না পুরাণ, কিংবদন্তী, মঙ্গলকাব্য। শিক্ষিত মানুষের তাতেও রুচি নেই। মাঝখানকার দেশকাল লঙ্ঘন করে তার চেতনা গিয়ে উপনীত হয় একদিকে উপনিষদ্ প্রান্তে, অপরদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রান্তে। রামমোহন রায় যেমন ইউরোপ পুনরাবিষ্কার করেন তেমনি উপনিষদ্ পুনরাবিষ্কার করেন। যেমন স্পেস অতিক্রম করেন তেমনি টাইম অতিক্রম করেন। যেই সময় থেকে শিক্ষিত মানুষমাত্রেই স্পেস টাইম সচেতন। দেশকাল সচেতন।

রামমোহন এর মধ্যে কোনো স্বতোবিরোধ দেখতে পাননি। নিজের জীবনে ও মনে তিনি একপ্রকার সামঞ্জস্য ঘটান। ভারতবর্ষের রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন উভয়েরই তিনি সূত্রপাত করে যান। বাংলাদেশে ও তার বাইরে সারা ভারতে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায়। সমাজসংস্কারের ধুম পড়ে যায়। ধর্মেরও নবযুগ আসে। সাক্ষাৎভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে এটা তাঁর সেই সামঞ্জস্যের ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোনো কথা ছিল না যে ইউরোপকে ও আধুনিককে বর্জন করতে হবে, কেবল ভারতের "সনাতন"কে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু শতাব্দী না ঘুরতেই বিরোধ দেখা দিল। অর্থনৈতিক বিরোধ থেকে রাজনৈতিক বিরোধ, রাজনৈতিক বিরোধ থেকে নৈতিক তথা সাংস্কৃতিক বিরোধ। মনে হলো পশ্চিমের সূর্য যে আলো দিচ্ছে সেটা আলো নয়, আলেয়া। আটলান্টিকের পার থেকে যে হাওয়া আসছে সেটা বসন্তের হাওয়া নয়, বসন্তরোগের হাওয়া। পশ্চিমদিকের দোরজানালা বন্ধ না করলে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজ ধর্ম সুরুচি ও সুনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ভারতের আত্মা হারিয়ে যাবে।

সেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীটারই এক ভাগ এই সময় হয়ে ওঠে রিয়ারগার্ড। অপর ভাগটার হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায়। ভ্যানগার্ডের ভাগ্য নির্ভর করে ইংরেজের ঔদার্যের উপরে। সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শাসনের অংশ দেয়, শোষণ কমায়, তবেই জোরগলায় বলতে পারা যাবে যে ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রেসী, লিবারল মতবাদ, মানবপ্রগতি ইত্যাদি কথার কথা নয়, কথা অনুসারে কাজও হচ্ছে, ইংলণ্ড এরই জন্যে ভারতে এসেছে ও ভারত এরই জন্যে ইউরোপে গেছে। ইউরোপ একটা নতুন যুগের প্রতীক। ভারতের যুগান্তর ও রূপান্তর তাকেই আশ্রয় করে হবে।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার নিজের ঘরেই সংকট ছায়া ফেলেছিল। অপরিমিত জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত ধনবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত জনবৃদ্ধি হয়েছিল। জ্ঞান আর শক্তি আর ধন এক শিবিরে। জন অন্য শিবিরে। ডিসরেলি বলেছিলেন ইংলণ্ড আসলে এক নেশন নয়, দুই নেশন। ধনীরা এক নেশন, দরিদ্ররা আরেক নেশন। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রত্যেকটি নেশন তলে তলে দুই নেশনে বিভক্ত হয়ে যায়। তেমনি এক নেশনের সঙ্গে অপর নেশনের শক্তিবৈষম্য ও ধনবৈষম্য বেড়ে যায় শিল্পবিপ্লবের আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতায়। ইংলণ্ড এগিয়ে গেলে জার্মানী রাগ করে, জার্মানী এগিয়ে গেলে ফ্রান্স ভয় পায়। রাশিয়া এগোতে চাইলে জার্মানী প্রমাদ গনে। ঘরে শত্রু অভদ্র হয়ে উঠছে, বাইরে প্রতিবেশী রুদ্র হয়ে উঠছে। মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেরও জল্পনাকল্পনা চলছে। শতাব্দীর পূর্বাহ্ণ যেমন আশান্বিত করেছিল শতাব্দীর সায়াহ্ণ তেমনি আশঙ্কিত করে।

সুতরাং ইউরোপ নিজেই নিজেকে নিয়ে বিব্রত। ইউরোপীয় মনীষীরাই ইউরোপের কঠোরতম সমালোচক। রেনেসাঁসের সময় থেকেই ইউরোপে যেমন একটা মানবিক ধারা ছিল তেমনি ছিল একটা ধার্মিক ধারা। ধার্মিকরা রেনেসাঁসকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেননি, কারণ বিজ্ঞান এসে তাঁদের চিরাচরিত জগৎজিজ্ঞাসা ও জীবনদর্শন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন চিন্তাকে তাঁরা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। স্বাধীন বিশ্বাসের উপর তাঁরা খড়্গহস্ত। অপরপক্ষে মানবিকরা কোনো প্রকার ডগমা কিংবা অথরিটি মানবার পাত্র নন। তার চেয়ে আগুনে পুড়বেন, কারাগারে পচবেন। ইউরোপীয় সভ্যতা রেনেসাঁসের প্রসাদেই আধুনিক সভ্যতা হয়েছে। রেনেসাঁস উলটে দিলে তার আধুনিকতার স্রোত উজান বইবে। তাকে ফিরে যেতে হবে মধ্যযুগে। শিক্ষিত ইউরোপের যাঁরা ভ্যানগার্ড তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। অথচ ফরাসীবিপ্লব দেখে শিল্পবিপ্লব দেখে তাঁদেরি কতক হলেন ক্রমে রিয়ারগার্ড। ফিরে চল রেনেসাঁসের পূর্বে। রাফেলের পূর্বে। ধনতন্ত্রের পূর্বে। ইউরোপ যখন ছিল সুন্দর। মানুষ যখন ছিল পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। ইউরোপের রেনেসাঁসের আদি পুরুষেরাও মধ্যযুগকে লঙ্ঘন করে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর গ্রীকযুগে। খ্রীস্টানকে ডিঙিয়ে পেগান জীবনাদর্শে। গোড়ার দিকে তাঁরাও এর মধ্যে স্বতোবিরোধ লক্ষ করেননি। সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু রেনেসাঁসের কিছু কাল পরে যে রেফর্মেশন এলো আর তার প্রতিক্রিয়ায় যে কাউণ্টার রেফর্মেশন দেখা দিল সেটা ধর্ম ও সমাজঘটিত হলেও জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যদৃষ্টি নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সংস্কারকরা ছিলেন প্রতিমাপূজার শত্রু। যীশুর জননী মেরীর মূর্তি তাঁরা সহ্য করবেন না। গির্জাকে মূর্তি দিয়ে তাঁরা সাজাবেন না। অথচ মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করেই পরমসুন্দর

হয়েছিল ইউরোপের মধ্যযুগের ভক্তিমার্গীয় আর্ট। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় কাউণ্টার রেফর্মেশন নিছক প্রতিক্রিয়া নয়। পূর্ববর্তীরা যেমন প্রোটেস্টাণ্টরা তেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেননি। পরে যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন তাঁরা ধর্ম জিনিসটাকেই পরিহার করলেন। তাতে প্রোটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের উপর জয়ী হলেন না, জয়ী হলো সেকুলার মনোভাব।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভ্যানগার্ড থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়ে রিয়ারগার্ড রচনা করলেন তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর দোষারোপ তো করলেনই, ভ্যানগার্ডকেও অব্যাহতি দিলেন না। ধর্ম আর সমাজ নিয়ে গভীর মতবিরোধ। তেমনি জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যবোধ নিয়েও। সাকারবাদ থেকে যে সৌন্দর্য সারা ভারত জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নিরাকারবাদ থেকে তার তুলনায় কতটুকু হয়েছে? কেন আমাদের পিতৃপিতামহের মন্দিরে যাব না? কেন বঞ্চিত হব সৌন্দর্য থেকে? আমরা কি বাইরের লোক যে বাইরে থেকে দৃষ্টিপাত করেই তৃপ্ত হব? আরো গভীরে যেতে হবে, নইলে আর একটা কোণার্ক আর একটি নটরাজ গড়তে পারব না। তেমনি সংস্কৃত কাব্যে নিমগ্ন হতে হবে, নইলে আর একখানি রামায়ণ বা মহাভারত হবে না। বর্জন যদি করতে হয় ইউরোপকে কর, রেনেসাঁসকে কর, রেফর্মেশনকে কর, কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে নয়, বর্ণাশ্রমী সমাজকে নয়, মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাকে নয়, কারুশিল্পকে নয়। ইংরেজ আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, গ্রামসংগঠন ধ্বংস করেছে, সভ্যতার পায়ে কুড়ুল মেরেছে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ভ্যানগার্ড তাতে সায় দিয়ে এবং পশ্চিমের অনুকরণে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন ঘটিয়ে এমন কী অর্জন করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে ক্ষতি-পূরণ হতে পারে? ইংরেজ তো মোয়া দিচ্ছে না। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হলেও তো আত্মশক্তি চাই, তার উদ্বোধন চাই! সে কি শুধু কথায় হবে? তার জন্যে চাই বিপরীত মার্গ গ্রহণ। এ মার্গ বর্জন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতাকে সহর্ষে গ্রহণ করার, সেই সঙ্গে ভারতের উপনিষদ্-যুগের সভ্যতাকে সযত্নে ফিরিয়ে আনার। এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করে উভয় তটে অবাধে গমনাগমন করার। সে সময় নব্য শিক্ষিতরা সকলেই একমত। দ্বিমত দেখা গেল শতাব্দীর শেষভাগে। পাশ্চাত্য তথা আধুনিককে গ্রহণ করতে দ্বিধাভাব এলো। অনেকের আত্মসম্মানে বাধল। একেবারে ইংরেজী বাদ দিতে না পারলেও ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি বিমুখ হলেন তাঁরা। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এমন উত্তেজিত হলেন যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতের মতো পাঁতি দিলেন ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ে কাজ নেই, তার বদলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়। বিজ্ঞানশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হলো না বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা অনেকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলে। যুক্তিবাদ পিছু হটল। সামনে এলো অবতারবাদ, গুরুবাদ, সাকারবাদ। "আনন্দমঠ।" সন্ন্যাসী নেতৃত্ব। ব্রাহ্ম

হলেন ব্রাহ্মণ। প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

শতাব্দীসায়াহ্নের প্রেরণা অবাধ গ্রহণের ও মিশ্রণের নয়, প্রধানত বর্জনের—সামান্য মিশ্রণের। চরমপন্থীরা তাতেও নারাজ। তাঁদের ভারত হবে ইউরোপের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সঙ্গে আধুনিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারত। তাঁরা বর্জন করবেন ইউরোপকে তথা আধুনিককে। তাঁদের বর্জনশীলতা সেইখানেই থামবে না। উপনিষদেও তাঁদের কাজ নেই। গীতা, চণ্ডী, পুরাণ ও ব্রতকথা হলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। মেয়েদের যদি পড়াশুনা করতেই হয় তবে মহাকালী পাঠশালায়। বাড়ীতে যারা থাকবে তারা শিখবে ব্রতকথার মাধ্যমে। ভারতের স্বধর্ম বলতে তাঁরা বুঝবেন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। তার ঘাঁটি হচ্ছে গ্রামে ও মেয়েমহলে। এসব ঘাঁটিতে ইংরেজীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাংলা ঢুকতে পারে, কিন্তু সে বাংলা হবে পুরাতন সংস্কৃতির বাহন, আধুনিক সংস্কৃতির নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারবাহী নয়। স্বদেশ ও স্বধর্ম একাকার হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর মধ্যে বর্জনের ভাবটাই প্রবলতর ছিল, গ্রহণের ভাবটা অতি ক্ষীণ। এবং চরমপন্থীরা যেমন আধুনিক ইউরোপকে বর্জন করলেন তেমনি উপনিষদের ভারতকেও। তাঁদের আন্তরিক আনুগত্য পৌরাণিক বর্ণাশ্রমী ভারতের প্রতি। বেদ তাঁদের নমস্য, কিন্তু স্মৃতি তাঁদের নিয়ামক। দর্শনে তাঁরা অদ্বৈতবাদী, কিন্তু কার্যত কালীপূজক। এটাও যে একপ্রকার বর্জন তা কেউ ভেবে দেখলেন না। সংরক্ষণ মানে শিকায় তুলে রাখা নয়, জীবনে প্রয়োগ করতে করতে চালু রাখা।

সুবিধামতো ভুলে যাওয়া হলো যে মুসলমান বলে আর একটি সম্প্রদায় আছে। তারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য থাকতে পারে। মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো কেউ জন্মাননি, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনও হয় এক পুরুষ বিলম্বে। রেনেসাঁস বা রেফর্মেশন কোনোটাই ঠিকমতো স্টার্ট পায়নি সে সমাজে। পেতো আরো কিছুদিন পরে, যদি না হিন্দু সমাজ বিপরীত মার্গ ধরত। মুসলমান সমাজের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড দেখল বিপরীত মার্গ নিলে মোগলভারতে উপনীত হওয়া দুরাশা। পৌঁছবে হয়তো হিন্দুভারতে। সে ভারত মুসলমানের জন্যে নয়। তার চেয়ে ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলানো শ্রেয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা বাঁধা বখরা মেলার আশা আছে, একেবারে বঞ্চিত হবার ভয় নেই। মুসলমান সমাজেও দ্বিমত ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড মোটামুটি একমত। মোল্লা মৌলানাদের কথা আলাদা। তাঁদের চোখে সব কিছুই বর্জনীয়। যেমন আধুনিক ইউরোপ তেমনি উপনিষদের ভারত তেমনি পৌরাণিক ভারত তেমনি আধুনিক ভারত। তাঁদের গ্রহণযোগ্য শুধু শরিয়তী রাষ্ট্র। তাঁদের আনুগত্য ভারতের প্রতি নয়, ইসলামের প্রতি। ইংরেজের হাত থেকে ভারত ফিরে পেলে তাঁরা দ্বিতীয় আওরংজেবকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষেক করতেন।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইউরোপ আবিষ্কার তথা আধুনিক আবিষ্কার এই দুই আবিষ্কারের উল্লাসে মুখর। দেখতে দেখতে সাহিত্যে শিল্পে শিক্ষায় সমাজে ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এলো। মনে হলো না যে একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে যা আরো মূল্যবান, যার ক্ষতিপূরণ নেই। শতাব্দীর জমাখরচের হিসাবনিকাশের সময় যখন এলো তখন দেশের চিন্তাশীলদের মধ্যেই মতভেদ লক্ষিত হলো। যাঁদের মধ্যে যুগচেতনা প্রখরতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন সেতুবন্ধ দিয়ে গমনাগমনের ফলে যা লাভ করা গেল তাকেই, সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই। যাঁদের মধ্যে দেশচেতনা বা দেশাত্মবোধ প্রবলতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন যা হারিয়ে গেল বা ভেঙে গেল বা লুট হয়ে গেল তাকেই, সেই বিচ্ছিন্ন আত্মগত ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকে। মুসলমানরাও তাকে তেমন ছিন্নভিন্ন করেনি রেল স্টীমার কলকারখানা যেমন করেছে। এইসব কলকরখানা ইংলণ্ডে অবস্থিত ও এর লভ্যাংশ ইংরেজের ভোগে লাগে। ভারত শুধু কাঁচামাল যোগায় ও তৈরি মাল কিনতে বাধ্য হয়। তার চিরকালের কারুশিল্প বিনষ্ট হয়। দারিদ্র্য ব্যাপক ও গভীর হয়, বুদ্ধির স্বার্থ বিপন্ন হয়। মনের অন্ধকার দূর হলে হবে কী, বাহির অন্ধকার। যার অতীত এত গৌরবময় তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন।

যুগদর্শী চিন্তানায়করা স্বীকার করতেন না যে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পশ্চিমের সঙ্গে তার আদানপ্রদান অনাবশ্যক। তাঁরা বরং আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অভাবটাকেই বড় করে দেখতেন ও তার জন্যে পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধটাকে একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য করতেন। জ্ঞানবিজ্ঞান না হলে ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ হবে না, অপূর্ণ থেকে যাবে, বহু শতাব্দী পেছিয়ে থাকবে। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান যে পশ্চিমের সাহায্য বিনা ভারতের ভিতর থেকেই আপনি উঠে আসবে এটা তাঁরা মেনে নিতে পারতেন না। ভারতকে একলা ছেড়ে দিলে সে যে ইউরোপের মতো জ্ঞানেবিজ্ঞানে আধুনিক হবে এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। পরের কাছে শিখতেই যখন হবে তখন সম্বন্ধ একটা পাতাতে হবেই, তবে সেটা যে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ হবে এমন কোনো কথা নেই, সেটা হবে সমানে সমানে সম্বন্ধ। তার লক্ষণ ইউরোপে দেখা যাচ্ছে। ভারতেও দেখা যাবে। ভারতও স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নয়।

অপরপক্ষে দেশভক্ত মনীষীরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী না করলে তার স্বধর্ম রক্ষা করা যাবে না। পরধর্ম তার পক্ষে ভয়াবহ হবে। জ্ঞানবিজ্ঞান পরের কাছ থেকে পাওয়া গৌরবের কথা নয়। পার্থিব ভোগবিলাস যে চায় না, তার ওসব নিয়ে হবে কী? ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে ভারতেরই দ্বারস্থ হবে বিশ্ব। ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ যদি হারিয়ে যায় তবে বিজ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্য তার কোন্ কাজে লাগবে? যা আছে তাকেই সমস্ত শক্তি দিয়ে সংরক্ষণ কর। যা নেই তার জন্যে উদ্বাহু হতে যেয়ো না। ভারতের যা

আছে আর কারো তা নেই। দৃষ্টিকে দেশের উপর সন্নিবদ্ধ কর। দেশের বর্তমান থেকে যে রেখাটি ধরে দেশের অতীতে যাওয়া যায় সেই রেখাটি ধর। দেশ থেকে যে রেখাটা ধরে পশ্চিমে যাওয়া যায় সে রেখাটা ছাড়ো। আধুনিকতার মোহ কাটাও। আধুনিক তো চিরন্তন নয়, সেও পুরাতন হবে। দু'দিনের দম্ভ দু'দিন পরে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত।" আধুনিক ইউরোপেরও আদি অবসান আছে। সনাতন হচ্ছে ভারত। তার নেই আদি অবসান। পরাধীনতা দূর করাই আপাতত একমাত্র কর্তব্য। স্বাধীন ভারত বিচ্ছিন্ন হবে কিনা এখন থেকে ভাবতে হবে না। বাইরে থেকে বড়জোর বিজ্ঞানকে নিতে পারে, আর সব তার আছে।

সব মানুষের অগ্রগতির যদি একটাই পন্থা থাকে তবে মানতে হবে যে ইউরোপ এগিয়ে রয়েছে, ভারত পেছিয়ে রয়েছে, সঙ্গ রাখতে হলে পিছু নিতে হবে, ধরে ফেলতে হবে, ছাড়িয়ে যেতে হবে। জাপান যা করতে চেষ্টা করেছে। স্বাধীন হয়ে থাকলে ভারতও বোধ হয় তাই করত। তা করলে কিন্তু স্বীকার করা হতো যে সব মানুষের জন্যে একই রাস্তা। সব মানুষের একটাই সভ্যতা। একটাই বিজ্ঞান। একটাই বিজ্ঞানদৃষ্ট রিয়ালিটি। একটাই ন্যায়অন্যায়বোধ। সাহিত্যে ও আর্টে একটাই বিশ্বজনীন বাণী। এইখানে দেখা দিল মতবিরোধ। আবিষ্কারের ঘোর কেটে গেছে। ইউরোপকে বা আধুনিককে দেখে পরম বিস্ময় জাগছে না। প্রতিদিন তার বর্বরতার সংবাদ চোখে পড়ছে, তার স্বার্থপরতার আঁচ গায়ে লাগছে। যেসব কারণে গ্রীস রোম বিলীন হলো, সেইসব কারণে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাও অধঃপাতে যাবে। তা হলে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া কেন? পথ এক নয়, পথ একাধিক। ভারতের পথ আধ্যাত্মিকতার। ভারত সে পথে এগিয়ে রয়েছে, ইউরোপ রয়েছে পেছিয়ে। পাল্লা দিতে হয় ভারতের পিছু পিছু ইউরোপই দেবে।

পথ এক নয়, পথ দুই। ক্রমেই এ ধারণা দৃঢ়মূল হতে থাকে। পরাধীনতার বেদনায় এ ধারণা জাত হলো বললে সবটা বলা হয় না। জাপান তো পরাধীন হয়নি। সেখানেও এর অনুরূপ দেখা গেল ওকাকুরার রচনায় ও কার্যকলাপে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্টের সংক্রমণ থেকে তিনি তাঁর দেশজ শিল্পাদর্শ সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজি এসে জাপানের সৌন্দর্য নাশ করছে দেখে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে তিনি বুদ্ধের দেশের শরণ নেন। সৌন্দর্যের ঐতিহ্যগত আদর্শে ভারত, চীন ও জাপান একপন্থী, কারণ সে আদর্শ প্রকৃতির অনুকৃতি নয়, চিত্তের গভীরতর স্তরে তার ভিত্তি। প্রাচ্যের সৌন্দর্যসাধনা অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওকাকুরার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠতা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। এই কবি যে একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেন তা কবিও জানতেন না, ওকাকুরাও না। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি কর্ণগোচর হবার অল্পদিন পরে ওকাকুরার দেহান্ত হয়।

তাঁর দেশ তাঁর কথা শুনলে না। ইউরোপের পথের পথিক হলো। সংসারের বিনিময়ে আত্মাকে হারালো। তাই তিনি ভগ্নহৃদয়ে অকালে শেষনিঃশ্বাস ফেলেন। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মতোই জাপানকে সাবধান করে দেন। ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে অপ্রিয় হন। ন্যাশনালিজম জাপানের বা ভারতের স্বধর্ম নয়। তবু উভয় দেশেই প্রবল। তাই এদেশেও তিনি অপ্রিয় হন।

এর মধ্যে একটু ভুল বোঝা ছিল। আধুনিক যুগে পড়বার আগে ইটালীও জাপানের ও ভারতের মতো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাস করত। সাধারণভাবে ইউরোপও তাই। রেনেসাঁস না ঘটলে, পরে শিল্পবিপ্লব না ঘটলে সে বিশ্বাস এখনো তেমনি থাকত। প্রভেদটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানসাধনার। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়। স্বধর্ম ও পরধর্ম এরূপ ক্ষেত্রে কেমন করে দেশানুসারী হবে?

শুধু ভারতে নয় বা জাপানে নয়, সব দেশেই দুটো বোঝাপড়া একসঙ্গে চলেছিল। একটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, আর একটা স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের। দৈনন্দিন জীবনে একটার থেকে আরেকটা পৃথক করা শক্ত। রেলগাড়ী বিদেশ থেকে আমদানী, তার থেকে লোকে ধরে নিল ওটা বিদেশী বা পশ্চিমী। আসলে ওটা একেলে। দেড়শ' বছর আগে কোনো দেশেই ওর অস্তিত্ব ছিল না। বিলেতেও বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি প্রথমে বিরাগ জাগিয়েছে। লোকে যন্ত্র ভেঙে দিয়েছে। রেনেসাঁসের একাধিক কারণের একটা হলো মুদ্রাযন্ত্র। সেটার উপরেও বহু লোক ক্ষিপ্ত হয়েছে। মনে করেছে ওটা নিছক মন্দ। "ভালো" "মন্দ" এই দুটি কথা নৈতিক বিচার থেকে ঐতিহাসিক বিচারে সম্প্রসারিত হলে কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বা অভিনবত্বই তার নাগাল এড়ায় না। আস্ত একটা যুগকেই "মন্দ" বলে সন্দেহ হয় ও সন্দেহ হলেই বিনাবিচারে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। আদিকালের ইতিহাস আমরা জানিনে। জানলে হয়তো এটাও জানা যেতো যে সেকালের লোক গোরুর গাড়ীকেও "মন্দ" বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল।

"ভালো" আর "মন্দ", "শাদা" আর "কালো", "স্বধর্ম" আর "পরধর্ম", "আধ্যাত্মিক" আর "জড়বাদী" এসব গণনা ইতিহাস ভূগোলের উপর বা দেশকালের উপর চাপালে তার পরিণাম হয় যা গ্রহণযোগ্য তার বহিষ্কার বা বর্জন। এবং যা পরিবর্তনযোগ্য বা পরিত্যাজ্য তার সংরক্ষণ। যেসব দেশ অতি পুরাতন বা দীর্ঘকাল হতে বিচ্ছিন্ন সেসব দেশে বহিরাগত ও নূতনের প্রতি একটা মারমুখো ভাব মজ্জাগত। সেদেশের মানুষ সিদ্ধান্ত করে বসে আছে যে ঘরে যা আছে তাই ভালো, আর বাইরে থেকে যা আসে তাই মন্দ। আগে থেকে যা আছে তাই স্বধর্ম, পরে যা এলো তাই পরধর্ম। এখানে যুগের পিণ্ড চাপানো হয় বিদেশের উপরে। অতীত সম্বন্ধে মানুষের একটা মোহ আছে। তার সবটাই সুন্দর। যেটা যত প্রাচীন সেটা তত সুন্দর। সে কখনো মন্দ হতে পারে না, অপূর্ণ হতে পারে না। তাকে পরিবর্তন করতে

হাত ওঠে না। মানুষের এই আসক্তি প্রকৃতির মধ্যে নেই। সে নির্মম হস্তে ভালো মন্দ সব ভেঙে ফেলে। সব আবার গড়ে তোলে। তার স্বধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তা নিত্য ভাঙা নিত্য গড়া। নিত্য মাজা নিত্য ঘষা। নিত্য ধরা নিত্য ছাড়া। তার মধ্যে একটা কন্‌টিনিউইটি আছে। কিন্তু সেটা তার নিজের প্রবহমানতা। সেটুকু বাদ দিলে আর সব জিনিসের বেলা ডিস্‌-কন্‌টিনিউইটি। পূর্ণচ্ছেদ। কত সভ্যতা গেল আর এলো। এলো আর গেল। আধ্যাত্মিক হলেও কি রক্ষা আছে, যদি না নিত্য ভাঙে নিত্য গড়ে? নিত্য মাজে নিত্য ঘষে? নিত্য ধরে নিত্য ছাড়ে? নিত্য ভাবে নিত্য বিচার করে? নিত্য শোধরায় নিত্য বদলায়? অনুসন্ধান করলে জানা যাবে ভারতও তাই করে এতকাল বেঁচে আছে। কিন্তু কোনো অবস্থায় আত্মাকে হারানো চলবে না। আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

ঊনবিংশ শতকের স্বর্ণলঙ্কার বাস করেও রাস্‌কিন, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার প্রভৃতি অনেক মনীষীর মনে সন্দেহ জেগেছে ইংলণ্ড ঠিক পথে চলেছে না ভুল পথে। তেমনি বিশাল ও বলবান রুশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও আভিজাত্য ভোগ করেও টলসটয়ের সন্দেহ জেগেছে ততঃ কিম্। এঁরা এক একজন এক একটা নির্ণয়ে উপনীত হয়ে এক একটা পথ নির্দেশ করেছেন। এমনি একটা পথ নির্দেশ করেন কার্ল মার্কস। সে পথ তাঁর নিজের দেশ নেয় না। নেয় তাঁর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য এক দেশ। রাশিয়া। এতদিনে আরো অনেক দেশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে আছে চীন। সেই যার ঐতিহ্যের ভিত্তি ছিল নৈতিক। দেখা যাচ্ছে নৈতিক বা জড়বাদী, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, ভালো বা মন্দ কোনো বিশেষণই এক্ষেত্রে খাটে না। ঐতিহাসিক ভবিতব্য বলে একটা তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ মানুষের মন অধিকার করেছে। স্বয়ং ইতিহাস নাকি একটা পথ নির্দেশ করেছে। সে পথ নাকি একটাই পথ। সব দেশের সব মানুষের জন্যে। কেউ যদি তা না মানে তবে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে। সেটাও নাকি ইতিহাসের নির্দেশ। ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে নেই। আছে নীতিশাস্ত্রে। নীতিসম্মত পথ নির্দেশ করেছেন গান্ধী। সেই পথটাও শুধু একটি দেশের জন্যে নয়, সব দেশের জন্যে। কিন্তু কেউ যদি তা না মানে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে না। দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। মহৎ দৃষ্টান্ত।

উপরে যে পথগুলোর ইঙ্গিত দেওয়া হলো সেগুলো এক একটি দেশে নিবদ্ধ নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং জাপানের শুধু একটিমাত্র পথ বা ভারতের কেবল একটিমাত্র পন্থা এ ধরনের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায়ই শোনা যেতো। প্রায়ই অপর কোনো দেশের উপর নজর রেখে। দুটো দেশ যেন দুটো বিপরীত মেরু। আকাশ আর পাতাল যেমন বিপরীত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলে যায়। দেশ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু

"ভালো" আর "মন্দ" বাঁটোয়ারা হয়নি। "শাদা" আর "কালো" গায়ের চামড়ায় থাকতে পারে, মনের বা চরিত্রের গঠনে নেই। "স্বধর্ম" আর "পরধর্ম" ব্যক্তির জীবনে সত্য হতে পারে, জাতির জীবনে অথথা। "আধ্যাত্মিক" ও "জড়বাদী" এখন কোনো দেশেরই গায়ে বসে না।

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রামমোহন প্রবর্তিত নতুন ঐতিহ্যে মানুষ। যুগপৎ যুগসচেতন তথা দেশসচেতন। এর মধ্যে স্ববিরোধিতা অনুভব করেননি। অকুণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ হস্তে দেশের কাছ থেকে, বাম হস্তে যুগের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। বর্জনের কথা উঠলে দেশের দেবদেবী ও সাকার আরাধনা ত্যাগ করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবিয়ানা পরিহার। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ ওঠে। সেটাও একটা বাইরের ঢেউ। নেপোলিয়নের পায়ের তলায় জাতীয়তার ঢেউ ওঠে যে দেশেই তিনি যান—ইটালীতে জার্মানীতে রাশিয়ায়। তেমনি ওঠে ব্রিটানিয়ার পদতলে। গর্বিত গৌরবময় দেশ ইটালী জার্মানী রাশিয়া। পরাজয়ের বা পরাধীনতার উত্তর দিল জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়ে। ভেবে দেখল না যে সেটাও হলো নেপোলিয়নেরই নৈতিক জয়। তেমনি ভারতবর্ষেও দেখা দেয় জাতীয়তাবাদ। ব্রিটিশশাসনের উত্তরে গর্বিত গৌরবময় দেশের পৌরুষের অঙ্গীকার। ইংরেজী শিক্ষাই ছিল তার মূলে। যদিও তার মন্ত্র লেখা হলো সংস্কৃতে তথা বাংলায়।

বিরোধ পরিহার করা গেল না। গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল চাইলেই মিলবে স্বাধিকার। এমন ইংরেজও ছিলেন যাঁরা ভারতের পক্ষে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের হাতে কামধেনু পড়েছে। বশিষ্ঠকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দেবেন, তা কি হয়? দেশের মনোভাব দিন দিন বিরূপ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অবিচলিত থাকতে পারেন না। একটু একটু করে দেশচেতনায় আচ্ছন্ন হন। দেশের অতীতের অভিমুখে যে রেখাটি গেছে সেই রেখা ধরে চলেন। পশ্চিমের অভিমুখী রেখাটি—আধুনিকের অভিমুখী রেখাটি—একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও গৌণ হয়ে যায়। অতীত বলতে দেশের লোক বোঝে পৌরাণিক অতীত। ছবি আঁকতে বসলে পুরাণ থেকেই শিল্পীরা সৃষ্টির প্রেরণা পায় বেশী। তাছাড়া অত বড় একটা মধ্যযুগকে ডিঙিয়ে যাবেই বা কী করে? বেদ উপনিষদ্ যতখানি সুদূর, রামায়ণ মহাভারত ততখানি নয়। রামায়ণ মহাভারত যতটা সুদূর, ভাগবত বা চণ্ডী ততটা নয়। মানুষ দেশকেও "দশপ্রহরণধারিণী" দেবীমূর্তি বলে বন্দনা করতে ভালোবাসে। সে যে মাতৃমূর্তি। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে হিন্দুসমাজ থেকে যাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন তাঁদেরি একজনকেই দেখা গেল বঙ্গমাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। স্বদেশী আন্দোলন সাকারবাদী আন্দোলন হয়ে উঠল। মধ্যযুগ ফিরে এলো। আধুনিক যুগ হলো রাজনীতিনিবদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্র যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের উপায় পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির উদ্বোধন।

স্বদেশী যুগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হয়েছিলেন। স্বাদেশিক শিক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশ পৌরাণিক

সাকারবাদী স্বদেশ নয়। তাঁর কাছে ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন নয়। ধর্ম তাঁর কাছে সব কিছুর ঊর্ধ্বে। জাতীয়তাবাদের খাতিরেও তিনি অধর্ম করবেন না। দেশের স্বাধীনতার জন্যেও খুন ডাকাতী সমর্থন করবেন না। অন্ধ কুসংস্কারকে মুক্তি আন্দোলনের মিত্র করতেও তাঁর আপত্তি। মিত্রই কপট শত্রু। অন্ধতা থেকেই পরাধীনতা এসেছে। অন্ধতার মধ্যে প্রবেশ করলে স্বাধীনতা আসবে কোন্ মায়াবলে? রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর প্রোগ্রাম গঠনকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতার বুনিয়াদ মজবুৎ করা। আবেদন আর নিবেদন নয়, বয়কট আর বোমা নয়, নিরলস সংগঠন ও সেবা। সেই উপায়ে দেশকে আপনার করে নেওয়াই দেশজয়। অবশেষে অপসরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে মনে করল পুলিশের ভয়ে শান্তিনিকেতনে গা-ঢাকা দিলেন। ধীরে ধীরে যুগচেতনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিলেন। সে যুগ স্বদেশী যুগ নয়, আধুনিক যুগ। তার সঙ্গে আড়ি করে পূর্ণভাবে বাঁচা যায় না। ইংরেজের সঙ্গে আড়ি করেও অগ্রসর হওয়া যায় না। "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।"

স্বদেশী যুগের অবসানে রবীন্দ্রনাথের মন যখন তৈরি হলো, তখন তিনি হলেন আবার পশ্চিম অভিমুখের যাত্রী। বাইশ বছর বাদে। এবার ইউরোপকে —সেই সূত্রে বিশ্বকে—তাঁর কিছু দেবার ছিল। সে দেওয়া তাঁর দেশের হয়ে। তাতে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগেরও অন্তঃসার। উপনিষদের তথা বাউল বৈষ্ণব কবিরপন্থের বাণী। পুরাণের নয়। এই বাইশ বছরে তাঁর নিজেরও উপলব্ধি জমেছিল। একজন আধুনিক কবিসাধকের। কিন্তু তিনি শুধু দিতে যাননি। নিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। জাতীয়তার অভিমান তাঁকে উদাসীন বা অগ্রহিষ্ণু করেনি। দিতে হলে নিতে হয়। নিতে না পারলে দিতে পারা যায় না। আদানপ্রদানেই তাঁর বিশ্বাস। "দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে।"—এই তাঁর আদর্শ। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হলো মেলা আর মেলানো। পরাধীনতা বা সাম্রাজ্যবাদ একে উলটে দিতে পারে না। তিনি কিপলিং নন যে বলবেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। দুই কখনো মিলবে না।" তবে কিপলিং তার সঙ্গে এটুকুও জুড়ে দিয়েছিলেন যে, "পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও যদি আসে তবু তারা মিলবে, যখন দুই বলবান পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়াবে।"

শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁর "যাত্রার পূর্বপত্র" রচনা করেন। তাতে বলেন, "য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া আমরা যদি সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?"

"য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাঁহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে। বিশ্বজগতেও আমরা

কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না? বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিক-তাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।"

এই রচনারই এক জায়গায় আছে, "আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে। এ কথা শুনিলেই দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির—য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরেই কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না—যেমন করিয়াই হউক আগুন ধরাইতেই হইবে। আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহেই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকেই খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।"

দেশে দেশে অমিল যেমন আছে মিলও তেমনি আছে। প্রথম পরিচয়ে অমিলটাই বেশী করে নজরে পড়ে, কিন্তু নিকট পরিচয়ে মিলটা আরো বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আর দেশে দেশে অমিলের কথা অত বেশী শোনা যায় না, যত বেশী শোনা যায় মতবাদে মতবাদে অমিলের কথা। আমেরিকাতেও কমিউনিস্ট আছে, রাশিয়াতেও ডেমোক্রাট আছে। যে যার সুযোগের অপেক্ষায় গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ন্যাশনালিজম এখন আর উৎকট আত্মস্বার্থবাদ নয়।

এক দেশ অপর দেশকে অনেক সময় বিনা শর্তে সাহায্য করছে। যেহেতু সে অবিকশিত। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছতে অনেক দিন লেগে গেল, অনেক সংঘাতের ভিতর দিয়ে আসতে হলো। সংঘাত ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বেলা নেশনে নেশনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলা কতকটা নেশনে নেশনে, কতকটা মতবাদে মতবাদে। এক দিক থেকে ওটা জার্মানীর সঙ্গে তার উভয় পার্শ্বের প্রতিবেশীদের রণ। আরেক দিক থেকে ওটা নাৎসী ফাসিস্ট মতবাদের সঙ্গে তার বিরুদ্ধমতবাদী কমিউনিস্ট তথা ডেমোক্রোটদের দ্বৈরথ। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যেই তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। মতবাদগুলোরও আর সে ধার নেই। এখন আর সেগুলোকে খ্রীসিস অ্যান্টিথীসিসের মতো লাগে না। মনে হয় একটা আরেকটার বিপরীত নয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই ঘোড়া যেমন বাজী রেখে দৌড়য়। একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে গিয়েই হারিয়ে দেবে, গুঁড়িয়ে দিয়ে নয়। সেইজন্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যত গর্জাচ্ছে তত বর্ষাচ্ছে না। পরমাণবিক বোমার ভয়ে নিবৃত্ত রয়েছে এটা অর্ধসত্য। নিবৃত্তি আসছে ভিতর থেকে। গণতন্ত্রী দেশগুলিতেও পাবলিক সেকটর হয়েছে এবং বাড়তে লেগেছে। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে যে পিছুটান দেখা দিয়েছিল সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর মন্থর হয়। কেবল ধর্মমিশ্রিত রাজনীতিতেই একটা স্বপথে ফিরে চলার ধ্যান ছিল। চরকা খাদিকে যদি অর্থনীতি বলা হয় তবে অর্থনীতিক্ষেত্রেও। কিন্তু দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে স্থাপত্যে স্বদেশের চেয়ে স্বকালের দিকে টান বাড়ে। কখনো প্রকাশ্যভাবে, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে। ক্লাসিকাল সঙ্গীতে ও নৃত্যেও আধুনিক রুচি ও রং লাগে। আধুনিক না বলে পাশ্চাত্য বললেও ভুল হয় না। পশ্চিমের উপর বিরাগটা রাজনীতিনিপুণদের মধ্যেই প্রকট। সাধারণ লোক তো বিদেশী ফিল্ম বলতে অজ্ঞান। তেমনি বিলিতী খেলা দেখতে পাগল। বিরোধটা একদা মনে হয়েছিল সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার। পরে মনে হলো নেশনের সঙ্গে নেশনের। পরিশেষে বোঝা গেল পলিসির সঙ্গে পলিসির। ওরা যুদ্ধ চায়, আমরা যুদ্ধ চাইনে, যদি না সিদ্ধান্তটা নিজের দায়িত্বে নিতে দেওয়া হয়। এতদিনে সেটা স্বীকৃত হয়েছে। এরই নাম স্বরাজের অন্তঃসার।

কিন্তু মানুষের জীবন থেকে ধর্মের অন্তঃসার বা নীতির অন্তঃসার যদি উবে যায়, তাহলে অন্ধ জাতীয়তাবাদের মতো অন্ধ প্রগতিবাদও মানুষের দুর্গতির হেতু হবে। সে প্রগতি অধোগতি। তার থেকে উদ্ধার জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে হবে না, হবে কয়েকটি চিরন্তন সূত্রে বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ফলে। সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায় অনাধুনিক হয়ে যায়নি। প্রগতির সঙ্গেও এদের অনাত্মীয়তা নেই। রেনেসাঁস শুধু এই কথাই বলার অধিকার দাবী করেছে যে প্রকৃতির তথা মানুষের জীবনধারা বহু বিচিত্র ও বড় জটিল। বাবাজীরা তাকে যেমন দোরঙা ও সরল ঠাওরান তেমন সে নয়। রেনেসাঁস সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায়কে মধ্যযুগীয় বলে খারিজ করেনি।

আধুনিক সভ্যতা যদি নীতির ও ধর্মের শাঁসকেও খোসার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয়, তাহলে তারও শাঁস বলতে বিশেষ কিছু থাকবে না। গণতন্ত্র বা শ্রেণী-সাম্য অতি মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু এহো বাহ্য। আগে কহো আর। বিশ্বজনীন চিরন্তন স্থিতিকেন্দ্র আছে, গতিই সব নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে "সভ্যতার সঙ্কট" লিখেছিলেন। "পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্কট" লেখেননি। কারণ পূর্ব-পশ্চিমের দ্বৈত ততদিনে তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এককালে যেমন আমাদের রেলস্টেশনগুলোতে হিন্দু জল ও মুসলমান জল ছিল, এখন নেই, তেমনি এক কালে কবিগুরুর মনেও পূর্ব-পশ্চিমের ভেদবুদ্ধি ছিল, শেষে থাকে না। এর সূচনা খোঁজ করলে পাওয়া যাবে "গোরা"তেই। তাতে যে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার জাত নেই, 'বিচার' নেই, ঘৃণা নেই। সে শুধু কল্যাণের প্রতিমা। সে ভেদবুদ্ধিকে প্রেম দিয়ে অতিক্রম করেছে। যেমন আনন্দময়ী রূপে তেমনি সুচরিতা রূপে। আরো পরে আরো পরিণত হয় তাঁর অভেদবুদ্ধি।

"I have no hesitation in saying that those who are gifted with the moral power of love and vision of spiritual unity, who have the least feeling of enmity against aliens, and the sympathetic insight to place themselves in the position of others, will be the fittest to take their permanent place in the age that is lying before us, and those who are constantly developing their instinct of fight and intolerance of aliens will be eliminated. For this is the problem before us, and we have to prove our humanity by solving it through the help of our higher nature. The gigantic organizations for hurting others and warding off their blows, for making money by dragging others back, will not help us. On the contrary, by their crushing weight, their enormous cost and their deadening effect upon living humanity, they will seriously impede our freedom in the larger life of a higher civilization." (*Nationalism in India*, lecture delivered in America in 1916, published in the book *Nationalism*.)

"ঘরে বাইরে"র সমসাময়িক যে ইংরেজী বক্তৃতার থেকে উদ্ধার করা হলো তার শেষাংশের "উন্নততর সভ্যতা" ভারতীয় বা পাশ্চাত্য নয়, মানবিক। "আমরা" সেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষ। বক্তা ভারতীয়, শ্রোতা মার্কিন। আর যেসব মূল নীতির উল্লেখ করা হলো সেগুলি যে কোনো ধর্মশাস্ত্রের বা নীতিশাস্ত্রের নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের উদ্দেশেও বলেছেন, ১৯১৬ সালে যা বলেছেন তা আজকের উদ্দেশেও বলা। আজকের রাশিয়াকে আমেরিকাকে ইংলণ্ডকে ফ্রান্সকেও বলা।

বেঁচে থাকলে কবিগুরু আবার সেইসব কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

বর্জন তাকেই করতে হবে যা মূলনীতিবিরুদ্ধ, যা অমানবিক, যা হৃদয়-হীন ও অসাড় করে, যা বৃহত্তর জীবনের মুক্তি ব্যাহত করে। তা পাশ্চাত্য বলে নয়, আধুনিক বলে নয়। পাশ্চাত্য বলেই বা আধুনিক বলেই কোনো জিনিস বর্জন করার কথা ওঠে না। তেমনি কিছু গ্রহণ করব কিনা সেটা নির্ভর করে তার গ্রহণযোগ্যতার উপরে। তার প্রাচীনত্বের উপরেও নয়। তার ভারতীয়ত্বের উপরেও নয়। তবে ভারত তার আত্মাকে হারাবে না, আত্মাকে দুর্বল হতে দেবে না, আত্মস্থ হবে।

পরাধীনতা থাকলেই তার গ্লানি থাকে। তার দরুন জ্বালা থাকে। পরাধীনতা মন্দ। মন্দের অন্ত চাই। তার জন্যে সংগ্রাম করাই জগতের নিয়ম। কিন্তু পৃথিবীতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভালোও থাকে। এমন কিছুও থাকে যা ভালোমন্দের দ্বারা বিশেষিত বা নিঃশেষিত নয়। সেইজন্যে মন্দকে অগ্রাহ্য করতে গিয়ে সমগ্র রিয়ালিটিকে অস্বীকার করতে নেই। ভারত পরাধীন হলো, পতিত হলো, নিরন্ন হলো, ভগ্নমনোবল হলো, চারিত্র্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু এই সব নয়। ভারত একরাষ্ট্র হলো, বহির্জগৎ হতে অবিচ্ছিন্ন হলো, আধুনিক যুগে পদার্পণ করল, আলোকিত হলো, অগ্রসর হলো, বিকশিত হলো, নবজাত হলো, পুনঃসংস্কৃত হলো। ভারতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, সে চ্যালেঞ্জের উত্তরে ভারত তার আত্মাকে না হারিয়ে নির্মোকমুক্ত হলো, নবকলেবর ধারণ করল। পরাজয়সত্ত্বেও সে অপরাজিত।

এত কিছু কি সম্ভব হতো যদি ইংরেজ শুধু শত্রুতা করত? রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাকে শত্রুজ্ঞান করেননি, যদিও তার দুষ্কৃতির সমর্থনও করেননি। তার কাছে আবেদন-নিবেদনও করেননি। তাঁর দৃষ্টি ইংরেজকে ছাড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের উপর পড়েছিল। রোমান্টিসিজম ও লিবারল মতবাদের উপর পড়েছিল। তিনিও সেই মুক্ত স্রোতের মীন ছিলেন। বাংলার বদ্ধজলার মাছ হলে স্বাধীনভাবে বাড়তে ও সাঁতার কাটতে পারতেন না। ভারত সরোবরের মৎস্য হলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হতো, বৃদ্ধি ব্যাহত হতো। এখন যে বহু শতাব্দীর পরে স্রোত ফিরে এসেছে এটা বহির্বিশ্বের সঙ্গে খাল কেটে সংযোগ ঘটানোর ফলে। স্বাধীনতা তাকে উদ্দাম করেছে।

(১৯৬১)

রবীন্দ্রনাথ কি ইউরোপীয়

(১)

(শ্রীদিলীপ রায়কে লিখিত)

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর অল্পকথায় দিতে চেষ্টা করছি।

বুদ্ধদেববাবুর যুক্তিটা হলো এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'রোমান্টিক'। 'রোমান্টিকতা' হচ্ছে ইউরোপের বিশিষ্টতা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন 'ইউরোপীয়'।

রবীন্দ্রনাথ যে 'রোমান্টিক' এটা স্বয়ং কবিগুরুই কবুল করেছেন। কিন্তু 'রোমান্টিকতা' যে ইউরোপের বিশিষ্টতা এটা কোনো ইউরোপীয় সমালোচকই স্বীকার করবেন না এবং এই কারণে রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় কবিপরম্পরায় স্থান দেবেন না। হোমার, ভার্জিল, দান্তে প্রমুখ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা 'রোমান্টিক' ধারার কবি নন, 'ক্লাসিকাল' ধারার কবি। 'রোমান্টিক' বললেই 'ক্লাসিকাল'-এর কথা ওঠে। যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে 'লিবারল' বললেই 'কনসারভেটিভের' কথা ওঠে। আজকের দিনের ইউরোপেও 'ক্লাসিকালে'র পক্ষপাতী ও 'রোমান্টিকে'র বিরোধী লেখক আছেন। এঁরা কি কম ইউরোপীয় ?

'রোমান্টিকে'র সূত্রপাত এলিজাবেথের যুগে। পরবর্তী যুগে 'রোমান্টিকতা'র হাওয়া পড়ে যায়। আবার ওঠে ফরাসী বিপ্লবের ঠিক পূর্বে ও পরে। আবার পড়ে যায়। 'ইউরোপীয় শিক্ষার' প্রবর্তনের পর বাংলাদেশেও 'রোমান্টিকতা'র হাওয়া আসে। মাইকেল মধুসূদনই প্রথম 'রোমান্টিক'। তিনি তো অশনে-বসনে ও বিবাহেও ইউরোপীয় ছিলেন। এ হাওয়া এখানে পড়ে যায়নি। কিন্তু খোদ ইউরোপে এখন 'রোমান্টিকতা'র পড়ন্ত দশা। মানুষ স্থিতি খুঁজছে, 'ক্লাসিকালে'র মধ্যে স্থিতির ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ কি কেবল 'রোমান্টিক' ? তিনি ভারতীয় 'ক্লাসিকাল' ঐতিহ্যের কবিপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত কবি। যদিও প্রকৃতিগতভাবে ও যুগধর্মের টানে শেলী কীটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ টেনিসন ব্রাউনিং-এর সমানধর্মা।

শান্তিনিকেতন,
১৪ আগস্ট, ১৯৬১

(২)

(শ্রীদিলীপ রায়কে লিখিত)

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার দীর্ঘ পত্র পেয়েছি। এখন আপনাকে খুলে বলতে পারি যে আপনার পোস্টকার্ডখানির উত্তরে আমি অনেকগুলি পোস্টকার্ড ও ইনল্যান্ড

লেটার লিখে নষ্ট করে তার পরে পোস্টকার্ড লিখে ডাকে দিই। তার পরেও চেয়েছিলুম আবার একখানা পোস্টকার্ড লিখে সংশোধন করতে। যেখানে যেখানে "ক্লাসিকাল" লিখেছি সেখানে সেখানে "ক্লাসিক" বসিয়ে দিতে। অভিধানে দেখলুম দুই সমার্থক হতে পারে। আবার ভিন্নার্থকও হতে পারে।

আরো চিন্তা করেছি। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে কাব্য-বিচারের পদ্ধতি ছিল কবিতাকে রস অনুসারে চিহ্নিত করা। "এটি বীর-রসাত্মক।" "এটি করুণ রসাত্মক।" "এটি আদি রসাত্মক।" মাইকেলের কাব্যকেও সেই পদ্ধতিতে বিচার করা হতো। তিনি বীররসাত্মক কাব্য রচনা করেছিলেন। করুণ রসও ছিল তার স্থলে স্থলে। শৃঙ্গার রসাত্মক "পত্র কবিতা"ও লিখেছিলেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে দিব্যি মিলে যাচ্ছিল।

কাব্য বিচারের এই যে সনাতন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে একদা রবীন্দ্র-কবিতারও বিচার হতো। কিন্তু এতে তাঁর কবিতার প্রতি সুবিচার হতো না। পদ্ধতিটা যে অপ্রযোজ্য এ জ্ঞান বিচারকদের ছিল না। অনেক কাল পরে পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। নতুন কালের সমালোচকরা বুঝতে পারেন যে এ সব কবিতা পাশ্চাত্য রোমান্টিক ভাবের। ভাষা শৈলী বিষয় উপাদান সমস্তই প্রাচ্য। কিন্তু ধারাটা পাশ্চাত্য। মেজাজটা রোমান্টিক।

বাংলাভাষার সাহিত্যিক চণ্ডীমণ্ডপ তাঁকে অপাঙ্‌ক্তেয় করার কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু পরবর্তী যুগের কবিরা এক ধার থেকে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। আর Nobel Prize তাঁর শিরে Laurel পরিয়ে দেয়। সারা দেশ সেই গৌরবের প্রতিফলনে গৌরবান্বিত হয়। এই যে "reflected glory" এ তো আজ প্রত্যেকটি বাঙালীর প্রধান সম্বল। সরস্বতী পূজার মতো গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী হচ্ছে এই "প্রতিফলিত গৌরবের" প্রেরণায়। নইলে কবিকে বোঝে ক'জন ? সমর্থন করে ক'জন ? বরাবরই একদল আছেন তাঁরা রবীন্দ্রদ্বেষী। এখন ছদ্মবেশ পরেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ যদি বলে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথই বাংলাভাষায় প্রথম ইউরোপীয় সাহিত্য লেখেন তার মানে আর কিছু নয় এই যে, তাঁর কবিতাই পাশ্চাত্য কাব্যবিচারে প্রথম রোমান্টিক ভাবের কবিতা। আমি এ বিষয়ে একমত নই। আমার মতে মাইকেলই প্রথম পাশ্চাত্য ধারার রোমান্টিক কবি বাংলা সাহিত্যে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য রোমান্টিক বললে আরেক দফা অবিচার হয়। তিনি ভারতীয় ক্লাসিক ঐতিহ্যের কবিপরম্পরা-ভুক্ত। ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির মণিমালার মণি। তিনি বাঙালীরই ঘরের ছেলে। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর আসন আছে, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁর স্থান নেই।

আপনি আমাকে "খুবই গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত" বলেছেন। ছিলুম যৌবনে তাই। পরে তাঁকে অন্যান্য সাহিত্যের কবিদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। তার ফলে আমার ধারণার বহু রদবদল হয়। সৌন্দর্যবোধ, জীবনবোধ, ধর্মবোধ ইত্যাদিতে আমি তাঁর খুবই কাছাকাছি। কিন্তু আরো কাছাকাছি আমি

uninhibited, বেপরোয়া, অ-সম্ভ্রান্ত, un-respectable দেশী ও বিদেশী কবিদের। তাঁর 'আভিজাত্য' তাঁকে মেরেছে, আমাকেও মারবে তাঁর মতো 'অভিজাত' যদি হতে যাই। * * *

শান্তিনিকেতন,
২৪ আগস্ট, ১৯৬১

(৩)

(শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যকে লিখিত)

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। দিলীপবাবুকে আরো একখানা চিঠি লিখেছি, দেখতে পারেন। আমি এই বিতণ্ডায় কোনো পক্ষেই যোগ দিতে চাইনে। শুধু এইটুকু বলি যে বুদ্ধদেববাবুকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবারিত ও অকুণ্ঠিত সুযোগ যেন দেওয়া হয়। তিনি লেখনীচালনায় সিদ্ধহস্ত। নিশ্চয় নিজের কেস্ নিজে প্রমাণ করতে পারবেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের উপর আধুনিক ইউরোপ তার প্রকাণ্ড ছায়া ফেলেছে। কিন্তু এর কতখানি বিশিষ্টভাবে ইউরোপীয় ও কতটা নির্বিশেষভাবে universal তা বিচারসাপেক্ষ। অনেক সময় আমরা universalকেও পাশ্চাত্য ভেবে বর্জন করতে যাই। রামমোহন তা করেননি, রামমোহনের আধ্যাত্মিক বংশধর রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। বিশিষ্টভাবে ইউরোপীয় বললে হোমার ভার্জিল দান্তে পেত্রার্কার সঙ্গে ধারা মেলাতে হয়। ইউরোপীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় একমাত্র মাইকেলেরই ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছিল বলে মনে হয় না। আর সকলের মতো তিনি ঐ শেকস্‌পীয়ার থেকেই শুরু করেছিলেন। তার মানে ক্লাসিক থেকে নয়, রোমান্টিক থেকে। রোমান্টিক মার্গের পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। স্বভাবেও তিনি ছিলেন রোমান্টিক। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ কতকটা universal, বাকীটা oriental. ইউরোপীয়রা তাঁকে ইউরোপীয় বলে চিনতে পারেনি। কারণ তাঁর পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল পটভূমিকা নেই।

শান্তিনিকেতন,
২৬ আগস্ট, ১৯৬১

পুনশ্চ : বিলেত না গিয়ে যেমন সাহেব হওয়া যায় না তেমনি গ্রীক ল্যাটিন সাহিত্য না পড়ে ইউরোপীয় হওয়া যায় না। তবে আধুনিক হওয়া যায়। রোমান্টিক হওয়া যায়।

(৪)

(শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যকে লিখিত)

প্রীতিভাজনেষু,

একটু আগে আপনাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখেছি। এটা তার পুনশ্চের পুনশ্চ।

অনেক সময় আমরা কালের পিণ্ড দেশের ঘাড়ে চাপাই। 'আধুনিক' একটা কালবাচক শব্দ। 'ইউরোপীয়' একটা দেশবাচক শব্দ। ইউরোপীয় শিল্পীরা আধুনিক। রামকিঙ্করও আধুনিক। অতএব রামকিঙ্কর ইউরোপীয়। এটা লজিকের মতো শুনতে, কিন্তু লজিক যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বলবেন এটা একটা ফ্যালাসী। ইউরোপীয় কবিরা আধুনিক। রবীন্দ্রনাথও আধুনিক। অতএব রবীন্দ্রনাথও ইউরোপীয়। এটাও সেইরকম একটা ফ্যালাসী। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে আঁকা ছবিগুলো modernist art-এর নিদর্শন। ইউরোপীয় আর্টের নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল পূর্ব পশ্চিমের সেতুবন্ধন। তিনি অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য পরস্পর মিলিত হবে, এইটেই আধুনিক যুগের কৃত্য। এই মিলনে যাঁরা বাধা দেবেন তাঁরা দেশভক্ত হলেও ভ্রান্ত। এইজন্যে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গেও একমত হতে পারেননি। পাশ্চাত্য বলতে কিন্তু তিনি আধুনিক পাশ্চাত্যকেই বুঝতেন, গ্রীক রোম বা মধ্যযুগের ইতালীকে নয়। সুতরাং তাঁর আসল ঝোঁকটা ছিল আধুনিকতার উপরে। আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক দর্শন, আধুনিক আর্ট ইত্যাদির উপর। অপরপক্ষে প্রাচ্য বলতে তিনি যাকে বুঝতেন সে প্রাচীন বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের, পুরাণ বাদ দিয়ে মধ্যযুগের। এক old bottle থেকে old wine ও আরেক old bottle থেকে new wine নিয়ে একত্র করলে যা হয়। শেষ বয়সে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ঐ cocktail-এর নাম synthesis নয়।

শান্তিনিকেতন,
২৭ আগস্ট, ১৯৬১

চায়ের পেয়ালায় তুফান

(শ্রীশান্তিকুমার মিত্রকে লিখিত)

প্রীতিভাজনেষু,

রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু যা লিখেছেন তা নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান বয়ে যাচ্ছে লক্ষ করেছি। কিন্তু এই বিতণ্ডায় আমাকে কেন অংশ নিতে হবে তার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি। সেইজন্যে চিঠিপত্রের উত্তরে চিঠিপত্র লিখেছি, প্রবন্ধ লিখিনি।

কিন্তু আপনাকে অত সহজে এড়াতে পারলুম না। বুদ্ধদেববাবুর প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখে নাম রাখলুম "পাশ্চাত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ"। শেষ মুহূর্তে স্থির করলুম যে ওটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করতে দেব। তাঁদের জন্যে অন্য একটি প্রবন্ধ লেখার সময় নেই। এর জন্যে আমি আপনার কাছে মার্জনা চাই।

যেসব কথা আমার ওই প্রবন্ধে বলা হয়নি সেসব কথা এই চিঠিতে ব্যক্ত করছি। প্রথম কথা হলো, আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রতিদিন নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আমাদের এই মূল্যবান স্বাধীনতার প্রয়োগ করছি। এর অপপ্রয়োগও যে না হচ্ছে তা নয়। খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখায়, আইনসভার বক্তৃতায় আমরা মাঝে মাঝে এর অপপ্রয়োগ করে থাকি। এটা এক এক সময় অনর্থ ডেকে আনছেও। তা বলে কেউ কি এই স্বাধীনতা প্রত্যাহার করার বা একে সঙ্কুচিত করার পক্ষে মত দেন? না। এ স্বাধীনতা বহু সাধনায় বহু ত্যাগে বহু আত্মোৎসর্গের ফলে লাভ করা গেছে। একে রক্ষা করতেই হবে, তাই এর অপপ্রয়োগ দেখলে ধৈর্য ধরতে হবে। রাম যদি অন্যায় কিছু লিখে থাকেন শ্যাম প্রতিবাদ করতে পারেন। প্রতিবাদের স্বাধীনতা তো কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়ে এমন কিছু করা চলবে না যার ফলে লেখক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বলবেন, "আমাকে স্বাধীনভাবে লিখতে দিচ্ছে কে? আমি আর লিখব না।"

দ্বিতীয় কথা, মানুষমাত্রেরই "good faith" বা সদ্ অভিপ্রায় মেনে নেওয়া উচিত। রাম যা লিখেছেন তা যদি শ্যামের মনঃপূত না হয় শ্যাম আর যাই বলুন এমন কথা যেন না বলেন যে রাম লোকটা "good faith" বর্জিত বা রামের একটা কোনো মতলব আছে বা রাম আর কারো কথায় লিখেছেন। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের লেখকরা আমরা কেউ দুর্মুখদের জিহ্বা থেকে নিরাপদ নই। অথচ আমরাই আমাদেরি মতো একজন লেখকের বিরুদ্ধে অন্যায় রটনা করি, অনুতাপ করিনে, লজ্জিত হইনে, ক্ষমা প্রার্থনা করিনে। মনে করি খুব একটা বাহাদুরি করলুম। পরে যে ও-জিনিস বুমেরাং হয়ে নিজেরি গায়ে ফিরে আসবে এ বোধ নেই। এর একমাত্র প্রতিকার অপরের "গুড ফেথ" বিনাবাক্যে মেনে নেওয়া। হয়তো এমন লেখক আছেন যাঁর অভিসন্ধি ভালো নয়। কিন্তু সে বিচার বিধাতা করবেন বা আদালত করবে। মহাকাল তো করবেই।

উপরে যে দুটি কথা বলা হলো সে দুটি আমাকে বহু দুঃখে উচ্চারণ করতে হলো। কারণ আমিও ভুক্তভোগী। আমার ধারণা ছিল, আমি ত্রিশ বছর কাল অক্লান্ত সাহিত্যসাধনা করে অন্তত এটুকু প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছি যে লোকে আমাকে স্বাধীনভাবে লিখতে দেবে ও হাজার প্রতিবাদ করলেও অভিসন্ধি আরোপ করবে না। সে মোহ আমার আর নেই। মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমি শিখেছি, যেখানকার নিয়ম হচ্ছে খালি অনুমতিযোগ্য

বিষয়ে বা ভাবে লেখা সেখানে লেখা বন্ধ করাই শ্রেয়। রাজনীতি নিয়ে লিখতে এমনিতেই আমার বিতৃষ্ণা। তবু মাঝে মাঝে দুটো একটা প্রবন্ধ লিখতুম। এখন তাও বন্ধ করে দিয়েছি। আর আমি শুনতে চাইনে যে, আমি জবাহরলালের মন যোগানোর জন্যে লিখেছি বা সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারের উপর নজর রেখে লিখেছি। সবচেয়ে আফসোসের কথা—আমার বন্ধুজনের রসনা এই রটনায় লিপ্ত।

এখন বুদ্ধদেববাবুর পালা। এর পরে কার পালা আসে কে জানে? দেশের লেখকরা যদি মৌনব্রত নেন তাহলে সাহিত্যের কী হবে সাহিত্যই জানে। কিন্তু এই দূষিত হাওয়া বদলাতেই হবে। কেউ কিছু ভালোমন্দ লিখলেই অমনি সে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায় না। হতে পারে, তার ভুল হয়েছে বা সে অহংকারী। কিন্তু একজন বাঙালীকে আরেকজন বাঙালী "ট্রেটর" বলবে না "মিথ্যাবাদী" বলবে এটা দেশসুদ্ধ বাঙালীর ধিক্কারযোগ্য। কারণ এতে দেশসুদ্ধ বাঙালীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত। আজ যাঁরা এ সত্য উপলব্ধি করছেন না কাল তাঁরা উপলব্ধি করবেন। এমনি করেই ইউরোপে ফাসিজম্ অনুপ্রবেশ করে। পশ্চিমের একজন বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে আমি একটুও একমত নই। কিন্তু আপনার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব।" গণতন্ত্র এমনি করেই গড়ে উঠেছে। কেবল সংবিধানের জোরে নয়। জনমতকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে অপ্রিয় ভাষণের দরুন কেউ নির্যাতিত না হয়। অপ্রিয় ভাষণ অনেক সময় অসত্য ভাষণের মতো লাগে। পরে হয়তো দেখা যায় যে তার মধ্যেও সত্য আছে। সময় দিলে সত্য অসত্য আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সময় দেওয়া চাই, সহ্য করা চাই।

বুদ্ধদেববাবুর প্রবন্ধ পড়ে আমি বিস্তর চিন্তা করেছি। উড়িয়ে দেবার মতো বাক্য তাতে গুটিকয়েক আছে বইকি। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য নিয়ে ভাবা দরকার। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভিতরে একজন ইউরোপীয় ছিলেন, সেই ইউরোপীয়টি জাতীয়তার চাপে সাহিত্যে প্রকাশ পাননি, শেষে প্রকাশিত হন চিত্রকর্মে। বুদ্ধদেববাবুর ঐকান্তিক রবীন্দ্রভক্তি আমাকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর মতো রবীন্দ্রচর্চা আমিও করিনি। আমার যদি কোনো যোগ্যতা থাকে সেটা রবীন্দ্রজ্ঞ হিসাবে নয়, সেটা ইউরোপফের্তা হিসাবে। সেও তো ত্রিশ বছর হলো তামাদি। আর ছবিও আমি ভালো বুঝিনে। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে এতদিন আমার মনে হয়েছিল তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা প্রাগৈতিহাসিক, যা অবচেতন স্তর থেকে উদ্গত। রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের কবিতার মধ্যেও অবচেতনের আভাস স্থলে স্থলে পেয়েছি। সুতরাং চিত্রকর্ম ও কবিকৃতি পরস্পরকে এই দিক দিয়ে সমর্থন করেছে, আরো অনেকে এটা লক্ষ করেছেন।

তা বলে বুদ্ধদেববাবুর স্বাধীন মত এক কথায় খারিজ করে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব যে বহুমুখী তা তো আমরা সকলেই জানি। অমন

একটি ব্যক্তিত্ব যদি সারাজীবন সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেও প্রকাশহীনতার বেদনায় চিত্রকলার আশ্রয় নেয় তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে এমন কিছু ছিল যার উপযুক্ত মাধ্যম সাহিত্য নয়, চিত্রকলা। সেই এমন কিছু যে কী তা আমরা কেউ নিশ্চিতভাবে জানিনে। ওই যে বলেছি প্রাগৈতিহাসিক বা অবচেতন ওটাও একটি অনুমান। ও নিয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। গ্যেটে সম্বন্ধে কথিত আছে তাঁর ভিতরেও এইরূপ একটা কিছু ছিল। তাকে বলা হতো গ্রীক ভাষায় ডাইমন। তার থেকে হয়েছে ইংরেজীতে ডীমন। কিন্তু প্রথমটা ভালো অর্থে, দ্বিতীয়টা খারাপ অর্থে। অনেকে গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে থাকেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও এক ডাইমন ছিল। তাকে বাংলা করলে দানবের মতো শোনাবে। ইংরেজী করলে ডীমনের মতো। তার চেয়ে বুদ্ধদেববাবুর "য়োরোপীয়" খুব এমন কী আপত্তিকর? শব্দটা তিনি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেননি। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একমত নন। তা তো গোড়াতেই বলেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও তো কেউ কেউ ইউরোপীয় বলে থাকেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় বলাটা চমকপ্রদ হলেও সম্মানহানিকর নয়। আপত্তি যাঁরা করেছেন তাঁরা এর বদলে ততটা ক্ষুব্ধ নন যতটা বুদ্ধদেববাবুর আর এক পা এগিয়ে গিয়ে আর একটি উক্তির জন্যে। কবি নাকি লোকভয়ে তাঁর ইউরোপীয় অন্তঃকরণটিকে আড়ালে রেখেছিলেন, শেষে ধরা পড়ে যান ছবি আঁকতে গিয়ে। অর্থাৎ তিনি দায়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন ইউরোপীয়। ধরা পড়ে প্রকাশ্য ইউরোপীয়।

শঙ্করাচার্যের মতো প্রচণ্ড বৈদান্তিক ভারতবর্ষে আর জন্মাননি। তর্কের দ্বারা বৌদ্ধদের তিনি কোণঠাসা করেছিলেন। অথচ সেই শঙ্করকেই বলা হয়ে থাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। কারণ যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশ্য সংগ্রাম তার সঙ্গেই তাঁর নিগূঢ় একাত্মতা। ইতিহাসে এ রকম আরো দেখা গেছে, মনস্তত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা আছে। যে যার সঙ্গে লড়াই করে সে দিনরাত তারই কথা ভাবতে ভাবতে তারই মতো হয়ে যায়। ইংরেজের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমরাও ইংরেজের মতো হয়ে গেছি। এতে আমাদের মোটের উপর ভালোই হয়েছে। পাকিস্তানীদের সঙ্গে লড়তে গেলে আমরাও পাকিস্তানীদের মতো হয়ে যেতুম, তাতে মোটের উপর মন্দই হতো। গীতায় একটি শ্লোক আছে, হাতের কাছে সেটি পাচ্ছিনে। তাতে এই ধরনের কথা আছে। যার কথা যে দিনরাত ভাবে তার মতো সেও হয়ে যায়।

শঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ যাঁরা বলেন তাঁরা তাঁকে সম্মানই করেন। তার মধ্যে কপটাচারের ইঙ্গিত নেই। তেমনি বুদ্ধদেববাবুও রবীন্দ্রনাথকে কপটতার অপবাদ দেননি। একবার স্বর্গীয় শচীন্দ্র মজুমদার আমাকে লিখেছিলেন যে তাঁর বিখ্যাত তান্ত্রিক বন্ধুর মতে রবীন্দ্রনাথও ভিতরে ভিতরে তান্ত্রিক। এর নাকি যথেষ্ট প্রমাণ আছে কবির রচনায়। আমি হেসে উড়িয়ে দিই। তেমনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কত লোক যে কত কী আবিষ্কার করেছেন তার লেখাজোখা

নেই। তাঁর এতগুলো পরিচয় আমাদের কারো চোখে পড়েনি। সুতরাং এসব পরিচয় প্রকাশ্য নয়, প্রচ্ছন্ন। তিনি নিজেই তো বলে গেছেন, "যে আমি স্বপন মূরতি গোপনচারী···সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে?" তবু তাঁকে ধরতে চেষ্টা করেছেন তান্ত্রিক, পৌত্তলিক, রামকৃষ্ণশিষ্য, বোদলেয়ারভক্ত, রিয়ালিস্ট, বিদ্রোহী, কেরানী, ন্যাশনালিস্ট, কমিউনিস্ট, "য়োরোপীয়"।

আর একটি কথা। শতবার্ষিকীর বছরটা কোনো দেশেই কারো বেলাতেই নিছক জ্ঞাবকতার জন্যে নয়। সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে হবেই। প্রতি দিন, প্রতি মাসে, প্রতি বছর। এই একটা বছরই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? এই একজন মহাপুরুষের বেলাতেই বা কেন ব্যতিক্রম হবে? টলস্টয় সম্বন্ধে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেসব পড়লে শিউরে উঠতে হয়। তা বলে কি তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে অনুষ্ঠিত অর্ধশত-বার্ষিকীতে সেসব তথ্য ধামাচাপা দেওয়া সমীচীন হতো? টলস্টয় এত মহান আর এমন বিশ্বজনীন যে তাঁর সম্বন্ধে ভালোমন্দ যা কিছু জানা গেছে সমস্তই তাৎপর্যপূর্ণ। হলোই বা কলঙ্ককর। রক্তমাংস হাড়গোড় বাদ দিয়ে টলস্টয়ের আত্মা নিয়ে আধুনিক মানব সন্তুষ্ট নয়। মহামানবের মধ্যে যদি মহাদানব থেকে থাকে তবে সেটাও জানা দরকার। মহাদানবের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম না করে মহামানব হওয়া যায় না, টলস্টয়ের জীবনে এটা সত্য হয়ে থাকলে অন্যান্য মহামানবদের বেলাতেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং খোলা মন দিয়ে গবেষণা করতে হবে। শতবার্ষিকীর পরেও তো শত শত বর্ষ আছে। বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবেই।

শতবার্ষিকীর দোহাই দিয়ে কাউকে নিরস্ত করা উচিত নয়। করলে নতুন সত্যের আবিষ্কার বাধা পাবে। নানা মুনির নানা মত শুনতে শুনতেই সত্যের জন্যে মন তৈরি হয়। অনেক সময় বিপরীতের সঙ্গে বিপরীতের ঠোকাঠুকিতেই আলো জ্বলে।

বুদ্ধদেববাবুকে নিরস্ত করলে নতুন সত্য আবিষ্কৃত হবে না। আমি তাঁকে উৎসাহ দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁকেও আমার নিবেদন যে তিনি যেন "আমি বলছি"-র উপর জোর না দিয়ে "কী বলছি"-র উপর জোর দেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রাজ্যে "আমি বলছি"-র দাম আছে। আমার চোখে পড়েছে, আমার কানে এসেছে, এখানে "আমার" কথাটির ওজন আছে। কিন্তু "আমি বলছি" বলে লাল ফুল নীল হয়ে যায় না, গঙ্গা নদী যমুনা হয়ে যায় না, বাঙালী কবি ইউরোপীয় হয়ে যান না, তাঁর ইউরোপীয়ত্ব প্রচ্ছন্ন থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। এখানে "আমি বলছি" তেমন ওজনদার নয়। কারণ এটা হলো ব্যক্তিনির্বিশেষ বিষয়ানুগ সত্যের রাজ্য। ব্যক্তিগত ধারণাকে এক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্বিশেষ বিষয়ানুগ সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

শান্তিনিকেতন,
৯ই আশ্বিন, ১৩৬৮

ভারতীয় সংহতি

(শ্রীসাগরময় ঘোষকে লিখিত)

তোমার বাসনা ভারতীয় সংহতি নিয়ে কিছুদিন হলো যে আলোচনা চলছে আমি তাতে যোগ দিই ও তার উপর একটি প্রবন্ধ লিখি। বিষয়টা পুরোপুরি রাজনীতিঘটিত নয়। কিন্তু রাজনীতিবর্জিতও নয়। লিখতে গিয়ে রাজনীতি এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। অথচ আমি এদিকে মনস্থির করে ফেলেছি যে রাজনীতি নিয়ে আর একটি কথাও নয়। যে কাজ আমি হাতে নিয়েছি তা আমি যদি সমাপন না করি তবে আর কেউ করবে না। সুতরাং সেইটেই আমার করণীয়। রাজনীতির জন্যে মেলাই লোক আছে।

তবে গোটাকয়েক "ফাণ্ডামেণ্টাল" তোমার জন্যে লিপিবদ্ধ করি। এর মধ্যে যদি রাজনীতির গন্ধ থাকে তাহলে আমি নিরুপায়।

আমি একাই একটা মহাভারত লিখে যেতে পারি বা মহাকীর্তি রেখে যেতে পারি, কিন্তু আমার মতো একাকী শিল্পীর হাতে মহাভারত গড়ে উঠবে না। এই মহান দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমবেত সাধনার উপর। এ জগন্নাথের রথ বহুতর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে দেশসুদ্ধ মানুষ যদি একসঙ্গে হাত লাগায়। আমি যদি তা দেখে মুগ্ধ হই তাহলে আমি আর সব ফেলে তাকেই অবলম্বন করে মহাকাব্য বা মহাকাহিনী লিখব। সেও অমর হবে, আমিও অমর হবো। আমি আমার গান্ধীবাদী বন্ধুদের বলি, তোমরা আমার কাছে প্রচারকার্য চেয়ো না। তোমরা যদি বীরত্বের পরিচয় দাও তাহলে আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোমাদের কীর্তিগাথা গান করব, কিন্তু মিশনারী হব না। ওটা যেমন তোমাদের স্বধর্ম, এটা তেমনি আমার স্বধর্ম।

যা বলছিলুম, সমবেত সাধনা করবে চল্লিশ কোটি ভারতসন্তান। তবেই এ দেশ আবার মহাভারত হবে। কেউ না কেউ তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নতুন মহাভারত লিখবেন। হয়তো বিশ ত্রিশ বছর পরে। গান্ধীজী থাকতে আমারও ছিল সেরকম উচ্চাভিলাষ। তাঁর মৃত্যু ও মৃত্যুর পূর্বে ও পরে যেসব বীভৎস ও মর্মভেদী ঘটনা ঘটে তা দেখে আমি আমার সে উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করি। কোথায় সমবেত সাধনা? হিন্দু একদিকে চলে তো মুসলমান আরেক দিকে। এমন করে কি জগন্নাথের রথের দড়ি টানতে হয়? মনকে বহু কষ্টে বোঝালুম যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চেয়ে দেশবিভাজনই ভালো। কুরুক্ষেত্র বাধলেও দেশ দু'ভাগ হয়ে যেতো। কারণ আমাদের গায়ে এত জোর ছিল না যে নিখিল ভারত জয় করে নিতুম। কী আর করি, ভাঙা ভারতেরই নাম রাখলুম নিখিল ভারত।

এই যে আমাদের নিখিল ভারত এটা বস্তুত নিখিল ভারত নয়, ঊনভারত। অথচ একেই অবলম্বন করে আমরা আমাদের আদর্শকে রূপায়িত করব। অবশিষ্টের জন্যে অপেক্ষা করব না। তাকে আহ্বান করব না। বাধ্য করব না। খোসামোদ করব না। তোয়াজ করব না। কিন্তু তার জন্যে দ্বার খুলে

রাখব বারো মাস চব্বিশ ঘণ্টা মা যেমন বসে থাকে দ্বার খোলা রেখে কখন তার নিরুদ্দেশ ছেলে ফিরবে। আমরা আমাদের আদর্শকে বিনাশর্তে রূপায়িত করে যাব। ওদের যদি কোনো আদর্শ থাকে ওরাও করুক। কেউ কাউকে বাধা না দিলেই হলো। ইতিহাস বিচার করবে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল। হতে পারে দুটোই ঠিক। দু'পক্ষে যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে তার থেকেই মঙ্গল হবে দু'পক্ষের। এমন কি একপক্ষে যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে তার থেকেও। এই একতরফা ভালোবাসা ছিল রবীন্দ্রনাথের, ছিল গান্ধীজীর। তিনি তো এর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিলেন। আছে জবাহরলালের। নইলে এতদিনে যুদ্ধ বেধে গিয়ে থাকত। দস্তুরমতো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। এই তিন মহাপুরুষের কাছে আমাদের ঋণের ইয়ত্তা নেই। শুনেছি পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে দু'খানি ফোটোগ্রাফ থাকে। একখানি কায়দে আজমের। একখানি রবীন্দ্রনাথের। সেদিন একজন পাকিস্তানী লেখিকা এসেছিলেন, তাঁর কাছে শোনা। তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা তো ভারতীয়ও নও, হিন্দুও নও। তোমাদের ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথের ফোটো কেন?" ওরা উত্তর দিল, "উনি আমাদের লোক।"

এঁরা তিনজনেই মূর্তিমান ভারত। দেশ দুভাগ হয়েছে বলে শোক করব না, যদি এঁদের আদর্শ অন্তত একটি ভগ্নাংশেও রূপায়িত হয়। ছোট একটি রাজ্যেও যদি হয় তা হলেও আমি জানব যে এই ল্যাবরেটরিতে যে পরীক্ষা সফল হয়েছে সর্বত্র তা সফল হবে। কিন্তু কেমন করে বলি যে পশ্চিমবঙ্গে সফল হয়েছে। না, এখানেও হয়নি। বন্দুক দিয়ে মেরে বা জেলখানায় পুরে সায়েস্তা করলে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাই নিয়ে স্মরণীয় কাহিনী বা কবিতা লিখে যেতে পারি? অমর করে দেবার মতো যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা শচীন মিত্রের ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মদান। অবশ্য বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান গোপনে পরস্পরের প্রাণরক্ষা ও মানরক্ষা করেছেন। কাগজে নাম দেননি। কাগজওয়ালাদের তাতে লাভও নেই। আমি যা জানি তা প্রকাশ করব না।

যে ভারত সত্যি বড় সে স্বপ্রকাশ। হৃদয় আর মন যখন বড় হবে তখন ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হবে। এখনো যদি তা লেখবার সময় না হয়ে থাকে তবে তার কারণ এখনো আমাদের দেশের লোক সমবেত সাধনার মূল্য বোঝে না। হিন্দু ভাবে সে তার প্রতিবেশী মুসলমানকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে আপনি প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হবে ও একার চেষ্টায় এই পশ্চাৎপদ দেশকে রাশিয়া বা আমেরিকার মতো অগ্রসর করে দেবে। এটা মহাভারত হবার পন্থা নয়, এটা উপভারত হবার এঁদো গলি। "ওরা আমাদের মারবে। আমরা ওদের ছেড়ে দেব?" এ যুক্তি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। ওরা যদি মেরেই থাকে তবে আইন আছে, আদালত আছে, জেলখানা আছে, ফাঁসীকাঠ আছে। কিন্তু এমন ভাব দেখানো হয় যেন সেসব কিছুই নেই, আছে শুধু জনতার হিংসা। সে হিংসা একজনের অপরাধে একশ'

জনের সর্বনাশ করে, পরে হয়তো জানা যায় সেই একজনও অপরাধ করেনি বা করে থাকলে তার গায়ে আঁচ লাগেনি। ভুগেছে যারা নিরপরাধ। এখন কে এর প্রায়শ্চিত্ত করবে? সাহস করে সাক্ষী দেবে কে? সাজা হবে ক'টা লোকের? সে কটাও তো বলতে পারে, দেখে নেব কেমন করে ভোট পাও।

গণতন্ত্রের গণেশ পাকিস্তানে উলটেছে। ভারতেও ওলটাতে পারে যদি সাধারণ লোকের মতিগতি পাকিস্তানের চেয়ে উন্নত না হয়। গণতন্ত্রের পত্তন হয়েছে জনগণের জন্যেই। তারা যদি রাখতে না জানে তবে গণতন্ত্র যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবে। ভারতে ও-জিনিস বিবর্তিত হয়নি, প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতে ওটা পরীক্ষাধীন। যেমন ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে। জনগণ যদি নিজের দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের গণতন্ত্র দু'চোখের দুটি মণির মতো রক্ষা করতে চায় তাহলে কথায় কথায় মানুষ মারা ও ঘর পোড়ানো ছেড়ে এমন কিছু করুক যাতে অন্যায়ের প্রতিকার হয়, অথচ পাল্টা অন্যায় না ঘটে। এ যা দেখছি তা গণতন্ত্রের উপর অনাস্থার প্রস্তাব পাশ। এটা আইনসভায় ভোটের জোরে হচ্ছে না, হচ্ছে একপক্ষের লাঠির জোরে, আরেকপক্ষের দৌড়ের জোরে। লেনিন যাকে বলতেন পা দিয়ে ভোট দেওয়া। অনাস্থার ভোট। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা যখন পালিয়ে এলো তখন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব পা তুলে পাশ করে এলো। রাজনীতিকরা যদি এর মর্ম বুঝতেন তাহলে ওদের পায়ে ধরে মাফ চাইতেন। বলতেন, "অমন করে আমাদের ভোটে হারিয়ে দিয়ে যেয়ো না। আমরা যে ক্ষমতাচ্যুত হব।" হলেন তাঁরা অবশেষে ক্ষমতাচ্যুত। আর ফিরে এলেন না। আসবেন যদি হিন্দুর পায়ের ভোট পান। মুসলমানের হাতের ভোটই যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্রে মেজরিটিই সর্বেসর্বা নয়। মাইনরিটির হাতেই তুরুপের তাস। দেখলে না, জিন্নার দল ঐ তাস খেলে আমাদের পাকা ধানে মই দিল। মাইনরিটির আস্থা পাইনি, পেলে দেশ দু'ভাগ হতো না। শিখ মুসলমান খ্রীস্টান সকলেরই আস্থা পেতে হবে। এটা আমাদেরই গরজ। নইলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

অনেক দিন আগে আমি আমার একখানি বইয়ের উৎসর্গপত্রে ঘোষণা করেছি, "সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ এক ও অবিভাজ্য। সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ অহিংস।"

আজো আমি আমার এই প্রত্যয়ে দৃঢ়। মোদের গরব মোদের আশা এই জনগণ। ওদের উপর যদি বিশ্বাস হারাই তবে গর্ব করবার কী আছে, আশা করবারই বা আছে কী? আমরা জনাকয়েক বুদ্ধিজীবী বড় জোর একটা সাহিত্য গড়ে দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে সাহিত্য প্রাণবান হবে কাদের নিয়ে? সংস্কৃত সাহিত্য অন্ত গেল শুধুমাত্র কয়েকটি রাজসভার বা মঠবাড়ীর বা টোলের ব্যাপার হয়ে। বাংলা সাহিত্যকে প্রাণোচ্ছল করবে বাংলার জনগণ। তথা ভারতের জনগণ। বাংলা সাহিত্য সারা ভারতেরই জনজাগরণের সঙ্গে

যুক্ত হবে। এর ভাষা বাংলা, কিন্তু ভাব ভারতীয়। হিন্দী যেমন সারা ভারতের, বাংলাও তেমনি সারা ভারতের। বাংলা যারা জানে না তারা নিজ নিজ ভাষায় তর্জমা করে নেবে। যেমন নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা। তিনি বাংলায় লিখেছেন ভারতের সাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্য। শুনেছি "গোরা" আজকাল তামিল ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপকভাবে পঠিত হচ্ছে। তারই ভিতর ওরা পাচ্ছে সমস্যার সমাধান। প্রশ্নের উত্তর। আপাতত এই আমাদের মহাভারত।

রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে যা ভেবে গেছেন তা আজো সমান প্রযোজ্য। তোমাকে তাঁর ইংরেজী নিবন্ধের একটুখানি শোনাই—

"India is too vast in its area and too diverse in its races. It is many countries packed in one geographical receptacle. It is just the opposite of what Europe truly is, namely, one country made into many. Thus Europe in its culture and growth has had the advantage of the strength of the many as well as the strength of the one. India, on the contrary, being naturally many, yet adventitiously one, has all along suffered from the looseness of its diversity and the feebleness of its unity. A true unity is like a round globe, it rolls on, carrying its burden easily; but diversity is a many-cornered thing which has to be dragged and pushed with all force. Be it said to the credit of India that this diversity was not her own creation; she has had to accept it as a fact from the beginning of her history." (*Nationalism in India*, a lecture delivered in America in 1916, published in *Nationalism*.)

রবীন্দ্রনাথের ওই বক্তৃতা পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমেরিকায় দেওয়া। আজ কি তাঁর বক্তব্যের সার কথা অসার হয়ে গেছে? তাঁর মতে ভারত একটা দেশ নয়, অনেকগুলো দেশের সমবায়। সেই অনেকগুলি দেশের নাম তুমি পাবে "জনগণমন অধিনায়ক" সঙ্গীতে। এই সমস্ত দেশকে একত্র ও একাত্ম করার অভিপ্রায় ভারতভাগ্যবিধাতার আবহমান কাল থেকে ছিল, তাই সব দেশকে ছাড়িয়ে উঠেছে ভারত নামক একটি সত্তা। তাকেও বলা হয় দেশ। রবীন্দ্রনাথও তার অন্য নামকরণ করেননি। দেশ বলতে কখনো বুঝিয়েছেন বাংলা। কখনো ভারত। "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানে দেশ হচ্ছে ভারত। তার থেকে বোঝবার জো নেই যে ভারত একটা দেশপুঞ্জ, যেমন ইন্দোনেশিয়া একটা দ্বীপপুঞ্জ। কাগজে পত্রে বাংলা একটা দেশ নয়, একটা প্রদেশ। মোগল আমলে ছিল সুবা। আরো আগে একাধিক রাজ্য। ইতিহাসের পরিহাসে আজকেও কতকটা তাই। কিন্তু বাঙালীর মন একে দেশ বলে কল্পনা করেছে। তাই সেই রবীন্দ্রনাথই গান বেঁধেছেন, "আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন

আপনি।" সেদিন যাঁকে তিনি জননী বলেছেন তিনি বঙ্গজননী। যাঁকে উদ্দেশ করে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে। পরে সেই "বন্দে মাতরম্" বাংলাদেশের বাইরেও সমান সমাদর পেয়ে ভারতমাতার বন্দনা-সঙ্গীতে পরিণত হলো।

আমাদের চিন্তায় বরাবরই একটা অস্পষ্টতা ছিল। "দেশ" কথাটার আরো একটা অর্থ ছিল। সেটা সাধারণত বাংলার বাইরে। দেশ বলতে বোঝাত "হিন্দুস্তান" যার আদিবাসী ছিল হিন্দুরা। যেখানে মুসলমানরা নবাগত ও প্রায় বিদেশী বললেও চলে। এ মনোভাব যে কেবল মুসলমানদের মধ্যেই ছিল তা নয়, হিন্দুদের মধ্যেও ছিল। "ভারত" কথাটা হিন্দীতে উর্দুতে অত বেশী ব্যবহার করা হতো না, তাই ওরা ভারতের নামে গান বাঁধত না, বাঁধত হিন্দু-স্থানের নামে। "হিন্দুস্তান হমারা" বা "মেরে সোনেকা হিন্দুস্তান" ছিল ওদের ওদিককার জাতীয় সঙ্গীত। আগেকার দিনে এই শব্দটি মুসলমানদের কারো মনে বিরাগ উদ্রেক করেনি, যেমন আমাদের মনে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া"। পরে কতক মুসলমানের মনে ধারণা জন্মাল যে হিন্দুস্তান হিন্দু নেশনের বাসভূমি, মুসলিম নেশনের বাসভূমি নয়। সুতরাং তাদের জন্যে চাই স্বতন্ত্র একটা বাসভূমি। সেটা হবে তাদের আপনার স্থান। পাকিস্তান বা পবিত্র-স্থান। শব্দ সাধারণত হয়ে থাকে তথ্যানুগ। এক্ষেত্রে দেখা গেল শব্দ পছন্দ হলো না বলে আর-একটি শব্দ বানাতে হলো, তার পর তথ্য বানিয়ে নেওয়া হলো। তথ্য হলো শব্দানুগ। সত্যি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

সেদিন "আমরা বাঙালী" নামক পত্রিকায় আবিষ্কার করে অবাক হই, স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের তৎকালীন নেতারা একটি ইশতাহার প্রকাশ করে দাবী করেছিলেন যে বাঙালী একাই একটি নেশন। 'দি বেঙ্গলী নেশন'। তাহলে দেখা যাচ্ছে তার দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের মার্কিন দেশের বক্তৃতার উৎস কোনখানে। নেশন কথাটা তাঁর ভালো লাগত না। কিন্তু আরো অনেকের ভালোই লাগত। বাঙালীরা একাই একটা নেশন স্বদেশীর যুগে এটা ছিল মানসিক আবহাওয়ার শামিল। অতএব ভারত ছিল বহুসংখ্যক নেশনের সমষ্টি। আমাদের কমিউনিস্ট কমরেডদেরও থীসিস এই। ইতিমধ্যে বদলেছেন কিনা জানিনে, কিন্তু দেশবিভাজনের প্রাক্কালে শুনেছি। মাউণ্ট-ব্যাটেন যেই প্রস্তাব করলেন যে ভারতবর্ষ ভাগ করলে বাংলাকেও ভাগ করতে হবে অমনি স্বয়ং জিন্না সাহেবেরই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "তা কী করে হবে? বাঙালীদের যে ন্যাশনাল বৈশিষ্ট্য আছে।" অর্থাৎ বাঙালী হিন্দু মুসলমান যে একাই একটা নেশন। জিন্না সাহেবও এক সময় কংগ্রেসে ছিলেন, কলকাতা যখন রাজধানী ছিল তখন কলকাতায় প্রায়ই আসতেন, স্বদেশী যুগের বাঙালীকে তিনি চিনতেন। ভারত ভাগ করার সময় তাঁর মনে পড়ে গেল, তাই তো! বাংলা কী করে ভাগ হবে? ও যে একটা নেশনের বাসভূমি। বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথও তাই বলতেন। গান্ধীজীরও আপত্তি ছিল

ওইখানে। ওই কারণে। বাঙালী যে হিন্দু মুসলমাননির্বিশেষে একটা ইউনিট। যদিও ভারত বলে একটা নেশনের অঙ্গ। ভারতও অবিভাজ্য, কিন্তু ভারত অবিভাজ্য হলেও বাংলা অবিভাজ্য। দেখা গেল বাংলাও বিভাজ্য। জনমত রাতারাতি তৈরি হলো। দাবী করল। আদায় করল। নইলে সে যা হতো তা আমেরিকার মতো গৃহযুদ্ধ।

আমি এই গৃহযুদ্ধের অনিবার্যতা উপলব্ধি করি দেশবিভাজনের বেশ কয়েক বছর আগেই। এর জন্যে আমার মনটাকেও তৈরি করেছিলুম। সব দেশে সিভিল ওয়ার হয়েছে, এ দেশেও হবে, এর ভিতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমার হিসাবে একটি বড়গোছের ভুল ছিল। আমি কল্পনা করেছিলুম সৈনিকে সৈনিকে যুদ্ধ। তা তো হলো না। হলো নিরীহ পথচারীর উপর সশস্ত্র গুণ্ডামি। নির্দোষ নারীর উপর পাশবিক আক্রমণ। দেশ তখন হিংসা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত। সৈনিকে সৈনিকে যুদ্ধ বাধলে কি গুণ্ডার গুণ্ডামি থামত, না শতগুণ বাড়ত? এ রকম সিভিল ওয়ার কোন্ দেশে হয়েছে যে এ দেশে হলে আমি সহ্য করতে পারব? ক্ষমতা হস্তান্তর না করে দেশ ভাগ না করে ইংরেজ চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বেধে যেতো সৈনিকে সৈনিকে গৃহযুদ্ধ, সেই সঙ্গে চলত অবাধ গুণ্ডামি, দুই মিলে যা হতো তা এমন ভয়ংকর যে লোকে প্রাণভয়ে পালাত। শরণার্থী সমস্যা মাত্রাতীত হতো। দেশবিভাজনের পরমাণু বোমা দিয়ে সে পৈশাচিক বিরোধ থামিয়ে দিতে হতোই।

যেখানে মনীষীদেরই মন বিভ্রান্ত সেখানে ধর্মান্ধদের কাছে অহিংসা আশা করা বৃথা। এটাও আমার আর-একটা হিসাবের ভুল। মানুষ স্বভাবত হিংস্র প্রাণী নয়। সে মরতেও চায় না, মারতেও চায় না। সে ভালো করেই জানে যে মারামারিতে নামলে মরণের আশঙ্কা আছে। সাধ করে কি কেউ মরতে যায়? তার স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, ক্ষেত আছে, তাঁত আছে। কিন্তু মানুষ যখন পক্ষভুক্ত হয়ে যায়, কোনো মতেই যখন দু'পক্ষের মীমাংসা হয় না, তখন যুদ্ধই হয় শেষ মীমাংসক। লোকে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, তবে হয়ে যাক একটা বল-পরীক্ষা। কে জেতে কে হারে তা দেখা যাক। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মতো সিভিল ওয়ারেরও একই নিয়ম। আর সিভিল ওয়ার যখন বাধে তখন দুই পক্ষের দুই সৈন্যদলকে চালানোর জন্যে দুটো গবর্নমেণ্ট দরকার হয়। আমেরিকায় যখন সিভিল ওয়ার বাধে তখন লিংকনের একটা গবর্নমেণ্ট, জেফারসন ডেভিসের একটা গবর্নমেণ্ট। আমেরিকানরা হিন্দু-মুসলমানের মতোই ভাই ভাই। বরং আরো বেশী করেই ভাই ভাই। কিন্তু চারটি বছর ধরে চলে সেই গৃহযুদ্ধ। দশ লাখ ছেলে যুদ্ধে মরে। সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করে পঞ্চাশ লাখ অথচ সে সময় তাদের মোট জনসংখ্যা ছিল তিন কোটির মতো। এই অনুপাতে রক্তপাত করতে কেই বা এ দেশে প্রস্তুত ছিল বা আছে? হিন্দু মুসলমানে গৃহযুদ্ধ একবার শুরু হলে চার বছরের আগে থামত না, দশ বিশ লাখ না মেরে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছত না। যে হারত তার মন চিরকালের মতো বিষিয়ে রইত। পুরুষানুক্রমে তার জের চলত। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়

হতো ভারতীয় জাতীয়তার বলিদান। কারণ হিন্দু মুসলমান মিলে এক জাতি বা নেশন গঠনের সব আশা বহু শতকের জন্যে নির্মূল হতো।

দেশ বিভাজনের দ্বারা সে আশা নির্মূল হয়নি। যে ভাগটা আমাদের কপালে জুটেছে সেটাতে আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে অবাধে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। ভারতীয়রা এখন একটাই নেশন। ভারত একটাই দেশ। হিন্দু মুসলমান শিখ নির্বিশেষে একটাই নাগরিক অধিকার। আমাদের এটা সেকুলার স্টেট, হিন্দু রাষ্ট্র নয়। যদিও তলে তলে হিন্দু প্রাধান্য রয়েছে এবং তার দরুন শিখরা ক্ষেপছে। এ মনোভাব না শোধরালে শিখদের সঙ্গেও তার দরুন বাধবে। তারপর রবীন্দ্রনাথের ঋষিদৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছিল তার জড় মরেনি। 'দি বেঙ্গলী নেশন' এখনো প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়া করছে। অক্ষম, কিন্তু অনিচ্ছুক নয়। পারলে এক হাত নিত অসমীয়াদের। তেমনি অসমীয়ারাও মনে মনে একটি স্বতন্ত্র জাতি বা নেশন।

বাংলাদেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন চলছিল তখন ওড়িশায় চলছিল আর একটি অনুরূপ আন্দোলন। সেটির লক্ষ্য মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বাংলার অন্তর্গত ওড়িয়াভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্র করে স্বতন্ত্র একটি প্রদেশ গঠন। উৎকল সম্মিলনী ছিল এই আন্দোলনের সূত্রধার। বয়কট ইত্যাদি এর প্রোগ্রামে ছিল না। তাই বাইরে তেমন নামডাক ছিল না। এই আন্দোলনের একটি জাতীয় সঙ্গীতের প্রয়োজন হলো। ততদিনে কবিবর রাধানাথ রায়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর লেখা একটি সংস্কৃত গান ছিল—"সর্বেষাং নো জননী ভারত" বলে তার আরম্ভ। গানটিকে পাল্টে দিয়ে করা হলো "সর্বেষাং নো জননী উৎকল"। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কত সহজে প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ হতে পারে! ভারতজননী কত সহজে প্রদেশজননী হতে পারেন!

আমরা যাকে প্রাদেশিক বলে থাকি তার ভিত্তি যদিও ভাষা তবু তার গভীরতর ভিত্তি হচ্ছে ইতিহাস। ওড়িয়াদের ইতিহাস গৌরবময়। প্রত্যেকটি ওড়িয়া তার জন্যে গর্বিত। সে গর্ব ও সে গৌরব সব ওড়িয়ার সার্বজনীন সম্পদ। তেমনি ওড়িয়া সাহিত্য, ওড়িশী নৃত্য, ওড়িশী গীত, ওড়িশার মন্দিরস্থাপত্য ওড়িয়াদের সকলের প্রিয়। ওড়িয়ারা মনে করে যে তাদের সংস্কৃতি বাংলার থেকে পৃথক, অন্ধ্রের থেকে পৃথক, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের থেকে পৃথক। যদিও বিচ্ছিন্ন নয়। ইউরোপে অবস্থিত হলে ওড়িশাকে বলা হতো একটি দেশ, ওড়িয়াদের বলা হতো একটি নেশন। আমি তো কোনো কারণই দেখিনে কেন বলা হবে না দেশ বা নেশন। এসব শব্দ যদি ইউরোপে সত্য হয় তো ভারতেও সত্য। কারণ এর পিছনে স্বতন্ত্র ইতিহাস, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র চালচলন আচার-ব্যবহার সামাজিক প্রথা। শুধু কি ভাষা? প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক বললে জটিলতাকে সরল করে আনা হয়। সেটা কি সত্যি অত সরল? ওড়িশা সম্বন্ধে যা বললুম অন্ধ্র সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। তামিল সম্বন্ধেও তাই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে এগুলিও এক একটি দেশ।

কিন্তু তাহলে ভারতবর্ষ কী? সেও কি একই নিঃশ্বাসে দেশ হবে? ভারতবর্ষ যদি দেশ হয় তবে মহারাষ্ট্র কী? তার ইতিহাসও এককালে মহা-গৌরবময় ছিল। রাজস্থান কী? গুর্জর কী? কাজেই একটা স্ববিরোধ রয়েছে আমাদের দেশভাবনায় দেশচেতনায়। জননী মানুষের একটিই হয়। দুটি জননী হয় কি? ভারত যদি জননী হয়, বঙ্গ বা উৎকল কেমন করে তা হবে? গুজরাট বা মহারাষ্ট্র যদি জননী হয়, ভারত কেমন করে তা হবে? পলিটিকাল ইন্‌টিগ্রেশন যত সোজা ইমোশনাল ইন্‌টিগ্রেশন তত নয়। ভারত বললে ততখানি প্রেম জাগে না, বাংলা বা তামিলনাড়ু বা কেরল বললে যতখানি।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা কোনো ইউরোপীয় মেনে নেবে না। ইউরোপ কোনো কালেই একটি দেশ ছিল না। নিখিল ইউরোপীয় আনুগত্য কোন দিনই দেখা যায়নি। তবে রোমক সাম্রাজ্য দাবী করেছিল রোমের প্রতি আনুগত্য। সেই আনুগত্য পরে রোমান ক্যাথলিক চার্চ দাবী করে। তারপরে সে আনুগত্য সমান্তরাল হয় হোলি রোমান এম্পায়ারের আবির্ভাবে। চার্চ ও এম্পায়ার মিলেমিশে কাজ করে কিছুকাল। পরে আড়াআড়ি হয়ে যায়। পোপ আর সম্রাট দুজনেরই ইউরোপীয় সংগঠন চূর্ণ হয়। বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন ধর্মের ভিত্তিতে ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষার ভিত্তিতে নেশন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ইউরোপ একটি সভ্যতার নাম। কিন্তু ইমোশন জাগায় না ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নেশনের মতো, দেশের মতো। সম্প্রতি ইউরোপের এক ভাগ রাশিয়ার দিকে ও আরেক ভাগ আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে। জোটবন্দী হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ। নেশনের উপরে নেশন গড়ে উঠেছে। এই প্রোসেসটা যখন শেষ হবে তখন দেখা যাবে ভারতেরই মতো দেশের উপরে দেশ। অর্থাৎ ইংলণ্ডও দেশ, আবার পশ্চিম ইউরোপও দেশ। তার দেরি আছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই সেকেলে নেশন অচল হয়ে আসছে। কোনো নেশনই তার নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারে না, যদি না আর দশটি নেশনের সঙ্গে জোট বাঁধে, অবাধ বাণিজ্য চালায়, সামরিক ব্যয় একই ভাণ্ডার থেকে নেয়। পশ্চিম ইউরোপ যা হতে চাইছে আমরা তা আগেই হয়ে রয়েছি। অগ্রগতি না হয়ে পশ্চাদ্‌গতি হবে, যদি ভবিষ্যতে ভারত রাষ্ট্র বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। সে রকম সম্ভাবনা আজ যদিও নেই তবু তার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। গণতন্ত্র সবাইকে সহজে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তাই কোনো এক অসন্তুষ্ট রাজ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সব তছনছ করে দিতে পারে। তুমি কি সৈন্য পাঠিয়ে তোমার স্বদেশ-বাসীকে গুলী করে মারবে? এব্রাহাম লিংকনের মনোবল জবাহরলাল নেহরুর নেই। তিনি জানেন যে ভারতের অন্তর্গত রাজ্যগুলি আমেরিকার মতো রক্তে এক নয়, ভাবে এক। যেখানে রক্তগত ঐক্য নেই সেখানে সম্মতি নিয়ে শাসন করতে হয়। আবার রবীন্দ্রনাথের সেই রচনার অংশ তুলে দিই—

"Nationalists say, for example, look at Switzerland, where

in spite of race differences, the people have solidified into a nation. Yet, remember that in Switzerland the races can mingle, they can intermarry, because they are of the same blood. In India there is no common birthright."

কী সাংঘাতিক কথা! রবীন্দ্রনাথ এর চাইতেও কড়া কথা বলেছেন সেই বক্তৃতায়। আরো খানিকটা তুলে দেখাই।

"And when we talk of western Nationality we forget that the nations there do not have physical repulsion, one for the other, that we have between different castes. Have we an instance in the whole world where a people who are not allowed to mingle their bloodshed their blood for one another except by coercion or for mercenary purposes? And can we ever hope that these moral barriers against our race amalgamation will not stand in the way of our political unity?"

শুনলে তো? দেশের জন্যে রক্ত দিতে চাইবে কে, যদি রক্তের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণে বাধা থাকে? যারা দেয়, তারা দেয় রাজারাজড়ার চাপে বা পেটের দায়ে। ভারত ইতিহাসের অনেকখানি জুড়ে আছে যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু যুদ্ধে যারা গেছে তারা খুব কম স্থলেই স্বেচ্ছাসৈনিক। যুদ্ধ যাদের পেশা তাদের কথা আলাদা। আমরা স্বাধীন হয়েছি। এ স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু দেশরক্ষার ভার যাদের উপরে তারা কি বিশ্বাস করেছে যে আমরা রক্তের বন্ধনে বাঁধা একজাতি? জাতীয়তাবাদ মানে কি বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি?

জাতি বলতে এ দেশের সাধারণ লোক একটি অর্থই বোঝে। জাতি মানে কাস্ট। সারা ভারতে এমন সর্বজনবোধ্য শব্দ আর একটিও নেই। সব কিছু যদি চুলোয় যায় আর জাত থাকে, তা হলেই আমাদের সাধারণ লোক সন্তুষ্ট। ভাত, কাপড়, ওষুধ, শিক্ষা, জমি, বাড়ি ইত্যাদি এক হাতে আর জাত অন্য হাতে নিয়ে যদি তুমি দাঁড়াও আর ভারতের জনতাকে বেছে নিতে বল ওরা একবাক্যে বলবে, "জাত"। অর্থাৎ রক্তের বন্ধন। রক্তের মিশ্রণ থেকেই জাত। এর অনিবার্য পরিণাম ভেদবুদ্ধি। এ আপদ শিখদের মধ্যে তো আছেই, খ্রীস্টানদের মধ্যেও আছে, মুসলমানদের মধ্যেও ঢুকেছে। কেউ কেউ গর্ব করেন এই নিয়ে যে ভারতের বৈশিষ্ট্য হলো জাত। পরাধীনতার সঙ্গে এর সম্পর্ক তাঁরা দেখতে পান না। জাত বাঁচলেই জাতি বাঁচবে, স্বাধীনতা নাই বা হলো। এই বোধ হয় তাঁদের মনোভাব। জাত এখন রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। অনেক সময় প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। শাসনব্যবস্থা কি ভেঙে পড়বে না একদিন, যদি জাত অনুসারে চাকরি বাঁটোয়ারা হয়? মুসলিম লীগ একভাবে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। অন্যান্য দলগুলি করছে অন্যভাবে। ওটার চেয়েও এটা অন্তর্ঘাতী। "কাস্টিজম" বলে দু'দশবার হাঁকডাক

ছাড়লেই কি এ সমস্যার সমাধান হবে? এতে লিপ্ত না আছে কে? উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত ঐ একই মানসিকতা। ডাকাতরা যেমন পরস্পরকে লুটের ভাগ দেয় এও তো সেই একই পারস্পরিক বন্দোবস্ত। এতে দেশ ভাগ হয়ে যাবে না, কিন্তু ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

দেশ কথাটির যেমন তিন-তিনটে অর্থ, জাতি কথাটার তেমনি চার-চারটে। যখন খুশি এর অর্থ বদলায়। যেন বহুরূপী। সংস্কৃত ভাষা শুনেছি শব্দসম্পদে ধনী। কিন্তু তার প্রমাণ তো পাইনে যখন শুনি "ইংরাজ জাতি ও ভারতীয় জাতি", তারপর একই নিঃশ্বাসে "হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতি", একটু পরে সেই নিঃশ্বাসে "বাঙালী জাতি ও অসমীয়া জাতি" এবং সেই মুখে "ব্রাহ্মণ জাতি ও বৈদ্য জাতি"।

শিক্ষিতরা একই শব্দের চার-চারটে অর্থ বোঝেন, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক তো অত কথা বোঝে না। তারা জাতি বলতে বোঝে ধোপা নাপিত চামার কামার ইত্যাদি জাতি। তারই সঙ্গে মিলিয়ে নেয় যখন শোনে মুসলমানরা একটা জাতি। ইংরেজরা একটা জাতি। পাঞ্জাবীরা একটা জাতি। আমার বাবা শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু এই সংস্কারের ঊর্ধ্বে ছিলেন বলতে পারিনে। ছেলেবেলায় আমাকে একদিন বলেন, "ভারতবর্ষে অসংখ্য জাত আছে। না হয় আর একটা বাড়ল। ইংরেজ যদি এ দেশের লোক হয়ে যায়, এই দেশকে আপনার করে নেয়, তা হলে আর একটা জাত হিসাবে থাকতে পারে। ক্ষতি কী?"

তিনি উদারচরিত। তাই তাঁর চোখে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ যেমন এক-একটি জাত, মুসলমান ও ইংরেজও তেমনি এক-একটি জাত। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মানসেও সেই রকম উদারতা ক্রিয়া করছিল। তাই সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন একই পঙ্‌ক্তি-ভোজনে। সবাইকে দেখলেন একই দৃষ্টিতে। আর্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খ্রীস্টান, ব্রাহ্মণ, পতিত—এদের সবাইকে একসূত্রে বাঁধতে হলে একটিমাত্র শব্দই আছে আমাদের অভিধানে। জাতি। ব্রাহ্মণ যদি সবাকার হাত ধরে তার মানে দাঁড়ায় প্রত্যেকেই 'caste' আর সকলে মিলে 'united castes of India'।

আমাদের জাতীয়তাবাদ ভূমিষ্ঠ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী ন্যাশনালিজমের পারিভাষিক শব্দরূপে। কিন্তু জাতীয়তাও জাতির মতো বহুরূপী। কখনো সে হিন্দু জাতীয়তা, কখনো বাঙালী জাতীয়তা, কখনো ভারতীয় জাতীয়তা এবং আড়ালে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতীয়তা। এটা পশ্চিমে গেলে আরো নির্লজ্জ। দক্ষিণে তো নির্লজ্জতম। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজনীতি ছিল না। এমন কি পেশোয়াদের আমলেও।

এতগুলো জাতীয়তাবাদ একসঙ্গে কাজ করলে জাতীয়তাই বাদ পড়ে যায়। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি তখনি নেশন হবে যখন জাতি বলতে সকলে শুধুমাত্র ভারতীয় জাতিই বুঝবে। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটুকু? আমার তো মনে হয় তার উলটোটাই সম্ভবপর। হিন্দু নেশন মুসলিম নেশনের মতো

বাঙালী নেশন অসমীয়া নেশন ভূমিহার নেশন কৈবর্ত নেশন নিয়ে বিভ্রাট বাধবে। নেশনের ভাষান্তর যদি হয় জাতি তবে জাতির ভাষান্তর হবে নেশন।

আসলে ভারতচেতনা এখনো খুব ব্যাপক তথা গভীর হয়নি। সব চেয়ে যা ব্যাপক তথা গভীর তার নাম হিন্দুচেতনা। বা মুসলিমচেতনা। বা শিখচেতনা। তার চেয়ে কম গভীর তথা কম ব্যাপক, ভারতচেতনার চেয়ে বেশী গভীর তথা বেশী ব্যাপক, বাঙালীচেতনা বা অসমীয়াচেতনা বা মরাঠাচেতনা বা গুজরাটীচেতনা বা তামিলচেতনা বা তেলেগুচেতনা। এই হচ্ছে ভারতরাষ্ট্রের বর্তমান স্বরূপ। একে স্বীকার করে নিয়ে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে অতিক্রম করতে হবে। অতিক্রম করবার অর্থ এ নয় যে আমরা পিতৃপিতামহের ধর্ম ভুলে যাব বা মাতৃমাতামহীর ভাষা ভুলে যাব। না, কখনো তা ভুলব না। তা ভুলে যাবার দরকারও নেই। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এমন কথা বলছে না যে, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। কিংবা সব ভাষা ত্যাগ করে হিন্দী ভাষাকেই বরণ কর। যার যা আছে সে তা রাখবে, তার উন্নতি করবে, কিন্তু ভারতচেতনাকে আরো ব্যাপক তথা আরো গভীর করতে হবে। কয়েক বছর ভারতরাষ্ট্রে বাস করলেই ভারতের নাগরিক হওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের ভারতীয় হতে হলে ভারতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আপনার করতে হবে, তার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। ভারতের ভবিষ্যৎ নেই অথচ বাঙালীর ভবিষ্যৎ আছে, তুমি ভাবতে পারো এ কথা? তুমি পারো না, কিন্তু পারে এমন বাঙালীও আছে আজকের দিনে। এমন তামিলও আছে, এমন অসমীয়াও আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ নেই অথচ হিন্দুর ভবিষ্যৎ আছে এটাও তেমনি অবাস্তব। তবু এমন হিন্দুও আছে যাদের চিন্তা এইরূপ। যে ভারতের স্বপ্ন এরা দেখে সে ভারত যবনহীন বা যেখানে যবন হীন। এর নাম কি ভবিষ্যৎ? না, এর নাম অতীত। যে-অতীত চিরকালের মতো গেছে। যার ফিরে আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কারণ ভারত এতদিনে বহুধর্মী হয়ে গেছে। তেমনি বহুভাষী। প্রত্যেক রাজ্যেই প্রত্যেক ভাষার প্রচলন আছে। আরো বাড়বে। শিল্পবিপ্লব যতই সর্বাত্মক হবে, প্রত্যেকটি রাজ্য হবে কলকারখানায় ভরা। তার প্রত্যেকটিতে জুটবে নানা রাজ্যের শ্রমিক, নানা রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার। বাঙালীতে ছেয়ে যাবে মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজীতে পশ্চিমবঙ্গ।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে প্রকৃতিস্থ হতে হবে। আঘাত পেলেই প্রত্যাঘাত করতে হবে এ নীতি হয়তো বিদেশীর বেলা খাটে, কিন্তু বিধর্মীর বেলা নয়, বিভাষীর বেলা নয়। বিদেশীর বেলা যাতে না খাটে তার জন্যে ইউনাইটেড নেশনস সচেষ্ট। সেখানে একটা বিশ্বচেতনাও কাজ করছে। নইলে কঙ্গোর জন্যে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? হাঁ, বিশ্বচেতনাকেও আরো ব্যাপক তথা আরো গভীর করতে হবে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয়, একেও ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়পদক্ষেপে অতিক্রম করতে হবে। মানবতার খাতিরে।

শান্তিনিকেতন,
৯ই নভেম্বর, ১৯৬১

সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ

কবি যদি আরো দশ বছর বাঁচতেন ও আশি বছর বয়সে না লিখে নব্বই বছর বয়সে তাঁর শেষ জবানবন্দী "সভ্যতার সংকট" লিখতেন তাহলে আর যেই হোক ইংরেজ হতো না তাঁর **"villain of the piece"**. ততদিনে জার্মানরা ষাট লাখ ইহুদী ও সমসংখ্যক পোলকে বালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে গ্যাস দিয়ে দম বন্ধ করে মেরেছে। মার্কিনরা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে গোটা দুই আণবিক বোমা ফেলেই লাখ কয়েক জাপানীকে মুছে ফেলেছে। যারা প্রাণে বেঁচেছে তাদেরও দুর্ভোগের অন্ত নেই। তারা নতুন রকমের ব্যাধিতে ভুগছে। আণবিক বোমা হাতে থাকলে জাপানীরাও যে ইতস্তত করত তা নয়। না থাকতেই তারা যা করেছে তার হিংস্রতা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীন কোনোদিন ভুলবে কিনা সন্দেহ। প্রাচ্য দেশ বলে জাপানের প্রতি কবির যে মমতা ছিল সেটা সেইদিনই লোপ পেতো জাপান যেদিন ভারতবর্ষ আক্রমণ করত। করেনি যে সেটা কবির প্রতি বা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়।

রুশদেশের সোভিয়েট শাসন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মোহ ছিল সেটাও মিলিয়ে যেতো স্টালিনের দুষ্কৃতির কাহিনী খোদ ক্রুশ্চভের জবানীতে শুনে। তবে তার জন্যে তাঁকে আরো বছর পাঁচেক বাঁচতে হতো। আরো দশ বছর বাঁচলে তো চীন সম্বন্ধেও তাঁর মোহভঙ্গ ঘটত। প্রাচ্য এবং প্রাচীন বলে চীন যে কবির মুখ রক্ষা করত তা নয়। ফ্রান্স সম্বন্ধেও তাঁর মনে একটি নরম কোণ ছিল। আহা, ফরাসী বিপ্লবের দেশ যে! কিন্তু আলজেরিয়ায় ফ্রান্স বোধ হয় এই কয় বছরে দেড় লাখ আলজেরীয় হত্যা করেছে। সমগ্র ব্রিটিশ আমলে ইংরেজের হাতে যত ভারতীয় নিহত হয়েছে তাদের সংখ্যা এর সিকিভাগও নয়।

তাহলে কার সম্বন্ধে কবির মোহ থাকত? ভারত সম্বন্ধে? সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশ সালের নরহত্যা, নারীহরণ, লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির জের এখনো মেটেনি। দেশের মাঝখানে প্রাচীর তুলে কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে দু'পক্ষের খুনেদের, লুটেরাদের। একই দেশের দুই পৃথক অংশ এখন পরস্পরের ভয়ে ইংরেজ আমলের তুলনায় বিপুল সৈন্যসমাবেশ করেছে। তাদের এখন জেট বিমানু বিমান পর্যন্ত আছে, যা ইংরেজেরও ছিল না। একপক্ষ যদি কোনো গতিকে আণবিক বোমা যোগাড় করে তো অপর পক্ষও করবে। তৈরি থাকলে বেধে যেতে কতক্ষণ?

যুদ্ধ বাধুক কেউ এটা চায় না, অথচ নিরস্ত্রীকরণের ফলে মন্দা দেখা দিক এটাও কারো ইচ্ছা নয়। মন্দা এড়ানোর উপায় যদি হয় কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন তাতেও পশ্চিমের লোকের আপত্তি। আমাদেরও। আফগানিস্তানের মতো বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাৎপদ হয়ে যদি কোনো সমাধান থাকে তবে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয় একটা মার্গ হয়তো সর্বোদয়, কিন্তু এখনো সেটা ভারতবর্ষেই অপরীক্ষিত। যতদিন না মন্দা নিবারণের উত্তম

উপায় আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়েছে ততদিন লোকে নাচার হয়ে সামরিক প্রস্তুতি সমর্থন করবে। একপক্ষের প্রস্তুতি লক্ষ্য করে অপরপক্ষও প্রস্তুত হবে। কোনো আয়ুধই বাদ দেবে না। তা পরীক্ষা করতে গিয়ে সবাইকে বিপন্ন করবে, নিজেও বিপন্ন হবে। সভ্যতার দোহাই দিলেও শুনবে না। ভগবানের দোহাই তো কবে বাতিল হয়ে গেছে। যীশুর জন্মদিনেও তো খ্রীস্টান নেশনদের যুদ্ধ স্থগিত থাকেনি।

যুদ্ধ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। মন্দা আরেক হাতে। অথচ দুই হাতে করে যেতে হবে যুদ্ধের জন্যে উদ্যোগ। এই হলো মোটামুটি পশ্চিমাদের পলিসি। নিকট ভবিষ্যতে এর মৌল পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। পরিবর্তন ততটুকুই হবে যতটুকু উভয়পক্ষের আলাপ-আলোচনার ফলে নিরাপদ। নীতির অনুশাসন মেনে শুভবুদ্ধির অনুরোধে মহৎ কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়তো ব্যক্তিবিশেষকে বা সংস্থাবিশেষকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে, কিন্তু জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষ যে নিরাপত্তার চেয়ে আর কোনো গণনাকে বড় মনে করবে তেমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। যুদ্ধ যদি বাধে নিরাপত্তার নামেই বাধবে। একপক্ষ বলবে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্যেই যুদ্ধ। অপরপক্ষ বলবে কমিউনিজমকে নিরাপদ করার জন্যেই যুদ্ধ। আবার যুদ্ধ যদি ঠেকিয়ে রাখা হয় তবে সেটাও নিরাপত্তার নামে। মানুষকে পাইকারী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মানসে।

আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই। যুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না বলতে পারব না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে যুদ্ধ যদি আরো বছর দশেক পেছিয়ে যায় তাহলে প্রস্তুতির ভারে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। সুতরাং প্রস্তুতিও মন্থর হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু তার ফলে যদি মন্দা দেখা দেয় তবে আবার ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে। অগত্যা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে সমাজের কল্যাণের দায়। সোজা বাংলায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার। বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও পাবলিক সেকটর ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ এককালে ধর্মের ষাঁড় ছিল। তার গায়ে হাত দেয় কার সাধ্য! একটু একটু করে সে বলদে পরিণত হচ্ছে। রাতারাতি বিপ্লব ঘটলে প্রতিবিপ্লবও ঘটবে। কিন্তু তিলে তিলে অলক্ষ্যে যা ঘটে যাচ্ছে সেও একপ্রকার বিপ্লবই। শুধু তার প্রতিবিপ্লব নেই। আর তার নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

ক্যাপিটালিজম বল, কমিউনিজম বল, সোশিয়ালিজম বল, সব ক'টারই শিকড় নেমে গেছে একই জায়গায়। পাঁচশ' বছর আগে যে রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম ঘটে তার মধ্যেই ছিল পুনর্বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা। পুনর্বিন্যাস না ঘটলে রেনেসাঁস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সেই সময় থেকেই ধ্যানীরা ধ্যান করে এসেছেন পুনর্বিন্যাসের। এমনি একটি ধ্যানের নাম ইউটোপিয়া। ধ্যানীর নাম সার টমাস মোর। প্রত্যেক শতকেই একাধিক ধ্যানী একাধিক ধ্যান করেছেন। কেজো মানুষরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সব উড়ে গেলেও একটা কথা মানুষের মনে গেঁথে গেছে। এই মর্ত্যভূমিকেই জ্ঞান-

বিজ্ঞানের সাহায্যে নিরলস কর্মসাধনার দ্বারা কাম্যলোকে পরিণত করা সম্ভব। তার জন্যে চাই জীবন ও জীবিকার, সমাজ ও অর্থনীতির, উৎপাদন ও বণ্টনের পুনর্বিন্যাস। গতানুগতিককে অক্ষুণ্ন রাখা চলবে না। আবার অকারণে ক্ষুণ্ন করাও কাজের কথা নয়। কী রাখতে হবে, কী ছাড়তে হবে, কী গড়তে হবে, কী ভাঙতে হবে এ নিয়ে অনবরত চিন্তা করতে হবে, বিচার করতে হবে, জল্পনা করতে হবে, কল্পনা করতে হবে। তার পর কাজে নামতে হবে। ফল দেখাতে হবে। সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। তারই নাম প্রগতি। মানুষ উত্তরোত্তর প্রগতি করবে। এক পুরুষে যা হলো না আরেক পুরুষে তা হবে। এক শতাব্দীতে যা হলো না আরেক শতাব্দীতে তা হবে। তার চলার পথে বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে, কিছুকালের জন্যে সে পেছিয়ে যাবে, তার পর আবার এগিয়ে যাবে। মানুষের ইতিহাসে বিশ ত্রিশ বছর ধর্তব্য নয়। শতাব্দী অনুসারে যদি হিসাবনিকাশ করা হয় তাহলে দেখা যাবে মানুষ মোটের উপর এগিয়েছে।

আদিকাল থেকেই মানুষের মনে সাধ ছিল সে আকাশে উড়বে। যে সাধ পূর্ণ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেলুনে চড়ে। এখন তো সে মহাশূন্যেও ঘুরে এল। সত্যি সত্যি একদিন সশরীরে চন্দ্রলোকে যাবে। যাবে মঙ্গলগ্রহেও। প্রগতি বইকি। তেমনি আদিকাল থেকেই মানুষের স্বপ্ন ছিল ক্রীতদাসপ্রথা উঠিয়ে দেবে। সে স্বপ্ন সার্থক হলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এখন তো ভূমিদাসদের বংশধররাই রাশিয়ার তথা অর্ধেক পৃথিবীর অধিনায়ক। এ যদি প্রগতি না হয় তবে প্রগতি কাকে বলে? এমনি কত দিকে যে কত রাস্তা খুলে গেছে, কত দূর অগ্রসর হওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সব মানুষ তার সমান শরিক নয়, সত্যি। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ তো এক আধজন মানুষই নেয়। একজনের পর একজন চলতে চলতেই পায়ে চলার পথ জনবহুল হয়। গোড়া থেকেই যদি পণ করতে হয় যে সব মানুষকে সঙ্গে না নিয়ে আবিষ্কারে বার হব না তাহলে প্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন সবাই মিলে স্থিতিশীল হওয়াই মোক্ষলাভের সদুপায়।

রেনেসাঁস বা পুনর্জন্মের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি পুনর্বিন্যাস। পুনর্বিন্যাস এক আধ শতাব্দীর ব্যাপার নয়। পুরাতন জীবনযাত্রাকে, সমাজব্যবস্থাকে, মৌল ধারণাকে, বদ্ধমূল সংস্কারকে ঠেলে সাজাতে বহু শতাব্দী লেগে যায়। ইংলণ্ড আজ যা হয়েছে তা পাঁচশ' বছরের পুনর্বিন্যাসের ফলে। রাশিয়া দেরিতে আরম্ভ করেছে বলে তাকে পাঁচ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দুই শতাব্দীতে ঠাসতে হয়েছে। তাতেও কুলোয়নি বলে বিপ্লব বরণ করতে হয়েছে। মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। জাপান আরম্ভ করেছে আরো দেরিতে। তাকেও লাফ দিয়ে এগোতে হয়েছে। লাফ দিতে গিয়ে সে খাদে পড়েছে। হাত পা ভেঙেছে। তবু তার অগ্রগতির বিরাম নেই। কেউ এ কথা জোর করে বলতে পারে না যে জাপানে কোনোদিন বিপ্লব ঘটবে না। তবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ জাপানের ধনিকরা চক্ষুষ্মান। অনেক সময় চক্ষুষ্মানরাও অবস্থার চাপে

বেচাল হয়। আর একটা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জাপানের অবস্থা চক্ষুষ্মানদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। সে ভয় আমাদের এ দেশেও আছে। মহাযুদ্ধের দাবী এমন সর্বগ্রাসী যে মানুষ সে দাবী মেটাতে গিয়ে দেখে সে আর অবস্থার প্রভু নয়, সে অবস্থার দাস। তখন অবস্থাই তাকে যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রিত করে।

জগতের রঙ্গমঞ্চে যে সব শক্তি পাঁচ শতাব্দী ধরে ক্রিয়া করছে তাদের সব ক'টার সূচনা রেনেসাঁস থেকে নয়। অধিকাংশ মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। ধর্মে ধর্মে ভেদ যত না আছে মিল আছে তার বেশী। সব ধর্মই মানুষকে শেখায় অন্তর্মুখী হতে, অন্তরের দিক দিয়ে অগ্রসর হতে। ধার্মিকমাত্রেরই প্রশ্ন হলো, আমি কি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না ঐশ্বর্যের দিকে এগোচ্ছি? যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তিনি বলেন, আমি কি নির্বাণের দিকে বা মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছি না তার বিপরীত দিকে পা চালাচ্ছি? প্রগতি বলতে ধার্মিকরা বোঝেন একটা দেশকালাতীত সত্যের অভিমুখে অগ্রগতি। তাকে ইতিহাস বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতির মাপকাটি দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তা বলে তাকে আফিং গাঁজা বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

স্মরণাতীত কাল হতেই মানুষ এমনভাবে মানুষ হয়েছে যে পার্থিব ঐশ্বর্যকেই তার নশ্বর জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে স্বীকার করতে লজ্জিত হয়েছে। মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে সে বলেছে, "যাতে আমাকে অমৃত না করবে কী করব আমি তা নিয়ে?" নচিকেতার মুখ দিয়ে বলেছে, "বিত্তে পরিতৃপ্ত হতে পারে না মানুষ।" যীশুর মুখ দিয়ে বলেছে, "তোমার তাতে লাভ কী যদি সমগ্র জগৎটাকে পাও অথচ আপনার আত্মাকেই হারাও?" এমনি কত মহাপুরুষের মুখ দিয়ে কত রকম করে বলেছে যে, এই সব নয়। আরো আছে। সেই আরোকে যদি না পাই তবে আমি ইহলোকে বা ইহকালে অচরিতার্থ। আমার চরিতার্থতার জন্যে চাই একটা পরলোক বা পরকাল বা পরজন্ম। সব ধর্মেই মানুষকে এর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এমন কি মহাযান বৌদ্ধধর্মেও। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধনসম্পদ বহুগুণিত করে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব মানুষের মধ্যে সমভাগ করে দিলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই কি সব?

সভ্যতার জন্যে একটা মেটিরিয়াল ভূমি চাই। যা না হলে সে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু তাকেই যারা একান্ত করে দেখে তারা সভ্যতার ঠাটটাকেই সভ্যতা বলে ভুল করে। বৈজ্ঞানিকরা আধপেটা খেয়ে জীর্ণ পোশাক পরে বছরের পর বছর এক একটা পরীক্ষা বা গবেষণা নিয়ে থাকেন। নিজের উপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেন। দার্শনিকদেরও আহারনিদ্রা নেই। কোনো একটা তত্ত্বের পিছনে ধাওয়া করে জীবন কেটে যায়। সংসার করার মতো রসদ জোটে না। করলেও সংসার অবহেলিত হয়। এঁরা যদি সুখের পায়রা হতেন তাহলে রেনেসাঁসই হতো না। হলে মাঝ পথে থেমে যেতো। শিল্পীদের মধ্যে সাংসারিক সাফল্য ক'জনের বরাতে জোটে? জুটলে শেষ বয়সে। যাঁরা

সরস্বতীর পূজা করতে গিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা করেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু তাঁদের বাড়ী গাড়ী ও ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স সাহিত্যের ঐশ্বর্য নয় বা চিত্রকলার বিভব নয়। সরস্বতীর ভাণ্ডারে যা জমে তাই দিয়েই সভ্যতার বিচার হয়ে থাকে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তো আজ আছে কাল নেই।

যুদ্ধ কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখলেও এই সভ্যতার জন্যে মাথাব্যথার যথেষ্ট কারণ আছে। অনেকের মতে রেনেসাঁসটাই একটা ভুল মোড়। মানুষ ভুল মোড় নিয়ে ভুল পথে চলেছে। তাকেই ভাবছে অগ্রগতি। এখন তার কর্তব্য হবে প্রগতির অহংকার ভুলে নম্রভাবে পশ্চাদ্ অপসরণ। ফিরে গিয়ে ঠিক মোড় নিতে হবে। তা হলেই তার জীবনে অখণ্ডতা আসবে। তখন বিজ্ঞান আর দর্শন আর ধর্ম আর সমাজ পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা পরস্পরবিরোধী হবে না। একই মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। স্পিরিচুয়াল আর মেটিরিয়াল একই লক্ষ্যের ইশারা করবে। বিপরীত লক্ষ্যের নয়। সত্যিকার প্রগতির অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে কয়েক শতাব্দী পেছিয়ে গিয়ে তার পরে সব দিক রক্ষা করে সবাইকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া।

টলস্টয় কিন্তু কয়েক শতাব্দী পশ্চাদ্ অপসরণেই সন্তুষ্ট হবেন না। ফিরে যেতে হবে আদি খ্রীস্টান যুগে। যখন প্রেমধর্ম রাজধর্ম হয়নি, রাজধর্ম হয়ে বিকৃত হয়নি। সেই মোড়ে ফিরে গিয়ে সেইখান থেকে নতুন করে যাত্রারম্ভ করতে হবে। নতুন পথে। যে পথের এক ধারে সঙ্ঘ অপর ধারে রাষ্ট্র সে পথে নয়। যে পথের একধারে অহিংসা অপর ধারে গ্রামোদ্যোগ সেই পথে। সঙ্ঘ আর রাষ্ট্র মানুষকে বিপথগামী করেছে ঐশ্বর্যের অভিমুখে। ঈশ্বরের অভিমুখে সুপথগামী করেনি। সাধুসন্তেরা শতহস্ত দূরে থেকেছেন। কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন।

টলস্টয়ের অন্বিষ্ট ছিল আদি খ্রীস্টান সাধকদের মতো মানবপ্রেমকে সূর্য করে তার সৌরমণ্ডলে আর সমস্ত বিষয়কে সন্নিবেশ করা। তার সঙ্গে যা বেখাপ তাকে বাদ দিতে হবে। ভয়ের শাসন তার সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব রাষ্ট্র বাতিল। সঙ্ঘও তো রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার পাপের ভাগী হয়েছে। রক্তের দাগে দাগী হয়েছে আপন শক্তির মদে অন্ধ হয়ে। অতএব সঙ্ঘ নাকচ। কিন্তু এসব বাদ গেলেও ধর্ম থাকবে, নীতি থাকবে, যীশুর বাণী ও আদর্শ থাকবে, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম থাকবে। প্রেমের শাসনে মানুষ সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করবে। সভ্যতার বুনিয়াদ এমন গভীর করে পাততে হবে যে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিরোধ বাধবেই না। যদি বাধে তার জন্যে বিহিত রয়েছে খ্রীস্টানুশাসন: মন্দের প্রতিরোধ কোরো না।

টলস্টয়ের মতে অপ্রতিরোধই প্রকৃত প্রতিরোধ। অবশ্য যিনি প্রতিরোধ করবেন তিনি আপনি ভালো হবেন। মন্দ যাতে প্রতিপক্ষের মন্দত্বকে পরোক্ষ সহায়তা না জোগায়। টলস্টয়ের ব্যাখ্যায় যা অসম্পূর্ণ ছিল গান্ধী এসে তাকে সম্পূর্ণতা দেন। প্রতিরোধ করতে হবে প্রেম দিয়ে, আত্মার তেজ দিয়ে, বীরের অহিংসা দিয়ে। মন্দ হয়ে নয়, মন্দ ভেবে নয়, মন্দ উপায়ে নয়,

কাপুরুষের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে নয়, গঠনের কাজ করতে করতে। চিত্তশুদ্ধি পূর্বক।

সঙ্ঘবিমুখ চিন্তা রেনেসাঁসের পূর্বে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। তার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রোটেস্ট করলেন তাঁরাও প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন যে সঙ্ঘ না হলে চলে না। একচ্ছত্র সঙ্ঘের পরিবর্তে তাঁরা স্থাপন করলেন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একাধিক সঙ্ঘ। রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হলো না তাঁদের সেইসব সঙ্ঘের। পরবর্তীকালে ছোট ছোট কয়েকটি সঙ্ঘ রাষ্ট্রের থেকে তফাৎ থাকে। রাষ্ট্রের থেকে সঙ্ঘের তফাৎ থাকার নতুন ঐতিহ্য আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা গ্রহণ করেন। তাঁদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন সঙ্ঘের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু রাষ্ট্র আর সঙ্ঘ নিঃসম্পর্কীয়। যেমন ছিল আদি খ্রীস্টান যুগে। সঙ্ঘ জিনিসটাই যাঁদের কাছে অসহ্য তাঁদের কেউ বাধ্য করে না যোগ দিতে। সঙ্ঘ না থাকলেও ধর্ম থাকে, যেমন ছিল যীশুর আপন জীবনে।

রাষ্ট্রের কথা আলাদা। রাষ্ট্রবিমুখ চিন্তাও রেনেসাঁসের পূর্বে ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো না। বরং দেখা গেল রাষ্ট্র আরো নিরঙ্কুশ হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক সঙ্ঘ ছিল তার ছত্রাধীন সকল রাষ্ট্রের উপরে। প্রোটেস্টাণ্ট সঙ্ঘগুলিকে কোনো রাষ্ট্রই উপরওয়ালা বলে স্বীকার করল না। বরং রাষ্ট্রই হলো উপরওয়ালা। অনিবার্য হলো রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তা। ইংলণ্ডের মতো যে দেশে প্রজাপ্রতিনিধিদের হাতে অঙ্কুশ চলে যায় সে দেশে তেমন নয় যেমন ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রাশিয়ায়। কথা উঠল রাষ্ট্র বলে কেন একটা কিছু থাকবে? কার স্বার্থে? পুলিশ তো দেখা যায় ধনীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যেই হয়েছে। আর সৈন্যদল হয়েছে অন্যান্য দেশ দখল করে ধনীদের ধনবৃদ্ধির জন্যেই। অথবা তাদের অন্যদেশীয় প্রতিযোগীদের শক্তি হ্রাস করার জন্যেই।

বাকুনিন প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ করার কল্পনা করলেন। মার্ক্স বললেন রাষ্ট্র একদিন আপনা হতেই শুকিয়ে যাবে। সুতরাং তার মূলোচ্ছেদ করতে হবে না। আপাতত তাকে করায়ত্ত করে শোষিত শ্রেণীর কাজে লাগানো চাই। করায়ত্ত করার যদি কোনো ভদ্র উপায় না থাকে তবে অভদ্র উপায় অবলম্বন করতে হবে। এটা ইতিহাসের নির্বন্ধ। তুমি আমি করছিনে, ইতিহাস করছে। মার্ক্স একটা শাস্ত্র লিখে শ্রেণী-সংঘাতের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেলেন। আর নৈরাজ্যবাদীরা কতকগুলি ব্যক্তিকে বধ করেই রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ-পর্ব সমাপন করল।

রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তা ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে কাজে লাগানোর চিন্তাই এখন প্রবল। অধিকাংশ দেশেই প্রজাপ্রতিনিধিদের হাতে অঙ্কুশ এসে গেছে। দরিদ্র-তমেরও ভোট দেবার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। সে যদি টাকার জন্যে ভোট বেচে তবে সেটা রাষ্ট্রের দোষ নয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা এখন ঘোরতর সঙ্ঘবদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এক্তারে লক্ষ লক্ষ ভোট। শ্রমিকরা ভোট দেয় ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশে। শ্রমিক-স্বার্থের ভিত্তিতেই ট্রেড

ইউনিয়ন, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে ধার্মিকরাও আর একপ্রস্থ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাপন করেছেন। রোমান ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়ন। তেমনি ধর্মের নামে রাজনৈতিক দলগঠন করাও চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় ধর্মের রথচক্র মুখর। ক্যাথলিক ধর্মের। ভোটগুলো যদি ধার্মিকরা না পান কমিউনিস্ট বা সোশিয়ালিস্টরা পাবে। তাতে ধর্ম আর অর্থ দুই বিপন্ন হবে। মোক্ষও কি বিপন্ন হবে না?

আবার এমন দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি যে, আমেরিকার ক্যাথলিকদের ছোট্ট একটি গোষ্ঠী আছে, নাম "ক্যাথলিক ওয়ার্কার"। এঁরা গ্যারিসন, থোরো আর গান্ধীর ঐতিহ্য অনুসরণ করতে চান। যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন না বলে এঁরা ইনকাম ট্যাক্স না দিয়ে জেলে যান। পারমাণবিক বোমার ভয়ে যেসব আত্মরক্ষার আশ্রয় নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে ঢোকার জন্যে যখন সাইরেন বাজানো হয় তখন এঁরা তার প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা করে কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ ও গঠনকর্ম এঁদের মূলনীতি। এমনি অনেক খাতে টলস্টয়ের চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে। একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, হতে পারে না। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রের উপর গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তার দাবী অনেক সময় বিবেক-বিরুদ্ধ। ইচ্ছা করলেই সে নাগরিকদের যুদ্ধের জন্যে কন্‌স্‌ক্রিপ্ট করতে পারে। নরনারীর সমান অধিকার যখন তখন সমান দায়িত্ব। নারীও যে একদিন যুদ্ধের জন্যে কন্‌স্‌ক্রিপ্ট হবে না এমন কোনো অঙ্গীকার কি কেউ দিয়েছে? প্রথমদিকে হয়তো প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অত্যাবশ্যক হতেও তো পারে। আধুনিক যুদ্ধ সর্বাত্মক। হার-জিতের প্রশ্নই সেখানে একমাত্র প্রশ্ন। নারীর নারীত্ব বা শিশুর শিশুত্ব যদি জয়ের অন্তরায় হয় তবে কেউ সে প্রশ্ন কানে তুলবে না। যার বিবেকে বাধবে সে জেলে পচবে বা ফাঁসীতে ঝুলবে। দেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত হবে।

শুধু যুদ্ধকালে যুদ্ধবিরোধিতা করলেই চলবে না, শান্তিকালেও সক্রিয় হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে, তার জন্যে খাটতে হবে, ত্যাগস্বীকার করতে হবে। আজকাল এমন কোনো বড়গোছের শিল্প নেই যার সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নেই, যা যুদ্ধের কাজে লাগবে না। অগত্যা ছোটগোছের শিল্পের উপর ঝোঁক দিতে হয়। চরকা কাটতে হয়, খাদি পরতে হয়। সত্যাগ্রহের সঙ্গে খাদির সেই সম্পর্ক মিলের কাপড়ের সঙ্গে যুদ্ধের যে সম্পর্ক। সেইজন্যে গান্ধীকল্পিত পতাকায় চরকা আঁকা থাকত। সেটা শান্তিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতীক। সত্যাগ্রহের স্মারক।

মানুষের যদি হৃদয় বলে কিছু না থাকে, যদি বিবেক বলে কিছু না থাকে, কিংবা থাকলেও সুবিধামতো সেসব বিসর্জন দেওয়া চলে, তাহলে সভ্যতার জন্যে অত গর্ব করার কী আছে? দেশসুদ্ধ মানুষকে যুদ্ধের জন্যে সব সময় প্রস্তুত রাখার অর্থই হলো হৃদয় আর বিবেককে নিম্ন মূল্য দেওয়া। ইতিহাসে

যুদ্ধবিগ্রহ অনেকবার ঘটেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাতে লিপ্ত হয়নি। তাদের কন্‌স্‌ক্রিপ্ট করার প্রয়োজনই হয়নি। তাদের উৎপাদন যুদ্ধার্থে নয়। তাদের হৃদয় অসাড় হয়নি, বিবেক পীড়িত হয়নি। সূক্ষ্মতর বৃত্তিগুলি বিমর্দিত হয়নি। প্রকৃতির হাতে, মানুষের হাতে বহুভাবে তারা নির্যাতিত হয়েছে, কিন্তু সেসব যন্ত্রণা তাদের দেহের উপর দিয়ে গেছে, হৃদয়কে বা বিবেককে নিষ্পিষ্ট করেনি। বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে রেনেসাঁসকেও দায়ী করা চলে না। এটা শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী। ফলিত বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এর জনক-জননী। যেখানে জননী আরেক সেখানেও জনক সেই একই। দুই মিলে হৃদয়কে ও বিবেককে উপবাসী রাখছে। রাষ্ট্ররূপ এর প্রতিফলন। মূল্যবোধ বদলালে রাষ্ট্ররূপ বদলাবে। কিন্তু রাষ্ট্র শুকিয়ে যেতে বা নির্মূল হতে বহু শতাব্দী দেরি।

আদি খ্রীস্টান যুগে বা আদি বৌদ্ধ যুগে ফিরে যাবার পথ সব সময়েই খোলা রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের সামনে। শহীদ হতে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে না, প্রবাদবাক্য যাই বলুক। বিকল্প সমাজব্যবস্থা বা বিকল্প সভ্যতা এই দু'হাজার বছরের মানব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে নয়, একে আত্মসাৎ করেই বিবর্তিত হবে। রেনেসাঁসের পূর্ব ও উত্তর উভয় কালই তার অঙ্গীভূত হবে। বিভিন্ন সভ্যতা তাতে স্রোত মেলাবে। স্পিরিট আর ম্যাটার দুই মিশবে। ইতিহাস সেই অভিমুখেই চলেছে। যদিও তার চাল আমাদের বেদনা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকেও দিয়েছিল তাঁর শেষ বয়সে।

কবি তাঁর ইংরেজী ও বাংলা বিভিন্ন ভাষণে ও প্রবন্ধে বার বার বলেছেন যে, "সভ্যতা" কথাটি এসেছে "সিভিলিজেশন" থেকে। আমরা ওটিকে নিয়েছি ওটির স্বরূপ না জেনে না চিনে। আমাদের নিজেদের শব্দ ছিল "ধর্ম" বা "সদাচার"। অনেকের জানা নেই বোধ হয় যে, "সিভিলিজেশন" কথাটি ইংলণ্ডেও অজ্ঞাতকুলশীল ছিল দুই শতাব্দী পূর্বে। ডক্‌টর জনসন ওটিকে তাঁর প্রসিদ্ধ অভিধানে ঠাঁই দিতে রাজী হননি। আর তিনিই তো তখনকার দিনের সাহিত্যিক ডিকটেটর। কথাটির উদ্‌ভব "সিভিলিটি" থেকে। সেটির অর্থ ছিল নাগরিকসুলভ ভব্যতা। গ্রাম্যতার বিপরীত। ইতিমধ্যে বদলাতে বদলাতে অন্য অর্থ দাঁড়িয়েছে। বর্বরতার বিপরীত। কারো কারো মতে পশুত্বের বিপরীত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফরাসী ঔপন্যাসিক দু'আমেল তাঁর যুদ্ধের কাহিনী লিখে নাম দেন "সিভিলিজেশন : ১৯১৪-১৮"। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও মনে আঘাত লেগেছিল। তাঁরই মতো বহু পাশ্চাত্য মনীষীর। তাঁরা তো ওকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে নিন্দা করে হাত ধুয়ে ফেলতে পারতেন না। কিন্তু তাঁরাও ক্লেশ বোধ করতেন বলে শ্লেষ দিয়ে ঢাকতেন। মানুষ যদিও লক্ষ লক্ষ বছর হলো পশুদশা অতিক্রম করেছে তবু তার ভিতরে পশুভাব সুপ্ত রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনায় ও ঘাতপ্রতিঘাতের বেদনায় তার সুপ্তিভঙ্গ

হয়। সদ্যজাগ্রত পশুর পশুত্বকে যদি ভাবি সভ্য মানুষের সভ্যতা তাহলে সেটা হবে সভ্যতার প্রতি অবিচার। তেমনি মানুষ যদিও হাজার হাজার বছর হলো বর্বরদশা ছাড়িয়ে এসেছে তবু তার ভিতরে বর্বরপ্রকৃতি গুপ্ত রয়েছে। স্বদেশের সমাজের চোখের আড়ালে সে যখন কোনো দূর দেশে গিয়ে উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য স্থাপন করে তখন আদিবাসী বা অধীনদের কাছে লেশমাত্র প্রতিরোধ পেলেই তার বর্বরপ্রকৃতির আবরণ খসে পড়ে। বিবসন বর্বরের বর্বরতাকে যদি ভাবি সভ্য মানুষের সভ্যতা তাহলে সেটাও হবে সভ্যতার প্রতি অন্যায়। সত্য হচ্ছে এই যে সভ্যতা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ভেঙে পড়ে। যেমন স্বাস্থ্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ভেঙে পড়ে। সাময়িক অসভ্যতা বা অস্বাস্থ্য নিশ্চয়ই পরিতাপের বিষয়, তার নিন্দা করব একশ' বার। কিন্তু কেমন করে বলব যে সেইটেই সভ্য মানুষের আসল চেহারা? ধর্মের বদলে অধর্ম সদাচারের বদলে কদাচারও তো বড় কম দেখা যায়নি প্রাচীন প্রাচ্যদেশে।

যুদ্ধের প্রস্তুতিও যুদ্ধের অঙ্গ। সেটাও একটা অসুখের সূচনা।

টমাস মান-এর প্রসিদ্ধ গল্প "ভেনিস-এ মৃত্যু" লেখা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের বছর তিনেক আগে। যুদ্ধের নামগন্ধ নেই তাতে, কিন্তু মান-এর ক্লিনিকাল দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে জার্মানীর অসাধ্য অসুখ ও ইউরোপের পচনশীলতা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও সে অসুখ থামে না। কারণ যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ও যুদ্ধের অঙ্গ। সে অধ্যায় শেষ হতে না হতে শুরু হয়ে গেল পুনঃপ্রস্তুতি। কাজেই অসুখ থামল না, বাড়ল। কেবল জার্মানীর অসুখ না বলে পাশ্চাত্য জাতিদের অসুখ বলাও চলে। কিন্তু জাপানই বা তালিকা থেকে বাদ পড়বে কেন? তাহলে বলতে হয় সভ্যতার অসুখ। সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ নয়, যদিও কেউ কেউ তেমন কথাও বলে থাকেন। সভ্যতা স্বভাবত সুস্থ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল প্রাক্‌সাময়িক ইংরেজী কাব্যসাহিত্য, ইউরোপীয় লিবারল মতবাদ। সেসব ছিল সুস্থ মানুষের কীর্তি। উত্তর-সাময়িক ইংলণ্ড তাঁকে নিরাশ করে। বহু ইংরেজকেও উদ্বিগ্ন করে। তাঁরাও হালে পানী পান না। কিন্তু ইংলণ্ডের হৃদয়বান ও বিবেকীরা একদিনও নিষ্ক্রিয় বসে থাকেননি। সংশোধনের চেষ্টা প্রতিদিন অক্লান্ত। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও এ কথা কম বেশী খাটে। কিন্তু ইতিহাসের আবর্তে তাঁরাও নিঃসহায়।

শুধু সাময়িক অসভ্যতার উপর যদি নজর রাখি তবে পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পাব না। সমস্ত স্খলনপতনসত্ত্বেও পুনর্বিন্যাসের কাজ পাঁচ শতাব্দী ধরে চলেছে। পাঁচ মহাদেশ জুড়ে চলেছে। যেখানে অরণ্য ছিল সেখানে বসত হয়েছে, যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে জমি হয়েছে, যেখানে পর্বত ছিল সেখানে রেলপথ বা আকাশপথ হয়েছে, যেখানে নদী ছিল সেখানে সেতু হয়েছে। অনেক শিল্প ধ্বংস হয়েছে তা ঠিক, কিন্তু অনেক শিল্পের পত্তন হয়েছে।

কৃষি অবহেলিত হয়েছে সত্য, কিন্তু চা কফি রবার ইত্যাদির প্ল্যান্টেশন হয়েছে। নতুন নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছে, কিন্তু পুরাতন মহামারী রোধ করা গেছে। এইভাবে হিসাবনিকাশ করলে খরচের চেয়ে জমার অঙ্কই মোটের উপর বেশী। নীতি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও প্রচুর কাজ হয়েছে। তবে তুলনায় পেছিয়ে রয়েছে। সৌন্দর্যের বেলাও এ কথা খাটে। এইসব দিকে না এগোলে মানুষের অগ্রগতি একপেশে হবে, বিকাশ মাথাভারী হবে। তা ছাড়া সব মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে না পারলে কতক মানুষের চলা ব্যাহত হবে। বিপ্লব তো এমনি করেই ঘটে। যেখানে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সেখানে বিপ্লব ঘটে না।

যুদ্ধের মতো বিপ্লবও আমাদের কালের ঐতিহাসিক রক্তস্নান। কিছুদিনের জন্যে মানুষ পশু হয়ে যায়। যাকেই সন্দেহ করে তাকেই মেরে নিঃশেষ করে দেয়। পরে অবশ্য পশুতায়। কিছুদিনের জন্যে সভ্যতার ক্রমভঙ্গ হয়। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের জোড় মেলে না। মানুষ এ বিচ্ছেদ অতিক্রম করে। পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করলেও পূর্বের সাহিত্যকে সঙ্গীতকে নৃত্যকে আপনার মনে করে। বৈপ্লবিক প্রেরণা চিরদিন থাকে না। কিন্তু মানবাত্মার অমর সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে আনন্দ জোগায়। কে তাকে মেরে নিঃশেষ করবে? যা ভাঙবার যোগ্য, যা ভেঙে পড়ছিল, যা ভেঙে পড়তই বিপ্লব তাকেই ভাঙে। সবকিছুকে ভাঙে না, ভাঙতে চায় না, ভাঙতে পারে না। যে রাজত্বের বা যে অভিজাত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ফুরিয়ে এসেছে তারা যদি সময়ে প্রস্থান করে তাহলে রঙ্গমঞ্চের উপর পতন ও মৃত্যু অভিনীত হয় না। যাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অবধারিত ও আসন্ন তাদেরকে মঞ্চ ছেড়ে দিলে তো তাদেরও আক্রোশ থাকে না। হাজার পুরাতন হলেও কোনো সমাজব্যবস্থাই সনাতন নয়, কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণীই চিরস্থায়ী নয়। হাজার ভালো হলেও কোনো জিনিসই বরাবর টেকে না। আর একটা ভালো জিনিসের জন্যে কিংবা আরো ভালো জিনিসের জন্যে জায়গা খালি করতে হয়। পুনর্বিন্যাস না করলেই নয়। নতুন সমাজব্যবস্থার আবশ্যক আছে। রেনেসাঁসের মধ্যেই তার ইঙ্গিত নিহিত। মানুষ তার আবেষ্টনের পরিবর্তন সাধন করবে, পশুর মতো সহ্য করবে না।

আবার সত্যের খাতিরে এটাও স্বীকার না করে গতি নেই যে, বিপ্লবের দ্বারা বা যুদ্ধের দ্বারা যেমন শক্তির মুক্তি ঘটে তেমন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দ্বারা নয়। ওই যে রাশিয়ানরা সাইবেরিয়া চষে ফেলছে, পাহাড়কে পাহাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে, চাঁদের বুড়ি ছুঁয়ে আসতে হাউই ছুঁড়ছে, একদিন সশরীরে শূন্যপারে পৌঁছে যাবেও—এ কি বিপ্লবসঞ্জাত ডাইনামিজম ভিন্ন সম্ভব হতো? রাশিয়ার পুনর্বিন্যাসের জন্যে এর দরকার ছিল যদি বলি তাহলে কি ভুল বলা হবে? তেমনি জার্মানীর পুনর্বিন্যাসের জন্যে প্রয়োজন ছিল দু'দুটো মহাযুদ্ধের। নইলে জার্মানী ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পায়িত হতে পারত না। সে একশ'

বছর পিছিয়ে ছিল। এখন সমান সমান। শুনতে পাই পরাজয়সত্ত্বেও জার্মানীই নাকি ইংলণ্ডের চেয়ে অগ্রসর। তার কারণ কি এই নয় যে, পরাজয়গ্লানি মুছে ফেলার জন্যে তার জীবনে একপ্রকার ডাইনামিজম জেগেছে? সেটা ইংলণ্ডের জীবনে অনুপস্থিত। জাপানের বেলাও সেই ডাইনামিজম সক্রিয়। প্রথমে তার উদ্যোগ ছিল ইউরোপীয় জাতিদের ধরে ফেলতে, তাদের সমান হতে। এখন পরাজয়গ্লানি মোচন করতে, তেমনি বা ততোধিক অগ্রসর হতে। জাপানের পুনর্বিন্যাস কি অন্য উপায়ে সম্ভব হতো?

অথচ এই ডাইনামিজম সত্যের ধার ধারে না, ন্যায়ের ধার ধারে না, নীতির ধার ধারে না। ধর্মকে নিজের পাপ সমর্থন করতে বলে ও বাধ্য করে। ধর্ম এখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণীকে উৎখাত করে চালান দেওয়া হলো সাইবেরিয়ায়। তা না হলে সাইবেরিয়ার বিকাশ হতো না। তেমনি খাল কাটার জন্যে পাঠানো হলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে তুচ্ছ কারণে বা অকারণে বিচারশালায় দণ্ডিত করে। নইলে খাল কাটা যেতো না। যুদ্ধের সময় কন্‌স্ক্রিপশন তো সেই নেপোলিয়নের আমল থেকেই ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই চালু ছিল। বাকী ছিল ইংলণ্ড। সেও প্রথম মহাযুদ্ধের শেষপর্যায়ে স্থির থাকতে পারল না। বিবেকীদের জেলখানায় পাঠিয়ে ছোকরাদের ধরে যুদ্ধে চালান দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিপদ এত আসন্ন যে সেটুকু ত্বর সইল না। গোড়া থেকেই কন্‌স্ক্রিপশন। এতদিনে ওটা একটা বনেদী প্রথায় পরিণত হয়েছে। আমেরিকাও ইংলণ্ডের মতো ইতস্তত করেছিল। এখন তেমনি প্রস্তুত। লাল চীন তো কন্‌স্ক্রিপশনের চূড়ান্ত করেছে শুনি। গ্রামের একভাগ কৃষক, একভাগ শ্রমিক ও একভাগ সৈনিক। সবাই কন্‌স্ক্রিপট। এখন আমরাই বাকী। এর জন্যে দুনিয়ার লোক আমাদের ঈর্ষা করে। যুদ্ধকে এক হাতে বিপ্লবকে আরেক হাতে ঠেকিয়ে না রাখতে পারলে আমরাও বাদ যাচ্ছিনে। কিন্তু কেবল ঠেকিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়। নৈতিক বিকল্প জোগাতে হবে যুদ্ধের, জোগাতে হবে বিপ্লবের।

সভ্যতার সর্বপ্রধান সমস্যা হলো কেমন করে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, কেমন করে সেটাকে বেগবান করতে হবে, কেমন করে তার মধ্যে সব মানুষকে টানতে হবে, কেমন করে সবাই মিলে এগিয়ে যেতে হবে, অথচ প্রাণের মূল্য জীবনের মূল্য ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য প্রেমের মূল্য সৌন্দর্যের মূল্য সত্যের মূল্য ন্যায়ের মূল্য শুভবুদ্ধির মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কেবল কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করতে হবে যে কতক মানুষের কাছে এগুলিও জীবনমরণের ব্যাপার। কতক লোককে স্বেচ্ছায় জেলে যেতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় গুলী খেতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় বিপদবরণ করতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় সেবাকর্মে বা গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর প্রত্যেকটাই ত্যাগের পথ। হাঁ, কতক লোককে স্বেচ্ছায় সৃষ্টির দায় নিতে হবে। লোকে হয়তো জানবে না যে সেটাও ত্যাগের পথ। রবীন্দ্রনাথ তার জন্যে জীবনব্যাপী ত্যাগস্বীকার করেছেন। নইলে, বড়লোকের ছেলে, কিসের

অভাব ছিল তাঁর? অনায়াসেই তিনি সিভিলিয়ান ব্যারিস্টার বা সওদাগর হতে পারতেন। নিদেনপক্ষে ডানপিটে জমিদার।

সভ্যতা তার দুই দিক মেলাতে পারছে না এটা স্পষ্ট। প্রাণের মূল্য জীবনের মূল্য প্রেমের মূল্য সৌন্দর্যের মূল্য ইত্যাদি যেসব মূল্যের নাম করেছি সেসব মূল্যের দেনা চুকিয়ে তার পরে আর অতখানি ডাইনামিজমের সঙ্গে পার্থিব উন্নতি করা যায় না। অপরপক্ষে অতখানি ডাইনামিজমের সঙ্গে পার্থিব উন্নতি করার পর প্রেমের মূল্য সত্যের মূল্য প্রভৃতির জন্যে আর তেজ বাঁধ থাকে না। অক্ষমের বিলাপ রাষ্ট্রনায়কদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। দু'দিক মেলাতে না পেরে সভ্যতা দ্বিতীয় দিকেই ঝুঁকেছে। এতে আদর্শবাদীরা সায় দিতে নারাজ। কিন্তু প্রথমদিকে ঝুঁকলে কি বস্তুবাদীরা সেটা মেনে নিতেন? আর বস্তুবাদীরাই তো এখন সর্বত্র ক্ষমতাশালী। ধনতন্ত্রও কি বস্তুবাদী নয়? আদর্শবাদীরা কোথাও সুখী নন। কারণ কোনোখানেই তাঁদের কথায় কাজ হয় না। অথচ তাঁরা যে একেবারে ব্যর্থ তাও নয়। তাঁরা বীজ বুনে যান।

"জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" রবীন্দ্রনাথের মতো এ বিশ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য লিবারলদেরও ছিল। তাঁরা নিজেরাও ভুলে-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথকেও ভুলিয়েছিলেন। টলস্টয়কে ভোলাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ যা সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন টলস্টয় তা সমস্ত প্রাণ দিয়ে অবিশ্বাস করেছিলেন। সে অবিশ্বাস গান্ধীর মনেও সঞ্চারিত করে-ছিলেন। তাই তাঁদের "বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল" না।

সংকট যদি দেশনামাঙ্কিত বিশেষ কোনো এক সভ্যতার হতো তাহলে কবি "সভ্যতার সংকট" না লিখে "পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট" বা "পশ্চিমের অত্যাচারে ভারতীয় সভ্যতার সংকট" লিখতেন। তা তো তিনি করেননি। তিনি সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার সংকটের কথাই বলেছেন। বলেছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। গেয়ে উঠেছেন, "ঐ মহামানব আসে।" বলা বাহুল্য, "মহামানব" কথাটির অর্থ এখানে মহাপুরুষ বা মহান ব্যক্তি নয়। এ হচ্ছে সেই অর্থে "মহামানব" যে অর্থে এর ব্যবহার হয়েছিল "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" মধ্যজীবনে যাকে কবি দেখেছিলেন তাঁর স্বদেশে, জীবনের শেষপ্রান্তে তাকেই দেখলেন তাঁর সর্ববিশ্বে। মহামানব হচ্ছে বিশ্ব-মানব বা সর্বমানব। মানব ঐক্যের অভ্যুদয় তিনি আসন্ন বলে জেনেছিলেন।

মহামানব যদি জাগে তবে সংকটমোচন হবে বইকি। কিন্তু তার আগে ভালো করে রোগনির্ণয় করতে হবে। সংকটটা কেন? কী নিয়ে? এই ভারতের ঐক্য একদিন কবির কাছে ধ্রুব সত্য ছিল। অথচ এই ভারতই ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল। খ্রীস্টীয় সঙ্ঘের ছত্রতলে পশ্চিমের মানুষও তো একদা খ্রীস্টেনডম রচনা করেছিল। কোথায় সে আজ? মানব ঐক্য যেমন বিভিন্ন ধর্মমতের দ্বারা

বিভক্ত হয়েছিল তেমনি বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা বিভক্ত হয়েছে ও হতে যাচ্ছে। এসব মতবাদ কেবল যে বিভিন্ন তাই নয়, পরস্পরবিরুদ্ধ ও বিপরীত। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে কমিউনিজমের না হয় একটা বোঝাপড়া হলো, কিন্তু রেনেসাঁসের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী জীবনাদর্শের বোঝাপড়া আরো কঠিন। আবার সেই জীবনাদর্শের সঙ্গে আদি খ্রীস্টান বা আদি বৌদ্ধ জীবনাদর্শের বোঝাপড়া অধিকতর কঠিন। টলস্টয় বা গান্ধী যে কোনো অবস্থায়ই অস্ত্র ধরবেন না। মানুষের কাছে দাবী করবেন বীরের অহিংসা।

মহামানব ধীরে ধীরে জাগছে। ইউনাইটেড নেশনস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তার বার্তা বহন করে এনেছে। কিন্তু এখনো রাত অনেক বাকী। এখনো রোগ-নির্ণয় হয়নি। এখনো স্থির হয়নি সভ্যতার অসুখ করেছে, না সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ। গান্ধীজী মনে করতেন আধুনিক সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ, সে অসুখ প্রথমে ইউরোপের হয়, তার পরে ইউরোপ তাকে দিকে দিকে ছড়ায়, ভারতেও তাঁর ছোঁয়াচ লেগেছে কলকাতা বম্বে প্রভৃতি শহরগুলোয়, সে ছোঁয়াচ তিনি গ্রামগুলির গায়ে লাগতে দেবেন না। আধুনিক সভ্যতা বলতে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা বুঝতেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে বুঝতেন খ্রীস্টান সভ্যতা, যা ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। তার সঙ্গে তাঁর কোনো ঝগড়া ছিল না। তাঁর ঝগড়া একালের বৈজ্ঞানিক নাগরিক যান্ত্রিক নিরীশ্বর সভ্যতার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধীজীর অনুরূপ নয়। তিনি সারাজীবন চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে মেলাতে। এই কাজে যখনি যেদিক থেকে বাধা পেয়েছিলেন তখনি সেইদিকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বা অভিমান করেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার যেটা দানবিক বা বর্বর দিক সেটার নিন্দাবাদ "নৈবেদ্য"তেই যথেষ্ট তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, "সভ্যতার সংকট"-এর অপেক্ষা রাখেনি। সেই যে "দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী" সে তো তাঁর বহুকালের চেনা। "চিতার আগুন পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার বিস্ফুলিঙ্গ" বলেই পরমুহূর্তে বলেছেন, "স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।" তার মানে কি এই হলো যে সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাটাই অসভ্যতা বলে বর্জনীয়? তাই যদি হতো তবে প্রাচ্য বিদ্যা ও প্রতীচ্য বিদ্যাকে একনীড়ে মিলিত করার জন্যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে হতো না। বরাবরই এ বিশ্বাস কবির মনে দৃঢ়মূল ছিল যে আধুনিক ইউরোপের একটা মানবিক দিকও আছে, সেটাই তার প্রকৃত সত্য, সেই সত্যকে স্বীকার না করে মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরে যাওয়াটা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। সেটাকে তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের অন্ধকার বা পশ্চাদ্দিকে পদক্ষেপ। সেদিক থেকে আগেই তিনি বাধা পেয়েছিলেন, তাকে "শিকলদেবীর ঐ যে পূজারেদী" বলে নিন্দা করেছিলেন। তাঁর "দুর্ভাগা দেশ"কেও বাক্যবাণে জর্জর করেছিলেন।

না, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার উপর এতদূর অপ্রসন্ন ছিলেন না যে তাকে একটা অসুখ বলে এক কথায় খারিজ করবেন। যখনি কোনোরূপ বিশেষণ না বসিয়ে "সভ্যতা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তখনি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা অর্থে করেছেন বললে ভুল হবে না। "সভ্যতা"কে কি পাইকারিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়? যুক্তি যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ করা চাই, সংস্কার যাই বলুক না কেন। ইতিহাস যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ করতে হয়, ঐতিহ্য যাই বলুক না কেন। জ্ঞান-পিপাসা ও রসপিপাসা যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ না করলে ক্ষতি, স্বাদেশিকতা যাই বলুক না কেন। "সভ্যতা"কে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের দিক থেকে আপনার করে নিয়েছিলেন বলেই তার সঙ্কট তাঁকে এতখানি বিচলিত করেছিল। অভিমান ছিল ইংরেজের উপরে, ঘৃণা ছিল সাম্রাজ্যবাদের উপরে, অন্যায়ের উপরে, কিন্তু "সভ্যতা"র উপরে যেটা ছিল সেটা তার অন্তর্নিহিত মানবিকতার উপর বিশ্বাস। "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষপর্যন্ত রক্ষা করব।" তাঁর এই উক্তির মধ্যস্থিত "মানুষ" ইউরোপীয় সভ্য মানুষ। যার দানবিকতায় তিনি বিক্ষুব্ধ। অথচ যার মনুষ্যত্বে তিনি বিশ্বাসবান।

মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে গ্রহণও করবেন না, নির্বিচারে বর্জনও করবেন না। বিচারের অধিকার নিজের হাতে রাখবেন। জাতীয়তাবাদীদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। বর্জনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ তিনি অসহযোগ আন্দোলনের দিন ঘোষণা করে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। আবার গ্রহণবাদ সম্বন্ধেও তাঁর দ্বিধা তিনি কখনো গোপন করেননি। চীনদেশে গিয়ে একটি বক্তৃতায় বলেন,

"The word 'civilization' being a European word we have hardly yet taken the trouble to find out its real meaning. For over a century we have accepted it, as we may accept a gift horse, with perfect trust, never caring to count its teeth. Only very lately we have begun to wonder if we realize in its truth what the western people mean when they speak of civilization." (*Civilization and Progress*, lecture delivered in China in 1924, See *Talks in China*.)

গান্ধীজী শুনলে বলতেন, ঐ খয়রাতী ঘোড়াটাকে ওর আস্তাবলে ওয়াপস পাঠালেই তো হয়। দাঁত না গুনে গ্রহণ করেছিলে বলে চিরকাল পুষতে হবে এমন কী কথা আছে? কিন্তু গুরুদেবের মনটা অতখানি লজিকাল ছিল না। জীবনের শেষপ্রান্তেও তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেননি। "মহামানবে"র উপরে বরাত দিয়ে মহাবিদায় নেন। বছর কয়েক পরে ইংরেজও চিরবিদায় নিল। কিন্তু ঘোড়াটা থেকে গেল। ওটার সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা এখনো কাটেনি। বর্জনবাদীরাও নিরস্ত হননি।

ওদিকে পশ্চিম ইউরোপের পুনর্বিন্যাস জোর কদমে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী অধ্যায় শেষ হয়ে এলো। পুঁজিবাদী অধ্যায় ইতিমধ্যে এমন একটা মোড় নিয়েছে যে শ্রমিকরাও পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত profit motive স্বীকার করেছে। তাহলে সমাজতন্ত্র পত্তন করবে কে? পুঁজিবাদের ছায়ায় সমাজতন্ত্র বাঁচবে কেন? বাড়বে কেন? দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদ এখনো জরাজীর্ণ হয়নি। তার ঐতিহাসিক ভূমিকা এখনো সমাপ্ত হয়নি। সাম্রাজ্য হারালেও সে প্রচুর লাভ করে ও লাভের ভাগ দিয়ে শ্রমিককে জুনিয়র পার্টনার বানায়। কমিউনিজম সফল হয়েছে বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নয়, বনেদী ফিউডাল দেশগুলিতেই। ফিউডাল ব্যবস্থা যে দেশে নেই সে দেশে কমিউ-নিজম দাঁত বসাতে পারে না। আয়ু ফুরিয়েছে ফিউডাল ব্যবস্থারই, ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার নয়, গণতন্ত্রী ব্যবস্থারও নয়।

এখন আমাদেরও কিছু দেবার পালা। বর্জন ও গ্রহণ ছাড়া তৃতীয় একটি কথা আছে—তার নাম দান। পৃথিবীর লোক আমাদের দিকে চেয়ে আছে চাতকের তৃষা নিয়ে। কী দান করব তার ধ্যান করা যাক। সে যেন পুরাতনের চর্বিতচর্বণ না হয়। কবেকার সেই প্রাচীন ভারতকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে গেলে বোঝা যাবে আমাদের আর নতুন কিছু দান করবার নেই। হাজার চেষ্টা করলেও অতীতের সে ডাইনামিজম তো ফেরবার নয়। অতীতের কাছ থেকে উপাদান আহরণ করতে পারি। কিন্তু তাতে গতিবেগ সঞ্চার করব কোন মন্ত্রবলে? পুনরুত্থানবাদী চিন্তা একদা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল, গান্ধীজীর মধ্যে তো ছিলই। আধুনিক ইউরোপের প্রতিপক্ষরূপে তাঁরা খাড়া করেছিলেন প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতকে। সে ধরণের চিন্তা তাঁদের জীবদ্দশাতেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দেশ থেকে এখনো বিলুপ্ত হয়নি। সহজে হবেও না। এখনো ভারতের বৈশিষ্ট্য বলতে লোকে বোঝে পুরাতনের বৈশিষ্ট্য। যেন ইতিহাস একটা অচল ঘড়ির মতো কবে থেকে থেমে রয়েছিল, সবে চলতে আরম্ভ করেছে। এই যদি সত্য হয় তবে আবার থামতে কতক্ষণ!

চাই অভিনব ডাইনামিজম। তা আমাদের ভিতর থেকেই উৎসারিত হবে। অতীতটাও আমাদের বাইরে। কেবল সেইটুকুই তার কাছ থেকে আমাদের নেবার যেটুকু এখনো সজীব ও প্রাণবান, যা অতীত হলেও অতিক্রান্ত নয়, যা বহুপুরাতন হলেও নিত্য নূতন। অপরপক্ষে পশ্চিমের সবটাই আমাদের বাইরে নয়। স্পেসের দিক থেকে যেটা বাইরে সেটার কতক হয়তো টাইমের দিক থেকে আমাদের ভিতরে। এই জটিল তত্ত্বটাকে আমি সরল করে বোঝাতে পারব না। শুধু একটা উদাহরণ দেব। সেটা রবীন্দ্রনাথেরই জবানীতে। "কালান্তর" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবী আমরা মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের

সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে, "A man is a man for a' that."—বলা বাহুল্য এ তত্ত্বটি গীতা উপনিষদ্ বা রামায়ণ মহাভারত থেকে পুনরুদ্ধৃত হয়নি। বাইরে থেকে এসেছে, সেইসঙ্গে ভিতর থেকেও। দেশটা বাইরে, যুগটা ভিতরে। রবার্ট বার্নস আমাদের দেশতুতো ভাই নন, কিন্তু কালতুতো ভাই। সে হিসাবে অনেক ভারতীয় কবির চেয়েও আপনার। অভিনব ডাইনামিজম সমকালের ভিতর থেকেই পাব। এ ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে যে যা কিছু সমকালীন তাই ডাইনামিক নয়।

সমকালীন সভ্যতা এখন অবিভাজ্য। দেশ অনুসারে পার্থক্য আছে ও থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পার্থক্যটাকেই যদি একান্ত করে দেখি তবে স্বকাল আচ্ছন্ন হবে স্বদেশপ্রেমের আবেগবাষ্পে। সংকট এখন আর দেশ অনুসারে বিশ্লিষ্ট নয়। একই সংকটই সর্বত্র ঘনিয়ে আসছে। প্রেয় যদি একদিকে টানে আর শ্রেয় আরেক দিকে, যদি সামঞ্জস্যের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় তবে সংকট অনিবার্য। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ হয়তো এর থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু কোটি কোটি মানুষের সমাজ বা সমষ্টি কি আগে আগুনে হাত না পুড়িয়ে কোনো দিন কিছু শিখেছে? তার শিক্ষার পদ্ধতিই হলো আগুনে হাত দেওয়া। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনায়াসেই এড়ানো যেতে পারত, কিন্তু এড়ানো গেল না। তেমনি এ যুগের দুই মহাযুদ্ধ। তেমনি ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লব।

তারপর ইতিহাসের এই অধ্যায় শুধু শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে প্রেয়কামনার সংঘাত নয়। তা যদি হতো তবে তো অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে যেতো। সংঘাতে শ্রেয়োবুদ্ধির জয় কিংবা সভ্যতার লয় হতো। প্রেয়কামনা কাজ করছে বইকি। তা তো স্পষ্ট। কিন্তু তার অন্তরালে ক্রিয়া চলেছে ঐতিহাসিক পুনর্বিন্যাসের। "মন্দ" বলে তাকে এক কথায় খারিজ করে দেওয়া চলে না। আবার "ভালো" বলে তাকে অন্ধভাবে মাথা পেতে নেওয়াও যায় না। নীতিনিপুণরা যদি তার বদলে এমন কোনো পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব নিতেন যা ষোলো আনা "ভালো", যার কোথাও এতটুকু "মন্দ" নেই, তাহলে তো মানুষ বেঁচে যেতো। মানুষের পক্ষে মনঃস্থির করা এমন দুঃসাধ্য হতো না। কিন্তু "ভালো" আর "মন্দ" বলে দু'রকম দুটো পুনর্বিন্যাস প্রস্তাব আমাদের সামনে নেই। নীতিনিপুণদের অধিকাংশই পুনর্বিন্যাস চান না, তাঁরা তাঁদের সেই খ্রীস্টীয় বা ইসলামী বা বৌদ্ধ বা কনফিউসীয় বা বর্ণাশ্রমী বিন্যাসেই সন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে কাল বদলে গেছে, এ কালের উপযোগী পুনর্বিন্যাস চাই, তাঁরাও বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আর্টকে বাদ দিয়ে ভোগকে বাদ দিয়ে এমন এক পুনর্বিন্যাসের কথা বলেন যে মনে হয় রেনেসাঁসটা একটা প্রক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ। নীতিনিপুণদের ছেড়ে দিলে পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব আর যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা যতগুলি পন্থা নির্দেশ করছেন প্রত্যেকটি ভালোয়-মন্দে মেশা। কোনোটাই সম্পূর্ণ শুদ্ধ বা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ নয়।

তা বলে নীতির প্রশ্ন গৌণ হয়ে যায় না। কাজ চালানো গোছের পুনর্বিন্যাস নিয়েও মানুষ সুখী হবে না, যদি না তার বিবেক পরিষ্কার থাকে, তার হৃদয় কোমল থাকে, তার আত্মা তার নিজের থাকে। খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে সেই পন্থাকে যাতে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিবেক দেহমন আত্মার পূর্ণতর সামঞ্জস্য সম্ভব। পরাজয়বাদী হচ্ছে সেই জন যে বলে, অসম্ভব। কিন্তু কেন আমরা পরাজয়বাদী হব? "হবে জয়, হবে জয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়?"

(১৯৬১)

কালপরিক্রমা

(শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত)

(১)

প্রীতিভাজনেষু,

দেশ, কাল ও পাত্র এই তিন মিলে পূর্ণ সত্য। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পাত্রদের প্রসঙ্গে দেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কালও তেমনি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এবং গোটা আধুনিক যুগ সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে এদের বিষয়ে লিখতে গেলে লেখা একদেশদর্শী হবেই। সুতরাং কালপরিক্রমা অত্যাবশ্যক। আমি আমার স্বল্প জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক অনুযায়ী কালপরিক্রমা করছি।

রবীন্দ্রনাথ যদি আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতেন, "গান্ধীর মতো" তাহলে আমি নিরাশ না হয়ে আশান্বিত হতুম। গান্ধীজীর পরীক্ষা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সব মানুষের হয়ে তিনি moral equivalent of war নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সফল হলে মানবনিয়তি বদলে যেত। পারমাণবিক যুদ্ধে মনুষ্যবংশ ধ্বংসের আশঙ্কা থাকত না। আমার প্রবন্ধের* শেষ কয় লাইনে আমি এরই ইঙ্গিত দিয়েছি। মানবিকবাদ যথেষ্ট নয়—তার উপর আরো কিছু চাই। সেটা হিংসা-প্রতিহিংসার vicious circle থেকে বেরোবার পথ। যে দেশ এই পথ খুঁজে বার করবে সেই দেশই বিশ্বমানবের অগ্রণী হবে। একসময় আমার মনে হয়েছিল ভারতবর্ষ সেই দেশ। এখন আমি অতটা নিশ্চিত নই। পৃথিবীর দৃষ্টি এখন Bertrand Russell-এর উপরে।

শান্তিনিকেতন,
১৯শে অক্টোবর ১৯৬১

* "মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ"

(২)

এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে মোগলরাজত্ব আরো দুশো বছর কায়েম হলে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জন্মযুদ্ধ হতো বা পেশোয়ার রাজত্ব আরো দুশো বছর স্থায়ী হলে গণতন্ত্রে পর্যবসিত হতো বা শিখরাজত্ব আরো দুশো বছর দৃঢ়মূল হলে মিলিটারির উপর সিভিল ঘোড়সওয়ার হয়ে বসত বা টিপু সুলতানের রাজত্ব আরো দুশো বছরের বনেদী হলে অহিংসাবাদী সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতো বা বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি আরো দুশো বছর ঝুলে থাকলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারিত হতো। এসব কাম্যবস্তুর জন্যে অন্যান্য দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে, রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে, বিপ্লব বেধেছে, লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে। আমরা কি ইতিহাসের প্রিয়পুত্র যে এসব কাম্যবস্তু বিনা দুর্ভোগে পেয়ে যেতুম ও বিনা শুল্কে ভোগ করতুম ? ইংলণ্ডের ইতিহাসে যা যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হয়েছে, যার জন্যে তারা বহু দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে গেছে, আমরা তা এত কম সময়ের মধ্যে এত কম ত্যাগের দ্বারা কোন্ মন্ত্রবলে লাভ করতুম ? এসব কাম্যবস্তুর মূল্য কত সে সম্বন্ধে সজ্ঞান না হলে এগুলি হারাতে কতক্ষণ ? শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন ছিল, তা পরাধীনতার বেশ ধরে এলো।

৩রা নভেম্বর ১৯৬১

(৩)

এটি আমার কালকের চিঠির পুনশ্চ।

দেশবিভাজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গান্ধীজীর অজ্ঞাতসারে। শুনেই তিনি বললেন, "অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে দেশ ছারখার হয়ে যাওয়া শ্রেয়। হোক civil war।" পরে তিনিই দেশের অবস্থা বুঝে কংগ্রেস-ওয়ালাদের সভায় (A. I. C. C.) বললেন, "মেনে নিতে হবে। Good will come out of evil." আমি সেদিন অত সহজে সান্ত্বনা মানিনি। এখনো প্রতিদিন ভাবি। ও ছাড়া কি উপায় ছিল না ? কেন evil-কে মেনে নিতে হলো ? Good একদিন আসবে বলে ? ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করছি যে historical reality চলে তার নিজের নিয়মে। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। আগুনের ওটা অন্যায়। কিন্তু ইহাই নিয়ম। যে দেশে বহু সম্প্রদায়, বহু ভাষা, বহু জাত, বহু স্বার্থ সে দেশে যদি অত্যন্ত গভীর ঐক্যবোধ না থাকে, যদি গোঁজামিলকেই ঐক্য বলে চালিয়ে দেওয়ার মানসিক বদ্ অভ্যাস থাকে, তাহলে সে দেশ civil war-এ জর্জর হবেই। Civil war এড়াতে হলে দেশবিভাজন ভিন্ন অন্য কোনো উপায় ছিল না, যদি না ইংরেজ রাজত্বকেই একটা উপায় বলে অনন্তকাল আঁকড়ে ধরা যেতো। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কয়েকটা রচনার কথাই সকলে বলেন। আগের দিকের রচনায় বার বার বলা হয়েছে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলুক, তার পরা

ইংরেজ যাবে। ইংরেজশাসনকে তিনি lesser evil মনে করতেন। গান্ধী তা মনে করতেন না। গান্ধী মনে করতেন civil war-কেই lesser evil। কংগ্রেস নেতারা তা মনে করতেন না। কংগ্রেস নেতারা মনে করতেন দেশ বিভাজনকেই lesser evil। অবশেষে এই lesser evil-কেই গান্ধীজীও মেনে নিলেন, এর থেকে good উঠে আসবে আশা করলেন। আমিও একটু একটু করে বুঝতে পারছি যে good has come out of evil। দেশ ভেঙে গেছে এটা যেমন সত্য, জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র-অভিমুখী নিরপেক্ষ আধুনিক গণতন্ত্র গড়ে উঠছে এটাও তেমনি সত্য। গত দুশো বছরের ইতিহাসও এমনি evil থেকে good উদ্গত হওয়ার ইতিহাস। Evil-কে আমি উড়িয়ে দিইনি। পরাধীনতা নিশ্চয়ই evil। কিন্তু সে evil-কে আমরাই ডেকে এনেছিলুম lesser evil বলে। 'আনন্দমঠ' দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথও "providential" বলেছিলেন তাকে। '*Nationalism*' দ্রষ্টব্য।

আমি গান্ধীবাদী নই। রবীন্দ্রবাদীও নই। আমি প্রেমবাদী, সৌন্দর্য-বাদী। আমার সাধ্য অনুসারে সত্যবাদী। সাধ্য অনুসারে বলছি তার কারণ, এখনো আমি প্রাণ খুলে সব চিন্তা, সব অনুভূতি, সব দর্শন, সব পরীক্ষণ প্রকাশ করতে পারিনে। এই তো 'রত্ন ও শ্রীমতী' লিখতে লিখতে থেমে গেলুম। আরো এগোলে বিপদে পড়তুম। আবার একখানা বড় উপন্যাসের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। কিন্তু যার পিছনে পঁচিশ বছরের প্রস্তুতি ছিল তাই যখন সারা হলো না তখন দু'পাঁচ বছরের প্রস্তুতি নিয়ে আরেকখানা কি সমাপ্ত করতে পারব ? হয়তো এর জন্যে আমাকে বাংলাদেশ ছাড়তে হবে। হয়তো ভারত ছাড়তে হবে। মন তা চায় না। কিন্তু জীবনে তো অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সত্য মানুষের কাছে অনবরত অপ্রিয় সিদ্ধান্তের দাবী জানায়। মানুষ তার সাধ্য অনুসারে সাড়া দেয়। যেদিন দেখব সাড়া দিতে আমার সাধ্য নেই সেদিন জানব যে আমাকে দিয়ে কোনো বড় বই (আকারে বড় বলছিনে) হবার নয়। খুচরো লেখায় অবসাদ এসেছে। আস্তে আস্তে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি। একেবারে গুটিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। সম্পাদকেরা নাছোড়বান্দা। তাঁদের প্রীতি আমাকে অভিভূত করে।

যা বলছিলুম। আমি গান্ধীবাদী নই। কিন্তু আমার বিশ্বাস গান্ধীজীই এ দেশের ও এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ বীর। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই আমার গভীর সম্পর্ক, কিন্তু সে সম্পর্ক একই রকমের নয়। প্রথমে uncritically গ্রহণ করেছি, তার পরে critically বর্জন করেছি, তার পরে critically গ্রহণ করেছি, তার পর uncritically গ্রহণ করেছি, তার পরে critically গ্রহণ করেছি। কিন্তু সব সময়েই ভালোবেসেছি, ভক্তি করেছি। তাঁর শূন্য স্থান কেউ পূরণ করেননি। কিন্তু আমি আমিই। কারো কাছে বুদ্ধি বিবেক স্বাধীনতা বাঁধা দিইনি, দেব না।

আমি কি "মজ্জাগত ইউরোপপ্রেমিক ?" হাঁ, কিন্তু সেই সঙ্গে মজ্জাগত ভারতীয় জনগণপ্রেমিক। ছেলেবেলা থেকে একবার এদিকে হেলি একবার

ওদিকে ঢলি। দুই বিরুদ্ধ আকর্ষণ আমাকে ত্রিশংকুর মতো ঝুলিয়ে রেখেছে। না যেতে পারলুম ইউরোপে ফিরে, না জনগণের মাঝখানে গ্রাম্য কুটীরে। শান্তিনিকেতনে সময়পাত করছি suspended অবস্থায়। এভাবে বেশীদিন চলবে না। দশ বছর কেটে গেল। একুশ বছরের সরকারী জীবনের মতো এরও একদিন ইতি হবে। অনিচ্ছায় নয়, স্বেচ্ছায়। সানন্দে। আপাতত এই indecision শিরোধার্য করে নিয়েছি।

আমি কি "মজ্জাগত ইউরোপপ্রেমিক?" হাঁ, কিন্তু তার মানে এ নয় যে আমি যুদ্ধবিগ্রহ শাসন শোষণ ইত্যাদি ভালোবাসি। বাল্যকাল থেকে আমি Tolstoy-এর প্রভাবে মানুষ হয়েছি। ইউরোপীয় সভ্যতাকে তাঁর মতো চিনেছে বুঝেছে সমালোচনা ও নস্যাৎ করেছে কে? বিদ্বেষ থেকে নয়, মূলনীতির দিক থেকে। আমিও তাই করতে গেছি, কিন্তু তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। কারণ যদি Christian values ছাড়া আমি আর এক প্রস্থ values মানতুম ও মানি। সেগুলি Renaissance বা humanist values। এর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন পোষণ ইত্যাদি জড়িয়ে গেছে বলে জট খুলতে পারা যাচ্ছে না। খুললে দেখা যাবে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, তনুসৌন্দর্য, জ্ঞানের জন্যে জ্ঞান, আর্টের জন্যে আর্ট, রোমান্টিক প্রেম ইত্যাদি সূত্রগুলি মানবাত্মার অগ্রগতির দ্যোতক, অধোগতির নয়। Tolstoy-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যত গভীর, Renaissance-উত্থিত ইউরোপের সঙ্গে আমার affinity তত নিবিড়। তা হলেও আমি ইউরোপীয় নই, কারণ আমি বৈষ্ণব ও সহজিয়াদের মতো লীলাবাদী ও রসিক। বাউলদের সঙ্গেও আমার affinity আছে। সুফীদের সঙ্গেও।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬১

(৪)

আপনার তিনখানি চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি।

গান্ধীজীর সত্যের অন্বেষণ বৈজ্ঞানিকদের মতো। তথ্য দেখে তিনি একটি working hypothesis খাড়া করতেন। যখন নতুন তথ্যের সঙ্গে খাপ খেতো না তখন hypothesis বদলাতেন, তথ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেন। আবার তার বিপরীতটাও করতেন। অর্থাৎ তথ্যকেই বদলে দেবার জন্যে কোমর বাঁধতেন। ইতিহাস সৃষ্টি করতেন। এখানে তিনি বৈজ্ঞানিক নন। তিনি man of action। তিনি সংস্কারক ও বিপ্লবী।

তেমনি একটি working hypothesis ছিল 'হিন্দ স্বরাজ'। নিশ্চয় মূল্যবান। কিন্তু বেদ কিংবা বাইবেল নয়। আমি তো বেদ বাইবেলকেও অভ্রান্ত মনে করিনে। গীতাকেও না। আমার সত্য আমার নিজের পরীক্ষণ ও উপলব্ধি নির্ভর। সাহায্য নিই বাইবেলের, গীতার, উপনিষদের। 'হিন্দ স্বরাজ' last word নয়। গান্ধীজীর শেষজীবনে তিনি একে অতিক্রম করে অনেক দূরে চলে গেছলেন। শেষ বয়সের রচনা বা ভাষণ খুঁটিয়ে পড়লে দেখবেন

একটি dynamic personality কাজ করছে। যার কাছে বেদবেদান্তও শেষ কথা নয়। গান্ধীজীই সত্যিকার ভারতবর্ষ, কারণ তিনি এক মুহূর্তও স্থির নন, "শুচি" নন, এমন কি সাবেক অর্থে নীতিনিপুণও নন। তাঁর রকম দেখে নোয়াখালিতে নির্মল বসু পর্যন্ত shocked!

১০ই নভেম্বর ১৯৬১

(৫)

ঐতিহাসিক তথ্য কেন ঘটল তার কারণ অনুসন্ধান করা ভালো, কিন্তু কেন ঘটল বলে তার সঙ্গে ঝগড়া করে ফল নেই। যা দেড়শো বছর কি দু'শো বছর আগে ঘটে গেছে বা দেড়শো দু'শো বছর ধরে ঘটেছে তা অঘটিত হবে না। ইতিহাসকে unwrite করার ক্ষমতা কারো নেই।

তবে তাকে undo করতে পারা যায়। যদি মনে করেন ব্রিটিশশাসন evil তবে তার বিরুদ্ধে সারা দেশের জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে অভিযান করতে পারেন, তাকেও বুঝিয়ে তার অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে পারেন। কিন্তু 'evil', 'evil' বলে মালা জপ করে তার থেকে উদ্ধার নেই।

তেমনি দেশবিভাজনকে যদি evil বলে স্থির সিদ্ধান্ত করে থাকেন তবে তার বিরুদ্ধেও সদলবলে অভিযান করুন। সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে দায়ী যাঁরা তাঁদের বুঝিয়ে তাঁদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করুন। তাকে মেষপালের মতো মেনে নিতে বলছে কে? তাকে অহিংস উপায়ে undo করা অসম্ভব নয়। শুধু হিংসা প্রতিহিংসা দিয়ে undo করতে যাওয়াটাই দৃষ্য। সেটা নিষ্ফলও। দেশ যেদিন সত্যই সাম্প্রদায়িক ব্যাধিমুক্ত হবে—প্রথমে হিন্দুরা ও শিখরা, পরে মুসলমানরা—সেদিন সেই সত্যই দেশবিভাজনকে undo করবে। আলো জ্বললে আঁধার মিলিয়ে যায়। ভালো জাগলে মন্দ মিলিয়ে যায়। ভালোবাসলে বিরোধ মিলিয়ে যায়।

ব্রিটিশশাসনকে evil বলে undo করতে চাওয়া এক। পাশ্চাত্য সভ্যতা বা আধুনিক সভ্যতা বা industrialisation-কে evil বলে undo করতে চাওয়া আরেক। প্রথমোক্ত ব্রতে জবাহরলাল ছিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে একমত। দ্বিতীয়োক্ত প্রশ্নে জবাহরলাল একমত নন। রবীন্দ্রনাথও না। দেশের একটা অতি প্রভাবশালী অংশ—intelligentsia—এ বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে একমত নন। এঁদের সঙ্গে যুক্তি করতে হবে, তর্ক করতে হবে, এঁদের বোঝাতে হবে, convince করতে হবে, তবে যদি এঁদের মত বদলায়। আর নয়তো এঁদের আশা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে জনগণকে ভজাতে হবে, জাগাতে হবে।

সেদিন 'গান্ধীমার্গ' সম্পাদক রামচন্দ্রন এসেছিলেন। বললেন, "আমরা দেশের intellectual-দের চাই।" বেশ তো। দেশের intellectual-রাও রাজী। কিন্তু এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর তাঁদের moral conviction চাপিয়ে দিলে তো হবে না। আপনি যাকে evil বলেন আমি যদি তাকে evil না বলি, তা হলে? যদি বলি lesser evil than caste, priestcraft,

asceticism ? যার কেবলমাত্র অতীত আছে ভবিষ্যৎ নেই তাকে নাড়া দিলে সে মরা ডালের মতো ভেঙে পড়ে। কিন্তু যার প্রচুর সম্ভাব্যতা আছে, যে বন্ধ্যা নয় গর্ভিণী, তাকে কেমন করে হটাবেন ? 'পরধর্ম' বললেও বুদ্ধিজীবীরা ভুলবেন না, কারণ তাঁরা পরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েই বুদ্ধিজীবী হয়েছেন। টোলে মক্তবে পড়েননি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও না। তাহলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীটাকেও পরগাছা বা পরধর্মী বলে খেদাতে হয়। অথচ এঁরাই রাষ্ট্র চালাচ্ছেন, রাজ্য চালাচ্ছেন। এঁরাই এখনকার ইংরেজ। "পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

১০ই নভেম্বর ১৯৬১

(৬)

প্রথমে ইচ্ছা ছিল না রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে কিছু লিখি। শুধু চেয়েছিলুম কবির সব লেখা আরেকবার পড়তে। হয়ে উঠল ঠিক বিপরীত। পড়ার সময় পেলুম না। সম্পাদকের চাপে লেখা শুরু করে দিলুম, প্রকাশকও তাঁর দাবী জানালেন, আর আমার নিজেরই ইচ্ছা করল রবীন্দ্রনাথকে এ-বিশ্বের বহমানকালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ও দেখাতে। দেশকেন্দ্রিক আলোচনা তো যথেষ্ট হয়েছে। যুগকেন্দ্রিক কোথায় ?

যুগ আমার কাছে দেশের মতনই সত্য। মাটির মতনই সত্য আমার কাছে আলোবাতাস। যখনি অনুভব করেছি একদিকের ভার বেশী হয়ে যাচ্ছে তখনি অন্যদিকে ঝুঁকে ভারসাম্য রক্ষা করেছি। সেইজন্যে কখনো ঝুঁকেছি দেশের দিকে, কখনো কালের দিকে। এই মুহূর্তে ঝোঁক কালের দিকে। যদি অনুভব করি দেশের দিকটা হালকা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আবার দাঁড়িপাল্লা সমান রাখার জন্য দেশের দিকে নজর দেব। আমি balance হাতে নিয়ে বসে আছি, unbalanced কখনো হব না। হলে ক্ষণকালের জন্যে, বরাবরের জন্যে নয়।

তেমনি একটা balance করা চলেছে হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের। কখনো এটা কখনো ওটা ভারী হয়। এই মুহূর্তে intellect-এর পাল্লা ভারী। এও ক্ষণকালের জন্য। এই পর্যায়ের লেখাগুলো শেষ হয়ে আসছে।

১৮ই নভেম্বর ১৯৬১

কবিগুরু

কবিগুরু হেসে বললেন যে "রাখী" নামটা তাঁরই কল্পনায় ছিল, আমি কেমন করে জানতে পেরে আমার কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছি। তার পর বইখানা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "এ ভুলটা অনেকেই করে। তুমিও করেছ দেখছি।"

আমি তখন ভয়ে কম্পমান। কী জানি কী ভুল ধরা পড়ে গেছে।

"কথাটা অমৃত, অম্বিত নয়।" এই বলে তিনি উচ্চারণের তফাৎ বুঝিয়ে দিলেন। প্রথমে "অ" উচ্চারণ করে "মৃত"। পরে "অম" উচ্চারণ করে "রিত"।

বলা বাহুল্য ছন্দের দিক থেকে ঘোরতর পতন। আমি তখন লজ্জায় অধোমুখ। কবি আমারি কবিতা আমাকে পড়ে শোনালেন। বুঝলুম কানের মাথা খেয়ে বসে আছি।

রবীন্দ্রনাথ যখন আমার বইখানি একপাশে সরিয়ে রাখলেন তখন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি মনে মনে বললুম, নিউকাসলে কয়লা বয়ে আনা আর কবিগুরুর কাছে কবিতা বয়ে আনা একই রকম ব্যাপার নয় কি ?

ভেবেছিলুম ব্যাপারটা ওইখানেই মিটল। তিনি আর আমার কবিতা দ্বিতীয়বার পড়বেন না। আমাকে আর উৎসাহ দেবেন না।

শান্তিনিকেতন থেকে বহরমপুরে ফিরে এসেই পেলুম পর পর দুই চিঠি। দ্বিতীয়টির সঙ্গে তাঁকে উপহার দেওয়া আমার কবিতার বই। বইখানার পাতায় পাতায় তাঁর নিজের হাতের লেখা। তিনি যত্ন করে পড়েছেন ও সংশোধন করেছেন। আমি ধন্য।

"পরাভব শোক নিশ্বসিছে মোর চিতে" এই লাইনটির পাশের মার্জিনে তিনি লিখেছেন—"নিঃশ্বসে"।

"পথের সাথী, আমি কী নিরমম" এই লাইনের শেষের কথাটিকে নির্মম ভাবে কেটে করেছেন—"নির্ম্মম"।

"সবারে ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা" এই লাইনের গোড়ার দিকের "রে" কেটে করেছেন "য়"।

"তারই পায়ে সঁপি আমার সত্য ভালোবাসা" এই লাইনের প্রথম দুটি কথা তাঁর হাতে হলো "তাহারি পায়"।

"মরণেও বুঝি হবে না ইহার অন্য" এই লাইনের মাঝখানের "বুঝি" কেটে করলেন "কিছু"। তার পরে গোটা লাইনটাই পালটে দিয়ে তার জায়গায় লিখলেন—"মরণেও বুঝি এ ছাড়া হবে না অন্য"।

অন্য একটি লাইনের থেকে ছাপার ভুলে "সুন্দর" পড়ে গেছল। কবি নিজের হাতে বসিয়ে দিয়েছেন—"সুন্দর"।

"জন্ম জন্মান্তরের ফুলে" তাঁর সহ্য হলো না। প্রথমে কেটে করলেন—"নানা জন্মের নানা"। তার পরে লিখলেন তার নিচে—"নানা যুগের" হলে ছন্দের পক্ষে আরো ভালো হয়।"

"কালের কোলে গেছি রেখে" এই লাইনের অন্ত্য শব্দটি তাঁর হাতে হলো "ফেলে"।

এর পরের লাইনে ছিল "দিনে দিনে যা পেয়েছি"। যার সঙ্গে এর মিল দেওয়া হয়েছিল সে লাইনটি ছিল "দেখবে সবই রেখে গেছি।" কবির এটা ভালো লাগল না। তিনি "যা পেয়েছি" কেটে করলেন—"যা মেগেছি"।

মার্জিনে লিখলেন, "ক্রিয়াপদের মিল হলে খুব খাঁটি মিল হওয়া চাই।"

এই কারণেই পরবর্তী স্তবকের "যা সয়েছি যা হয়েছি" এই লাইনটির সঙ্গে আমি যে মিল দিয়েছিলুম সেটা তাঁর পছন্দ হলো না। "যা চেয়েছি যা পেয়েছি" কেটে করলেন—"যা চেয়েছি যা লয়েছি।"

"ধ্রুবতারা পাব কবে" লিখে আমি মিল দিয়েছিলুম, "আন তারা কিবা হবে।" এখানে "আন" কথাটা অচল বলে তিনি আস্ত লাইনটাকেই পালটে দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, বাড়িয়ে দিয়ে করলেন—"অন্য তারায় কী আমার বলো হবে।"

"আন ফল কিবা হবে" কেটে করলেন "অন্য ফলেতে কী আমার বলো হবে।"

"আন মণি কিবা হবে" তাঁর হাতে দাঁড়াল—"অন্য মাণিকে কী আমার বলো হবে।"

"আন দেখা কিবা হবে" কেটে লিখলেন—"অন্য দেখায় কী আমার বলো হবে।"

"আন সুর কিবা হবে" শুধরে দিয়ে করলেন, "অন্য সুরেতে কী আমার বলো হবে।" ততক্ষণেআমার কান তৈরি হয়ে গেছে। আমিও তাই করতুম।

"খুব খোয়ালেম আয়ুর পুঁজি" লিখে নতুন কিছু করা হলো ঠাওরেছিলুম। কবি তার প্রথম দুটি শব্দ কেটে দিয়ে লিখলেন—"শেষ করে দিই।"

"বাহিরে" লিখেছিলুম। তিনি "হি" কেটে করলেন "ই"।

"নয় কি মনোহর সে কত" এই লাইনটির "নয় কি" তাঁর হাতে হলো "হায় রে।" নিচে এক পাশে লিখলেন—"কত মনোহর কি নয়?"—ঠিক বাংলা হয় না।" এই বলে "কত"র নিচে রেখা টানলেন। তাঁর পর অন্য পাশে আধা ইংরেজী আধা বাংলায় লিখলেন—" Is it not how beautiful—যেমন হয় না।"

আমার মনে হয় এটা তিনি মুখেও আমাকে বলেছিলেন সেদিন।

আর একটি কবিতায় ছিল "তুমি পথে আর আমি পথে"। দেখি বন্ধনীর মাঝখানে লিখেছেন—"রথে?" ওটা অবশ্য আমার ইচ্ছাকৃত। তার পরের লাইনেও ছিল "পথে" শব্দটির পুনঃপ্রয়োগ। "চকিতের মতো থামি' পথে।" কবির এ সংশোধন আমি গ্রহণ করিনি।

"বুকে ভরি' লনু যাহা পারি" সত্যি অচল। কবি করেছেন "লনু" স্থলে "লই"।

এর পরেই বিভ্রাট। "কী যে অমৃত তুমি, নারি!" তাঁর কানে বাজল। তিনি প্রথমাংশ কেটে করলেন—"কী অমৃতময়ী"। মার্জিনে লিখলেন, "ঋ ফলা দুই মাত্রা নয় অর্থাৎ ওর উচ্চারণ অন্বিত নয়।"

আর একটি কবিতায় "ফিরিল" লিখে তার সঙ্গে মিল দিয়েছিলুম "মরিল"। কবি "ফিরিল" কেটে করলেন "সরিল"।

"বধিরা দেবীর প্রসাদ পারথি' পূজারী নিবায়ে গিয়াছে আরতি" এই

দুটি লাইনের মাঝখানে যে, "পারথি" কথাটি ছিল কবির হাতে সেটি হলো "প্রারথী"।

"সোণা" লিখেছিলুম মূর্ধন্য ণ দিয়ে। কবি করলেন দন্ত্য ন।

"নিষ্ফল" লিখেছিলুম দন্ত্য স দিয়ে। তিনি "ষ্ফ" বসিয়ে দিলেন।

"টানবে বিচ্ছেদ পানে" কেটে করলেন—"ল'বে বিচ্ছেদ পানে"।

"এ কী ঘন গূঢ়" তাঁর পছন্দ হলো না। মার্জিনে লিখলেন "নিগূঢ়"।

"মউন" কেটে করলেন "মৌন"।

এর পরে বোধ হয় ধৈর্য ধরে বইখানা শেষ করতে পারেননি। অর্ধেক বাকী রেখেছেন।

প্রথম চিঠিতে ছিল—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার রাখী পড়লুম। বিশেষ ভালো লাগল। এর ভাষার রূপ আছে, ভাবে রস আছে, সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটি বিশিষ্টতা দেখা গেল। ইতিপূর্বে তোমার গদ্যপ্রবন্ধ পড়ে আনন্দ পেয়েছি। তোমার কবিতার মধ্যে সহজ নৈপুণ্য ও আবেগের নিবিড়তা এবং ছন্দের গতিলীলা দেখে তোমাকে সাধুবাদ দিচ্ছি। ইতি ২ জানুয়ারি ১৯৩০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম চিঠির পরের দিনই দ্বিতীয় চিঠি এসে হাজির। বলা যেতে পারে একখানির পুনশ্চ অপরখানি। এর পরে কবি আমাকে আর কখনো চিঠি লেখেননি। সুতরাং দ্বিতীয় চিঠিই শেষ চিঠি।

দ্বিতীয় চিঠিতে ছিল—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

কাল দৈবাৎ আমার হাতে একটু সময় ছিল তাই মনোযোগ করে তোমার "রাখী" আর একবার পড়লুম। দেখলুম তোমার যথার্থই শক্তি আছে কিন্তু এখনো দ্বিধা ঘোচেনি। কতকগুলি কবিতা সম্পূর্ণ ভালো, আবার কতকগুলি যেন পিছিয়ে পড়েছে। এই বইয়ে সাধারণের কাছে তোমার প্রথম পরিচয়, এইজন্যে বিশেষ বাছাই করে যদি কবিতাগুলি সাজাতে তাহলে ভালো হত। সামনে তুমি উপস্থিত থাকলে মোকাবিলায় আলোচনা করতে পারতুম। তোমার বইখানিতে স্থানে স্থানে হস্তক্ষেপ করেচি—এর থেকে বুঝতে পারবে আমার মতে কোথায় কি আকারের ত্রুটি। অবশ্য আমার মত তোমার মতের সঙ্গে যে মিলবেই এমন কোনো কথা নেই—এ ক্ষেত্রে তোমার মতেরই চরম অধিকার।

ইতি ৩ জানুয়ারী ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির কাছ থেকে চিঠি আর পাইনি। টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম বার দুই। সে অন্য প্রসঙ্গে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম এই ঘটনার এগারো বছর পরে তাঁর শেষ জন্মদিনের কবিতা পেয়ে। কবিতাটি নিজের হাতে লেখা নয়, অপরকে দিয়ে টাইপ করানো। ভেবেছিলুম এ রকম টাইপ করা কপি তো আরো কতজনের কাছে গেছে, যথোচিত গুরুত্ব দিইনি। পরে সেই কবিতাটি প্রকাশিত হলো "প্রবাসী"তে। তার উপরে লেখা ছিল— শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে।

"আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ !…"

কবিতাটি অত্যন্ত করুণ। যতদূর মনে পড়ে নিচে কবির স্বাক্ষর ছিল কম্পিত হস্তের হিজিবিজির মতো। আমাকে তিনি তাঁর শেষ জন্মদিনে স্মরণ করেছিলেন। আমি ধন্য।

(১৯৬২)

শতবার্ষিকী

("জয়শ্রী" সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে লিখিত)

মাননীয়াসু,

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী প্রসঙ্গে কেউ আমার বক্তব্য শুনতে চাননি। আমিও অনাহূত ভাবে শোনাতে যাইনি। মৌন ছিলুম। থাকব স্থির করেছিলুম। তাই আপনার সম্পাদকীয় আহ্বানে সাড়া দিইনি। দ্বিতীয়বার সেই একই আহ্বান এসেছে আপনার কাছ থেকে। কী করি ! ভেবে দেখছি সাড়া দেওয়াই ভালো।

তিন বছর আগে পি ই এন নামক আন্তর্জাতিক লেখক সংস্থার অধিবেশনে যোগ দিতে জাপানে যাই। সেখানে নানা দেশের লেখকলেখিকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের নাম করি ও জানতে চাই তাঁর গ্রন্থ কোন দেশে কেমন চলে। একই উত্তর পাই সকলের কাছে। নাম সর্বত্র বিদিত, কিন্তু গ্রন্থ সর্বত্র দুষ্প্রাপ্য কিংবা অচলিত। "হাঁ, হাঁ, বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু কী জানি কেন বই আর কেউ পড়ে না।" মোটামুটি এই হলো উত্তরের মর্ম। অর্থাৎ সোনার মোহর, কিন্তু বাজারে চালু নয়। বাজারে চলে রুপো, তামা, নিকেল ও কাগজের মুদ্রা।

রবীন্দ্রনাথের ক'খানাই বা ইংরেজী বই ছিল ! তার থেকে আর সব বাদ দিয়ে ম্যাকমিলান ছাপে শুধু "কাব্যনাটকসংকলন" ও "গীতাঞ্জলি"। এ হলো বিলেতের ম্যাকমিলান। দেশে ওরা আরো কয়েকখানা বইয়ের সুলভ সংস্করণ ছাপত। আজকাল সব পাওয়া যায় না। এগুলি ভারতেই চলে। বাইরে পাবার উপায় নেই। অন্য প্রকাশকের ঘরে "মানুষের ধর্ম" ছিল। আছে কিনা জানিনে।

বাংলার রবীন্দ্রনাথ জগতের হয়েছিলেন ইংরেজী গ্রন্থের প্রসাদে। সেসব গ্রন্থ যদি অপ্রচলিত হয়ে যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের নাম ক্রমে জনশ্রুতিতে পর্যবসিত হবে। শুনেছি আশরফি নামে একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সুন্দর দেখতে। কই, দেখিনে তো ? যিনি বিশ্বকবি, বিশ্ব যদি তাঁর কবিতার স্বাদ না পায় তাহলে তাঁর কবিপ্রসিদ্ধি হবে সেই সোনার আশরফির মতো শোনা কথা।

তার পর এটাও বোধ হয় মানবেন যে ভারতের অন্যান্য প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রথম প্রবেশলাভ করে ইংরেজীর মাধ্যমে। তাই দিয়ে তার মান নির্ধারিত হয়ে যায়। আজকাল কবির ইংরেজী বই খুব কমসংখ্যক ভারতীয়ের চোখে পড়ে। তাদের প্রধান অবলম্বন হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়, সাধারণত ইংরেজীর থেকে অনুবাদ। তার মানে অনুবাদের অনুবাদ। মূল বাংলার থেকে অনুবাদ যে হয়নি তা নয়, তবে ভারতের সমস্ত প্রান্তের ভাষায় নয়। ইদানীং হিন্দীর মাধ্যমে অনুবাদ হচ্ছে। এসব অনুবাদে মূল বাংলার বা কবির স্বকৃত ইংরেজীর মাধুর্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য। তাও যদি উপযুক্ত পাত্রের দ্বারা ভাষান্তরিত সব সময় হতো ! এর ফলে ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও রবীন্দ্রনাথের নাম পড়ে যাচ্ছে। বিশেষত যাঁরা বাংলা কিংবা ইংরেজী কোনোটাই জানেন না তাঁদের কাছে। আর এঁরাই ক্রমে দলে ভারী হচ্ছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রান্তের গুণীদের সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প পরিচয় আছে। দেখি তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের কথাই বেশী বলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কথা তত নয়। আসলে হয়েছে এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় ভাবানুবাদ বা সারানুবাদ করেছেন। মূল "উর্বশী" বা "তাজমহল" যাঁরা পড়েছেন তাঁরা কবিকৃত সারানুবাদ পড়ে কতটুকু রস পাবেন ? তা ছাড়া কবি তাঁর জোরালো কবিতাগুলির তর্জমায় হাত দেবার সময় পাননি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জোর কমে আসছিল। একশ' রকম কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাই অভিনিবেশও কমে আসছিল। কবিতার অনুবাদও মূল কবিতার মতো কারুকার্য। ঢিলেঢালা অনুবাদে অনেক সময় উলটো ফল হয়। মানুষটি চলে গেলে, তাঁর ব্যক্তিত্বটি সরে গেলে যা পড়ে থাকে তা দিয়ে তাঁকে বিচার করলে বিচারফল অনেক সময় তাঁর অনুকূলে যায় না।

বাঙালী পাঠক রবীন্দ্রনাথকে দিন দিন আরো ভালো বুঝছে, আরো ভালোবাসছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রান্তের পাঠক, বাইরের অন্যান্য

দেশের পাঠক তাঁকে দিন দিন ভুলে যাচ্ছে। বা তাঁর ভুল পরিচয় পাচ্ছে। শতবার্ষিকীর উৎসবে এই সত্যটি ঢাকা পড়তে পারে, কিন্তু যখন সব হৈ চৈ থেমে যাবে, সব টাকা খরচ হয়ে যাবে, সব উৎসাহ জল হয়ে যাবে তখন এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেবে যে, রবীন্দ্রনাথের ক'খানা বই ভারতের বাইরে চলে আর বাংলার বাইরে ঠিকমতো চলে? ইচ্ছা করলে এখন থেকেই এর প্রতিকার চিন্তা করা যায়। কিন্তু তেমন ইচ্ছাই বা কোথায়?

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে এইখানেই থামি।

শান্তিনিকেতন,
২৪শে আগস্ট ১৯৬০

গান্ধী

ভূমিকা

অসহযোগের দিনে আমিও ছিলুম গান্ধীজীর অন্ধ ভক্ত। তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমিও সমালোচক হয়ে উঠি। কিন্তু বিকল্প কোনো পন্থার সন্ধান না পেয়ে, বিকল্প কোনো নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে না পেরে আবার সেই মহাত্মার কাছেই ফিরে আসি। এবার কিন্তু অন্ধ ভক্ত হিসাবে নয়। সমালোচক হিসাবেও নয়।

তাহলে কী হিসাবে? তা এককথায় বোঝানো যাবে না। তার জন্যে আস্ত একখানা পুঁথি লিখতে হয়। সেরকম পুঁথি লেখার সাধ বিশ-একুশ বছর বয়সেই হয়েছিল। লিখলে লিখতুম ইংরেজীতে। তার নাম দিতুম 'গান্ধীজম ইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস'। বিধাতা আমাকে সেই ছেলেমানুষীর থেকে রক্ষা করেছেন।

গান্ধীজীর এপিক সংগ্রাম নিয়ে নতুন এক মহাভারত লেখার খেয়ালও যে কখনো হয়নি তা নয়। লিখলে সেটা হতো এপিক উপন্যাস। তার সময় এখনো আসেনি। তার জন্যে আরো পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করা চাই। সেকাজ আমাদের কারো সাধ্য নয়।

তার পরে ভাবি গান্ধীযুগের শেষ পাঁচ বছর নিয়ে বড়ো একটা উপন্যাস লিখব, কিন্তু তাঁকে আমার নায়ক বা প্রধান চরিত্র করব না। তিনি চকিতে দেখা দিয়ে যাবেন। অন্যান্য নেতারাও। পরে আবার এ কল্পনাও ত্যাগ করি। ছোটখাটো ট্র্যাজেডী আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু এত বড়ো ট্র্যাজেডী আমার সহনাতীত। তাই রচনাতীত। স্বাধীনতাদিবসেই দাঁড়ি টানতুম। কিন্তু সেটাও কি কম ট্র্যাজিক নাকি? বাংলাদেশ ও ভারতভূমি এক কোপে দু'খানা হয়ে গেল, কী করে আমি অবিচলিত না হয়ে বর্ণনা করব? আর অবিচলিত না হয়ে কথাসাহিত্যের জগতে সিদ্ধি কোথায়?

গান্ধীজীর তিরোধানের পর বন্ধুরা আমার কাছে প্রত্যাশা করেন তাঁর একটি জীবনকথা। স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁদের একজন। আরেকজন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আমি এড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু যখন যা মনে আসে তা খাতায় টুকতে শুরু করি। সেসব খাতা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। আমার নিজের লেখা নোট পড়তেই এত সময় লাগবে যে ততদিনে পুরো মাপের একখানা বই লিখে ফেলা যায়। শতবার্ষিকীর আগেই ও ভার মাথা থেকে নামাতে চাই বলে একদিন কলম ধরি। তারই পরিণতি এ বই।

না বলা রয়ে গেল দশগুণ কথা। অপরের জন্যে সেসব অপেক্ষা করবে। আমি গান্ধীবিশেষজ্ঞ নই, গান্ধীবাদীও নই, আমি একজন সাক্ষীমাত্র। তাও দূর থেকে। এই আমার সাক্ষ্য। অন্যের সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলতেও পারে, না মিলতেও পারে। তবু সত্য।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ — অন্নদাশঙ্কর রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থ রচনার পর প্রায় তেরো বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে আরো অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আমিও আরো অনেক ভেবেছি, অনেক চিন্তা করেছি। তাই এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পরিবর্তন করেছি। আপনার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করেছি। ক্ষমতা হস্তান্তরের অপ্রকাশিত দলিল সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে ও আমার নজরে এলে আরো অনেক তথ্য জানা যাবে। তখন আরো যোগ বিয়োগ করব। যদি এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হয় ও আমি জীবিত থাকি।

'ক্রান্তদর্শী' বলে যে বৃহৎ উপন্যাসটিতে হাত দিয়েছি সেটি গান্ধীজীবনের শেষ দশকের সঙ্গে জড়িত। এই সব কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে, আরো বিস্তৃত পটভূমিকায়। গান্ধীজীর জীবন আমার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জীবনের ভিতরেও সক্রিয়। 'গান্ধী' বইখানি 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাসটির প্রস্তুতিপর্ব।

১৭ই এপ্রিল ১৯৮২ — অন্নদাশঙ্কর রায়

"I know, too, that I shall never know God if I do not wrestle with and against evil even at the cost of life itself."

—Gandhi

এক

কথাটা তাঁর শত্রুপক্ষের মুখে শোনা। বোধহয় সেই জন্যে আমাকে অমন চমৎকৃত করেছিল। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪২ সালের কথা। কিন্তু আগস্ট মাসের আগেকার কি না স্মরণ নেই।

"All his ideas are right. But he is two hundred years in advance of his time."

বলেছিলেন যিনি তিনি একজন পুলিশ অফিসার। আইরিশম্যান। রোমান ক্যাথলিক। বয়সে অনেক বড়ো। গোয়েন্দা বিভাগে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যখন তখন নিশ্চয়ই গান্ধীজীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গোপনীয় সূত্রে পরিচিত।

দু'শ বছর আগে, একথা যদি স্বীকার করি তবে হয়তো মেনে নেওয়া হবে যে ভারতের স্বাধীনতারও ততকাল বিলম্ব হবে। কিন্তু ভদ্রলোক সে অর্থে বলেননি। গান্ধীজীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আইডিয়াগুলোরই কথা তাঁর মানসে ছিল।

গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত যে বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব নয় এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। কিন্তু স্বপ্নটা অবাস্তব নয়। বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে।

ততদিন অপেক্ষা করতে আমার মন রাজী ছিল না। গান্ধীজীর যেমন অলৌকিক প্রতিভা তিনি হয়তো আমার জীবিতকালেই অসাধ্য সাধন করবেন। যুক্তিবাদী হিসাবে আমি মিরাক্ল বিশ্বাস করতুম না। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই নিয়ে কতবার বলেছি। তবু অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করতুম যে গান্ধীজী একজন মিরাক্ল মেকার। ঘটাবেন একদিন এক মিরাক্ল। ভিতরে ভিতরে আমি ছিলুম ভক্তিবাদী।

"তামিল ব্রাহ্মণ আর সীমান্তের পাঠান মিলে এক নেশন হতে পারে কখনো? এক টেবিলে বসে খাবে?" শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন পুলিশ সাহেব। আরেকদিন।

"নিশ্চয়। রাজাজী আর সীমান্ত গান্ধীর দিকে চেয়ে দেখুন।" আমি সগর্বে বলি।

একবারও মনে উদয় হয়নি যে ১৯৪৭ সালে পুলিশ সাহেবের কথা ফলে যাবে। কেন যে তিনি ভারতীয় একতায় বিশ্বাস করেন না! সাম্রাজ্যবাদী সংস্কার তাঁরও আছে।

জেল থেকে গান্ধীজীও বলতে আরম্ভ করলেন যে তিনি একশো বিশ বছর বাঁচতে চান। তার মানে স্বাধীনতার দেরি আছে। আরো একবার কি দু'বার বলপরীক্ষা করতে হবে। ওদিকে হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটি তো প্রায় সমাধানের অতীত। যদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে হয় তবে তার জন্যেও গণসত্যাগ্রহের দরকার হতে পারে।

একপক্ষ যদি দাবী করেন যে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব ভারত-বাসীরই তাঁরা প্রতিনিধি আর অপরপক্ষ যদি পাল্টা দাবী করেন যে ভারতীয় বলে কেউ নেই, আছে শুধু মুসলমান ও হিন্দু, আর তাঁরাই হলেন সব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি তাহলে গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কীভাবে এর মীমাংসা হতে পারে আমার বুদ্ধিতে কুলোত না। কিন্তু গান্ধীজীর উপর আর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার উপর এমনি গভীর ছিল আমার আস্থা যে, আমি আশা করতুম গৃহযুদ্ধও এড়ানো যাবে, যদি একপক্ষ অহিংসার দ্বারা অপর পক্ষকে প্রতিরোধ করে।

একদিন খবর পেলুম যে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসছেন। আমরা দু'জনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি, যদি সিউড়ি থেকে তাঁর প্রার্থনাসভার পূর্বে এসে হাজির হতে পারি। কিন্তু নবজাত কন্যাকে নিয়েও যাওয়া যায় না, রেখেও যাওয়া যায় না। তাই তার মা রইলেন বাড়িতে আর আমি একাই উঠে বসলুম মোটরে। পথে আমার সঙ্গ নিলেন আমাদের সবর মুনসেফ। পৌঁছে শুনি গান্ধীজী আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী। পনেরো মিনিট সময় হাতে রেখেছেন। যা তিনি সাধারণত করেন না।

দিনটা ছিল ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৫। সেইদিনই অ্যাণ্ডরুজ মেমোরিয়াল হাসপাতালের ভিত্তিশিলা স্থাপন। বিনয়ভবনের কাছাকাছি এক দাগ জমিতে। গান্ধীজী পায়ে হেঁটে আসতে আসতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুটি-একটি কথা হয় উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে।

"ইনি আমাদের জেলা জজ, কিন্তু—" বলে আমার সাহিত্যিক পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

"বাট হি ইজ নো জজ।" বলে গান্ধীজী কথা কেড়ে নেন। তাঁর মুখে দুষ্টু হাসি। বলেই তিনি 'শ্যামলী'র দিকে পা বাড়াতে যান।

আমি তাকে মনে করিয়ে দিই যে মালিকান্দায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম। তারপর অন্যের কানে না যায় এমনভাবে খুব তাড়াতাড়ি ও খুব কম কথায় নিবেদন করি যে কলকাতা শহরের ক্ষুধা আর কলকাতার বড়-লোকের লোভ বাংলাদেশের মন্বন্তরের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

'শ্যামলী'তে প্রবেশ করবার মুখে গান্ধীজী বলেন, "আজ তো সময় হবে না। আরেকদিন শুনতে চাই আপনার কথা। কলকাতা সম্বন্ধে ওকথা আরো কেউ কেউ আমাকে বলেছেন।"

প্যারেলাল কাছেই ছিলেন। তাঁর সাহায্যে আবার একটা দিন ফেলা গেল। এবার কলকাতায়। কিন্তু দিন স্থির হলেও ক্ষণ স্থির হলো না। পরে খবর পাই সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে ভোরবেলা তাঁর প্রাতর্ভ্রমণের সাথী হওয়াই সাক্ষাৎকারের একমাত্র সুযোগ। ময়মনসিং বদলি হবার সময় কলকাতায় যেখানে উঠি সেখান থেকে—পার্কসার্কাস থেকে সোদপুর বহুদূর। জোড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠে না বলে আমরা এখনো আপসোস করি।

কে জানত যে আমাদের জীবনে সেই সুযোগেই হবে শেষ সুযোগ।

সেদিন মহাত্মার প্রার্থনাসভায় গিয়ে মুনসেফ সাহেব আর আমি তাঁর আর এক মূর্তি নিরীক্ষণ করি। বুদ্ধের মতো পদ্মাসনে মুদিততেত্র গান্ধী। একান্ত গম্ভীর। হয়তো বিশ্বের বেদনায় কাতর। সামনে কী আছে কে জানে। বেদীর উপরে তিনি, তলায় তাঁর পরিজন। ভজন চলছিল, কিন্তু ওতে তাঁর যোগ ছিল না। তিনি বিগ্রহের মতো নিশ্চল। তবে চাদরের আড়ালে তাঁর ডান হাত নড়ছিল। অনুমানে বুঝতে পারলুম মালা গড়ানো হচ্ছে। তখন তিনি কর্মযোগী নন, ভক্তিযোগী। তিনি গীতার সেই ভক্ত যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

প্রার্থনার শেষে তাঁর ভাষণ শোনা গেল। অস্পৃশ্যতা পরিহার করতে উপদেশ দিলেন। উচ্চারণ করলেন "অস্প্রশ্যতা"।

ফেরার পথে মুনসেফ সাহেব বললেন, "পাকা আমটির মতো চেহারা হয়েছে মহাত্মার। স্বাস্থ্য ভালোই আছে মনে হলো।"

হ্যাঁ, তাঁকে তরুণ মনে হচ্ছিল। অতদূর পায়ে হেঁটে এসেও অক্লান্ত। তাও রোদ্দুরে। খালি মাথায়। আশ্রমে তিনি পদপরিক্রমা করেন, মোটরে ওঠেন না।

আর আমরা তো দিব্যি মোটর হাঁকিয়ে চলেছি। হঠাৎ মুনসেফ সাহেব ব্যাকুলভাবে বলে ওঠেন, "ঐ যাঃ। বড্ড ভুল হয়ে গেল!"

"কী ব্যাপার! কিছু ফেলে এসেছেন নাকি?" আমি জিজ্ঞাসু।

"মহাত্মা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন সেখান থেকে তাঁর পদরজঃ কুড়িয়ে আনতে ভুলে গেলুম!"

একজন ব্রাহ্মণের মুখে শোনবার মতো কথা বটে! মহাত্মা যে উত্তুঙ্গ শিখরে উপনীত হয়েছেন সেখানে তিনি সব মানুষের নমস্য। যেমন বুদ্ধ, যেমন যীশু। তা বলে তাঁর পদরজঃ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করা আমার অনুমোদন পায় না। তাতে মানবাত্মার অবমাননা।

কিছুদিন পরে ময়মনসিং পৌঁছে দেখি দেশ দিন দিন অরাজক হচ্ছে। অহিংস উপায়ে তার প্রতিকার যদি কেউ করতে চান করুন, কিন্তু আমরা যারা শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে দায়ী তারা খারাপকে আরো খারাপ হতে দিতে পারিনে। কড়া হাতে দমন করতে বাধ্য। যদিও আমি ব্যক্তিগত মতবাদে একজন নৈরাজ্যবাদী তবু অরাজকতাকে আমি নৈরাজ্য বলে স্বীকার করিনে। দুর্বলকে রক্ষা করতে হবে।

ওদিকে ইংরেজদের মনের অবস্থা যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সে জ্ঞান আমার ছিল না। একজন পুলিশ বন্ধু আমাকে জানালেন যে বড়ো বড়ো ফাটক তৈরি হচ্ছে। সাহেবরা ঝুঁকি নিতে চায় না। ধরবে আর পুরবে। কে জানে ক'হাজার বা ক'লাখ!

কেন? অত ভয় কিসের? ওদের হাতেই যখন সৈন্যবল।

লোকে যদি হঠাৎ ক্ষেপে যায় তো একরাত্রেই সব ক'টাকে নিকেশ করবে।

সৈন্য এসে পৌঁছবার আগেই দশ-বিশ হাজার খুন হয়ে যাবে। তাই ওরা আরো আগে আঘাত হানবে। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর।

একথা বলতে না বলতে এসে পড়ল বম্বের খবর। রাজকীয় ভারতীয় নৌবহরের বিদ্রোহ। যথাকালে সিপাহী বিদ্রোহও পুনরাগমন করবে।

আশ্চর্য এক সাল ওই ১৯৪৬! ও সালে সব কিছু সম্ভবপর ছিল। বিদ্রোহ, বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ। প্রথমটা মনে হয়েছিল আমরা সিপাহী বিদ্রোহের অভিমুখে যাচ্ছি। কিংবা এমন এক বিস্ফোরণের অভিমুখে যাকে বলা হয় বিপ্লব।

কিন্তু এমনি আমাদের বরাত যে সহসা নিস্ফোরণের রূপান্তর ঘটল। যে ইংরেজরা জানুয়ারী মাসে কম্পমান ছিল তারাই আগস্ট মাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যে হাত সাহেব বধ করতে উদ্যত হয়েছিল সেই হাতই ভাইয়ের বুকে ছোরা বসিয়ে দিল। যেন দুই ভাই নয়, দুই দুশমন। বাঁণা সাহেবের ভাষায় দুই নেশন।

ইংরেজী কেতায় জিন্না যাঁকে বলা হয়, গুজরাতী ভাষায় তাকেই বলা হয় ঝীণা। ঝীণা শব্দের অর্থ 'ছোট'। জীবনে তিনি কারো কাছে ছোট হতে চাননি, ছোট হবেন কিনা গান্ধীর কাছে? আরেক গুজরাতীর কাছে? না, তিনিও আরেক আগস্ট আন্দোলন করবেন। যার নাম ডাইরেক্ট অ্যাকশন। একজনের হাঁক ছিল "ভারত ছাড়ো"। আরেকজনের ডাক হলো "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"।

দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল দেশটা! এক বছর বাদে দেশ দুটো। অবিকল এক বছর বাদে। বলতে গেলে একই তারিখে। আমরা যেন নিয়তির হাতের পুতুল। মহামানব মহাত্মা পর্যন্ত। কায়দে আজম ঝীণাও তাই লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তেমনি। মনে মনে কেউ পার্টিশন চাননি। কায়দে আজমও না। কিন্তু দেশের অরাজক অবস্থা বিস্ফোরক হয়ে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনল যখন তখন তার থেকে পরিত্রাণের অহিংস পন্থা তৈরি নেই দেখে দেশের লোক বাঁটোয়ারায় রাজী হয়ে গেল। গান্ধীজীর জন্যে অপেক্ষা করল না।

তাছাড়া এমন কোনো সংবিধান রচনা করা সম্ভব ছিল না যেটা কংগ্রেস লীগ উভয় দলের বা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য। ইংরেজরা যে সংবিধান দিয়েছিল তাকে খারিজ করা সোজা, কিন্তু তার বদলে আর একটি সংবিধান নিজেরাই একমত হয়ে গড়ে তোলা রাম রহিমের অসাধ্য। মহাত্মা কি তাঁর অহিংসা দিয়ে কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দিতেন নাকি? না, ঐক্যের নামেও কিছু চাপানো যেত না। তা সে যতই ভালো হোক। সবাই স্বেচ্ছায় নেবে এমন জিনিস একটিমাত্র ছিল, ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি। আর সবই বিতর্কিত। মহাত্মাও সে বিতর্কের উত্তর জানতেন না।

জানতেন হয়তো কোনো এক ডিক্টেটর, যাঁর পেছনে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র সৈন্যবল। কিন্তু সেদিন আমরা দেখেছি সৈন্যদলও একই ধ্বজা বইবে না, একই কমান্ড মানবে না। সর্বত্র একানুগত্যের অভাব।

কি পুলিশ কি সিভিল সার্ভিস। কি জনসাধারণ। ইংরেজ যদি সময় থাকতে উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে না যেত তাহলে উত্তরাধিকার নিয়ে শাহজাহানের ছেলেদের মতো লড়াই বেধে যেত।

স্বাধীনতার সংগ্রাম যাদের একজোট করতে পারেনি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাদের একছত্রাধীন করত? না, তেমন কোনো নিরাক্ত মহাত্মার হাতের মুঠোয় ছিল না। অনশন বৃথা হতো। নিয়তির গতি দুর্বার। ব্রিটিশ অপসারণকেও রুখতে পারা যেত না, সর্বসম্মত হস্তান্তর না ঘটলে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বকেও ঠেকাতে পারা যেত না।

পনেরোই আগস্টের দিন সাতেক আগে আমি ময়মনসিং থেকে বদলি হয়ে চলে আসি। গান্ধীজী তখন কলকাতায় শান্তি পুনঃস্থাপনের সাধনায় নিযুক্ত। চোখে দেখলুম তাঁর সিদ্ধি। পনেরোই আগস্ট ঘোরতর রক্তপাত হবে এরকম একটা দুঃস্বপ্নের ভিতর রাত কাটে। কিন্তু রাত পোহাবার আগেই যে মর্মভেদী চিৎকার শুনে জেগে উঠি তা মহামারীর নয়। নিজের কানকেই বিশ্বাস হয় না এমন এক সুখাবর্ষণ। ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করছে, তাই তাদের হর্ষধ্বনি। শুধু সেই নয়। ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গেছে। দু'শ বছরের জগদ্দল। ওইটেই সত্যিকার সত্য।

পনেরোই আগস্ট যা ঘটল তা অলৌকিক ঘটনা বইকি। গান্ধী না হলে আর কোন শক্তি তা পারতেন না। কলকাতা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে বাংলার সর্বত্র গড়িয়ে যেত রক্তস্রোত। ধাবিত হতো জনস্রোত। দেখতে দেখতে আর একটা পাঞ্জাব ট্রাজেডী। একজন মানুষ যে একটা ট্রাজেডী নিবারণ করতে পারেন এটা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। পারতেন কি তিনি যদি অর্ধেকটা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণঃ না হতেন? যদি তাঁর অহিংসা শক্তিধর না হতো? হ্যাঁ, এটাও সত্যিকার সত্য।

ঐতিহাসিক শক্তিগুলো ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তিবিশেষের অহিংস যাদুদণ্ড তাদের গতি বা স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ভারতবর্ষে তিন তিনটে শক্তি কাজ করছিল। ইংরেজ, তার প্রতিপক্ষ কংগ্রেস, তার প্রতিপক্ষ লীগ। বছর-খানেকের জন্যে তিন শক্তি একই শিখরে সমবেত হয়েছিল। সেখানে নিত্য মতান্তর। ইংরেজ মাঝখানে না থাকলে আর দুটো জুড়ে যেত এই ধারণা ভুল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ আগমনের পূর্বে যেমন দুই প্রধান শক্তি ছিল মুঘল ও মরাঠা পরেও তেমনি দুই প্রধান শক্তি হলো কংগ্রেস ও লীগ। দুই শক্তির দুই স্থান। এটা ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ বা ডিটারমিনিজম। ব্যক্তি এখানে নিমিত্তমাত্র। হলেনই বা তিনি মহাত্মা। পনেরোই আগস্ট প্রমাণ করে দিল যে ঐতিহাসিক শক্তির খেলায় ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছু নয়।

আবার সেই পনেরোই আগস্ট কি সাক্ষী রইল না যে অসাধারণ ব্যক্তি না থাকলে ও তাঁর যাদুদণ্ড না থাকলে বাংলাদেশে পাঞ্জাবের পুনরভিনয় হতো? মানতেই হবে যে ইতিহাসে ডিটারমিনিজম সব কথা নয়। ব্যক্তিও একপ্রকার শক্তি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় কংগ্রেস নামক শক্তি ও গান্ধী নামক ব্যক্তি কার

কী পরিমাণ অংশ তা নির্ণয় করা সহজ নয়। কংগ্রেস নেতারা সাধারণত গান্ধীজীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন, কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার বেলা এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মহাত্মার সঙ্গে পরামর্শ না করেই, এমন কি তাঁকে না জানিয়েই, কথাবার্তার বেসিস বদলে দেওয়া হয়। একটিমাত্র কেন্দ্র থাকবে, তার নিচে থাকবে তিনটে জোন, তাতে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের ভারসাম্য, এই ছিল বেসিস। পরে এক সময় দেখা গেল এভাবে কথাবার্তা অগ্রসর হবে না। ইংরেজ না থাকলে উচ্চতম পর্যায়ে মতবিরোধ ও নিম্নতম পর্যায়ে অরাজকতা রোধ করা যাবে না। অতএব দুই পাঞ্জাব। দুই বাংলা। কংগ্রেস ও গান্ধী দ্বিমত।

নিম্নতম পর্যায়ের অরাজকতা আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। নোয়াখালীর পুনরাবৃত্তি ময়মনসিং জেলায় হতে পারত, হলো না যে তার জন্যে সাধুবাদ দিতে হয় আমাদের জনাকয়েক সহকর্মী অফিসারকে। এঁরা নিষ্ক্রিয় হলে গান্ধীজীর অহিংস সহকর্মীরা হয়তো জানতেনই না কোথায় কী ঘটেছে। নৈরাজ্যবাদী আমি, আমাকেও অবশেষে স্বীকার করতেই হলো যে পুলিশ চাই, আদালত চাই, জেল চাই ও কিছুতেই সমলাতে না পারলে মিলিটারি চাই। তার মানে পুরোদস্তুর রাষ্ট্রিক কাঠামো চাই। কাঠামোটা কার হাতে পড়বে, কংগ্রেসের হাতে না লীগের হাতে, সেটা পরের কথা। কিন্তু কাঠামো একটা না থাকলেই নয়। সে কাঠামো আধুনিক হওয়া চাই। সেকেলে হলে চলবে না। এদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজ রাজত্ব আমাদের যা দিয়ে গেছে তা মহামূল্য সম্পদ।

দুই

সাতচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে গভর্নর আসেন ময়মনসিং সফরে। ডিনারে ডাকেন। সেই প্রথম তাঁর মুখে শুনি যে ইংরেজরা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে।

"হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় লড়ুক। আমরা কেন থাকব রিং ধরতে?" মানে সার্কাসের রিং।

আরো বললেন, "আমরা ভেবে দেখেছি যে বাণিজ্যেই লাভ। আয়ারল্যান্ড স্বাধীন হবার পর থেকে সেদেশে আমাদের বাণিজ্য বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষেও তাই হবে।"

একদিন যেমন ওরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরেছিল তেমনি শর্বরী পোহালে রাজদণ্ড ছেড়ে মানদণ্ড ধরবে। এখন শর্বরী পোহালে হয়।

মহাত্মা তখন নোয়াখালীতে শর্বরীর অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছিলেন। কোনদিকে এতটুকুও আলোর ছটা দেখতে পাচ্ছিলেন না।

আমার অন্তরেও তখন একটা মন্থন চলছিল। ইংরেজ তো আপনা হতে যাচ্ছেই, তাকে গলাধাক্কা দিতে হবে না। বিদ্রোহ বিপ্লব গণসত্যাগ্রহ সবই

এখন নিষ্প্রয়োজন। যেটা সত্যিকার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দুর্জনের হাত থেকে সুজনকে রক্ষা করা।

গান্ধীজী আমার তরুণ মনে যে ক'টি স্বপ্নের বীজ বুনেছিলেন তার একটি ছিল নৈরাজ্য, আর একটি সত্যাগ্রহ। একটি ছিল এণ্ড, আর একটি মীনস। অন্যান্য নেতারা কেউ আমার মনে তেমন কোনো স্বপ্নের আবাদ করেননি।

আপাতত তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন মীনসের উপরে, সত্যাগ্রহের উপরে। তাঁর কথা হলো মীনস যদি ঠিকমতো অনুসরণ করা হয় তবে এণ্ড তারই ভিতর থেকে আসবে। এণ্ড নিয়ে আমরা যেন অকারণে মাথা না ঘামাই।

কিন্তু এই অরাজকতাই কি সেই নৈরাজ্য? আলেয়া কি আলো? না, তা নয়। শুনতে কতকটা একই রকম, আসলে অন্য জিনিস।

দু'শো বছরের সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ে তখন দিকে দিকে অরাজকতা দেখা দেয়। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষেও দেখা গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাত বারোটা বাজার আগেও দেখা যাচ্ছে। নানা যুগে নানা দেশে এর নজীর মেলে। এর নাম সত্যাগ্রহসাপেক্ষ নৈরাজ্য নয়। এর জন্যে এদেশের লোক আটাশ বছর কাল সাধনা করেনি।

এটা অন্য জিনিস। বেশ, তা না হয় হলো। কিন্তু এখন এর সম্মুখীন হই কী করে? অরাজকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে আমার হাতে কী থাকবে? রাজদণ্ড না সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্ত্র? আমাকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হলো যে সত্যাগ্রহ দিয়ে অরাজকতার প্রতিরোধ করা কাজের কথা নয়, প্রতিরোধ করা চলে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির। তার অসহনীয় অন্যায়ের। তার অন্তহীন অধীনতার। তার ভিত্তিমূলে অবস্থিত হিংসার। তার অপ্রতিদ্বন্দ্ব বাহুবলের।

তত্ত্বের দিক থেকে এটা হয়তো ঠিক যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির চেয়ে অরাজকতা এমন কী ভয়ংকর যে সত্যাগ্রহের দ্বারা তার প্রতিরোধ অহিংসা-ব্রতীর অসাধ্য? তা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারত, কিন্তু তর্কের জন্যে আমাদের হাতে সেদিন সময় যথেষ্ট ছিল না। গভর্নর ময়মনসিং ছাড়ার কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে। ক্ষমতা কার হাতে হস্তান্তর করা হবে সেটা নির্ভর করবে ভারতীয়দের একমত হওয়া না হওয়ার উপরে। একমত না হলে একাধিক হাতে।

একমত হওয়া যে একান্ত জরুরি এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। সময় বয়ে গেলে আদর্শ সমাধানও অবাস্তব হয়ে যায়। সুতরাং সময় থাকতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা হয়তো আদর্শের দিক থেকে খাটো, কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কার্যকর। সে সিদ্ধান্ত আর যাই হোক অরাজকতা নয়।

সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকেই বসাতে হবে।

সেই যে নতুন রাজশক্তি তার অধীনেও সৈন্য পুলিশ আদালত ও জেল থাকবে। রাষ্ট্রিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে বা তাকে ভেঙে যেতে দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর কার কোন কাজে লাগবে? সে যেন গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া। অমন একটা অসহায় গবর্নমেণ্ট অরাজকতা রোধ করতে অক্ষম হবে।

গান্ধীপন্থীদের প্রত্যেকের জীবনে সে এক অগ্নিপরীক্ষা। ওঁরা চেয়েছিলেন সাত লক্ষ গ্রামে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠবে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে উপরিতন আঞ্চলিক রেপাবলিককে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে তাদের উপরিতন প্রাদেশিক রেপাবলিককে। তারাও তেমনি তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে কেন্দ্রীয় রেপাবলিককে। ইংরেজ যদি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অপর এক রাজশক্তিকে হস্তান্তর না করে চলে যায় তা হলেই সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। নতুবা একবার হস্তান্তর হয়ে গেলে তারপর যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সেই হবে ক্ষমতার মালিক। সে হয়তো কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কিয়দংশ প্রদেশকে দেবে, তারপর প্রদেশ হয়তো প্রাদেশিক ক্ষমতার কিয়দংশ অঞ্চলকে দেবে, তারপর অঞ্চল হয়তো আঞ্চলিক ক্ষমতার কিয়দংশ গ্রামকে দেবে। একেবারে বিপরীত প্রোসেস।

শাসনের দিক থেকে ক্ষমতার ভাণ্ডারে একপ্রকার শূন্যতা না হলে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠতে পারে না। অপরপক্ষে শূন্যতা হয়েছিল বলেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শত শত দেশীয় রাজ্য গজিয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা তাদের সংখ্যা কমাতে কমাতে প্রায় ছ'শোটিতে দাঁড় করিয়েছিল। আবার এক শূন্যতা সৃষ্টি হলে কে জানে ক'হাজার বলকান রাজ্য রাতি ফুঁড়ে ওঠে! সেইজন্যে শূন্যতার উপরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাস ছিল না। সে ঝুঁকি তাঁরা নিতেন না।

লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে যেমন পরিণয় হয় না তেমনি ইতিহাসও হয় না। বেশ বুঝতে পারছিলুম যে ইংরেজ চলে যাচ্ছে। নেতারা একমত হতে না পারলে ক্ষমতার হস্তান্তর একাধিক হাতেই হবে। একাধিক মানে দুই হাতও হতে পারে, দশ হাতও হতে পারে। ক্ষমতার হস্তান্তর না হলে যা হবে তা শূন্যতাও হতে পারে। কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংরেজদের একটি স্কীম ছিল, তাকে বলত র‍্যালিয়িং পয়েণ্ট স্কীম। কোথাও বিদ্রোহ বাধার লক্ষণ দেখলে জেলার সব জায়গার ইংরেজরা এক জায়গায় জুটত। তাদের সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতো। সাতচল্লিশ সালে সেই জাতীয় একটা স্কীম প্রস্তুত করেন বড়লাট ওয়েভেল। সারা ভারতের সব প্রদেশের ইংরেজ এক প্রদেশে জমায়েত হবে ও মিলিটারি প্রোটেকশন পাবে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন গুটিয়ে আনা হবে। এ পরিকল্পনা যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর কাছে পেশ করা হয় তখন তিনি সেটা নাকচ করে ওয়েভেলকেই সরিয়ে দেন।

এরপর মাউণ্টব্যাটেন আসেন বড়লাট হয়ে। তিনি দেখেন ক্যাবিনেট

মিশন স্কীমের ভিত্তিতে নেতারা একমত হবেন না। বৃথা চেষ্টা। কিন্তু ওয়েভেলের মতো হাল ছেড়ে না দিয়ে তিনি নতুন করে কথাবার্তা শুরু করেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের কোয়ালিশন ভেঙে যাওয়ায় বিকল্প সরকারের আশা না থাকায় গভর্নরের শাসন চলছিল। হঠাৎ হিন্দু ও শিখদের তরফ থেকে দাবী ওঠে, পাঞ্জাব পার্টিশন করা হোক। এ দাবী পাঞ্জাব থেকে বাংলায় ছড়ায়। এ দাবী ওঠার আগে পাঞ্জাবে একদফা দাঙ্গা হয়ে গেছে। তেমনি বাংলায়। একদিকে মুসলিম লীগ দাবী করছে ভারতবর্ষের পার্টিশন, অপর দিকে পাঞ্জাব বাংলার হিন্দু শিখ দাবী করছে স্ব স্ব প্রদেশের পার্টিশন। নেতাদের সঙ্গে কথা কয়ে মাউণ্টব্যাটেন বুঝতে পারেন যে, দোতরফা যদি হয় তবে পার্টিশনে রাজী আছেন বল্লভভাই ও জবাহরলাল। সেই মর্মে মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান তৈরি হয়। ঝীণাকে রাজী করানোর ভার নেন মাউণ্টব্যাটেন। সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রেফারেণ্ডাম হবে আশ্বাস পেয়ে ঝীণাও অবশেষে সায় দেন, কিন্তু গান্ধী সায় দেন না।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গান্ধীজীর আপত্তির হেতু ছিল আসামের ভাগ্য। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় তাঁর আপত্তির কারণ ছিল বাংলার ভাগ্য। বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্যে তিনি বাঙালীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু ও শহীদ সুহারাবর্দী সেই লাইনে কাজ করছিলেন। সে চেষ্টা সফল হলে দুটোর জায়গায় তিনটে ডোমিনিয়ন হতো। তাতে কংগ্রেসের আপত্তি। কংগ্রেসের ভিতরে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস পছন্দ করতেন না। এতে ইংরেজদের মনে খটকা ছিল যে মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সফল হবে না। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মতো ভেস্তে যাবে। সেই কথা ভেবে তাঁরা একটি গোপন পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন, নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব্যর্থ হলে সেই গোপন পরিকল্পনা কার্যকর হতো। বড়লাট এক একটা প্রদেশ এক একটা দলের হাতে সঁপে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলতে বিশেষ কিছু টিকে থাকলে অবশিষ্ট ক্ষমতা তার হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়ে প্রস্থান করবেন। তার পরে কাকে কাকে সনদ দেওয়া হবে তা ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করবেন।

কাউকে না জানিয়ে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনায় একটি ধারা যোগ করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি বাংলার হিন্দু মুসলমান একমত হয় তাহলে বাংলা অখণ্ড থাকবে ও একাই একটি রাষ্ট্র হবে। সম্ভবত ওরা একমত হতো না। তবু তার জন্যে একটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। বিলেত থেকে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্জুরি এলে মাউণ্টব্যাটেন প্রকাশ্যে তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করতেন। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্রামের জন্যে সিমলায় যান। নিভৃতে কথাবার্তার জন্যে নেহরুকেও অতিথি হতে আমন্ত্রণ করেন। একদিন খানার পরে পিনার সময় কী মনে করে দলিলটি নেহরুকে দেখতে দেন। বড়লাটের ধারণা ছিল ঝীণা আপত্তি করতে পারেন, নেহরু করবেন না।

কিন্তু জবাহরলাল তা পড়ে প্রথমে লাল, তারপরে সবুজ। দলিলটা

ফেরত দিয়ে বলেন, "এ জিনিস চলবে না। আমি তো নয়ই, কংগ্রেসও না, ভারতও এটা গ্রহণ করবে না।" এর পরে তিনি বড়লাটকে এক কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, ওর ফল হবে ভারতবর্ষের বলকানীকরণ ও গৃহযুদ্ধ। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কেরও অবনতি হবে।

এতদিন মাউন্টব্যাটেন তাঁর ইংরেজ পারিষদের দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন। এবার তাঁর সহায় হন তাঁর ভারতীয় পারিষদ ভি. পি. মেনন। এই ভদ্রলোক অনেকদিন আগেই সর্দার বল্লভভাইকে বাজিয়ে দেখেছিলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে ভিত্তি করে পার্টিশন হলে সে পার্টিশনে তিনি রাজী, যদি বাংলা ও পাঞ্জাব সেইসঙ্গে ভাগ হয় ও যদি স্বাধীনতা তার ফলে ত্বরান্বিত হয়। মেনন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার উপর ভিত্তি করে সেই মর্মে একটা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে সেটা ভালো করে মুসাবিদা করে সিমলায় পেশ করেন। নেহরুকে সেটা দেখানো হয়। এবার জবাহরলাল সম্মতি দেন।

তখন তারই নাম হয় মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান বা দুই স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন প্ল্যান। সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লণ্ডনে উড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার পূর্বের পরিকল্পনা বাতিল করে পরবর্তী পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। এর পরে নেতাদের একত্র করে তাঁদের সবাইকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নেবার দায় ম্যাউন্টব্যাটেনের। বিশেষ করে ঝাঁপাকে দিয়ে।

বেশ বোঝা যায় যে ব্রিটিশ পক্ষের স্বার্থ ছিল কংগ্রেসকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাসে সম্মত করানো। যেই সেটি হাসিল হলো অমনি বাংলা, পাঞ্জাব পার্টিশনে ইংরেজদের যে আপত্তি ছিল তাঁদের সে আপত্তি দূর হলো। বাকী রইল মুসলিম লীগের বাধা। সে বাধা মাউন্টব্যাটেনই খণ্ডন করলেন। তখন ভারতবর্ষ সেই পিঠে ভাগের মতো দু'ভাগ হলো। ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার ঠিক আছে দেখে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রাতারাতি স্বাধীনতা বিল পাশ করে দিলেন।

পরাধীন দেশে যার নাম ডিভাইড অ্যান্ড রুল স্বাধীন দেশত্বয়ে তারই নাম ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। দুই দেশ ডোমিনিয়ন না হয়ে এক দেশ ডোমিনিয়ন হলে কিন্তু এ নীতি বজায় রাখা কঠিন হতো। জবাহরলাল দীর্ঘকাল চেষ্টা করেছিলেন ডোমিনিয়ন স্টেটাস ঠেকাতে। দূঢ় থাকলেন না এইজন্যে যে সেই গোপনীয় পরিকল্পনা অনুসারে অবিভক্ত পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল।

বাংলা যাতে অবিভক্ত থাকে তার জন্যে মহাত্মার বিশেষ মাথাব্যথা ছিল। কিন্তু উল্টো বুঝলি রাম। আমাদের এক সাব জজ আমাকে সুধান, "আচ্ছা, বাংলার সেই সব বিপ্লবী ছেলেরা গেল কোথায়? গান্ধীকে কেন কেউ গুলি করে না?" আমি তো হতবাক। অতি শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষটির হঠাৎ এমন মতিভ্রম প্রত্যাশা করিনি। তিনি বিষম উদ্বেগের স্বরে বলেন, "বাংলা ভাগ না হলে বাঙালী বাঁচবে কী করে?" অর্থাৎ মুসলিম লীগ তো অবাধে

সাবাড় করবে।

ডাইরেক্ট্ অ্যাকশন শুরু করে মুসলিম লীগ যে হিংসা-প্রতিহিংসার পরম্পরা পয়দা করেছিল তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারত মহাত্মার অহিংসা। কিন্তু সেই সঙ্কটকালে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় হাতের কাছে ছিল না বলে বাঙালী হিন্দু বাংলা ভাগকেই ঠাওরায় নিরুপায়ের উপায়। সে মুহূর্তে হিংসাবাদীরা এগিয়ে এসে অভয় দিতে পারতেন। কিন্তু সেদিন তাঁদের হিংসাও ছিল নিষ্ক্রিয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা ভ্রাতৃরক্ত পাত করেননি।

দোসরা জুন রাত বারোটার একটু আগে দিল্লীর বড়লাটভবনে ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের অভিনয় সারা হয়। ভারত ভাগ্য-বিধাতার এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে সংগ্রামের আটাশ বছর যিনি সকলের পুরোভাগে সন্ধির দিন তিনিই সবার পিছে। মাউন্টব্যাটেনের শঙ্কা ছিল যে গান্ধী সেদিন ইচ্ছা করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে পারতেন। তিনি তো পার্টিশনে সায় দেননি।

পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া শক্ত ছিল না। ছোট্ট একটি "না" বলাই যথেষ্ট। কষ্ট করে অনশনও করতে হতো না। কিন্তু কাঁচিয়ে দিলে তাঁকে শূন্যতার সঙ্গে পাঞ্জা করতে হতো। ইংরেজশূন্যতার সঙ্গে। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যে সশস্ত্র ফোর্স তার সঙ্গে ম্যাচ করবার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স নামক নিরস্ত্র ফোর্স। যাকে তিনি বলতেন ম্যাচিং ফোর্স। কিন্তু ইংরেজ যদি উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে না যায় তাহলে যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ বেধে উঠবে তার সঙ্গে ম্যাচ করবার মতো নিরস্ত্র ফোর্স কই তাঁর তূণীরে?

উত্তরাধিকারের যুদ্ধের উত্তর গণসত্যাগ্রহ নয়। তিনি বোধহয় কল্পনা করেছিলেন যে মুসলিম লীগকে মসনদে বসিয়ে দিলে সে কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি করবে। নয়তো লীগ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একদিন গণসত্যাগ্রহ করা যাবে। কিন্তু তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কেউ বিশ্বাস করতেন না যে মসনদে বসলে লীগের স্বভাব শোধরাবে। গুণ্ডারাজের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কি সত্যি কোনো ফল হতো? হলে সে ফল নোয়াখালীতেই প্রত্যক্ষ করা যেত।

যে অহিংসার সঙ্গে দেশের লোক এতদিন পরিচিত ছিল সে ছিল কারা-বরণের শৌর্য ও সৎসাহস। কিন্তু গৃহযুদ্ধের দিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ নর-নারীকে রক্ষা করার জন্যে যে অহিংসার প্রয়োজন হতো সে অহিংসা হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর মরণ বরণ। অথচ মরণব্রতী সত্যাগ্রহীর সংখ্যা সেদিন হাজার হাজার তো নয়ই, শত শতও নয়। এমন কি দশ-বিশটিও নয়। যে দু-চারজনকে পাওয়া গেল তাঁরা ধরিত্রীর লবণ। কিন্তু সেই ক'জনকে নিয়ে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া যায় না।

তা ছাড়া গান্ধীজী ছিলেন মুক্তার জহুরী। স্বাধীনতার মুক্তাটি সাচ্চা না হয়ে ঝুটো হলে নিশ্চয়ই তিনি বাধা দিতেন। মুক্তাটি যে ঝুটো নয় সাচ্চা

এবিষয়ে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ এক না হয়ে দুই হলো বলে তিনি সাচ্চা স্বাধীনতাকে ঝুটা বলে প্রত্যাখ্যান করতেন না। তবে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ভালোবাসার জিনিসকে ভেঙে দু'খানা করা কি সহ্য হয়? বিশেষ করে বাংলাকে?

আসলে স্বাধীনতা ও পার্টিশন ছিল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একপিঠকে খারিজ করলে অন্যপিঠকেও খারিজ করা হয়। কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

তিন

মালিকান্দায় যেবার তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলুম সেবার সেই ১৯৪০ সালের গোড়ায় আমার মনে হয়েছিল যে এই নিরস্ত্র মানুষটির শক্তির রিজার্ভ অপরিমেয়। অনাগত দিনের সংগ্রামের জন্যে তিনি সেই রসদ মজুত রেখেছেন।

বিয়াল্লিশ সালের বলপরীক্ষায় তাঁর রিজার্ভ কি নিঃশেষিত হলো? না, তা নয়। শক্তির নবীকরণের অফুরন্ত ক্ষমতা ছিল তাঁর অন্তরে। পুনঃ পুনঃ ভরে উঠত ভাণ্ডার। পঁয়তাল্লিশ সালের শেষে আবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা তখন আবার তিনি যেমনকে তেমন। শ্রান্ত ক্লান্ত ভগ্নোৎসাহ সৈনিকের মতো চেহারা নয় তাঁর। প্রয়োজন হলে আরেকবার রণে ঝাঁপ দিতে পারতেন।

কিন্তু সেই আরেকবার আর এলই না। সংগ্রামের জন্যে অফুরন্ত শক্তির রিজার্ভ নিয়ে বসে আছেন মহাত্মা। কিন্তু কোথায় সেই সংগ্রাম? না, মুসলিম লীগের সঙ্গে সমান ধর্মান্ধ হিংস্রতার নাম গান্ধীয় সংগ্রাম নয়। জাতীয় সংগ্রামও নয়। তেমন কোনো সংগ্রামের দায়িত্ব নিতেন না তিনি। তাঁর ইস্পাতের সমকক্ষ মুসলিম লীগ নয়, ব্রিটিশ সরকার। তাঁর উপযুক্ত প্রতিপক্ষ ঝাঁণা নন, সম্রাটের প্রতিনিধি।

তাঁর অনিঃশেষিত সংগ্রামী শক্তি তূণভরা বাণের মতো তূণেই রয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে লড়ছে কে যে তিনি লড়বেন? অভিনয়ের মাঝখানে সহসা যবনিকা-পতন। নায়ক প্রতীক্ষা করছেন রঙ্গমঞ্চে প্রতিনায়কের, কিন্তু প্রতিনায়ক সাজঘর থেকে বাড়ি চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। নেপথ্যে নায়কের দলবলের সঙ্গে প্রতিনায়কের সন্ধি হয়ে গেছে। প্রতিনায়কও রণক্লান্ত, নায়কের দলবলও তাই।

আমাদের জীবনে সেটা ছিল একটা সত্যের মুহূর্ত। মোমেণ্ট অফ ট্রুথ। ইংরেজের সঙ্গে আর নয়, মুসলীম লিগের সঙ্গেই সংগ্রাম আবশ্যক। অথচ গান্ধী তাতে নেতৃত্ব করবেন না, ঝাঁণা তাঁর প্রতিনায়ক নন। ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা ইংরেজ রাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। আর কোনো ভূমিকায় তাঁকে মানায় না। তা ছাড়া লীগের সঙ্গে লড়তে হলে হাজার হাজার মরণব্রত সত্যাগ্রহী

চাই। কোথায় পাবেন তাদের? কারাবরণকারীদের নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম চলত। লীগের সঙ্গে নয়। গান্ধীজী সেই সত্যের মুহূর্তে অনিচ্ছুক বা অক্ষম। ইচ্ছুক যাঁরা ছিলেন তাঁরা হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন, কিন্তু পারতেন কি দেশকে অখণ্ড রাখতে, প্রদেশকে অবিভক্ত রাখতে? না, সে শক্তি তাঁদের ছিল না। সেইজন্যে তাঁরা সন্ধিতে রাজী হলেন।

গান্ধীজীর রিজার্ভ শক্তি সংগ্রামের আরেকবার উপলক্ষ না পেয়ে বিড়ম্বিত হয়। তাঁর হিসাবমতে না হয়ে আরো আগে—আরো অনেক আগে—ভূমিষ্ঠ হয় স্বাধীনতা। শ্যামদেশীয় যমজ।

একবার যদি ধরে নিই যে ইংরেজের সঙ্গে আর নয়, লীগের সঙ্গেই সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল তাহলে গান্ধীজীর তাতে কোনো ভূমিকা ছিল না, থাকতে পারত না। যাঁদের ভূমিকা তাঁরা মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় দেশ ভাগাভাগি ও প্রদেশ ভাগাভাগি করে নিলেন। আর্মিরও একভাগ তাঁদের হাতে এল। দরকার হলে সৈন্যচালনা করবেন।

স্বাধীনতার সার কথা যদি হয় রাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভ তথা সংবিধান প্রণয়নের অবাধ অধিকার তবে স্বাধীনতার কোথাও কিছু কম পড়ল না। শুধু বাদ গেল জনগণের ঐক্য, ভারতবর্ষের ঐক্য, পাঞ্জাবের ঐক্য, বাংলার ঐক্য।

আমরা এক নেশন রইলুম না। আমাদের ইতিহাস একধারায় বইল না। আমাদের মন ভেঙে গেল। হৃদয় ভেঙে গেল। আমাদের মধ্যে যারা সংখ্যালঘু—পাকিস্তানের হিন্দু শিখ আর ভারতের মুসলমান—তাদের কাছে স্বাধীনতা অসার বোধ হলো। তার চেয়েও মারাত্মক কথা ভবিষ্যতে যদি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধরত হয় তারা হবে সন্দেহভাজন বিভীষণ। গৃহযুদ্ধের মূল কারণ তো থেকেই গেল। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ।

এ বিরোধকে মীমাংসায় পরিণত করা ইংরেজ থাকতে সম্ভব ছিল না। ইংরেজ যেতেই কি সম্ভব হলো? যারা মুসলিম রাজকে বা হিন্দু রাজকে যমের মতো ভয় করত তারা ঘরবাড়ি ক্ষেত-খামার ফেলে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক মারল ও মরল। এমন হিংসার নজির আমাদের ইতিহাসে মেলে না। মিললে সেই মহাভারতের যুদ্ধে মেলে। তিন সপ্তাহে পাঞ্জাবের মৃত্যুসংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশী। আর উৎপাটিতের সংখ্যা তো এক কোটির কাছাকাছি যায়।

পাঞ্জাবে যে এরকম হতে পারে তার আভাস আমি মেদিনীপুরে বসে ১৯৪০ সালে পাই। আমার এক পাঞ্জাবী মুসলিম সহকর্মী ছুটির থেকে ফিরে গল্প করেন যে পাঞ্জাবে একটুকরো লোহা কিনতে পাওয়া যায় না। লোকে সংগ্রহ করছে লড়াইয়ের জন্য। তাদের ধারণা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজের হার হবে। ইংরেজ অপসরণ করবে। তখন পাঞ্জাব কার হবে? শিখদের মতে শিখদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো ইংরেজরা ছিনিয়ে নিয়েছিল, যার ধন সেই পাবে। তেমনি মুসলমানদের মতে মুসলমানদের, কারণ তাদের হাত

থেকেই তো শিখরা কেড়ে নিয়েছিল, যার ধন সেই পাবে। তেমনি হিন্দুদের ধারণা হিন্দুদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো মুসলমানরা অপহরণ করেছিল, যার ধন সেই পাবে।

পাঞ্জাব ছেড়ে আর কোথাও লড়তে যেতে কেউ রাজি ছিল না বলে রিক্রুট বন্ধ হবার জোগাড়। শেষে একটা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। শিখদের বলতে হয়, মুসলমানরা কেমন সেয়ানা। যুদ্ধে নাম লিখিয়ে ওরা তালিমও পাবে, হাতিয়ারও পাবে। তারপর তোমাদের পিটিয়ে পাঞ্জাব দখল করবে। তেমনি মুসলমানদের বলতে হয়, দেখছ তো শিখরা কেমন চালাক। যুদ্ধে নাম লেখাচ্ছে তালিমের জন্যে, হাতিয়ারের জন্যে। সময় এলে তোমাদের হটিয়ে পাঞ্জাব ভোগ করবে। তেমনি হিন্দুদের বলতে হয়—যাক গে! সাম্রাজ্যবাদের যা চিরকেলে পলিসি। সবাই জানে, সবাই বোঝে, অথচ সবাই ভোলে। বিস্তর শিখ, বিস্তর মুসলমান, বিস্তর হিন্দু যুদ্ধে যায়। ফিরে এসে গৃহযুদ্ধের জন্যে উদ্যত থাকে। পাঞ্জাবের অনর্থ যে ভয়ঙ্কর হবে এটা আমার কাছে অজানা ছিল না।

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন যে ইংরেজরা চলে গেলে বড়জোর পনেরো দিনের অরাজকতা হবে। তা পড়ে আমি লিখেছিলুম যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো দিনে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য ধ্বংস হয়েছিল। সেটাও ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই।

বিয়াল্লিশ সালের সেই প্রবন্ধে আমি আরো লিখেছিলাম, "এতকাল আমরা বলাবলি করেছি তৃতীয় পক্ষই এর থেকে লাভবান হয়েছে ও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, এর মানে এমন নয় যে তৃতীয় পক্ষ চলে গেলেই আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করব। বরং তৃতীয় পক্ষের প্রস্থানের পরেই এ সমস্যা চরমে উঠবে, এরূপ আশঙ্কা করবার কারণ যদি না থাকে তা হলেও আশঙ্কা আছে। আশঙ্কাকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সেই আশঙ্কা অবশেষে বাস্তবে পরিণত হলো। পার্টিশনের জন্যে হলো এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য—আরো বড় সত্য যে ব্রিটিশ শক্তির অপসরণের জন্যে হলো। এক শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়েছে, তার জায়গায় অপর শক্তি সক্রিয় হয়নি, সেই যে গোধূলিবেলা বা সন্ধিক্ষণ সেটা অরাজকতার অবাধ অবসর। সে সময় মহাত্মা যদি কলকাতায় না থেকে পাঞ্জাবে থাকতেন তাহলে তাঁর নৈতিক প্রভাব হয়তো বা কাজ দিত। যেমন দিল কলকাতায়।

কিন্তু নৈতিক প্রভাবেরও একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত ছিল। কলকাতার গবর্নমেণ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর কাজে সহযোগিতা না করে বাধাবিঘ্ন ঘটালে ফল অন্যরূপ হতো। তেমনি সুহরাবর্দী সাহেবের সাহায্যেরও দরকার ছিল গান্ধীজীর। লাহোরের গবর্নমেণ্ট তো তাঁকে অবাঞ্ছিত বলে অনাদর করতই, রাজনৈতিক নেতারাও যে স্বাগত জানাতেন তা নয়। আর লাহোরই হলো পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতার মতো লাহোরে গিয়ে পার্টিশনের পূর্বাহ্ন হতে প্রভাব বিস্তার করা অত্যাবশ্যক ছিল। মহাপুরুষের নৈতিক প্রভাবের

শূন্যতাও শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অরাজকতাকে দুর্বার করেছিল।

কলকাতা যেমন বাংলার প্রাণকেন্দ্র, লাহোর যেমন পাঞ্জাবের, দিল্লী তেমনি ভারতবর্ষের। হঠাৎ দিল্লী থেকে ডাক আসে। যে মানুষটির পূব মুখে নোয়াখালী রওনা হবার কথা তাঁকে পশ্চিম মুখে দিল্লী ছুটতে হয়। সেখানে গিয়ে দেখেন সে এক বিচিত্র অরাজকতা। পুলিশ আছে, মিলিটারি আছে, আদালত আছে, জেল আছে, মাথার উপরে নিজেদের সরকার আছে। রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কোথাও এতটুকু অকুলান নেই। সে ক্ষমতার শরিক নেই। অপোজিশন নেই। তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধন প্রাণ মানসম্মান ধর্মস্থান কিছুই নিরাপদ নয়, কোনো কিছুরই মূল্য নেই। তারা গান্ধীজীর মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, আবার এক নিরাকের প্রত্যাশায়। কলকাতার মতো।

কিন্তু কলকাতার সঙ্গে দিল্লীর তুলনাই হয় না। কলকাতা ছিল ইংরেজদের রাজধানী, তার আগে আর কারো নয়। দিল্লী ছিল তার আগে মুঘলদের রাজধানী, তুর্কদের রাজধানী। আরো আগে রাজপুতদের রাজধানী, মহাভারত সত্য হলে কুরুপাণ্ডবের রাজধানী। এখন তার উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পতাকা উড়লেও ভিতরে ভিতরে ইতিহাসের বিলুপ্ত অধ্যায়-গুলির হিসাবনিকাশ চলছিল। হিন্দুরা ভাবছিল কতকাল পরে যবনের হাতে পরাভবের অবসান হলো। সাতশো বছর যেন একটা দুঃস্বপ্ন। মরাঠারা ভাবছিল কতকাল পরে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পরাভবের অপমান গেল। দু'শো বছর যেন একটা দুর্গ্রহ। মরাঠারাও তো এককালে দিল্লীর হর্তাকর্তা ছিল। মুঘল রাজত্ব যদি পাকিস্তানে ফিরে এসে থাকে মরাঠা আধিপত্য তেমনি হিন্দুস্থানে ও তার রাজধানীতে ফিরে আসতে কতক্ষণ?

আমার এক মন্ত্রী বন্ধু দিল্লী ঘুরে এসে দুঃখ করে বলেন, কংগ্রেস তো নামেই ক্ষমতার আসনে, আসল ক্ষমতা এখন মহারাষ্ট্রীয়দের কী একটা সঙ্ঘের করলে। সেদিন ওকথা আমার বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু একটু একটু করে প্রত্যয় হয় যে দেশের একভাগ মুঘলদের দিলে আরেকভাগ মরাঠা ও শিখদের দিতে হয়। গোলমাল করছিল ওরাই। কেউ শরণার্থী হয়ে, কেউ প্রতিশোধপ্রার্থী হয়ে। ওদের সঙ্গে জুটেছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিভিন্ন সংস্থা। এমন কি কংগ্রেসেরও একটা অংশ। হাঁ, ক্যাবিনেটেরও কোনো কোনো সভ্য।

মহাত্মার নীতি ছিল স্বার্থহীন ও নিঃশর্ত। সেকুলার স্টেটের নাগরিক-মাত্রেরই সমান মর্যাদা ও অধিকার। সবাইকে সমান প্রোটেকশন দিতে হবে। দিতে রাষ্ট্র বাধ্য। তার জন্যে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। পাকিস্তান যদি সেকুলার স্টেট হতো সেও তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করত। তা যখন সে নয় তখন তার ব্যবহারে তারতম্য ঘটতে পারে, ঘটলে প্রতিকার করা যেতে পারে, কিন্তু ওখানকার দুর্ব্যবহারের জন্যে এখানকার নিরীহ সংখ্যালঘুদের সাজা পেতে হবে কেন? একের অপরাধে

অপরের শাস্তি কি ন্যায় না ধর্ম ?

অন্যদিকের বক্তব্য হলো, পাকিস্তান যখন সেকুলার স্টেট নয়, ইসলামিক স্টেট, তখন সে তার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেই। এর কোনো প্রতিকার নেই। একদিন না একদিন সবাইকে চলে আসতে হবেই। তাহলে এরা এখানে থাকবে কেন ? এখানকার সংখ্যালঘুরা। লোকবিনিময় ভিন্ন আর কোন পন্থা নেই। আর লোকবিনিময় তো অমনিতেই হবে না। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, ঘরের বদলে ঘর, জমির বদলে জমি, গোরুর বদলে গোরু, জরুর বদলে জরু এই হচ্ছে পদ্ধতি। এর নাম বদলা।

অর্থাৎ ভারত হবে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্থান। যেমন পাকিস্তান কেবলমাত্র মুসলিমদের স্থান। এ সেই পুরাতন তর্ক, শুধু পরিস্থিতিটা নূতন। কংগ্রেস হবে কেবল হিন্দুদের জন্যে। যেমন মুসলিম লীগ কেবল মুসলিমদের জন্যে। ঝীণার এই দাবী কংগ্রেস তখন মেনে নেয়নি, এখন দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসেরই একভাগ সেই লাইনে চিন্তা করছেন।

ভারতের কংগ্রেসের মতবাদ জয়ী হবে বলেই এর নাম হিন্দুস্থান না হয়ে হয়েছে ভারত। এ রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র না হয়ে হয়েছে সেকুলার স্টেট। অপরপক্ষে পাকিস্তানে লীগের মতবাদ জয়ী হবে বলেই তার নাম পাকিস্তান, সে ইসলামিক স্টেট। কংগ্রেস ও লীগ যে যার মতবাদে অটল থাকলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবন দুর্বহ হবে এটা সত্য, কিন্তু তার জন্যে মহাত্মা নোয়াখালী ফিরে গিয়ে যা হয় করবেন। তাঁর দিল্লীর মিশন সফল হলে তাঁর নোয়াখালীর মিশনও সাফল্যের অভিমুখে যাবে। কিন্তু দিল্লীর মিশন যদি ব্যর্থ হয় তবে তো নোয়াখালীর হাল ছেড়ে দিতেই হয়।

মহাত্মার অপ্রতিশোধ নীতির কদর্থ করা হলো মুসলিমপ্রীতি। ওদের অমন করে তোষণ করা দুর্বলতা। তার চেয়ে ওদের উপর শোধ নাও। হিংসার বদলে হিংসা। পাকিস্তান একমাত্র হিংসার ভাষাই বোঝে। কিন্তু ওরা যে ভারতীয় নাগরিক, যেমন কংগ্রেসী মুসলমান। কে শোনে কার যুক্তি ? সব মুসলমানই পাকিস্তানী, সব মুসলমানই পঞ্চমবাহিনী।

ভারতের অন্যায় দিয়ে পাকিস্তানের অন্যায়ের প্রতিকার হবে, মহাত্মা এটা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর জীবনের সমস্ত শিক্ষাই লোকে ভুলতে বসেছে, এমন কি তাঁর প্রিয় সহকর্মীদের কেউ কেউ। রাষ্ট্র হাতে পেয়ে তাঁরা রক্ষক হবেন না, ভক্ষক হবেন। প্রাইভেট ভায়োলেন্সকে প্রশ্রয় দেবেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেও বিসর্জন দিয়ে তার আসনে বসাবেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে। গান্ধীজী তা হলে কিসের জন্যে বাঁচলেন ? কিসের জন্যে বাঁচবেন ? অনশন-মৃত্যুই শ্রেয়।

কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ বদলী হয়ে গিয়ে শুনি অনশন ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু দিন দুই যেতে না যেতেই প্রার্থনাসভায় বোমা। প্রহ্লাদের মতো তাঁর পরীক্ষা চলেছে। অনশনে মরণের হাত থেকে বাঁচলেন তো বোমার মুখে পড়লেন। বোমার মরণের হাত থেকে বাঁচলেন তো—আমি নিশ্চিত ছিলুম যে

প্রহ্লাদের মতো গান্ধীজীও বাঁচবেন।

একদিন টেনিস খেলে ফিরছি, বাড়িতে ঢুকতে যাবো, এমন সময় দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্থানীয় কংগ্রেস প্রধান। সুধান, "আপনি কি কিছু শুনেছেন ? রেডিওতে নাকি বলেছে—"

"কী বলেছে ?" আমিও তাঁরই মতো অধীর।

"মহাত্মাকে নাকি গুলি করেছে। মহাত্মা নাকি—" তিনি আবেগের সঙ্গে বলেন।

"অসম্ভব।" আমি তাঁর দু'হাত চেপে ধরে বলি, "এ হতেই পারে না।"

ভিতরে ঢুকতেই শুনি রেডিওতে জবাহরলালের বিলাপ। আলো নিবে গেছে।

হা ভগবান !

দেখতে দেখতে সরকার থেকে রেডিওগ্রাম এসে হাজির। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কিন্তু আততায়ীর নাম নেই। তার পরিচয় সে একজন ডাউনকাস্টি হিন্দু। ডাউনকাস্টি বলতে তো বাংলাদেশও বোঝায়। বাঙালী নয় তো ? সারা রাত ছটফট করি। অমন কাজ করতে পারে কে ? কার এত হিংসা ? মরাঠা বনাম প্রচ্ছন্ন মুঘল, ব্রাহ্মণ বনাম অব্রাহ্মণ গুরু, হিন্দু বনাম ম্লেচ্ছদের বন্ধু, সনাতনী বনাম অন্ত্যজদের সখা, হিংসা বনাম অহিংসার উদ্গাতা, এমনি করে ভাবতে ভাবতে যে নির্ণয়ে উপনীত হই তা পরের দিনকার খবরের সঙ্গে মিলে যায়।

এতদিন যেটা করা উচিত ছিল, করা হয়নি, এখন ঘোড়া ছুটি যাবার পর আস্তাবলের দরজায় তালা পড়ে। সাইফার মেসেজের পর সাইফার মেসেজ। অমুক প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত হলো। অমুক আইন অনুসারে অ্যাকশন নাও। তখন আমি জেলশাসক। ধরপাকড় করে জেলে পাঠাই। কিন্তু রাজ্যিশুদ্ধকে জেলে পুরলেও মহাত্মাকে তো ফিরে পাবার নয়।

পরে শুনি সে রাত্রে নাকি বহরমপুর শহরের অনেকগুলি বাড়িতে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, মফঃস্বলেও। খবরটা রটবার সঙ্গে সঙ্গেই। একের কাছে যা পরম শোকাবহ অপরের কাছে তাই পরম সুখকর। হিন্দুর শত্রু নিপাত হয়েছে। হিন্দু এখন নিষ্কণ্টক।

যীশুর ক্রুশিফিকশন দ্বিতীয়বার অভিনীত হলো। আমাদের জীবনে দেখতে হলো সে সকরুণ অথচ গৌরবময় দৃশ্য। আমার পক্ষে জন্মালগ্ন। আমি নিষ্ফল রোষে জ্বলেছি। আমার মতে এ ঘটনা অনিবার্য ছিল না। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছাটাই বিভক্ত।

তিরিশে জানুয়ারির ঘটনার পরিপূরক হলো পরের দিনের ঘটনা। করাচী বন্দর থেকে জাহাজে উঠল শেষ ব্রিটিশ সৈনিক। দু'শো বছর বাদে রাহুমুক্ত হলো দেশ। মনে হলো প্রথম সত্যাগ্রহীর অপসারণ ও শেষ বিদেশী সৈনিকের অপসরণ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। গান্ধীজী জন্মেছিলেন যে কাজটা করতে সেটিও ফুরোল, তাঁর আয়ুও ফুরোল।

চার

গান্ধীজী তখনো জীবিত। স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে একবার দার্জিলিং থেকে ফিরছি। শিলিগুড়িতে আমার কামরায় সহযাত্রী হন এক ইংরেজ মিলিটারি অফিসার। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্ল্যাটফর্মের এক নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন অপর একজন সাহেবের সঙ্গে। যিনি তাঁকে তুলে দিতে এসেছিলেন। শেষের দিকে তাঁরা পাগলের মতো জড়াজড়ি করেন।

লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। বলেন, "আমাদের দু'জনের ব্যবহার দেখে আপনি হয়তো হকচকিয়ে গেছেন। ও হচ্ছে আমার দাদা। ওর সঙ্গে বিশ বছর বাদে আজকেই প্রথম দেখা। শেষ দেখাও বলতে পারি। আমি ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দাদা চা বাগানের মালিক। সে থেকে যাচ্ছে।"

এরপরে তিনি যা বলেন তা আমার মনে খোদাই হয়ে আছে।

"দাদার সঙ্গে তর্ক করেই সময় কেটে গেল। দাদা বুঝতে পারছে না কেন আমরা এই সোনার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কে আমাদের যেতে বাধ্য করছে। আমি ওকে বোঝাই, দাদা, মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদের সে মাইট কি আর আছে? কেমন করে থাকি!"

কথাটা ঠিক। ইংরেজদের মাইট ছিল, আর সেই মাইটের ধারক ছিলেন সেই মিলিটারি অফিসার। মাইট কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে, সে দাপট আর নেই, তাই ওঁরা মানে মানে বিদায় নিচ্ছেন।

তেমনি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহীরা বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট। মিলিটারি অফিসারের কথাটার ঠিক উল্টোটি। তাঁর থীসিসের অ্যান্টিথীসিস্।

রাইট বাড়তে বাড়তে যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে হাত বাড়ালেই সিদ্ধি। কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে ষোল আনা সিদ্ধিলাভ আর হলোই না। তবু বোঝা গেল, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট।

গান্ধীজীর বাণী সেই মিলিটারি অফিসারের বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জোর যার ন্যায় তার নয়। ন্যায় যার জোর তার।

গায়ের জোর বনাম ন্যায়ের জোর এই দুই জোরের সংঘাত ত্রিশ বছর ধরে চলে। ওটি একটি এপিক সংগ্রাম। ও নিয়ে একদিন এপিক লেখা হবে। কিন্তু যেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলো তাকে গ্লোরিয়াস এণ্ডিং বলা শক্ত। মহাত্মার নিজের কথায় ওটা একটা গ্লোরিয়াস স্টাগলের ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং।

অথচ এমনই নিয়তির বিধান যে পনেরোই অগাস্ট তাঁকে যার থেকে বঞ্চিত করল তিরিশে জানুয়ারি তাই তাঁকে দিল। গ্লোরিয়াস এণ্ডিং। গৌরবময় পরিসমাপ্তি।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের এপিক চরিত্র তাকে একদিন এপিকের বিষয়বস্তু করবে। তাকে নিয়ে এপিক উপন্যাস, এপিক নাটক, এপিক কাব্য রচিত হবে। আর তার মহানায়ক হবেন গান্ধীজী। আধুনিক মহাভারতের আধুনিক যুধিষ্ঠির তথা কৃষ্ণ।

গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছিল। তখন কিন্তু খেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রই শেষ কথা নয়, তার পরে আছে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের শোচনীয় দেহাবসান। নতুন মহাভারতও সেই পুরাতন ট্র্যাজেডীর রূপান্তর। মন আমার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে এপিকের প্রয়োজনেই গান্ধীজীকে অপসৃত হতে হবে। ব্রিটিশ অপসরণ ও গান্ধী অপসারণ যেন একই সূত্রে গাঁথা। যেন মঞ্চ থেকে নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয়েরই নিষ্ক্রমণ একই কালে। যেন একজনের প্রস্থানের পর আরেকজনের উপস্থিতি অর্থহীন।

গান্ধী বিয়োগের পর একদিন বহরমপুরের বিশিষ্ট নাগরিক রমণীমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রমণীবাবুর মুখে শুনি যে গান্ধীজী একবার তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। বাড়ির একটি নবজাত শিশুকে দেখে আশীর্বাদ করেন। বলেন, দীর্ঘজীবী হও। দীর্ঘজীবী হও।

তখন রমণীবাবু বলেন, মহাত্মাজী, আপনিও দীর্ঘজীবী হোন। গান্ধীজী তা শুনে গভীর প্রতীতির সঙ্গে বলে ওঠেন—

"Believe me, Ramani Babu, I shall not live a day longer than necessary."

তাই হলো। যেই তাঁর প্রয়োজন ফুরোল অমনি তাঁর পরমায়ু ফুরোল। প্রয়োজনটা আমাদের দিক থেকে নয়, তাঁর দিক থেকে। আমরা তো তাঁকে কোনোদিনই নিষ্প্রয়োজন মনে করতুম না। এই দুর্ভাগা দেশের প্রয়োজনের তালিকাটি তো ছোট নয়। কিন্তু তাঁর দিক থেকে তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসের দিক থেকেও। ব্রিটিশ সৈনিক না থাকলে প্রথম সত্যাগ্রহী লড়বেন কার সঙ্গে? ব্রিটিশ রাজের সঙ্গেই অর্ধনগ্ন ফকিরের দ্বন্দ্ব। একের অন্তর্ধান অপরকে অনাবশ্যক করে।

তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝতে পেরেছিলেন যে আর তাঁকে কেউ চায় না। 'কেউ' মানে 'কেউ কেউ'। তিনি তাঁদের পথের কাঁটা।

মর্ত্যলোকে মানুষের মুখে যে শেষ কথা শুনে যান সেকথা নাকি কতকটা এইরকম—তোমার অহিংসা দিয়ে কাজ হবে না। তোমার দিন গেছে।

হাঁ, এইটেই ছিল মূল প্রশ্ন যা নিয়ে তাঁর আপনার লোকেদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে এমন কোনো সমস্যা নেই যার অহিংস সমাধান নেই। খুঁজলেই মেলে। যত্ন করে সন্ধান করো। মিলবেই মিলবে।

তাঁদের মতে অহিংসা কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। সে উদ্দেশ্য যখন আর নেই সে উপায়ও তখন অকেজো। আর তাঁরা হলেন রাজনীতির লোক। সাধুসন্ত নন যে সবকিছু ফেলে অহিংসাব্রত নেবেন ও

তামাম সমস্যার অহিংস সমাধান হাতড়ে বেড়াবেন। তাই যদি হয় তো সৈন্যসামন্ত আছে কী করতে? ক্ষমতার হস্তান্তর কিসের জন্যে?

সত্যাগ্রহ যে কোথায় এক নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল সেটাও একটা বিস্ময়। ত্রিশ বছর যা মঞ্চ জুড়ে ছিল তা কি সত্য না মায়া? গান্ধীজী নিজেই বলতে আরম্ভ করেন যে তিনি এতদিন একটা মায়া নিয়ে পথ চলেছিলেন। এখন সে মায়া তাঁর নেই। তিনি মোহমুক্ত।

একথাও বলেন যে, এতদিন তিনি যাকে অহিংসা বলে ভ্রম করেছিলেন সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। দুর্বলের অস্ত্র। দুর্বল যখন বলবান হয়ে ওঠে, অন্য হাতিয়ার হাতে পায় তখন হিংসায় ফেটে পড়ে।

আমার মন গান্ধীজীর এই খেদোক্তিতে সায় দেয়নি। ত্রিশ বছর ধরে কত বড়ো একটা শক্তি কত বড়ো একটা দেশকে ইঞ্জিনের মতো চালিয়ে নিয়ে গেল, কতদূরে চালিয়ে নিয়ে গেল। তার সমস্তটাই কি দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ?

গান্ধীজী অতি সাধারণ মানুষের কাছে অতি অসাধারণ তপোবল প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে যে সমবেতভাবে যা তারা করেছে তা সত্যি অসাধারণ। সমবেত যদি থাকত তাহলে আরো অসাধারণ কীর্তি রাখত। কিন্তু শেষের দিকে তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল আর পরস্পরকে মর্মান্তিক আঘাত করে পর হয়ে গেল। এটা যেন ক্লাইমাক্সের পর অ্যান্টিক্লাইমাক্স।

ট্র্যাজেডী সন্দেহ নেই। কিন্তু অহিংসা তা বলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ছদ্মবেশ হয়ে যায় না। সত্যাগ্রহ তা বলে মায়া হয়ে যায় না। মহাত্মার জীবনের কাজ অকারণ হয়ে যায় না। বিচার করলে দেখা যাবে যে ভারতের লোকশক্তির উচ্চতা বেড়ে গেছে আর সেটা গান্ধীজীর নেতৃত্বের কল্যাণে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির নীচতায় সে উচ্চতার হানি হয়েছে তা ঠিক। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে তা ঠিক। তা সত্ত্বেও আমরা এমন কিছু করেছি যা নিয়ে এপিক লেখা যায়। ত্রিশ বছর তো মিথ্যা নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী একবার একস্থানে বলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা একশো বছরের কাজ। তার কমে কি হবে?

কিন্তু জাগতিক অবস্থা সহায়ক হয়েছিল। তাই তাঁর সেই উক্তির ত্রিশ বত্রিশ বছরের ভিতরেই হলো। জাগতিক অবস্থা বলতে বোঝায় দু'দুটো মহাযুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধের মাঝখানে রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তোর ব্রিটেনে শ্রমিক শক্তির জয়। তা ছাড়া অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি। ক্যাপিটালিজমের সংকট। কমিউনিজমের প্রসার।

স্টালিনগ্রাডের পরেই আমরা কেউ কেউ ইউরোপের মানচিত্র নিয়ে বসি ও তার উপর মনের সুখে লাইন টানি। জার্মানীর সবটা তো রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ইংরেজ মার্কিনও তো লঙ্কাভাগ করবে। জার্মানীর পার্টিশন অবধারিত। পরে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে তখন ইংরেজ মার্কিন কিছুটা এগিয়ে থাকবে। তাই যদি হয় তবে ওরা রাশিয়ার

সঙ্গে লড়বে, না সেইসঙ্গে ভারতের সঙ্গেও লড়বে? একসঙ্গে ক'টা ফ্রন্ট খোলা যায়? ভারতীয় ফ্রন্ট গুটিয়ে আনাই হবে ওদের নীতি। যদি ভারতকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মিত্ররূপে পাবার প্রয়োজন থাকে তবে তো স্বাধীন করে দিতে হবেই। অবশ্য স্বাধীন হবার পর ভারত মিত্র হবে কি না অগ্রিম অঙ্গীকার দিতে পারে না। মিত্রতার অঙ্গীকার স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। বিনাশর্তে স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা আসছে, আর খুব বেশী দেরি নেই। তবে ঠিক কত দেরি তা তখনো বুঝতে পারিনি। তখন এইকথাই ভেবেছি যে স্বাধীনতা হলে তো গান্ধীজীর সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে, সংগ্রাম সারা হলে তো সেনাপতিত্বও সারা হবে, তারপরে কি তিনি বাঁচতে চাইবেন? বাঁচবেন? আমার তখন থেকেই আশঙ্কা যে স্বাধীনতা যেই আসবে অমনি গান্ধীজীও চলে যাবেন। তাই মনে মনে বলেছি, হোক না স্বাধীনতার দেরি, তা বলে গান্ধীজীকে তো হারাতে পারিনে। বিচার করে দেখিনি যে স্বাধীনতার চেয়ে গান্ধীজীর প্রাণকে আরো বেশী মূল্যবান ভেবেছি। ইংরেজ চলে গেলেই গান্ধীজীও চলে যাবেন এটা আমার কাছে একটা ইনটুইশন ছিল। সেইজন্যে রাতারাতি স্বাধীনতা কামনা করিনি।

জাগতিক অবস্থা সহায়ক হলো। সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থাও। আমি জানতুম যে দু'দু'বার রুশদেশে বিপ্লব ঘটে গেল মুদ্রাস্ফীতির দরুন। ভারতেও যে হারে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে তার পরিণতি বৈপ্লবিক না হয়ে পারে না। যুদ্ধ যদি দীর্ঘতর হয় তবে যুদ্ধের মাঝখানেই বিপ্লব অর্থাৎ স্বাধীনতা ভূমিষ্ঠ হবে; গান্ধীজীরও ধারণা ছিল তাই। নানাকারণে যুদ্ধকাল সংক্ষেপিত হয়। তাই যুদ্ধের মাঝখানে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের রূপ নিয়ে স্বাধীনতা আসে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেও অহিংস মতবাদের মহাক্ষতি করে। অহিংসার চেয়ে হিংসার প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। হওয়া উচিত ছিল এর বিপরীত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী শ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে কোথায় শান্তির ধ্যান করবে, না ধ্যান হলো হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা, রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিনের, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর। অহিংসা যেন চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়। কোণঠাসা হয়ে সেবাগ্রামে নিবন্ধ।

একেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। ভারতের স্বাধীনতা কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে, অহিংস মতবাদে দেশের লোকের বিশ্বাস কদম কদম পেছিয়ে পড়ছে। এটা এমন একটা পরিস্থিতি যাতে গান্ধীজী অবিচল, কিন্তু তাঁর সহযাত্রীরা অবিচলিত নন। নেতাকে ত্যাগ করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না, কিন্তু নীতিকে আঁকড়ে ধরা তাঁদের পক্ষে দিনকের দিন দুরূহ হয়। ব্রিটিশ সরকার নয়, মুসলিম লীগই দুরূহ করে।

নেয়াখালীর জন্যে আমার মনোবেদনা লক্ষ করে আমার মুসলিম বন্ধুরা

বলেন, "ওর জন্যে দায়ী মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের হিংসা প্রতিহিংসা মানুষের মনুষ্যত্ব বিগড়ে দিয়েছে। মানুষগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে।"

ভারতের মানুষ তো দুনিয়ার বার নয়। মনুষ্যত্ব বিগড়ে যায় দুনিয়া জুড়ে। সর্বত্র ওই একই তত্ত্ব। মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদের যা আছে তা আমরা গায়ের জোরে রাখব। আমাদের যা নেই তা আমরা গায়ের জোরে কেড়ে নেব। গায়ের জোরই ন্যায়ের জোর।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ ছিলেন যিনি উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে স্থির থেকে শান্তস্বরে বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট। তাঁর মতবাদ থেকে তাঁকে টলাতে পারে এমন সাধ্য কার? তিনি শতবর্ষ পরমায়ু চেয়েছিলেন যাতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেন। আর সকলের পালা যখন শেষ হবে তখন তাঁর পালা আসবে। হিংসার দৌড় যতদূরই হোক না কেন, অহিংসার দৌড় তার চেয়েও বেশী। সেই জন্যে চাই দীর্ঘতর জীবন। হিংসাবাদীরা হয়তো সাময়িকভাবে জিতবে। কিন্তু আখেরে জিতবে প্রেম মৈত্রী অহিংসা।

আমরাও মহাত্মার শতায়ু কামনা করে অহিংসার আরো মহৎ পরীক্ষার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছিলুম। পরীক্ষা যদিও একজনকে কেন্দ্র করে তবু তার পরিধি সারা দেশ ও সারা বিশ্ব। মানুষের আত্মা কি সাড়া না দিয়ে পারে? আসবে, সেদিন আসবে। আমাদেরও চাই দীর্ঘতম জীবন। তার মানে অসীম ধৈর্য।

শেষ পর্যন্ত কী দেখা গেল? দেখা গেল অহিংসা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে না। স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা করতে পারে না। গৃহযুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ব্রিটিশ অপসরণ ত্বরান্বিত হয়। অকালে ভূমিষ্ঠ হয় রক্তাক্ত যমজ শিশু। ক্রন্দনমুখর। রক্ত আর অশ্রু মুছে দেওয়াই হয় মহাত্মার মহত্তর কৃত্য। কৃত্যের মধ্যপথে নিধন।

হৃদয়টা হায় হায় করে ওঠে। সান্ত্বনা মানে না। বলে, এরকম তো কথা ছিল না। আমরা তো কেউ কখনো এরকমটা ভাবিনি। কেন তবে এরকম হলো?

না ভেবেছি তা নয়। ভেবেছি বইকি। মাঝে মাঝে ভেবেছি যীশুকে ইহুদীরা সহ্য করতে পারল না, ক্রুশে বিঁধে মারল। গান্ধী বেঁচে আছেন কী করে? তাহলে কি তিনি যীশুর মতো মহান নন?

আমার অনেক আগে মিসেস বেসান্ট ভেবে রেখেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর গান্ধী যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন প্রথম দর্শনেই মিসেস বেসান্ট বলেন, যীশুর মতো চোখ। এঁর পরিণামও কি যীশুর মতোই হবে?

স্বাধীনতা আর অহিংসা দুই হাতে দুটি বর নিয়ে আসেন গান্ধীজী। আমরা স্বাধীনতাকেই চেয়েছি, অহিংসাকে চাইনি। স্বাধীনতার খাতিরে

যেটুকু গিলতে পেরেছি গিলেছি। গিলে হজম করতে পারিনি। স্বাধীনতার দিক থেকে তাঁর যতটা মূল্য ততটা দিয়েছি, তার বেশী যদি দিয়ে থাকি তবে মহাত্মা বলে ভক্তি। কিন্তু তাঁর মতবাদ আমাদের আন্তরিক আনুগত্য পায়নি। সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল অন্তহীন অপেক্ষা।

তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে অহিংসার পরীক্ষায় দেশের লোক বার বার সাড়া দিয়েছে ও তেমন সাড়া হিংসার পরীক্ষায় দেয়নি। আমাদের ভবিষ্যতের বাদশাহী সড়ক গান্ধীজীরই হাতে গড়া। সে সড়ক কোনোদিনই সরু গলি হবে না। জনগণকে নিয়ে যদি কোনোদিন জয়যাত্রায় যেতে হয় তো সে-ছাড়া আর কোনো সড়কে কুলোবে না। যাদের দরকার তাদের জন্য থাকবে হিংসার রেল লাইন। তাতে আর ক'জনের যোগদান সম্ভব হবে? গতিবেগ হয়তো খরগোসের মতো হবে, কিন্তু কচ্ছপেরই তো জিৎ হলো উপকথায়। যীশুখ্রীষ্ট বলে গেছেন,

"The meek shall inherit the earth."

জনগণের ধরণীর উপর উত্তরাধিকার। যদি তাঁরা নম্র হয়, অথচ নত না হয়। গান্ধীজী তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষায় শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে।

পাঁচ

গান্ধীনেতৃত্বের অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের পানে তাকাই। মনে পড়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার সেই দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি।

"Bliss was it in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven!"

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জীবনে যেমন ফরাসী বিপ্লব আমার জীবনে তেমনি অসহযোগ আন্দোলন। প্রায় অর্ধশতক পরেও তার উন্মাদনা আমি এখনো অনুভব করি। তেমন দিন জাতির জীবনে একবার মাত্র আসে, চিরদিন প্রভাব রেখে যায়।

ফরাসী বিপ্লবও তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। অথচ তার মতো সার্থক আর কোন্ ঘটনা? এখনো বিশ্বমানবের চিত্তে তার স্বপ্ন জেগে আছে।

তেমনি অসহযোগের দিনগুলির স্বপ্ন।

গান্ধীজী হঠাৎ কোন্‌খান থেকে এসে একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেন। তার কমে ইংরেজ রাজের চৈতন্য হতো না। এবার তাঁরা জানলেন যে সব হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করলেও একটি হাতিয়ার থেকে যায়, সেটির নাম হাতিয়ার না থাকা। তার থেকে কোনো মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না।

ভারতের জনগণ সেই প্রথম ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করে। তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে আসেন এক অসাধারণ তেজস্বী নেতা। তাঁর হাতে একটিমাত্র অস্ত্র। তার নাম নিরস্ত্রতা। সেই অসামান্য অস্ত্রই তিনি জনগণের হাতে

ধরিয়ে দেন।

আবেদন নিবেদন করে যেটুকু পাবার সেটুকু পাওয়া গেছে, তার বেশী পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ সে পথে আসবে না। সুতরাং দেশবাসী তখন অন্য কোনো পথের সন্ধান করছিল। সে পথ কি তবে সশস্ত্র বিদ্রোহের বা বিপ্লবের পথ? মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পথ সেইরূপ হলেও লক্ষ লক্ষ পথিকের জন্যে সে পথ নয়।

এদেশের সাধারণ লোকের হাতে রাইফেল বা রিভলবার ধরিয়ে দিলেও তারা সাহস করে ধরবে না। সেই সাহসই তাদের নেই। ধরবে যারা তারা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত তরুণ ভদ্রঘরের সন্তান। তাদের জীবনদর্শন রোমান্টিক। সেই অসমসাহসিকদের উপর ছেড়ে দিলে তারাই দেশকে স্বাধীন করে দেবে এ বিশ্বাস খুব বেশী লোকের ছিল না। আর থাকলেও তারা চাচার মতো আপনা বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অংশ নিচ্ছিল না। ইতিহাসের মঞ্চে তাদের টেনে আনা অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

তবে সে চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বর্জন বলে আরো একটা পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সে পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়া গেছল। কিন্তু যে জিনিসটিকে বর্জন করবে সে জিনিসটি যদি অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে তবে সেটির অভাব পূরণ করবে কি দিয়ে? দেশে কি সেটি তৈরি হয়? তৈরি না হলে তৈরি করে নিতে কি তোমরা তৈরি?

বর্জন যে ফল হলো না তার কারণ তার সঙ্গে গঠনের আয়োজন ছিল না। যারা গড়বে না, শুধু ভাঙবে, তাদের সঙ্গে জনগণ বেশীদূর যায় না। তাই বর্জন আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী এটা লক্ষ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে প্রথমেই মনোযোগ দেন গঠনের উপর। দেশ যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রথম থেকেই গঠনের উপর ঝোঁক তাঁকে ধাপে ধাপে নিয়ে যায় খাদির অভিমুখে, চরকার অভিমুখে। একমাত্র সেই ভাবেই দেশের কোটি কোটি দীনহীন মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। নয়তো যা হবে তা কয়েকটা শহরের কয়েকজন মিল মালিকের স্বাবলম্বন।

স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাবলম্বনের সম্পর্ক সব দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। ওটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের তত্ত্বও ছিল দেশকে সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। কিন্তু ঝোঁকটা পড়েছিল বর্জনের উপরে। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তখন থেকে তাঁর মনে যে বিরূপভাব সঞ্চিত হয়েছিল তা অমূলক ছিল না। তিনি যখন শুনলেন যে গান্ধীজীও বর্জন প্রচার করছেন তখন তিনি ধরে নিলেন যে গান্ধীজীও গঠন না করে বর্জনের পক্ষপাতী। বর্জন কথাটাই রবীন্দ্রনাথের কানে জাতিবৈর-সূচক অথবা একটা উৎপাত। কারণ তাঁর স্বদেশীযুগের অভিজ্ঞতা সেইরূপ ছিল।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে গান্ধীজী দেশকে নিয়ে বিপুল আকারে গঠন-

কর্ম করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ও বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল গঠনকর্মের দেশব্যাপী উদ্যোগ। রবীন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করে গঠন কথাটিকে একমাত্র উচ্চার্য শব্দ করা। গান্ধীজীর মনের ইচ্ছা যে তার থেকে ভিন্ন তা নয়। কিন্তু বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করলে বিদেশী প্রভুশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় না। আর সংগ্রাম না হলে স্বাধীনতা হয় না। তবে গান্ধীজীও স্বীকার করতেন যে নিছক গঠনমূলক কর্মের দ্বারাও দেশ স্বাধীন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বাণীও কি তাই নয়?

তারপর অসহযোগ কথাটিও রবীন্দ্রনাথের অসহ্য। তার পেছনে রয়েছে কেবল শাসকদের বা শোষকদের সঙ্গে নয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার পাশ্চাত্য তথা আধুনিক প্রবাহের সঙ্গে একপ্রকার অসহযোগী মনোভাব। সেটা তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। না করাই উচিত। বিদেশী কাপড় বর্জন করলে দেশে একদিন স্বদেশী কাপড় বোনা হবে, তা সে যতই মোটা হোক, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপাবলী নির্বাপিত দিলে যা হবে তা অমাবস্যার অন্ধকার। মধ্যযুগ নেমে আসবে। শাসক ইংরেজ, শোষক ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাও করো। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য সংস্পর্শ থাকবে না এটা সংস্কৃতির দিক থেকে অঙ্গহানি।

আমাদের সংস্কৃতি তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রাচীন হিন্দু, মধ্য-যুগীয় মুসলিম ও আধুনিক পাশ্চাত্য। এর থেকে কোনো একটিকে বাদ দেওয়া যায় না। সরকারী বিদ্যালয় থেকে বিদ্যার্থীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও, বেশ। কিন্তু যেখানে নিয়ে যাচ্ছ সেখানেও তাদের ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করাও। সাধারণত এইসব জাতীয় বিদ্যালয় ছিল সরকারী বিদ্যালয়েরই পরিবর্তিত সংস্করণ। প্রাচীন বা মধ্যযুগের মতো নয়। নতুনের মধ্যে ছিল ইংরেজীর বদলে বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার মাধ্যম। পাঠ্যতালিকায় হয়তো ছিল এমন কোনো বই যা সরকারী বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না, কারণ রাজদ্রোহগন্ধী। বর্জন এক্ষেত্রে গঠনের মৌলিকতাবিহীন। তাই জাতীয় শিক্ষা অবশেষে চরকা খাদিকেই অবলম্বন করে গ্রামমুখীন হয়। সংস্কৃতির প্রবাহ সে খাতে বয় না।

আদালত বর্জনের উদ্দেশ্য ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চায়েৎ গঠন। সেখানেই দেশের লোক অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজবে ও পাবে। আদালতে যারা সত্যকথা বলে না পঞ্চায়েতে বলতে বাধ্য হবে। গ্রামের লোক তাদের সহজাত প্রতিভার দ্বারা বুঝতে পারবেন কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা। কারাগারে না পাঠিয়েও দণ্ড দেওয়া যায় আর তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে। রাজদ্বারে যে দণ্ডদান হয় তা মনুষ্যত্ববিরোধী। আর ইংরেজের আদালতে তো দুর্নীতির বেসাতি। সেখানে ন্যায় বলতে কতটুকু মেলে? একরাশ উকিল মোক্তার ও টাউট পোষাই কি সভ্যতা? আর হাকিমদের চুলচেরা বিচার যতই মূল্যবান হোক ভারতের সাধারণ লোকের কাছে তার কতটুকু মূল্য?

বহু ইংরেজ অফিসারও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আদর্শের আইন আদালত

প্রবর্তনের মহিমা বুঝতেন না। ভারতের লোকের জন্যে চাই কাজীর বিচার বা রাফ জাসটিস। তাঁদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে হাইকোর্ট লোয়ার কোর্ট ইত্যাদি কিছুই গড়ে উঠত না। আমরাও যে তার বদলে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলতুম তাও নয়। আমাদের সম্বল হতো মরাঠা ও মুঘল বিচার পদ্ধতি। ব্রিটিশ রাজত্ব আমাদের রাষ্ট্রে একটি আধুনিক অঙ্গ যোজনা করে। তার নাম জুডিসিয়ারি। তাকে ভেঙে ফেললেই যে তার বদলে নির্ভরযোগ্য আর এক জুডিসিয়ারি লাভ হবে তা নয়। যেটা হবে সেটা হয়তো মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটামুটি সুবিচার। কিন্তু দেখা গেল শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউ সেটা চায় না। তারা চায় সূক্ষ্ম বিচার।

ব্যয়বহুল দুর্নীতিকলুষিত হলেও ব্রিটিশ আদর্শের জুডিসিয়ারি দেশের লোকের বহু শতাব্দীর অভাব পূরণ করেছিল। সেইজন্যে তারই উপর তাদের আস্থা বেশী। এসব বিষয়ে লোকে স্বদেশী বিদেশীর বিতর্ক বোঝে না। বিদেশী পদ্ধতি যদি স্বদেশী পদ্ধতির চেয়ে উন্নত হয়ে থাকে তবে উন্নততর বলে বিদেশীকেই বরণ করে। বিদেশী কাপড় সম্বন্ধে যাদের আপত্তি বিদেশী বিচার সম্বন্ধে তাদের আপত্তি থাকলে অসহযোগ নিশ্চয়ই জোর পেত। কিন্তু দেখা গেল আদালত বর্জন করে সরকারের চেয়ে সাধারণেরই অসুবিধে হলো বেশী। পঞ্চায়েৎ দিয়ে বিচারের অভাব মিটল না।

ইংরেজ রাজত্বে যেমন আমাদের রাষ্ট্রে আধুনিক আদর্শের জুডিসিয়ারি সংযোজিত হয় তেমনি হয় লেজিস্‌লেচার। এ জিনিস এর আগে এদেশে ছিল না। ব্রিটেন থেকেই আসে। এটা প্রবর্তন করতে ইংরেজদের যে বিশেষ স্পৃহা ছিল তা নয়। তারা দীর্ঘসূত্রিতার চরম করেছে। কারণ তাদের দেশের ইতিহাসে পার্লামেণ্ট ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়, রাজা ক্রমে ক্রমে হীনবল হন। ভারতের মাটিতে পার্লামেণ্ট প্রবর্তন করলে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে। ভারতীয় লোকপ্রতিনিধিরা ক্ষমতাশীল হবেন, ইংরেজ শাসককুল সাক্ষী-গোপাল হবেন। সাধে কি কেউ সাক্ষীগোপাল হয়?

তা ছাড়া ইংরেজদের ধারণা ছিল যে তাদের পার্লামেণ্টারি সীস্টেম তাদেরই বিশেষত্ব। ব্রিটেনের বাইরে প্রবর্তন করা নিষ্ফল। সে সীস্টেম চলে একজোড়া চাকার উপর গড়াতে গড়াতে। একটি সরকার পক্ষ। অপরটি বিরোধী পক্ষ। দুই পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে যে সাধারণ নির্বাচনে বেশীর ভাগ ভোট যার ভাগ্যে পড়বে সেই শাসনভার নেবে। অপর পক্ষ নেবে বিরোধিতার ভার। বিরোধিতার ভারও দায়িত্বপূর্ণ। কারণ বিরোধীরাও একদিন সরকার গঠন করার হকদার হবে। পার্লামেণ্টারি কনভেনশন না মানলে পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা অচল। তেমন কনভেনশন তো আইন করে প্রবর্তন করা যায় না। ভারতীয়রা হাজার যোগ্য হোক সেসব কনভেনশন পাবে কোথায়? নিজেদের ভিতর থেকে বিবর্তন করা কি এত সহজ? অতএব লেজিস্‌লেচার প্রবর্তন করা বৃথা।

ঠিক ওই জিনিসটি দাবী করেই কংগ্রেসের সূচনা। কংগ্রেসের কাম্য ছিল

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একটি ভারতীয় সংস্করণ। বিদেশী বলে তাতে তার অরুচি ছিল না। স্বদেশী বলতে যা ছিল তা পার্লামেণ্টের বিকল্প নয়। তা লেজিস্‌লেচারই নয়। যে দেশে যেটা নেই সেদেশে সেটা চাওয়া কি দেশীয়তা-বিরুদ্ধ? অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে কোনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তেমন কথা ভাবেননি। তাঁরা ইংরেজের কাছে ইংরেজের যা শ্রেষ্ঠ তাই বরং চেয়েছেন। পার্লামেণ্টারি শাসন।

ইংরেজদের মধ্যে বরাবরই একদল সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁরা ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুত। গায়ের জোরে নয়, বন্ধুতার ডোরে ভারত ও ব্রিটেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থাকবে এই ছিল তাঁদের আদর্শ। তাঁদেরই একজনের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে হিউম ছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। জাতীয়তা-বাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে আরও অনেক ইংরেজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, হাত না ধরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া দাদাভাই, সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজশা, গোখলে, মালবীয় প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাধ্যাতীত ছিল। গান্ধীজীও কি হাত ছাড়িয়ে নিতেন? নিতে হলো, না নিয়ে উপায় ছিল না।

সহযোগিতা সমানে সমানে হতে পারে, স্বাধীনে স্বাধীনে হতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ড যে এতবড় একটা মহাযুদ্ধের পরেও ভারতকে সমান ও স্বাধীন বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। মহাযুদ্ধে ভারত কি কম রক্ত, কম অশ্রু, কম অর্থ, কম উপকরণ দান করেছিল? তার সৈনিকরা প্রাণ না দিলে তুর্কদের হটানো যেত না। জার্মানদের হারানো আরো কঠিন হতো। অথচ কাজের বেলায় কাজী যারা কাজ ফুরোলেই পাজী তারা। তাদের উপর রাওলাট আইন চাপানো হলো। তাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হলো না।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার সময়ও গান্ধীজী ব্রিটেনের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করতেন। সে বিশ্বাস একটু একটু করে টলে। প্রথম ধাক্কা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। বুকে হাঁটার হুকুম। আনুষঙ্গিক বিবিধ প্রতিশোধ। কারণ কয়েকজন ইংরেজ পুরুষকে খুন করা হয়েছিল ও ইংরেজ নারীকে অপমান করা হয়েছিল। ইংরেজদের মনে আতঙ্ক জন্মেছিল যে সিপাহীবিদ্রোহ আবার বাধতে যাচ্ছে, তখন আর ইংরেজ পুরুষ বা নারী কেউ নিরাপদ নয়। কাজেই তাদের একজনের গায়ে হাত দিয়েছ কি সর্বনাশ করেছ। তারাও সর্বনাশ করবে।

দ্বিতীয় ধাক্কা মুসলমানদের মনে লাগে, ভাই হিসাবে গান্ধীজীরও মনে। যুদ্ধের পরে যে শান্তি বৈঠক বসে তাতে তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা খর্ব করা হয়, মালিক হিসাবে তিনি দুনিয়ার মুসলমানদের ধর্মস্থানগুলির উপর কর্তৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ভারতীয় মুসলমান বন্ধুরা গান্ধীজীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরামর্শ চান। তখন তিনি তাঁদের বলেন যে আবেদন নিবেদন করে যদি কোনো ফল না হয় তবে মুসলমানদের কর্তব্য

হবে অসহযোগ। অসহযোগ কথাটি আচমকা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর তিনি সেটি ভুলে যান। পরে আবার মনে পড়ে যখন আবেদন নিবেদন সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ট্র্যাজেডী নিয়ে দেশময় ঝড় উঠেছিল। প্রথম অসহযোগী আর কেউ নয়, নাইট উপাধিত্যাগী রবীন্দ্রনাথ।

আমরা যে সবাই মিলে এক নেশন তার প্রমাণ পাঞ্জাবীদের লাঞ্ছনায় সকলেরই লাঞ্ছনাবোধ আর মুসলমানদের মর্মবেদনায় সকলেরই সমবেদনা। তবে এ দুটির ভিতরে একটু তফাৎ ছিল। খেলাফৎ বহুদূরের ব্যাপার। খেলাফৎ নিয়ে ব্যথা পাওয়া তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক যারা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সেটা অবাস্তব। তাই মুসলমান ভিন্ন আর কেউ সে ইস্যুতে অসহযোগ করতে এগিয়ে আসতেন না বড়ো। গান্ধীজীর কথাতেও না। তেমনি পাঞ্জাবের ইস্যুতেও আসমুদ্র হিমাচল এককথায় অসহযোগ করত না। এ ছাড়া আরো একটা ইস্যুর দরকার ছিল। তার নাম স্বরাজ।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবার মতো ছিল না। গান্ধীজীও গোড়ায় তার বিরুদ্ধতা করেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর প্রত্যয় হয় যে মহাযুদ্ধের দুঃখদুর্দশার ফলে দেশ যেমন আগুন হয়ে রয়েছে হিংসাপন্থীরাই তার সুযোগ নেবে ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিশোধ ডেকে আনবে। অহিংসাপন্থীরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে তবে কোনোদিনই সুযোগ পাবে না। মুসলমানরা যখন অসহযোগ করতে উদ্যত, পাঞ্জাবীরাও প্রস্তুত, তখন আর সবাইকে স্বরাজের নামে ডাক দিলে তারাও সাড়া দেবে। কেননা স্বরাজের জন্যে অভূতপূর্ব এক আকুলতা জেগেছিল। ধাপে ধাপে শাসন সংস্কার, কে জানে ক'পুরুষ বাদে স্বরাজ, এটা তারা মেনে নিতে নারাজ যাদের রক্ত গরম। সন্ত্রাসবাদী যাদের বলা হতো তারা অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বিশ্বময় জাল পেতেছিল। কোথায় কানাডা, কোথায় জার্মানী, কোথায় জাপান ও ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র তাদের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত ছিল।

একহাতে নরমপন্থীদের সরিয়ে আরেক হাতে সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। তাঁর পেছনে খেলাফতী মুসলমানদের ওমায়েৎ। আর যাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি সেই অন্ত্য ইতর জনগণ। শূদ্রকে এতদিন ক্ষুদ্র বলেই অনুকম্পা ও অসম্মান করা হতো। এখন বোঝা গেল স্বরাজের জন্যে লড়তে হলে বিপুল সংখ্যকের যোগদান অত্যাবশ্যক। সুতরাং মুচি মেথর চামার কামার এরাও যোদ্ধা।

যুদ্ধের প্রয়োজন সব দেশেই শূদ্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নারীরও। গান্ধী পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের বেলাও তাই ঘটে। দেশ যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে সংগ্রামের প্রতীক্ষায় ছিল। অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে গান্ধীজী সেই সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। তার জন্যে একটা প্লাটফর্মের দরকার ছিল। আশ্চর্যের বিষয় রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে কংগ্রেসই হয় সেই প্লাটফর্ম। সংগ্রামের তীব্রতা তাকে ক্রমে ক্রমে একটা পার্টির চেহারা দেয়।

অসহযোগ আপাতত কার্যক্রম হলেও সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সই ছিল লক্ষ্য। লক্ষ লক্ষ লোক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই আকর্ষণে ও মহাত্মার সম্মোহনে।

ছয়

অহিংসার সর্বশক্তিমত্তার উপর গান্ধীজীর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল পর্বতের মতো অটল। কিন্তু তাঁর অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। তারা আশা করেছিল হাতে হাতে ফল। ফল যখন ফলল না তখন তারা নিরাশ হলো।

গান্ধীকথিত একবছর তো ফুরিয়ে গেল। কোথায় স্বরাজ? তখনো বাকী ছিল মাস্ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স। যার বাংলা করা হয় গণসত্যাগ্রহ। সকলের আশা গণসত্যাগ্রহ যদি একবার আরম্ভ করে দেওয়া হয় তাহলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে ও দমকলের দ্বারা দমনের অতীত হবে। সেই তো স্বরাজ। তাই সকলেরই দৃষ্টি বারদোলির উপর। গুজরাতের সেই তহশিল হবে পথপ্রদর্শক।

এমন সময় ঘটে গেল চৌরিচৌরায় আকস্মিক এক ঘটনা। পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে উন্মত্ত জনতা থানায় আগুন দিল। পুড়ে মরল বাইশজন কনস্টেবল। মহাত্মার চোখে ভয়ংকর এক অশুভ লক্ষণ। এত বড়ো দেশে চৌরিচৌরার মতো ঘটনা যে আর কোথাও ঘটবে না সে নিশ্চয়তা কে দেবে? অহিংসা সত্যাগ্রহ হত্যাগ্রহ হতে কতক্ষণ? সরকার কি ছেড়ে কথা কইবে? সরকারও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আগুন নেবাবে।

ব্রিটিশ সরকার যে দরকার হলে তার মখমলের দস্তানা খুলে লোহার হাত বার করতে পারে এবিষয়ে গান্ধীকে কিছু বলার আবশ্যক ছিল না। তাহলেও তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সতর্ক করে দেন যে ইংরেজরাও তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রস্তুত। গণসত্যাগ্রহ তারা অঙ্কুরে বিনাশ করবে।

এমনি এক বন্ধুর নাম মহম্মদালী ঝীণাভাই খোজানী। পরবর্তী বয়সে 'ভাই' ও 'খোজানী' বাদ দিয়ে মহম্মদ আলী ঝীণা। ইংরেজীতে জিন্না। ইনি একদিন রাত্রিবেলা বারদোলিতে উপস্থিত। এঁর মতে গণসত্যাগ্রহ কিছুতেই করা উচিত নয়, করলে শুরুতেই গুলি চলবে। ইংরেজরা বেপরোয়া হয়ে রয়েছে। তার চেয়ে ভালো বড়লাট লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে বৈঠক। ঝীণা ও মালবীয় সেই চেষ্টায় আছেন।

গান্ধীজীও জানতেন যে সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজরা সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত, অতএব সশস্ত্র। একগুণ হিংসার উত্তর ওরা দশগুণ হিংসায় দেবে। তারপরে হয়তো কিছু শাসনসংস্কার বা চাকরিবাকরি দিয়ে নিহত ও আহতদের স্বদেশবাসীকে কৃতার্থ করে দেবে। সুতরাং একগুণ হিংসা যাতে

আদৌ না হয় সেইটেই শ্রেয়। তার মানে কি সব আন্দোলন স্তব্ধ? না, তা কদাচ নয়। অহিংসা সেকথা বলে না। অহিংসা বলে, আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করো, তারপরে গণসত্যাগ্রহ করো। ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হয়নি চৌরিচৌরা তার সঙ্কেত। ওই লাল সিগনাল অগ্রাহ্য করলে সিপাহীবিদ্রোহের মতো পরিণাম হবে।

একজন সত্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু এক কোটি সত্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে কি? যেখানে জীবনমরণ সংগ্রাম চলেছে সেখানে এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রশ্ন। নেতা যিনি তাঁকে এর সম্যক উত্তর দিতে হবে। বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। গণসত্যাগ্রহের সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন যদি না হয় তবে আর কখন হবে কেউ বলতে পারে না। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। অথচ যে সংগ্রাম অহিংস তার অহিংস চরিত্র না থাকলে তার নেতৃত্ব করা কি গান্ধীজীর উপযুক্ত কাজ?

গণসত্যাগ্রহের তখনকার দিনের পরিকল্পনা ছিল বারদোলির অনুসরণে এক এক করে ভারতের অগণ্য তহশিল সরকারী কর্মচারীদের শাসনমুক্ত হবে। সরকারী কর্মচারীরা সেখানে গেলে সহযোগিতা পাবেন না। তাঁদের বর্জন করা হবে। তখন হয় তাঁরা তহশিলবাসীদের পক্ষে যোগ দেবেন নয় তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। এমনি করে ভারতের তহশিলে তহশিলে স্বাধীনতা আসবে। সরকারকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হবে।

তত্ত্বের দিক থেকে ভুল নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা হতো তা ওই বারদোলির মতো দুটি একটি তহশিলে আত্মশাসন। তারাও কিছুদিন বাদে হাল ছেড়ে দিত। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ বেশীদিন চালাতে পারে না। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা কি কেবল অপকারই করেন? আপদে বিপদে উপকার করেন না? তাঁরাও যদি অসহযোগ করেন, যদি তহশিলে না যান, তবে তহশিলবাসীরাই কি তাঁদের কাছে গিয়ে সাহায্যপ্রার্থী হবেন না? বাংলাদেশে আমি বহু অঞ্চল দেখেছি যেখানে সরকারী কর্মচারীরা পারতপক্ষে পা দেন না। এতই দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন। সাধারণের স্বার্থে তাঁদের জোর করে পাঠাতে হয়েছে। অঞ্চলবাসী যদি তাঁদের সহ্য করতে না পারে তাহলে তাঁদের উপর চাপ দেওয়া বৃথা। তাঁরা যদি না যান অঞ্চলই অবহেলিত থাকবে।

থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিস যদি না মেলে তবে চমৎকার একটা আইডিয়াও মাঠে মারা যায়। ব্যর্থতাই ছিল তখনকার পরিকল্পনার কপালে। যদি গান্ধীজী চৌরিচৌরার ইঙ্গিতে গণসত্যাগ্রহ স্থগিত না রাখতেন। ফলে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হলো। অনেক গালমন্দ শুনতে হতো, যদি না সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁকে কারারুদ্ধ করতেন। ওটা শাপে বর। জেলে গিয়ে তিনি সব সমালোচনা এড়ালেন।

গণসত্যাগ্রহ যখন শিকেয় তোলা রইল তখন কর্মীদের একদল ধুয়ো ধরলেন যে বিকল্প হচ্ছে কাউন্সিল বর্জন তুলে নেওয়া। কাউন্সিলে গিয়েও তো

সরকারের সঙ্গে একহাত লড়তে পারা যায়; অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকার-পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারা যায়। তা যায়। কিন্তু সরকার তা বলে দেশের কাঁধ থেকে নামে না। আইনসভার হারজিতের উপর সরকারের হারজিৎ নির্ভর করে না। তবে প্রাদেশিক সরকারের কয়েকটা বিভাগ নির্বাচিত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত। সেইসব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারলে তাঁদের পতন ধ্রুব। কাউন্সিলগামী স্বরাজীদের সাধ্যের সীমা সেই পর্যন্ত। সেভাবে কি স্বরাজ হতে পারে? কংগ্রেস ওই প্রশ্নে দ্বিমত। পরে স্বরাজীদের কাউন্সিলে যাবার জন্যে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হয়।

এমনি করে অসহযোগ নীতিতে উজান বইতে শুরু করে। বিদ্যার্থীরা ফিরে যায় স্কুল কলেজে। উকিলেরা আদালতের পসারে। কোথায় সেইসব জাতীয় বিদ্যাপীঠ, কোথায়ই বা গ্রাম পঞ্চায়েৎ? চরকা ও খাদি টিম টিম করে জ্বলতে থাকে। গঠনকর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে শিবরাত্রির সলতে জ্বালিয়ে রাখেন।

অহিংসার দৌড় দেখে হিংসাপন্থীরা আবার হিংসাত্মক কার্যকারখানায় উৎসাহ ফিরে পান। কংগ্রেসের এক অংশ তাঁদের নৈতিক সমর্থন জোগান। পেণ্ডুলাম ধীরে ধীরে অহিংসার থেকে হিংসার অভিমুখে দোলায়িত হয়। আর সে হিংসা যে কেবল রাজনৈতিক হিংসা হয়েই ক্ষান্ত থাকে তা নয়। বহুস্থলে সাম্প্রদায়িক হিংসার আকার ধারণ করে। দোষ অবশ্য দেওয়া হয় তৃতীয়পক্ষের 'ভাগ করো আর শাসন করো' নীতিকে। দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধের হেতু তা বলে হাওয়া হয়ে যায় না।

খেলাফতের স্তম্ভ ছিলেন তুরস্কের খলিফ। কামাল পাশা তাঁকে বিতাড়ন করে নিরস্ত্রের করেন। তখন খেলাফতের ভারতীয় স্তম্ভধারীরা স্তম্ভীভূত হন। খেলাফতের ইস্যুতে যারা হাতে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁদের হাতের জোড় খুলে যায়। তারপরে হাতাহাতি বাধতে কতক্ষণ? একদা যেসব হিন্দু মুসলমান হয়েছিল বা হতে বাধ্য হয়েছিল আর্যসমাজ তাদের ফিরিয়ে নিতে হাত বাড়ায়। মোল্লা ও মৌলবীরা বিনা দ্বন্দ্বে ফিরতে দিতে পারে? ধর্মান্তরীকরণ নিয়ে যে বিবাদের সূত্রপাত তার পরিণতি ভয়াবহ দাঙ্গায়।

নির্বাচনে জিতে কংগ্রেসপ্রার্থীরা অনেকগুলি মিউনিসিপালিটির কর্ণধার হয়েছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে মুসলমানদের আরো কয়েকটা চাকরি দিতে পারতেন। কিন্তু দিলে হয়তো হিন্দু ভোট হারাতেন। ফল যা হলো তা সাম্প্রদায়িক গাত্রদাহ। মুসলমানরা অনেকেই কংগ্রেসের উপর ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়। কংগ্রেস রাজা হলে মুসলমানের কী এমন সুবিধে? ও তো হিন্দুরাজ। পরের জন্যে লড়তে যাবে ও জান দেবে কোন্ আহাম্মক?

তা সত্ত্বেও বিস্তর মুসলমান কংগ্রেসে রয়ে যান, জাতীয় সংগ্রামের দায়িত্ব অস্বীকার করেন না, হিন্দুর দোষে ভারতকে দণ্ড দিয়ে নিজেরা খালাস হন না। দেশের জন্যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা তাঁদের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষের ঊর্ধ্বে রাখে।

গান্ধীজী যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন তখন দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়ে এমন হয়েছে যে গণসত্যাগ্রহের লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই। অসহযোগও মৃতপ্রায়। বেঁচে আছে কেবল চরকা ও খাদি। ওদের বাঁচিয়ে রাখাই হয় তাঁর পিতৃকৃত্য। সে কাজে তিনি তাঁর সকল শক্তি ঢেলে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জোয়ার আবার একদিন আসবে। যেদিন আসবে সেদিনকার জন্যে আপনাকে প্রস্তুত রাখাই তাঁর কর্তব্য। সেদিন যাঁরা তাঁর সঙ্গে চলবেন তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হলে গঠনকর্ম নিয়েই জনসংযোগ রক্ষা করতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে কাউনসিলযাত্রা হচ্ছে লক্ষ্যভ্রংশ। আর হিংসা তো রীতিমতো বিপথ।

কলেজে গিয়ে আমি নানা বিদেশী গ্রন্থ পাঠ করি ও নানা মুনির নানা মতের সঙ্গে পরিচিত হই। গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ পাই। মানবের ইতিহাসে গান্ধীই আদি বা অন্ত নন। গান্ধীবাদীদের গোঁড়ামি দেখলে আমিও সমালোচনা করি। কিন্তু আমার সমালোচনা বাইরের লোকের নয়, ঘরের লোকের। আর সমালোচনাই কি শুধু করি, সমর্থনও কি করিনে? আমার সমর্থন আমার সাজে পোশাকে। টিকি আর টুপী ছাড়া আর সবই তো আমি নিয়েছি। টিকি যে আমি নিইনি এর কারণ আমি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় রেনেসাঁসের সন্তান। গান্ধীজীর সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আমার মিল নেই। টিকি দেখলেই আমার হাত নিসপিস করে। কাঁচি আমার অস্ত্র। আমি তার বেলা হিংসাপন্থী। আর টুপী না পরাই আমাদের প্রাদেশিক ঐতিহ্য। আমরা টুপী পরিনে, মাথা খালি রাখি। পরলে আর বাঙালী থাকিনে, সাহেব বনে যাই।

একদিনে নয় দিনে দিনে আমার এ ধারণা দৃঢ় হয় যে অহিংসাই প্রকৃষ্ট উপায়, যেমন সততাই প্রকৃষ্ট পলিসি। ভারতের যা অবস্থা তাতে অহিংসা ভিন্ন আর কোনো উপায় জনগণের কাছে খোলা নয়। যাঁদের কাছে খোলা তাঁদের দলে জনগণ নেই। বিপ্লববাদীদের দলেও না, কাউন্সিলগামীদের দলেও না। তাঁরা যদি জনগণকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে ও পরে সংরক্ষণ করতে পারেন তো আমি সাধুবাদ দিতে রাজী আছে। কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে ভাবা মহাত্মার আবির্ভাবের পর আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজী এসে জনগণকে এমনভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন যে তারা কিছুদিনের মতো অসাড় থাকলেও আর কখনো অসাড় হবে না। তখন জনগণের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন কোন্ বিপ্লববাদী বা কোন্ কাউন্সিলগামী? করলে কী ভাবে করবেন? তাদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে না ভোটপত্র দিয়ে? হাতিয়ার দিলে গৃহযুদ্ধ। ভোটপত্র দিলে তিন বছর বা পাঁচ বছর অন্তর একবার ঘুম ভাঙা। বাকী সময়টা নিদ্রা। কুম্ভকর্ণের মতো। আমার কাছে গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ তিনে এক, একে তিন। হিন্দুদের ত্রিমূর্তি, খ্রীস্টানদের ট্রিনিটি, বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন যেমন।

তারপর আধুনিক যুগের অপরাপর মতবাদের মধ্যে ন্যায়ের অন্তঃসার

যথেষ্ট থাকলেও প্রায় প্রত্যেকটির আড়ালে রয়েছে উদ্দেশ্যই আসল, উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যে-কোনো উপায় অবলম্বনীয়, উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায়ের সাত খুন মাফ। এন্ড জাস্টিফায়েস মীনস্। টলস্টয় অনুপ্রাণিত গান্ধী মতবাদই বলতে গেলে একমাত্র মতবাদ যে বলে উপায়ই আসল, উপায় অশুদ্ধ হলে উদ্দেশ্যও মাটি হয়, উপায় শুদ্ধ হলে উদ্দেশ্যও হয় তদনুরূপ। এর কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ। এর হাতে না আছে ঢাল না আছে তলোয়ার। তবু এ বলবে, উদ্দেশ্য মহৎ হলে কী হবে, উপায় যদি নীচ হয় তবে তেমন সিদ্ধি কাম্য নয়। ন্যায়ের জগৎ অন্যায়ের রক্ত আর কর্দম পিচ্ছিল পথ দিয়ে আসতে পারে না।

Mars-এর পূজা করব না, Mammon-এরও না, একথা বলতে পারতেন একমাত্র গান্ধীজী। সেইজন্যে জাতীয়তাবাদের মতো একটা সংকীর্ণ মতবাদও তাঁর নেতৃত্বের মহিমায় মহীয়ান হয়ে ওঠে। নেশনের পূজারীরা মানব সত্যেরও পূজারী হন। ভারতের জাতীয়তাবাদ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। তা হলেও তার তলায় বিদ্বেষের বিষক্রিয়া ছিল। অহিংসার সঙ্গে তা সঙ্গতিহীন। অহিংসাকে তা ভিতরে ভিতরে লঙ্ঘন করে চলেছিল। বীরের প্রকাশ্য হিংসাও তার চেয়ে ভালো। প্রকাশ্য হিংসার সাহস যাদের ছিল না গান্ধী নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় মুখ ঢেকে তারা অহিংসার গৌরব বৃদ্ধি করত না। করত কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি। সংগ্রামের দিন সেটারও দরকার ছিল। বস্তুত সর্বসাধারণের কাছে আন্দোলনের বা প্রতিষ্ঠানের দুয়ার খোলা রাখলে বাছবিচারের কড়াকড়ি থাকে না। যারা ঢোকে তারা যদি অহিংসার জল ঘোলা করে বা জাতীয়তার সঙ্গে বিজাতিবিদ্বেষ মেশায় তাহলে মহাত্মারও সাধ্য নেই যে ঠেকান। তাঁর ধারণা চরকা কাটার বিধান দিলে কেবল সাধুসজ্জনরাই টিকে থাকবে, আর সবাই কেটে পড়বে। বিদেশীর আইন ভঙ্গ করতে যারা এগিয়ে এসেছে মহাত্মার আইন ভঙ্গ করার থেকে তারা পিছিয়ে যাবার পাত্র নয়।

উপায় নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল না। আমিও মানতুম যে অহিংসা অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ ছিল। ইংরেজ সরকার যাক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিও কি যাবে, যেহেতু তার বাহন পাশ্চাত্য বা ইংরেজী? সত্য আর অহিংসা আর মৈত্রী প্রভৃতি শাশ্বত মূল্যগুলি আসুক, সে তো অতি উত্তম কথা, কিন্তু রেনেসাঁসের পর থেকে যেসব মূল্য চলিত হয়েছে—যুক্তি আর তথ্য আর সংস্কারমুক্তি আর বন্ধনহীনতা—সেসবের প্রস্থান ঘটবে না তো? জনগণ অহিংস হোক, আমিও চাই। কিন্তু অজ্ঞ হলেই কি ভালো হবে? রেনেসাঁসকে জনজীবনের খাতে বইয়ে দেওয়াই কি কাম্য নয়?

একটিমাত্র কোকিল দিয়ে যেমন একটা বসন্ত হয় না তেমনি একজনমাত্র গান্ধী দিয়ে একটা ভাববিপ্লব। ধীরে ধীরে আমার প্রত্যয় হলো যে রেনেসাঁস তাঁর উপর বিশেষ কোনো প্রভাবপাত করেনি, অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় এনলাইটেনমেণ্ট তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে সামান্যই করেছে, আধুনিক যুগ

বলতে তিনি বোঝেন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম ও মিলিটারিজম। তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হতে পারবে, জনগণও প্রতিরোধশক্তি লাভ করবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীও সম্ভবপর, কিন্তু আর একটা ফরাসীবিপ্লব কেমন করে সম্ভব? তার প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় ভলতেয়ার? কোথায় রুশো? দিদেরো ও তাঁর বিশ্বকোষ-রচয়িতা বন্ধুগণই বা কোথায়?

আমরা কি তাহলে মধ্যযুগে ফিরে যাব? ইংরেজ বিদায় মানে কি ইংরেজপূর্ব যুগের প্রত্যাবর্তন? মধ্যযুগ তো তবু হিন্দুমুসলমান উভয়ের। মুসলমানকে বাদ দিয়ে আরো অতীতে ফিরে যাবার চিন্তাও অনেকের মনে ছিল। তাঁদের বলা হতো হিন্দু রিভাইভালিস্ট। তেমনি একদল মুসলিম রিভাইভালিস্টও ছিলেন। আমরা কি তাহলে রিভাইভালিস্টদের সংঘর্ষের দৃশ্য দেখব? মানুষ যেমন দেশবিশেষের সন্তান তেমনি যুগবিশেষেরও সন্তান। আমরা কোন্ যুগের সন্তান? যদি আধুনিক যুগের সন্তান হয়ে থাকি তবে সে যুগের সঙ্গে আমাদের কি ভালোবাসার সম্পর্ক না বিদ্বেষের সম্পর্ক?

মিলিটারিজম ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম যে আমাদের যুগকে ফোঁপরা করে তুলছে আমি তা ভালো করেই জানতুম। স্বাধীন ভারত বলতে যদি বোঝায় আর-একটা ইটালী বা জাপান তা হলে সে ভারত গান্ধীজীর তো কাম্য নয়ই। কাম্য নয় আমারও। গান্ধীজীর সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে একমত। কোনো একটা যুগের সব কিছুই গ্রহণীয় নয়। তাই যদি হতো তবে গত শতাব্দীর দাস-প্রথাও গ্রহণীয়ের তালিকায় পড়ত। আমাদের যুগ ওটাকে অতিক্রম করে এসেছে। তেমনি মিলিটারিজম তথা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমকেও করবে। এই ছিল আমার বিশ্বাস। তাই স্বাধীন ভারত বলতে আমি আর-একটা ইটালী বা জাপান বুঝতে চাইতুম না।

কিন্তু ওটা তো হলো নেতিবাদ। কী চাইনে তা বলা হলো। কী চাই তা তো বলা হলো না। গান্ধীজীর দিকে তাকাই। মন মেনে নিতে পারে না যে হাজার হাজার বছর ধরে গ্রামে বাস করা মানুষ চিরকাল গ্রামে বাস করলেই নতুন এক সমাজব্যবস্থার পত্তন হবে, নতুন এক সভ্যতার উদয় হবে। উচ্চনীচ ভেদ তুলে দিলেই জাতিভেদ আরো পাঁচ হাজার বছর সহনীয় বা স্পৃহনীয় হবে। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করলেই নরনারীর সম্পর্ক মধুময় হবে ও নরনারীর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ধনিক শ্রমিক, খাতক মহাজন, জমিদার রায়ত সকলেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেও শ্রেণীসাম্য সম্ভব। সনাতন শাস্ত্র শাসিত মন একতিলও বদলাবে না, একটুও বিদ্রোহ করবে না, অথচ বিংশ-শতাব্দীর গতিশীল মন হবে। এই যদি তাঁর মত হয় তবে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনে।

সাত

গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ এই ত্রয়ীতে আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনের যোগফলে ভারতের কী ভাবরূপ হবে তা আমাকে ভাবিয়ে তুলত। যদি হয় বর্ণাশ্রমী ভারত তাহলে তো তার সঙ্গে আমার মূলগত অমিল। কারণ আমি চাই গতিশীল জীবন, স্থিতিশীল জীবন নয়। আর আমি চাই নতুন শৃঙ্খলা, পুরাতন শৃঙ্খল নয়।

গান্ধীজীর দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, প্রতি সপ্তাহে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়ি। ইতিপূর্বেই পড়া হয়েছিল 'হিন্দ্ স্বরাজ'। এরপরে পড়া গেল 'সত্যের পরীক্ষা' বা আত্মজীবনী। এ জগতে যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেন ইনি হলেন তেমনি একজন পুরুষ। এঁকে যীশু বুদ্ধের মতো মহাগুরুও বলতে পারা যায়। আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা এঁর বাণী সতৃষ্ণ আগ্রহে পান করে। ইনি যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আমিও যে সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এ কি আমার পরম সৌভাগ্য নয়? ভাবীকালের মানুষ আমাকে এই জন্যে ঈর্ষা করবে। আমার সাধ ছিল যাতে একদিন বলতে পারি—"হাঁ, গান্ধীজীকে আমি দেখেছি।"

সুযোগ জুটে যায় তাঁর জেল থেকে বেরোবার বছর দেড়েক বাদে পাটনায়। যে বার স্বরাজীদের হাতে কংগ্রেসকে সঁপে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ধার করা এক ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে আমিও ঢুকে পড়ি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়। মহাত্মার কাছ থেকে অদূরেই আমার আসন। ফোটো তুলিনি, তবে সমস্তক্ষণ তাঁর উপর দৃষ্টি রেখেছি সূর্যমুখীর মতো। মানুষটার সীক্রেট কী? কিসের জোরে উনি নতুন এক সৌরমণ্ডলীর সূর্য? কেন ওইসব সর্বজনমান্য জ্যোতিষ্ক তাঁর চারদিকে ঘুরছেন? হাঁ, সেই সভায় ভারতের তাবৎ বড়ো বড়ো নেতাকেও প্রত্যক্ষ করি। নেহ্রুকেও।

কেমন করে বুঝব কী তাঁর সীক্রেট? ডেস্ক সামনে রেখে মেজের উপর পা মুড়ে বসেছিলেন ও একমনে শুনছিলেন নেতাদের বক্তব্য। অখণ্ড ধৈর্য। মাঝে মাঝে দুটি একটি উক্তি করছিলেন একান্ত বিনয়ে ও নিম্নস্বরে। তখন ঠিক মালুম হয়নি যে স্বরাজীদের কাছে তিনি হেরে গেছেন, ওটা তাঁর পরাজয়-সভা। এই মর্মে সন্ধি হয়েছে যে ওঁরা তাঁর খদ্দর নীতি মেনে নেবেন আর তিনি ওঁদের পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম মেনে নেবেন। বুদ্ধের মতো অবিচলিত বিগ্রহ। কিন্তু বুদ্ধের মতো প্রশান্ত নন। ভিতরে ভিতরে অশান্ত। কি যেন করতে এসেছিলেন, করতে পারেন নি, করতে পারছেন না। তবু স্থিতপ্রজ্ঞ। স্বীয় মতবাদে অটল। বজ্র দিয়ে গড়া।

কিন্তু ততদিনে আমি তাঁর মতবাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। যদিও সংযোগ রেখেছি। কে পার্লামেণ্টে যাবে, কে চরকা নিয়ে থাকবে এসব আমার গণনা নয়। ইতিমধ্যে মার্কসবাদীরা সক্রিয় হয়েছেন, আমার সতীর্থরা

এম এন রায়ের 'ভ্যানগার্ড' পড়ছেন। কেউ কেউ আবার মুসোলিনির ভক্ত ও ফাসিস্ট মতবাদের অনুরক্ত। মুসলমান বন্ধুদের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছিল। খেলাফতের ইস্যুতেই তাঁরা সংগ্রামে নেমেছিলেন, নইলে শুধুমাত্র স্বরাজের জন্যে তাঁরা ইংরাজদের সঙ্গে বিবাদ বাধাতেন না। তাঁরা বরং কমিউনিস্ট বনবেন, তবু ন্যাশনালিস্ট হতে তাঁদের অন্তরের বাধা। তাঁরা যে একটি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসঙ্ঘ। তাঁদের খালিফ না থাকলেও তীর্থ আছে, মক্কার সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর টান। আমাদের চোখে তুর্করা আরবরা ইরানীরা এলিয়েন। কিন্তু তাঁদের চোখে এলিয়েন নন।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে একদা ক্যাথলিকরা তাঁদের আন্তর্জাতিক ধর্মগুরু পোপ ও আন্তর্জাতিক তীর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে প্রোটেস্টাণ্টদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ছন্দ রাখতে অক্ষম হয়েছিলেন। এই নিয়ে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দেশের চার্চ থেকে তো বটেই, রাষ্ট্র থেকেও ক্যাথলিকদের নিষ্কাশন করা হয়। এখানে ওখানে এক আধজন ক্যাথলিক রাজকর্মচারী থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্তু রাজা থেকে আরম্ভ করে রাজত্বের উচ্চতর স্তরে তাঁরা অনধিকারী বলে গণ্য হন। তাঁদের সুদিন ফিরে আসতে প্রায় তিন শতাব্দী লাগে।

সুতরাং কারা এলিয়েন, কারা নয়, এটা একটা গুরুতর সমস্যা। হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক যে কেবল ধর্মভেদের দরুন কণ্টকিত তাই নয়, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের দরুন দ্বিধাজড়িত। খেলাফতের মতো একটা বাইরের ইস্যু নিয়ে যারা দেশসুদ্ধ লোককে সংগ্রামে নামাতে চায় স্বরাজের মতো সর্বভারতীয় ইস্যু সম্বন্ধে তাদের ক'জনের সত্যিকার মাথাব্যথা? তার বেলা কেবল দরাদরি। হিন্দুরা কী দেবে? কত দেবে? ইংরেজরা যদি তার চেয়ে বেশী দেয় তাহলে কী হবে? গান্ধীজী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নৈব নৈব চ। হাত মেলাতে হবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে। অর্থাৎ যাঁদের আনুগত্যে দোটানা নেই। তাঁদের হিন্দু হতে কেউ বলছে না, তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে কেউ হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্তু তাঁরা আর সকলের মতো ভারতীয়, সুতরাং ভারতের জাতীয় ঐক্যের শরিক।

ন্যাশনালিজম নিয়ে যেমন দোটানা তেমনি ডেমোক্রাসী নিয়েও দোভাগা। চাকরিবাকরির বেলা তো বটেই, নির্বাচনকেন্দ্রের বেলা, নির্বাচিত প্রতিনিধির বেলা ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীর বেলাও দুটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাগ। মুসলমান দায়ী শুধু মুসলমানের কাছেই। বাদ বাকী দায়ী শুধু বাদবাকীর কাছেই। না ভেবেচিন্তে গান্ধীও এককালে এতে সায় দিয়েছিলেন। মনটা তো পার্লামেণ্টারি নয়, বুঝবেন কি করে, কী পরিণাম এর। অসহযোগ স্থগিত রাখার পর স্বরাজীদের উপরোধে পার্লামেণ্টারি ঢেঁকি গেলার পর গলায় বাধল যখন তখন বুঝলেন।

গান্ধীজী কোনোরূপ চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। চুক্তি তো সংগ্রামের

জন্যে নয়, পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থার জন্যে। তেমনতর কর্মপন্থার জন্যে ভারত ইতিহাসে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর তাতে বিশ্বাসও নেই। সেইজন্যে লখনউ চুক্তির অনুরূপ চুক্তি দ্বিতীয়বার সম্ভব হলো না। ঝাঁণাও সে আশা ছেড়ে দিলেন। এরপরে আসে ঝাঁণার চৌদ্দ দফা দাবী। কংগ্রেস ওসব শুনতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পলিসিই সফল হয়। যেসব মুসলমান একদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজীর পেছনে ভিড় করেছিলেন তাঁদের অনেকেই পিছু হটতে হটতে অদৃশ্য হয়ে যান। আর তাঁদের দাড়িটি দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে তাঁরা স্বরাজের ইস্যুতে লড়তে চাননি। চেয়েছিলেন খেলাফতের ইস্যুতেই লড়তে। দুই ইস্যু জুড়ে না দিলে লড়াই হতো না বলে তাঁরা স্বরাজের জন্যেও লড়েন।

এই গোঁজামিলের জন্যে বহু সমালোচক গান্ধীজীকে দুষেছেন। কিন্তু করতেনই বা তিনি কী, যখন খেলাফতীরা অগ্রণী হয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ও খেলাফতের জন্যে সংগ্রামের সেনাপতি হতে অনুরোধ করেন? তাঁর শর্ত হলো অহিংসা। সে শর্তে যখন তাঁরা রাজী তখন তিনি কি রাজী না হয়ে পারেন? তা ছাড়া নিছক স্বরাজের জন্যে সংগ্রাম জোর পেত কী করে, যদি মুসলমানরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপ না দিতেন? দু'চারটি মুসলমানকে নিয়ে তো জাতীয় সংগ্রাম হয় না। হলে যা হয় তা এত বিরাট নয়।

আমার এক মুসলিম বন্ধু বহুদিন পরে আমাকে বলেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলমান একজোট হয়ে লড়েছিল। তার ফল হলো কী? মুসলমানেরই জান গেল, জমিন গেল। হিন্দুরা সেসব জমিন নীলামে কিনে নিয়ে ধনবান হলো। সেই থেকে মুসলমানরা আর হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হয়ে লড়তে চায় না। তাতে তাদের লাভ তো কিছু হবেই না। লোকসানই হবে।

সিপাহী বিদ্রোহ যে ইংরেজকে আর মুসলমানদের একশ্রেণীকে বরাবরের জন্যে প্রভাবিত করে গেছে এটা মনে রাখলে অনেক ব্যাপারের অর্থ ভেদ করা যায়। ইংরেজের মনে আতঙ্ক হিন্দু মুসলমান একজোট হলে আবার সেইসব বিভীষিকা ফিরে আসবে। কানপুরে আর দিল্লীতে আর লখনউতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল। মুসলমানদের একশ্রেণীর প্রাণে ত্রাস ইংরেজরা তাদের মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে আর হিন্দুরাই তাদের সম্পত্তি ভোগ করবে। আগে যেমন করেছিল।

জেল থেকে ফেরার চার-পাঁচ বছর বাদে হাওয়া আবার গান্ধীনেতৃত্বের অনুকূলে যায়। স্বরাজীদের দৌড় দেখে দেশের লোক নারাজীদের দিকে ঝোঁকে। বারদোলিতে একটা ছোট মাপের সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। তার সর্দার হন বল্লভভাই পটেল। বারদোলির এবারকার সত্যাগ্রহ একটা স্থানীয় ইস্যুতে। খাজনাবৃদ্ধির প্রতিবাদে। এতে বল্লভভাইয়ের উচ্চতা বেড়ে যায়। গান্ধীজীই তাঁকে সেই সুযোগ দেন।

সামনের সারিতে আসার সুযোগ এতদিন প্রো-চেঞ্জাররা পেয়ে আসছিলেন,

এবার থেকে নো-চেঞ্জাররা পেলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদে দ্বিতীয়বার বৃত হবার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে গান্ধীজী সে মণিহার জবাহরলালের কণ্ঠে পরিয়ে দেন। তখন থেকে জবাহরও প্রথম সারির নেতা। বলা বাহুল্য তিনিও ছিলেন নো-চেঞ্জার। পরে তিনি সোশিয়ালিস্ট চিন্তাধারা আবাহন করে নিয়ে আসেন। অন্যান্য নো-চেঞ্জারদের ছাড়িয়ে যান। যুবকের দল তার দিকে আর সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকান। তবে সবাই জানতেন যে গান্ধীজী যা করবেন তাই হবে। কারণ স্যাংকশনস তো সেই একজনের হাতে।

স্যাংকশন অর্থাৎ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স একমাত্র গান্ধীজীর ইচ্ছা-নির্ভর। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তিনি যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন তো আর সকলেও অগত্যা নিষ্কর্মা। তাঁরা লম্ফ-ঝম্ফ যতই করুন। আর গান্ধীজী যে নিষ্ক্রিয় সেটা ঠিক নয়। গঠনের কাজে প্রাণ মন ঢেলে দেওয়াই সত্যাগ্রহের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করে তোলা। সত্যাগ্রহ কেবল তাকেই মানায় গঠনের কাজে যার এক মুহূর্ত বিরাম বা বৈরাগ্য নেই। যুদ্ধের যেমন প্যারেড সত্যাগ্রহের তেমনি গঠনকর্ম। গঠনের কাজে অনাগ্রহ থাকলে সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

গঠনকর্মের মর্মকথা কায়িক শ্রম। গঠনকর্ম হচ্ছে শ্রমাগ্রহ। শ্রমই সমাজের প্রধান শক্তি। অধিকাংশ মানুষই শ্রমজীবী। দেশে দেশে শ্রমজীবীদের হাতেই ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে তাদেরি মতো কায়িক শ্রমে রুচি হওয়া চাই। যাদের একান্তই অরুচি তারা দেশের মূলস্রোতের বাইরে থাকতে পারে। কিন্তু মূলস্রোতের সামিল হবে যারা তাদের কাছে কায়িকশ্রমে যোগদান এমন কিছু অন্যায় প্রত্যাশা নয়। দিনে আধঘণ্টা চরকা কাটা তো ন্যূনতম আশা। তাতেও যারা নারাজ তারা কি কোনদিন দেশের লোকের মন পাবে? ভোটের জোরে দেশ শাসন করতে পারে, কিন্তু তাদের সেই নৈতিক শক্তি কোথায় যে জনগণ তাদের নির্দেশ মান্য করবে?

স্যাংকশনস বলতে বোঝায় সেই নৈতিক শক্তি যা বিদেশী শাসকদের গায়ের জোরকে হটাতে পারে ও তার জায়গায় স্বদেশী লোকপ্রতিনিধিদের হুকুম দেবার ক্ষমতাকে বসাতে পারে। গান্ধীজীর ব্রত তেমন স্যাংকশনস তৈরি করা। কবে একদিন জোয়ার আসবে, তার জন্যে কান পেতে থেকে তিনি অহরহ গঠনের কাজ চালিয়ে যান। দেখতে দেখতে খাদিশিল্প গড়ে ওঠে। বলতে গেলে বিনা মূলধনে। বিনা রাজানুকূল্যে।

গান্ধীজী সরাসরি জনগণের সান্নিধ্যে কতটুকু আসতে পারেন? তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে শত সহস্র সহকর্মী চাই। তাঁরাই ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়বেন ও জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। তাঁরা যেমন জনগণের সেবা করবেন তেমনি জনগণও তাঁদের সাংসারিক অভাব মোচন করবেন। সে অভাব যদি গ্রামবাসীর সাধ্যের অতীত না হয়। অধিকাংশ কর্মীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চিরাচরিত স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ না করে তাঁরা গ্রামবাসী জনগণের সেবা করতে পারেন না। নয়তো তাঁরা

শ্রমজীবী মানুষের পিঠের বোঝা বাড়িয়েই দেবেন। ফলে তাঁদের সঙ্গেই গ্রামের লোকের ঠোকাঠুকি বাধবে।

সৌভাগ্যক্রমে সত্যিকার ত্যাগী কর্মী দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন ও নিরলস সাধনার দ্বারা জনগণের চিত্তজয় করেছিলেন। কিন্তু যার জন্যে তাঁরা এতকিছু ছেড়েছিলেন ও এত দুঃখ বরণ করেছিলেন তার নাম স্বরাজ। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল দেশপ্রেম। দেশকে না ভালোবাসলে তাঁরা জনগণের জন্যে আবেগ বোধ করতেন না। তাঁদের ভালোবাসা দেশকেন্দ্রিক, জনকেন্দ্রিক নয়।

আর গান্ধীজীর ভালোবাসা দেশের মানুষকে ভালোবাসা। বিশেষ করে যারা দীনহীন, যারা দুর্বল, যারা বিপন্ন, যারা আতুর, যারা অনাথ সেইসব মানুষকে ভালোবাসা। তাঁর ভালোবাসা অহেতুক। তার বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না, দেশের স্বাধীনতাও না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি লড়বেন, সেটা তাঁর প্যাশন, কিন্তু স্বাধীনতার পরে যখন লড়বার প্রয়োজন থাকবে না তখন কি তাঁর দেশের জনগণকে কম ভালোবাসবেন বা কম সেবা দেবেন? জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নৈমিত্তিক নয়, নিত্য। দেশ পরাধীন থাকতেও যা, দেশ স্বাধীন হলেও তাই। তিনি জনগণের লোক। তারা ও তিনি অভিন্ন। তেমনি তিনি অহিংসার পূজারী। অহিংসা ও তিনি অভিন্ন।

তাঁর সহকর্মীদের সকলের মধ্যেই জ্বলন্ত দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু জনপ্রেম ছিল অতি বিরলসংখ্যক অনুগামীর মধ্যে। এঁরাই ধরিত্রীর লবণ। এঁরা না থাকলে গান্ধীজীর বাক্যগুলো হয়তো জনগণের কানে পৌঁছত, কিন্তু গান্ধীজীর বাণীর জীবন্ত রূপ তাঁদের চোখে ভাসত না। জনগণকে এঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যবহার করতে চাননি, দেশের স্বাধীনতাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন জনগণের জন্যে। নিজেদের জন্যে এঁদের পরোয়া ছিল না। অতি অল্পেই এঁদের অভাব মিটত। এঁরা ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। জাতীয়তাবাদী এরা নিশ্চয়ই, কেন তার চেয়ে বড়ো কথা এঁরা গান্ধীবাদী। স্বাধীনতার পরেও এঁরা গান্ধীবাদী থাকবেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের ত্যাগস্পৃহা ফুরোবে না। এরকম নিষ্ঠাবান কর্মীদের কারো কারো সংস্পর্শে আমি এসেছি। জানি এঁরা কী ধাতুতে গড়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরবার সময় গান্ধীজী দুই হাতে দুটি দান নিয়ে আসেন, দুই চোখে দুটি ধ্যান। একটি তো সত্যাগ্রহ, অপরটি সর্বোদয়। স্বরাজ কথাটি তাঁর সৃষ্টি নয়। যাঁর সৃষ্টি তিনি যতদূর জানি টিলক। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন দাদাভাই নওরোজী। গান্ধীজী অবশ্য পরে ওটিকে আপনার করে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই "হিন্দ্ স্বরাজ" লিখে স্বরাজের একটা সংজ্ঞা দেন বা ছবি আঁকেন। তাঁর স্বপ্নের স্বরাজ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের কল্পনার স্বরাজ নয়। কেমন করে হবে? তাঁরা তো সত্যাগ্রহ বা সর্বোদয় কোনটার দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। গান্ধীজীর স্বরাজের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল সত্যাগ্রহ, আরেকটি

অপরিমেয় অঙ্গ সর্বোদয়।

স্বরাজের ইস্যুতে না হোক যে কোনো উপযুক্ত ইস্যুতে সত্যাগ্রহ তিনি করতেনই। জনগণকে নিয়ে না হোক একজনকে নিয়েও তাঁর সত্যাগ্রহ চলত। সত্যাগ্রহেরই অপর নাম অহিংসা। গান্ধী আর অহিংসা অভিন্ন। জগৎকে সত্যাগ্রহের বাণী শোনাবার জন্যেই তাঁর জন্ম। তেমনি সর্বোদয় হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শনের লক্ষ্য। কতজনের কতরকম ইউটোপিয়া, গান্ধীজীর ইউটোপিয়া হচ্ছে সর্বোদয়। স্বরাজেই থেমে যাবে না তাঁর চলা। তাঁর অনুগামীদের চলা। সর্বোদয় যদি স্বরাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে থাকে তবে স্বরাজও ইংরেজবিদায় নামক একদিনের একটা ঘটনা নয়। বহুকাল ধরে গড়ে তোলার মতো একটি সাধনা।

স্বরাজ কথাটি তিনি এক এক পটভূমিকায় এক এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে স্বরাজ এক বছরেই হতে পারে সে স্বরাজ 'হিন্দ্ স্বরাজ' নয়। এক বছরে হতে পারে ক্ষমতার হস্তান্তর। রাজপ্রতিনিধিদের হাত থেকে লোক-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা আসা। তারপরে যদি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না হয় তবে তো ভারতের স্বাধীনতা হবে ইটালীর স্বাধীনতার মতো একটা বড়লোকী ব্যাপার। যাতে তেমন না হয় সেইজন্যেই তো 'হিন্দ্ স্বরাজ' লেখা। ইটালীর স্বাধীনতা দূরের কথা ব্রিটেনের পার্লামেণ্টারি সীস্টেমও গান্ধীজীর চোখে লাগে না। এমন কি গোটা পশ্চিম ভূখণ্ডের আধুনিক সভ্যতাও তাঁর মতে একটা ব্যাধি, যা ব্রিটেনকে দিয়ে ভারতে সংক্রামিত হয়েছে। এককথায় তিনি চান নীতির জগৎ, যেমন সেকালের সাধুসন্তেরা চাইতেন ধর্মের জগৎ। নৈতিককে উপেক্ষা করে বৈষয়িক উন্নতি তাঁর কাছে তুচ্ছ।

তিনি তাঁর সত্যাগ্রহের দ্বারা অনৈতিকের সংক্রমণ হতে স্বদেশকে রক্ষা করবেন, তাঁর সর্বোদয় সাধনার দ্বারা স্বদেশের জনগণকে প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী করবেন। দীর্ঘ পথ, তার একটা মধ্যবর্তী স্টেশনের নাম স্বরাজ। টিলকের স্বরাজ, দাদাভাইয়ের স্বরাজ, রাজনৈতিক স্বরাজ। পার্লামেণ্টারি সীস্টেমকেও তিনি আর তাচ্ছিল্য করেন না। যদিও পঞ্চায়তী ব্যবস্থাই তাঁর অন্বিষ্ট।

আট

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী যখন স্বদেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। যার থেকে প্রায় পঁচিশ বছরই কেটেছে বিদেশে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যদি ইউরোপীয়দের একটি দেশ বলে ধরা হয় তবে পশ্চিমে আর কোনো ভারতীয় মনীষী বা নেতা তাঁর মতো এতকাল ইউরোপের বা ইউরোপীয় উপনিবেশে অতিবাহিত করেননি।

পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করে তাঁর যা প্রত্যয় হয় তারই উপর

নির্ভর করে তিনি লেখেন 'হিন্দ্ স্বরাজ'। তখনো তিনি জানতেন না যে সত্যাগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকায় সফল হবে, সেইসূত্রে ভারতবর্ষে তাঁর নাম হবে, সেখানে পাঁচ বছর বাদে তিনি ফিরবেন, ফেরার চার বছর বাদে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে নামবেন। তার এক বছর বাদে ভারতের স্বরাজের ইস্যুতে অসহযোগ পরিচালনা করবেন।

বলতে গেলে 'হিন্দ্ স্বরাজ'ই তাঁর ম্যানিফেস্টো। মার্ক্সের যেমন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ইশ্তাহারের সারাংশ দিয়ে তাঁর এক স্বদেশবাসী বন্ধুকে তিনি একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিতে ছিল—

"এক। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কোনো অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই।

দুই। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় সভ্যতা বলে কোনো পদার্থই নেই। আছে এক আধুনিক সভ্যতা। সেটা পুরোপুরি বস্তুভিত্তিক।

তিন। আধুনিক সভ্যতার ছোঁওয়া লাগার আগে ইউরোপের লোকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল ছিল পূর্বমহাদেশের লোকের। অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষের লোকের। আজকের দিনেও যেসব ইউরোপীয়ের গায়ে আধুনিক সভ্যতার ছোঁওয়া লাগেনি তারা ভারতীয়দের সঙ্গে আরো ভালো ভাবে মিশতে পারে আধুনিক সভ্যতার সন্তানদের চেয়ে।

চার। ভারতবর্ষ শাসন করছে ব্রিটিশ জাতি নয়, আধুনিক সভ্যতা। তার বাহন হচ্ছে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি সভ্যতার জয় বলে কথিত যাবতীয় উদ্ভাবন।

পাঁচ। বম্বে, কলকাতা ও অন্যান্য প্রধান ভারতীয় শহরগুলোই হচ্ছে প্রকৃত মহামারীক্ষেত্র।

ছয়। কালকেই যদি ব্রিটিশ শাসনের জায়গা নেয় আধুনিক পদ্ধতির উপর নির্ভর ভারতীয় শাসন তাহলে ভারতের অবস্থা এর চেয়ে ভালো হবে না। তবে যে টাকাটা ইংলণ্ডে টেনে নেওয়া হচ্ছে তার কিছুটা ভারতে থেকে যাবে। কিন্তু ভারত তখন হবে ইউরোপ অথবা আমেরিকার দ্বিতীয় অথবা পঞ্চম নেশন।

সাত। পূর্ব আর পশ্চিম তখনি সত্যি মিলতে পারবে যখন পশ্চিম ওই আধুনিক সভ্যতাকে প্রায় পুরোপুরি বিসর্জন দেবে। তারা অন্যভাবেও দৃশ্যত মিলতে পারবে, যদি পূর্বমহাদেশও আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করে। কিন্তু সেপ্রকার মিলন হবে সশস্ত্র যুদ্ধবিরতির মতো। যেমন ধরুন, ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর। উভয় নেশনই মরণশালায় প্রাণধারণ করছে, যাতে এক অপরকে ভক্ষণ না করে।

আট। একজন বা একদল মানুষের পক্ষে সারা দুনিয়ার সংস্কার শুরু করা বা ধ্যান করা নিতান্তই ধৃষ্টতা। অত্যন্ত কৃত্রিম ও বেগবান যানবাহনের দ্বারা এমন কিছু করার চেষ্টাও অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা।

নয়। বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দ্বারা নৈতিক বিকাশ হয় না, এটা সাধারণভাবে জাহির করা যেতে পারে।

দশ। চিকিৎসাবিজ্ঞান হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘনীভূত সারাংসার। উঁচু-দরের ডাক্তারি দক্ষতা বলে যা চলে তার চেয়ে হাতুড়েগিরি অশেষগুণে শ্রেয়।

এগারো। শয়তান তার রাজত্ব রক্ষা করার জন্যে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে হাসপাতালগুলো হচ্ছে তাই। পাপ, দুর্গতি, অধঃপতন ও প্রকৃত দাসত্বকে চিরন্তন করে তারা। আমি যখন ডাক্তারিতে তালিম হতে চেয়েছিলুম তখন আমি সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়েছিলুম। হাসপাতালে যেসব অনাসৃষ্টি ব্যাপার হয় তাতে কোনপ্রকার অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে পাপকর্ম। যৌনব্যাধির জন্যে, এমন কি ক্ষয়রোগের জন্যেও, যদি হাসপাতাল না থাকত তাহলে আমাদের মধ্যে কম ক্ষয়রোগ ও কম যৌনব্যাধি থাকত।

বারো। বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারত যা শিখেছে তাকে না-শেখাতেই তার পরিত্রাণ। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকিল, ডাক্তার ও সেইরূপ সমস্তকেই যেতে হবে। কৃষকের সরল জীবনই হচ্ছে এমনতর জীবন যাতে সত্যিকারের সুখ, একথা জেনে তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীদের সচেতনভাবে ধর্মোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে কৃতসংকল্প হয়ে বাঁচতে শিখতে হবে।

তেরো। ভারতের পক্ষে কলে তৈরী কাপড় পরা অনুচিত, তা সে ইউরোপীয় মিলেরই হোক আর ভারতীয় মিলেরই হোক।

চোদ্দ। ইংলণ্ড ভারতকে এবিষয়ে সাহায্য করতে পারে। তা হলেই ভারতের উপর তার অধিকার অনুমোদনযোগ্য হবে। ইংলণ্ডে আজকাল অনেকে এই মর্মে ভাবেন।

পনেরো। জনগণের বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যের একটা সীমা বেঁধে দিয়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল প্রাচীন ঋষিদের বিজ্ঞতা। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের রুক্ষ লাঙল আজকেও চাষীদের লাঙল। তার মধ্যেই পরিত্রাণ। এই ধরনের অবস্থাতেই মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচে। বাঁচে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে। তেমনধারা শান্তি ইউরোপ উপভোগ করেনি আধুনিক কার্যকলাপ অবলম্বন করার পর থেকে।..."

উপরোক্ত চিন্তাধারা যে ভারতীয় নয় তা এক আঁচড়ে চেনা যায়। রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ, গোখলে বা টিলক কেউ সভ্যতার সামনে 'আধুনিক' বলে একটি বিশ্লেষণ বসিয়ে দিয়ে তাকে এককথায় খারিজ করেননি। পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন বা বিপরীত সভ্যতার কথাই তাঁরা ভেবেছেন। কেউ বা চেয়েছেন সমন্বয়, কেউ বা আত্মরক্ষার খাতিরে পাশ্চাত্যকে রোধ করতে বসেছেন।

আসলে ওই চিন্তাধারা ইউরোপেরই ভিন্নমুখী চিন্তাধারা। সবাই যে আধুনিকের পক্ষে তা নয়। বিপক্ষেও বহুলোক। এমন কি সভ্যতা কথাটারও স্বপক্ষে বিপক্ষে বহু বাক্তি। প্রকৃতিসম্মত জীবনই সুখ, প্রকৃতির যে যত কাছে সে তত সুখী, এ তত্ত্ব ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকেই মানতেন। শিল্পবিপ্লবকে ও যন্ত্রপাতিকে ইউরোপের মনীষার একভাগ বরাবর বাধা দিয়েছে। কিছুতেই যখন ঠেকান গেল না, তখন পথ ছেড়ে দিতে হলো।

রাশিয়াতে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে টলস্টয় নতুন করে বিরোধিতা করেন। ততদিনে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে ক্যাপিটালিজম ফলিত বিজ্ঞানকে লাগিয়েছে আপনার কাজে, সমাজের কাজে নয়। আর ক্যাপিটালিজম নিয়েছে সাম্রাজ্য-বাদের রূপ। আর তার দোসর হয়েছে মিলিটারিজম। এমনি করে দেশে দেশে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংঘাত ধূমায়িত হচ্ছে টলস্টয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তার অনিবার্য পরিণাম একদিকে যুদ্ধ ও অপরদিকে বিপ্লব। সময় থাকতে তিনি প্রতিকারচিন্তা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হননি। সে ভারটা পড়ল গান্ধীজীর উপরে।

টলস্টয় একা নন, আরো অনেকের চিন্তাধারা যুদ্ধবিরোধী তথা বিপ্লব-বিরোধী ছিল। সেইজন্যে আধুনিক সভ্যতাবিরোধী, এমন কি সভ্যতা জিনিসটারই বিরোধী ছিল। কিন্তু চিন্তার উপযোগী কর্মের সন্ধান জানতেন না অনেকেই, যাঁরা জানতেন তাঁদের কর্মক্ষমতা ছিল না। তাঁদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন গান্ধীজী। তাঁর হাতে সত্যাগ্রহ বলে উপযুক্ত একটি অস্ত্র। আর তাঁর পেছনে অল্পসংখ্যক হলেও একদল সৈনিক।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ শুরু হবার দু'বছর পরে ও শেষ হবার পাঁচ বছর আগে 'হিন্দ্ স্বরাজ' পড়ে টলস্টয় আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু গোখলে খুশী হননি। তৎকালীন ভারত সরকার ও বই নিষিদ্ধ করে দেন। গান্ধীজী ভারতে ফিরে এসে নেতৃত্ব নিলে পরে ও বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়।

গত শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এক প্রস্থ নতুন মূল্য এসে আমাদের পুরাতন মূল্যগুলিতে ঘা দিয়েছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আরেক প্রস্থ মূল্য এসে আবার ঘা দিল। এবার নতুন শেখা মূল্যগুলিতে। মহাত্মার দাবী হলো যা শিখেছি তাকে না-শিখতে হবে। স্লেটের লিখন মুছে ফেলতে হবে।

এবারকার অভিযান আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে। তার অপরাধ সে বস্তুভিত্তিক। তাতে কেবল বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু নৈতিক বিকাশ হবার নয়। আর মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না। অন্নের সঙ্গে চাই অমৃত। যাতে তাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে সে কী করবে? মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা বহুযুগ পরে ঘুরে ফিরে এল।

যীশুর জিজ্ঞাসাও বলতে পারি। তাতে তোমার লাভ কী হবে, যদি তুমি সারা দুনিয়াটা পাও, কিন্তু আপন আত্মাকেই হারাও?

আমাদের যুগেও এ জিজ্ঞাসা বিভিন্ন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। গান্ধীজী স্বয়ং বলেছেন যে 'হিন্দ্ স্বরাজে' প্রকাশিত মতামতগুলি যদিও তাঁর নিজের তবু তিনি বিনম্রভাবে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন টলস্টয়, রাসকিন, থোরো, এমার্সন প্রভৃতি লেখকদের, তা ছাড়া ভারতীয় দর্শনাচার্যদের। বিশেষ করে টলস্টয় বেশ কিছুকাল থেকে তাঁর অন্যতম গুরু।

গান্ধীজীর জিজ্ঞাসাকে মৈত্রেয়ীর বা যীশুর জিজ্ঞাসার মতো একটি বাক্যে

সংহত করলে এইরকম দাঁড়ায়—বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে তুমি করবে কী, যদি তোমার হৃদয় অসাড় হয়, বিবেক নিষ্ক্রিয় হয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে উঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক ?

গান্ধীজীর চেয়ে টলস্টয় আরো ভালো করে চিনতেন ইউরোপের আধুনিক সভ্যতাকে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, এত যে বড়াই করছ তোমার ব্যক্তি-স্বাধীনতার, কিন্তু কোথায় থাকে তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা, যখন যুদ্ধের জন্যে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, যখন কন্‌স্‌ক্রিপ্ট হয়ে তুমি মানুষ মারো ?

'হিন্দ্‌ স্বরাজ' রচনার পাঁচ বছর যেতে না যেতেই মহাযুদ্ধ বেধে যায়। রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ গোড়া থেকেই কন্‌স্‌ক্রিপশন চালায়। ইংলণ্ড যতদিন সম্ভব এড়ায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও তাই করতে হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। গেল তো এমনি করে একটি মূল্য। এমনি করে আরো কয়েকটি গেল রাশিয়ার দুই বিপ্লবে। তারপর ফ্যাসিস্ট ইটালীতে। তারপরে স্টালিনের রাশিয়ায়। তারপরে হিটলারের জার্মানীতে। তারপরে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন আমেরিকায়।

আমার জীবনে গান্ধীজী ও টলস্টয় বলতে গেলে এই সময়ে আসেন। মনে মনে আমি বিষয় বৈরাগী নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠি। জনগণের মধ্যেই দেশের ও নিজের সার্থকতা দেখতে পাই। জীবনের গভীরে তলিয়ে যেতে হলে গ্রামেই যেতে হবে, নগরে নয়। নগরের জীবন বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু অগভীর। কারুশিল্প ও কৃষি যা দিতে পারে কলকারখানা কি কখনো পারে ? বিত্তের দিক থেকে যা কম পড়বে চিত্তের দিক থেকে পুষিয়ে যাবে।

কোন্‌টা সার কোন্‌টা অসার বেছে নিতে হলে নাগরিক সভ্যতার মায়া কাটাতে হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বলতে কি নাগরিক সভ্যতাই বোঝায় ? তার চেয়ে আরো বড়ো কিছু নয় ? আধুনিক সভ্যতার সংজ্ঞা কি রেল স্টীমার আদালত হাসপাতাল কলকারখানা শহর ? তা যদি হয় তবে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চারুশিল্প এরা কোথায় দাঁড়ায় ?

বিজ্ঞান যে এতবড়ো আসন জুড়ে বসেছে সে কি শুধু বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণিত করার জন্যে ? না সত্যের সন্ধানে অতন্দ্র থেকে নিত্য নতুন তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কিয়ার জন্যে ? সাহিত্যিকদেরও চোখে ঘুম নেই। তাঁরাও সজাগ। কিসের জন্যে ? সৌন্দর্যের তথা সত্যের অন্বেষণে নয় কি ? না কেবল ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্যে ? চারুকলার সাধকরা যে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত তা কি কামিনীর নগ্নতার বিনিময়ে কাঞ্চনের আশায় ?

সন্দেহ নেই যে এসব ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবসাদারি চলেছে। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে বুজরুকি। কিন্তু গত পাঁচশো বছরের খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে মানুষ যদি মধ্যযুগের নিরাপদ বন্দর ছেড়ে অকূলে তরী ভাসিয়ে থাকে তবে তা বস্তুগত সওদাগরির জন্যেই শুধু নয়, অবস্তুগত অচেনা অজানা সত্য ও সৌন্দর্যের অভিনব বন্দরে নতুন করে আশ্রয় নেবার প্রয়োজনেও। আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে গতিশীল সভ্যতা। তার বাইরের যানবাহনের গতি হচ্ছে

ভিতরের চিন্তাস্রোতের গতি। চেতনাস্রোতের গতি।

গত পাঁচশো বছরের ইতিহাসে অন্ধকারের ভাগ হয়তো বেশী, কিন্তু আলোর ভাগ কি নেহাৎ কম ? কী করে আমি আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল অন্ধকারটাকেই দেখি ? আর আলোর মূল্য অস্বীকার করলে কি অন্ধকারের মূল্য বেড়ে যায় না ?

অন্তহীন ভাবনার পর যেখানে এসে আমি পৌঁছলুম সেখানে আমি জনগণের পক্ষে, অহিংসার পক্ষে, গান্ধীজীর পক্ষে, কিন্তু সেইসঙ্গে আধুনিক সভ্যতারও পক্ষে, তার গতিশীলতারও পক্ষে। নিত্য নতুন আইডিয়া, নিত্য নতুন আবিষ্কার, নিত্য নতুন সৃষ্টি না হলে আমি বাঁচব না। ভুলভ্রান্তি করবার যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা আমার চাই। আধুনিক সভ্যতা এ স্বাধীনতা দিয়েছে। মধ্যযুগের সভ্যতা এ স্বাধীনতা দেয়নি। ধর্মের নামে নীতির নামে কেড়ে নিয়েছে।

ও ছাড়া আর কোনো মীমাংসা আমার পক্ষে—আমার মতো তরুণদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে যে মূল্য পরিবর্তন ঘটেছিল আমরা তার উত্তরাধিকারী। হিসাব করলে আমরা তার চতুর্থ পুরুষ। আমরা আর উজিয়ে যেতে পারতুম না। ইংরেজী স্কুল ছেড়ে দিলেও আমাদের সেই উত্তরাধিকার আমাদের সঙ্গ নিত। জাতীয় বিদ্যালয়েও সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রবেশ করত।

আমাদের সেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আধুনিক যুগের তথা পূর্ব-পশ্চিমের মহামানবের পরিবর্তিত মূল্যরাজি আমরা কারো কথায় বিসর্জন দিতে পারিনে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ঐতিহ্যে আমরা লালিত হয়েছি তার প্রবাহ কারো কথায় শুকিয়ে যাবার নয়। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে আমরা গান্ধীজীর প্রবর্তিত আরেক প্রস্থ মূল্য মাথা পেতে নিই। মানুষে মানুষে বিরোধ যদি দেখা দেয় তবে সে বিরোধ অহিংসভাবেই মেটাতে হবে। মেটাতে না পারলে যেটা অনিবার্য হবে সেটা সহিংস সংগ্রাম নয়, অহিংস সংগ্রাম। অহিংসার পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের ভারতীয় তথা খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য। প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে প্রাণীর প্রতি অহিংসা। সত্যও তেমনি মহামূল্যবান। সত্যের পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের বিসর্জনীন ঐতিহ্য। মহাত্মার মধ্যে তারই পরিপূর্ণতা। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্যেও অসত্য অবলম্বন করবেন না। তাঁর কার্যকলাপ সকলের সামনে খোলা। সরকারের কাছেও তাঁর গোপনীয় কিছু নেই।

তেমনি জনগণের বঞ্চনার অবসান আমাদেরও কাম্য। স্মরণাতীত কাল থেকে যাদের পায়ের তলায় রাখা হয়েছে তাদের হাত ধরে তুলতে হবে, তুলে পাশে বসাতে হবে, সমান সুযোগ দিতে হবে। সম্ভব হলে সমানের চেয়েও বেশী দিতে হবে, যাতে অতীতের সঞ্চিত অসাম্য দূর হতে পারে। এর জন্য যদি ভাগ্যবান শ্রেণীকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তো সেটা করতে হবে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। অন্যায় সুবিধে যে যা পেয়েছে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা

উচিত নয়। বিপ্লবের দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে যাওয়াই বিপ্লব পরিহারের প্রকৃষ্ট পন্থা। গান্ধীজীরও উদ্দেশ্য তাই। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চললে বিপ্লবের দরকার হবে না, কারণ বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের কাটাকুটির পর যেটুকু শেষপর্যন্ত বাঁচে গান্ধী নেতৃত্ব তার চেয়ে বেশী এনে দেবে।

গান্ধীবাদী রাষ্ট্র যদি নৈরাজ্যের দিকে অর্ধেক পথ যায় তাহলে তো আমাদের কোনো খেদই থাকে না। টলস্টয়ের মতো আমিও ছিলুম রাষ্ট্রমাত্রেরই উপর বিরূপ। স্বাধীনতায় লাভ কী হবে যদি রাষ্ট্র তেমনি থেকে যায়? গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মনের মিল অহিংসার জন্যে ততটা নয়, নৈরাজ্যের জন্যে যতটা।

নয়

অথচ এমনি আমার নিয়তি যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পড়তে হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে। যে আমি টলস্টয় গান্ধীর প্রভাবে অহিংস নৈরাজ্যবাদী। নিয়তি বোধ হয় আমাকে হাতে কলমে শেখাতে চেয়েছিল যে স্বরাজ্য আর নৈরাজ্য একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নয়, স্বরাজ্য হচ্ছে স্বরাষ্ট্র আর স্বরাষ্ট্র যদিও সর্বোদয়ের অভিমুখী তবু তা রাষ্ট্রশূন্যতা নয়।

ইতিমধ্যে আমার শিক্ষনবিশী আমাকে ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। সেখানে দু'বছর থাকি ও ছুটি পেলেই ইউরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে আসি। টলস্টয়, রাসকিন প্রভৃতির কথা আমার মনে ছিল। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে ইতিহাস তাঁদের শিক্ষা উপেক্ষা করছে, সমুদ্র যেমন উপেক্ষা করছিল রাজা ক্যানিউটের অনুজ্ঞা। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যেমন তাঁদের অনুবর্তীর সংখ্যা অগণ্য ছিল যুদ্ধের দশ বছর পরে তেমন নয়। যুদ্ধ যেন সর্বপ্রকার আদর্শবাদকে অবাস্তব বলে কোণঠাসা করেছে। করেনি কেবল কমিউনিজমকে। কিন্তু কমিউনিজম আদর্শবাদ বলে আপনার পরিচয় দেয় না। কমিউনিজম বলে যে বস্তুবাদ, সে এমন একপ্রকার বস্তুবাদ যা পূর্বনির্ধারিত ঘটনার মতো ইতিহাসে একদিন সম্ভব হইবে।

যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবাত্মার প্রতিবাদ তখনো সাহিত্যের বিষয় ছিল। মানুষ তো একেবারে যন্ত্রদাস বনে যেতে পারে না। যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থেকে যন্ত্র বনতেও তার অনিচ্ছা। সে হবে যন্ত্রী। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়? ওদিকে আলাদীনের দৈত্যের মতো একালের যন্ত্র চাইবামাত্র যা এনে দিচ্ছে তা কি সেকালের তাঁত চরকার কর্ম? তা ছাড়া এমন সব দরকারী কাজও তো করে দিচ্ছে যা বিনা যন্ত্রে হবার নয়।

প্রাচীনদের জীবনে যেমন তাঁত চরকা কাস্তে হাতুড়ি আধুনিক জীবনে তেমনি বাষ্প বিদ্যুৎ পেট্রল চালিত যন্ত্র। এর হাত থেকে পরিত্রাণের কথা হয়তো একদা বাস্তব ছিল, এখন অবাস্তব। তাই যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

অন্তর থেকে উত্থিত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলেই যন্ত্রমুখাপেক্ষী। এমন কি অটোমেটিকেরও যথেষ্ট প্রচলন। তাতে শ্রমিকের দানাপানি বিপন্ন, তবু শ্রমিকরাও তা ব্যবহার করছে। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট বা চকোলেট পাচ্ছে। যন্ত্র ভারতের মাটিতে অপেক্ষাকৃত নতুন ও তার সঙ্গে বিদেশী শাসন শোষণ সংযুক্ত বলে গান্ধীজী তাঁর স্বদেশবাসীর মনে যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন টলস্টয় তাঁর স্বদেশবাসীর মনে ততটা নয়। থোরো তো নয়ই। কী ক্যাপিটালিস্ট কী কমিউনিস্ট কী অ্যানার্কিস্ট সবাই এখন যন্ত্রের পক্ষে। যদিও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শোনা যায়। ওটা যেন বিশ বছর ঘরসংসার করে সন্তানাদি হওয়ার পর বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অথচ কলকারখানার পেছনে কলের মত খেটে ও অবসর সময়ে কলের গান শুনে বা কলের অভিনয় দেখে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিকল। একটা যুদ্ধবিগ্রহ পেলে সে যেন বর্তে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কি কলের মতো লড়তে হয় না? মানুষের জীবনযাত্রা গত দুই শতাব্দীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাধারণত ধনতন্ত্রের আওতায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের আওতায় হলেও মোটামুটি এমনই হতো। সমাজতন্ত্রও নিছক কাস্তে হাতুড়ির ব্যাপার হতো না।

দেখলুম পুরাতন নীতিবোধ আর কাজ দিচ্ছে না। নীতির ক্ষেত্রে এসেছে বিশৃঙ্খলা। তেমনি পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে সংশয়। সংশয় থেকেও বিশৃঙ্খলা আসে। ইউরোপের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তার জন্যে শিল্পায়ন যথার্থই দায়ী। কৃষি ও কারুশিল্পভিত্তিক সমাজ যদি ধীরে সুস্থে শিল্পায়িত হতো তাহলে হয়তো ভাঙনও হতো ধীর মন্থর। কিন্তু পুঁজিওয়ালাদের লাভের জন্যে বা এক নেশনের সঙ্গে আরেক নেশন পাল্লা দিতে গিয়ে শিল্পায়নের গতি এত দ্রুত হয়েছে যে কৃষি ও কারুশিল্পভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত লেগে তার ভাঙন ত্বরান্বিত হয়েছে। ইংলণ্ডের যেখানে দুই শতক লেগেছে জার্মানী সেখানে দুই শতকের পথ অর্ধ শতকে অতিক্রম করতে গিয়ে অনর্থ ডেকে এনেছে। মহাযুদ্ধের পরেও কি তার শিক্ষা হয়েছে? কারোরই না।

শিল্পায়নের ঘাড়ে কিন্তু সবটা দায়িত্ব চাপানো যায় না। তার পূর্বেই সমাজবিপ্লবের আইডিয়া ফ্রান্সে ও জার্মানীতে বাসা বেঁধেছিল। অর্ধশতকের পূর্বের অর্ধশতক মনোজগতের ঘাতপ্রতিঘাতে মুখর। আরো অর্ধশতক পিছিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ফরাসী বিপ্লব। তার আদিতে ছিল অবিমিশ্র রাষ্ট্রবিপ্লবের সংকল্প। ধাপে ধাপে এল সমাজবিপ্লবের চিন্তা। সেটা যদিও তখনকার মতো ব্যর্থ হলো তবু তার বীজ বুনে রেখে গেল ভাবীকালের জন্যে।

বিংশ শতাব্দীর গাছপালার মূল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কি ফরাসী-বিপ্লবেরও আগে। ইংলণ্ডেরও দান কম নয়। রাজার মুণ্ডু তো ওরাই প্রথম কাটে। ফরাসীরা তার দেড় শতক বাদে। রুশরা আরো দেড় শতক পরে। রাজাই হলেন ফিউডাল সমাজের মাথা। তাঁর মাথা নেওয়া মানে ফিউডাল

সমাজের মাথা নেওয়া। সে সমাজ তার পরে বাঁচে কি করে? অভিজাতদের প্রাধান্য যায়। বুর্জোয়াদের প্রাধান্য আসে। রুশদেশে তো বুর্জোয়াদেরও প্রাধান্য যায়।

আমি যে সময় ইউরোপে ছিলুম সেটা বাইরের দিক থেকে শান্ত হলেও ভিতরে ভিতরে অশান্ত। নতুন শৃঙ্খলার জন্যে মানুষ উতলা হয়ে উঠেছিল। নতুন শৃঙ্খলা বলতে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় শৃঙ্খলার পুনরাবর্তন বোঝায় না। নতুন বলতে যা বোঝায় তা পুরানোর রকমফের নয়। সত্যিকার নতুন শৃঙ্খলায় থাকবে রেনেসাঁসের মানবিকতা, ফরাসীবিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, শ্রমবিপ্লবের শিল্পায়ন, রুশবিপ্লবের সামাজিক ন্যায়, ইংলণ্ডের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, আমেরিকার সেকুলারিজম।

কিন্তু মার্স ও ম্যামনের আরাধনা যদি সমানে চলতে থাকে তা হলে আর নতুন শৃঙ্খলা কী হলো? দু'দিন আগেই হোক, পরেই হোক, মানুষ মোহমুক্ত হয়ে আবার তেমনি প্রশ্ন করবে, বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে আমরা করব কী, যদি আমাদের হৃদয় হয় অসাড়, বিবেক হয় নিষ্ক্রিয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক? কী করতে এ জগতে আসা, কেনই বা অপঘাতে মরা, অমরত্ব কি নিশ্চিত, না এখানেই সব শেষ? ঈশ্বর কি আছেন, না শয়তান আমাদের রাজত্ব দিয়ে ভোলাচ্ছে, যেমন ভোলাতে চেয়েছিল যীশুকে? প্রগতি যাকে বলছি তা কি গতিতেই নিবদ্ধ, না তার আছে একটা অন্তিম লক্ষ্য? অন্তহীন প্রগতি কি একটা মীনস, না একটা এণ্ড?

টলস্টয় তাঁর জীবনে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে দেখেন সব অন্তঃসারশূন্য, সব ঝুটো। খ্রীষ্টের জীবনই তাঁকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, নইলে আত্মহত্যা করতেন। সেই সঙ্গে বুদ্ধের শিক্ষা। অহিংসা ও প্রেমই তাঁকে শান্তি দেয়। জীবনযাত্রাকে সরল করে এনেই তিনি জীবনের তাৎপর্য পান। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি গান্ধীকে যে শেষ চিঠি লেখেন সে চিঠি যেন তাঁর শেষ টেস্টামেণ্ট। ওইভাবে গান্ধীকেই যেন তিনি দিয়ে যান তাঁর জীবনের ব্রত, তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। তাতে ছিল—

"The longer I live, and especially now, when I vividly feel the nearness of death, I want to tell others what I feel so particularly clearly and what to my mind is of great importance, namely, that which is called 'passive resistance', but which is in reality nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretations. That love, which is the striving for the union of human souls and the activity derived from it, is the highest and only law of human life, and in the depth of his soul every human being—as we most clearly see in children—feels and knows this; he knows this until he is entangled by the false teachings of the world. This law was proclaimed by all—by the Indian as by the Chinese, Hebrew, Greek and Roman sages of the world. I think this law was most clearly expressed by Christ, who plainly said, 'In love alone is all the law and the prophets'…

'He knew, as every sensible man must know, that the use of force is incompatible with love as the fundamental law of life; that as soon as violence is permitted, in whichever case it may be, the insufficiency of the law of love is acknowledged, and by this the very law of love is denied. The whole Christian civilization, so brilliant outwardly, grew up on this self-evident and strange misunderstanding and contradiction, sometimes conscious but mostly unconscious."

টলস্টয়ের আশী বছরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার শেষ পরিণতি সেই চিঠিতে ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী—

"In acknowledging Christianity even in that corrupt form in which it is professed among the Christian nations, and at the same time in acknowledging the necessity of armies and armament for killing on the greatest scale in wars, there is such a clear clamouring contradiction that it must sooner or later, possibly very soon, inevitably reveal itself and annihilate either the professing of the Christian religion, which is indispensable is keeping up these forces, or the existence of armies and the violence kept up by them, which is not less necessary for power…"

টলস্টয়ের নিজের দেশ তাঁর মৃত্যুর সাত বছর বাদে এই দোটানার অবসান ঘটায় খ্রীষ্টধর্মকে—ধর্ম জিনিসটাকেই—জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে। সেই সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া সোজাসুজি নাস্তিক বনে যায়। সে আর প্রেমের নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিয়মে। ফলে একদিক থেকে সে ভারমুক্ত হয়েছে। বিবেকভারমুক্ত। হৃদয়-ভারমুক্ত। তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা প্রেমাবতারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কেউ বলতে পারে না যে তার কথায় ও কাজে অসঙ্গতি আছে বা সে ভণ্ড। সমস্তক্ষণ একটা দোটানায় পড়ে তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে না। সে দেহে মনে সুস্থ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে একথা বলা চলে না। এরা না পারে খ্রীষ্টে বা ঈশ্বরের বিশ্বাস হারাতে, না পারে মার্স বা ম্যামনের আরাধনায় বিরত হতে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদের বিস্তর লোক কায়মনে পেগান

হয়ে গেছে। যেমন ইটালীর ফাসিস্টরা, জার্মানীর নাৎসীরা। তারা এখন রোমান বা টিউটন পূর্বপুরুষদের মতো প্রাক্‌খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহি নেই। তারা নির্বিবেকে নরহত্যা করতে পারে। রক্তেই তাদের উল্লাস। টলস্টয় বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতেও পারেননি যে দোটানার এটাও একটা সমাধান। আর এ সমাধান কমিউনিজমেরই প্রতিক্রিয়া। ইউরোপের একপ্রান্তের খ্রীষ্টান যদি কমিউনিস্ট হয় অপর প্রান্তের খ্রীষ্টান ফাসিস্ট বা নাৎসী হবে। অমনি করে খ্রীষ্টের তথা ঈশ্বরের টান কাটাবে। তখন একমাত্র টান হিংসার।

এদের বাদ দিলে যারা থাকে তারা এখনো এরকম কোনো সমাধানে সম্মত নয়। তারা শ্যামও রাখবে, কুলও রাখবে। তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্ত, জীবনযাত্রায় অসুখী, জীবনের আভ্যন্তরিক স্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অসুস্থ। এমন অবস্থার অন্য নাম malaise বা জীবনজোড়া অস্বস্তি। বুদ্ধি কাজ করছে, বুদ্ধি কাজ করছে, কিন্তু সত্তায় অবসাদ।

টলস্টয়ের সেই চিঠিতে আরো একপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যদিও অতটা স্পষ্ট নয়। গান্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ম। লিখেছিলেন ঋষি—

"Therefore, your activity in the Transvaal, as it seems to us, at this end of the world, is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ তখনো বেশীদূর এগোয়নি। তার সিদ্ধি তখনো সুদূর ও অনিশ্চিত। তথাপি টলস্টয়ের শ্যেন দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে গান্ধীজীর কাজই পৃথিবীর সব চেয়ে সারবান, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে একদিন খ্রীষ্টান নেশনগুলি কেবল নয়, সারা জগতের নেশন সমূহ অপরিহার্যরূপে অংশ নেবে।

ইউরোপে সেদিন আমি তেমন কোনো লক্ষণ দেখিনি। তবে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি তাঁরা হিংসা প্রতিহিংসায় ক্লান্ত। তাঁরা চান চিরতরে শান্তি। কিন্তু শান্তি চাইলেও তো আর অমনি মেলে না। তার জন্য জীবন-যাত্রাকে ঢেলে সাজাতে হয়। ধনদেবের উপাসনা করলে রণদেবও আপনি এসে উপস্থিত হন। তিনিও উপাসনা দাবী করেন। ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে যুদ্ধ এড়ানো যায় কি?

আধুনিক সভ্যতা না বলে আধুনিক ধনতন্ত্র বললে গান্ধীজীর নিদান-নির্ণয় আরো যথার্থ হতো। ব্রিটেনকে যে ব্যাধিতে ধরেছে, যে ব্যাধি সে ভারতে সংক্রামিত করেছে তার নাম আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ। মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রস্তের সাংঘাতিক অবস্থা হয়। তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক মন্দা। ও জিনিস যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে কম দুঃসহ নয়। মন্দায় আক্রান্ত দেশ বরং যুদ্ধকেই কম মন্দ বলে বরণ করবে, তবু অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাবে না।

রেখে দাও তোমার রাস্কিন ও তাঁর 'আন্টু দিস লাস্ট'। যার গুজরাতি তর্জমার নাম 'সর্বোদয়'। যুদ্ধপ্রস্তুতি যতদিন চলে ততদিন মন্দার প্রকোপ থাকে না। তাই ধনতন্ত্রের সংকটে রণতন্ত্রই ভরসা। তার উপর যদি একটা যুদ্ধ বেধে যায় তো কোথায় মন্দা! ধনতন্ত্র আর রণতন্ত্র তখন দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্তের মতো পরস্পরকে সাহায্য করে।

এই যে জুটি এ জুটি ভাঙবে কে? মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন, এ জুটি ভাঙবে যে গোত্তুলে বাড়িছে সে। তার নাম সমাজবিপ্লব। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী রাশিয়ার মতো এক সামরিকবাদী বিরাট দেশে ফলে যায়। তার থেকে ধারণা জন্মায় যে সর্বত্র ফলবে। তার দেখাদেখি আরো কয়েকটি দেশে বিপ্লবের চেষ্টা হয়। ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু ধারণাটা কায়েমী হয়। তাই ইউরোপের বহু দেশে প্রতিবিপ্লবী ধারণাও শক্তি সঞ্চয় করে।

তবে ইংলণ্ডের মতো যেদেশে পার্লামেণ্টারি ঐতিহ্য অতি গভীর সেদেশে বিপ্লব বা তার বিরোধী শক্তি কোনোটাই পার্লামেণ্টের বাইরে গিয়ে বল কষাকষি করার ছল পায় না। পার্লামেণ্টই তাদের ভিতরে ডেকে এনে বল-পরীক্ষার সুযোগ দেয়। আমার দেশে ফিরে আসার মাসকয়েক আগে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের সময়। আমাকে অবাক করে দিয়ে লেবার পার্টি জয়লাভ করে। আরো অবাক হই যখন দেখি যে বুর্জোয়ারা তাতে সুখী না হলেও খেলোয়াড়ের মতো পরাজয় মেনে নিয়েছে। শ্রমিক মন্ত্রীদের মনে সন্দেহ ছিল সিভিল সার্ভিস সহযোগিতা করবে কি না। সন্দেহ অচিরেই দূর হলো।

দেশে যখন ফিরি তখন ইংলণ্ড আর তার পার্লামেণ্টারি ঐতিহ্য আর তার সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নিয়েই ফিরি। ভারতে কি ওসব ভদ্রভাবে প্রবর্তন করা যায় না? সংগ্রাম বিনা কি গতি নেই? দুই শতাব্দী ধরে পরিচয় কি দুই পক্ষকে সন্ধির জন্যে প্রস্তুত করেনি? পার্লামেণ্টের বাইরে গিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা সত্যাগ্রহ একটা না একটা কিছু না করলেই নয়?

দেশের নেতারাও ইংলণ্ডকে পরখ করে দেখতে চান। তার আগে কিছু করবেন না। তাঁরা সাইমন কমিশনের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে সহযোগিতার পথ না পেয়ে অসহযোগ করেছেন। তারপরে নিজেরাই মিলেমিশে নিজেদের দেশের জন্যে একটা পার্লামেণ্টারি সংবিধান রচনা করেছেন। তাতে ইংলণ্ডের মুখ চেয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাস অঙ্গীভূত করেছেন। কিন্তু তার জন্যে মেয়াদ নির্দেশ করেছেন একটি বছর। একবছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক দেরি। এর মধ্যে যদি মোতিলাল নেহেরুর রিপোর্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ করে তো ভারত হবে একটি স্বশাসিত ডোমিনিয়ন। আর নয়তো পরের বছর থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হবে।

কিন্তু লক্ষণ তেমন সুবিধের নয়। আর সব দল একমত হলেও মুসলমানদের একটি প্রভাবশালী দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানরা কিছুতেই ছাড়বে না, তারা নাছোড়বান্দা। আর

তারা চায় ফেডারেশন, সর্বময় কর্তৃত্ব যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না পড়ে, হিন্দুপ্রধান কেন্দ্র যাতে মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর উপর একচ্ছত্র না হয়। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কার কথা শুনবে? মুসলমানদের সম্মতি না নিয়ে কি নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা যায়?

বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ সরকারের মন জেনে এসে ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক প্রগতির চরম লক্ষ্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস। সে বিষয়ে আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসবে। ভারতের নেতাদের নিমন্ত্রণ করা হবে। বড়লাট কিন্তু ঠিক করে বলতে পারলেন না কবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ভূমিষ্ঠ হবে। কতকাল পরে।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের মধ্যবর্তী মধ্যরাত্রে লাহোর কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে রাভী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় গান্ধীজীকে।

দশ

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সমাপ্ত হলে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে তাঁর সম্বন্ধে হিবার্ট জর্নাল নামক দার্শনিক পত্রে লেখেন ১৯১৪ সালে—

"Persons in power should be very careful how they deal with a man who cares nothing for sensual pleasure, nothing for riches, nothing for comfort or praise or promotion, but is simply determined to do what he believes to be right. He is a dangerous and uncomfortable enemy, because his body which you can always conquer, gives you so little purchase upon his soul."

এই বিপজ্জনক ও আরামনাশা শত্রুটির সঙ্গে লড়াই করা বড়ো বড়ো সেনাপতিদের কর্ম নয়। এঁকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিলে তো এঁরই ইচ্ছামতো কাজ হয়। দেশের লোক তাতে ভয় পেয়ে যায় না। বরং ভয় কাটিয়ে ওঠে। তাদের ভয় যতই কমে সরকারের অথরিটিও ততই কমে। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মার অথরিটি বেড়ে যায়।

গান্ধীজীর স্ট্রাটেজি ছিল একই, ট্যাকটিক্স এক এক সময় এক এক রকম। তিনি চেয়েছিলেন লোকের রাজভয় ভেঙে যায়। লোকে শূধু হাতে সরকারী অথরিটির মুখোমুখি হতে পারে। নির্ভয়ে 'না' বলতে পারে। অকাতরে শাস্তি বরণ করতে পারে। অথচ মারের বদলে মার না দেয়। ক্ষতির বদলে ক্ষতি না করে। সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে গান্ধীজীকে—তাঁর নির্দেশকে—অমান্য না করে। তাঁর নির্দেশ অহিংসা রক্ষা করা।

সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে গান্ধীজীকে অমান্য করা মানে তাঁর

অথরিটি না মানা। সেটাই তাঁর পক্ষে সব চেয়ে পীড়াকর। না সরকারের অথরিটি, না লোকনায়কের অথরিটি কোনো অথরিটিই যদি কেউ না মানে তবে তো তার নাম স্বরাজ নয়, তার নাম অরাজকতা। অরাজকতা তাঁর অভিষ্ট নয়। যদিও পরাধীনতার চেয়ে অরাজকতাও ভালো। কিন্তু তার জন্যে গান্ধীনেতৃত্বের কী প্রয়োজন? গুণ্ডানেতৃত্বই যথেষ্ট।

চৌরিচৌরা গান্ধীজীকে নিদারুণ পীড়া দিয়েছিল। তাঁর অথরিটির কানাকড়ি মূল্য নেই দেখে তিনি তাঁর চাল ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন। তা বলে কি তিনি বার বার চাল ফিরিয়ে নেবেন নাকি? এত বড়ো দেশে দুটো একটা চৌরিচৌরা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তা ছাড়া প্ররোচক চররাও তো তেমন কিছু বাধিয়ে দিতে পারে। যাতে গান্ধী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব তো পাশ হয়ে গেল। এবার গান্ধীজী কী করবেন? আর বারের মতো বারদোলি তহশিল থেকে আরম্ভ করে ভারতের সব ক'টা তহশিলকে একে একে শাসনমুক্ত করা? গান্ধীজী কাউকে কিছু জানতে দেন না। এবার তিনি কী করবেন তা তিনিও কি জানেন?

তিনি সহিংস বিপ্লবীদের কাছে আবেদন করেন যে তাঁরা যেন তাঁদের কার্যকলাপ স্থগিত রাখেন ও তাঁকে একটা সুযোগ দেন। তাঁর অহিংস কার্যকলাপে তাঁদের সহিংস কার্যকলাপ যে ব্যাহত হয় সেটা ঠিক, কিন্তু তাঁদের সহিংস কার্যকলাপে তাঁর অহিংস কার্যকলাপ আরো বেশী ব্যাহত হয়। সেইজন্যে লর্ড আরউইনের রোষের চেয়ে তিনি সহিংস বিপ্লবীদের ভয় করেন বেশী।

চৌরিচৌরার চেয়ে শতগুণ গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। কিন্তু সেটা যেদিন ঘটে তার আগেই গান্ধীজী তার দাণ্ডী অভিযান শুরু করে দিয়েছেন ও অভিযানের অন্তে সমুদ্রের তীরে একমুঠো প্রাকৃতিক লবণ তুলে নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেছেন। সারা ভারত যেন এই সঙ্কেতটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। সর্বত্র লবণ তৈরি করে আইন ভঙ্গ করা চলল। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটে আঠারোই এপ্রিল। ততদিনে অহিংস সংগ্রাম ভারতময় ছড়িয়ে গেছে ও তাকে প্রত্যাহার করা কারো সাধ্য নয়। তেমন ইচ্ছাও নেই কারো।

গান্ধীজীকে তখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি বোধহয় এই আশায় যে তিনি আরো বড়ো অনর্থের আশঙ্কায় তাঁর সত্যাগ্রহ থেকে নিবৃত্ত হবেন, কিন্তু তিনি এযাত্রা প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন যে, "হয় আমি যা চাই তা নিয়ে ফিরব, নয় আমার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসবে।"

নুন যে সমুদ্রকূল ছাড়া আরো অনেক জায়গায় তৈরি করা যায় আমরা কেউ অত জানতুম না। জলা জমি, লোনা জমি দেশের সব জেলায় কিছু কিছু মেলে। সত্যাগ্রহীরা খুঁজে পেতে সেসব জায়গায় গিয়ে জোটে। নুন হয়তো নয়, তবু নোনতা লাগে জিবে। আর যায় কোথা? অমনি গ্রেপ্তার। ওরাও

তো তাই চায়। যাতে জেল গুলজার হয়। মেয়েরাও দলে দলে জেলপথের যাত্রী হয়। কর্তাদের পক্ষে মহাসমস্যা।

সঙ্গে সঙ্গে চলে বিদেশী কাপড় বয়কট আর মদের দোকানে পিকেটিং। এত দূর গড়ায় যে বম্বের দোকানদাররা কংগ্রেসের কথায় ওঠে বসে, সরকারের কথায় নয়। কংগ্রেসের অথরিটি বাড়ে, সরকারের অথরিটি কমে। গান্ধীজী যেমনটি চেয়েছিলেন। সবাইকে অবাক করে দেয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা। তাদের ত্যাগস্বীকার দেখে গঢ়ওয়ালী ফৌজ গুলী করতে অস্বীকার করে। পেশোয়ার কিছুদিনের জন্যে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে চলে যায়। খান আবদুল গফর খান্ সীমান্ত গান্ধী বলে প্রখ্যাত হন। মুসলমানরা গান্ধীর সঙ্গে নেই, এই প্রচারকার্যের বুকে শেল বেঁধে আর হিন্দুরা মুসলমানদের জাত শত্রু এই অপপ্রচারের আঁতে ঘা লাগে।

ধরাসনার নিমক গোলায় অহিংস হানাদারদের উপর যে অমানুষিক লোহাবসানো লাঠি চার্জ হয় ও তারাও যে বীরোচিতভাবে তার সম্মুখীন হয় তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক ওয়েব মিলার। ভারত সরকারের সেনসরশিপ এড়ানোর জন্যে আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইরানে যান ও সেখান থেকে যেসব রোমহর্ষক সংবাদ পরিবেশন করেন তা দুনিয়া জুড়ে তেরশো পঞ্চাশখানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ওয়েব মিলার তাঁর আঠারো বছরের সাংবাদিক অভিজ্ঞতায় বিশটি দেশে শত শত দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাস্তায় রাস্তায় লড়াই বিদ্রোহ ইত্যাদি দেখেছেন, কিন্তু এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখেননি।

মেদিনীপুরের কাহিনী আমরা জানি। বারদোলি ও অন্যান্য অঞ্চলে যে খাজনা বন্ধ আন্দোলন হয় তার ফলে বহু কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বড়োদা রাজ্যে চলে যায়। খাজনা বন্ধ আন্দোলন যুক্তপ্রদেশে ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে যায়। এমনি করে হয় কৃষক জাগরণ। শ্রমিক জাগরণও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। সবশুদ্ধ এক লাখ সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে। তাদের মধ্যে বহু নারী। কারো কারো কোলে শিশু।

লবণ সত্যাগ্রহ একবছরেরও কম সময় নিয়েছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে আলোড়ন ঘটে গেল তা দেখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্থিতধী সমালোচক মন্তব্য করেন যে এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়মাত্রেরই উচ্চতা বেড়ে গেছে। আমিও সেটা অনুভব করি। দেশের লোক স্বাধীন না হোক নির্ভীক হয়েছে। দুর্ভোগ বহন করতে এগিয়ে এসেছে। নেতার আদেশ মান্য করতে ও আসমুদ্র হিমাচল একসঙ্গে পা ফেলতে শিখেছে।

এদেশের ইউরোপীয়রা এই নবজাত চেতনা সহ্য করতে না পেরে আবদার ধরে যে আরো কড়া হাতে দমন করতে হবে। এর উত্তরে বড়লাট আরউইন বলেন,

"However emphatically we may condemn the civil disobedience movement, we should, I am satisfied, make a profound

mistake, if we under-estimate the genuine and powerful meaning of nationalism that is to-day animating much of Indian thought and for this no complete or permanent cure had ever been or ever will be found in strong action by the Government."

এই সাধুপ্রকৃতির খ্রীস্টান যে সে-সময় ভারতের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন এটা ভাগ্যের কথা। গান্ধীজীকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু মহাত্মা যা করতে চান তাঁকে তা করতে দিলে আইনের শাসন চলে না, ব্রিটিশ-রাজত্বও থাকে না। বড়লাটের পরামর্শদাতারা তাঁকে শক্ত হতেই পরামর্শ দেন। তিনি চান দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া।

এমনিতেই ইংলণ্ড তখন অর্থনৈতিক মন্দায় ভুগছিল। বয়কটের ফলে বিলিতী কাপড়ের চাহিদা পড়ে যায়। যত কাপড় আমদানী হচ্ছিল তার সিকিভাগ বা সেইরকম আমদানী হয়। বম্বেতে ইউরোপীয়দের ষোলটা মিল বন্ধ হয়ে যায়। যেসব ভারতীয় মিল খাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না বলে অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা দুই শিফটে কাজ করে। খাদির চাহিদা এত বেড়ে যায় যে খাদির উৎপাদন শতকরা সত্তর ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সমস্ত খাদির ভাণ্ডার খালি হয়ে যায়। খাদি বলে একটা বিকল্প না থাকলে মিল একাই পারত না বিলিতী কাপড়ের অভাব মেটাতে। বয়কট ব্যর্থ হতো। এইজন্যেই মহাত্মা খাদির উপর এত জোর দিয়েছিলেন।

আন্দোলনটা ছিল সাড়ে পনেরো আনা স্বতঃস্ফূর্ত। নেতাদের ধরে ধরে জেলে পুরলে জনতা নিজের হাতেই আইনভঙ্গের দায়িত্ব নেয়। তেমন পরিস্থিতিতে যা হবার তা হবেই। লোকেও বাড়াবাড়ি করবে, পুলিশও মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এমন একটা পরিস্থিতি কেমন করে সামলাতে হয় সে শিক্ষা তো কারো ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেটরা কি এমন বেপরোয়া ও এমন ব্যাপক আইনভঙ্গ এর আগে কখনো দেখেছেন? অসহযোগ ছিল এর তুলনায় অনেক সংযত। স্বয়ং গান্ধীজী বাইরে ছিলেন পরিচালনা করতে। এবারেও তাঁকে বেশ কিছুদিন বাইরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। মোতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতাদেরও। কিন্তু পরে সে পলিসি পরিবর্তন করতে হয় আন্দোলনের তোড় দেখে। তাঁরাও কি বাইরে থাকলে সরকারকে শান্তি দিতেন?

গণসত্যাগ্রহ একপ্রকার যুদ্ধ, কেননা সেটা রাজায় প্রজায় বলপরীক্ষা। একপ্রকার বিপ্লবও বটে, কেননা সমাজের নিম্নতম স্তর তার বিপুলতম সামর্থ্য নিয়ে অঙ্গনে ঝাঁপ দেয়। কোনোপক্ষ কি কোনোপক্ষকে শান্তি দিতে পারে? হারজিতের প্রশ্ন আছে। জীবনমরণ প্রশ্ন। কেউ কারো খাতিরে নিজের জেদ ছাড়বে না। এ সংগ্রাম অনন্তকাল চললেও না।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসতে শুরু করে। গান্ধী বা কংগ্রেসের জন্যে সবুর করে না। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল বৈঠকের আলোচনা অবাস্তব। ভাবী সংবিধান যদি উপর থেকে চাপানোর অভিপ্রায় না থাকে তবে গান্ধী ও কংগ্রেসের অভিমত জানা দরকার। তাঁরাই যখন

ভারতীয়দের মধ্যে প্রধান পক্ষ। তাঁরা আসুন, এসে অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করুন। তারপর ভারতীয়রা একজোট হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। গোল টেবিল বৈঠক তাঁদের মুখ চেয়ে মুলতুবি রাখা হয়।

তাছাড়া বড়লাট আরউইনের কার্যকাল ফুরিয়ে এসেছিল। ভারত থেকে বিদায়ের পূর্বে তাঁর আন্তরিক কামনা গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া। এত বড়ো একটা অশান্তি তিনি পেছনে রেখে যেতে চান না। তাই তিনি সাপ্রু ও জয়াকরের শান্তিপ্রচেষ্টায় সায় দেন। তাঁদের মধ্যস্থতায় কথাবার্তা চলতে থাকে। অবশেষে গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

গান্ধীজী তাঁর গণসত্যাগ্রহ সহজে থামাতে চাননি। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হয়। কথাবার্তায় কোনোপক্ষেরই ষোল আনা বক্তব্য বজায় থাকে না। উভয়পক্ষকেই কিছু না কিছু ছেড়ে দিতে হয়। উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে লবণ আইন উঠে না গেলেও যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে নিজেদের জন্যে নুন তৈরির ও স্বগ্রামের লোকের কাছে বিক্রীর স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়। শ্রমিক ও কৃষক যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, কিন্তু বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেবার ব্যবস্থা হয়, যদিও শর্তসাপেক্ষভাবে। পদত্যাগী কর্মচারীদের পুনরায় বহাল করার সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারদের উদার হতে বলা হয়। কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত দিতে বড়লাট নারাজ।

গান্ধীজী সব দিক বিবেচনা করে গণসত্যাগ্রহ রহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু হিংসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা তাঁদের নয়। এই নিয়ে গান্ধীজীকে অনেক কথা শুনতে হয়। বিশেষতঃ ভগৎ সিংহের ফাঁসির পরে।

আন্দোলনটা যদি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে হয়ে থাকে তবে পূর্ণ স্বাধীনতা হলো কোথায় যে এত লোকের এত দুঃখ ও এত ত্যাগ সার্থক হবে? অমন করে অসময়ে ওটা থামিয়ে দেবার দরকারটাই বা কী ছিল? কংগ্রেসের ভিতরেই অনেকে বলতে আরম্ভ করেন যে গান্ধীজী ভুল করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস গণসত্যাগ্রহ ক্রমেই আরো বিশাল আকার ধারণ করত ও তাকে দমন করা সরকারের সাধ্যাতীত হলে সরকার একদিন আত্মসমর্পণ করত। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অনুরূপ ব্যাপার আর কী। যেন পরিস্থিতিটা যুদ্ধকালীন ও সরকার যুদ্ধে হারতে বসেছে।

বস্তুতঃ এই আন্দোলনের পটভূমিকা ছিল আন্তর্জাতিক মন্দা। সে পটভূমিকায় আন্দোলন খুব বেশীদূর যেতে পারে না। জেলগামীদের সংখ্যা মাত্র একলাখ। দেশের মোট জনসংখ্যার তিনশো ভাগের একভাগ। অন্যভাবে যারা জড়িত হয়েছে তাদের সংখ্যা বড়জোর আরো একলাখ। সেও ভারতের মোট জনসংখ্যার তিনশো ভাগের একভাগ। সুতরাং বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের পক্ষে তো নয়ই।

আসলে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সমালোচকদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। তাঁরা যদি মনে রাখতেন যে গান্ধীজী তৈরী হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহলে সেখানকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন ও মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে তাঁর কর্মপদ্ধতি দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত। এখানকার সত্যাগ্রহ ছিল সেখানকার সত্যাগ্রহেরই ক্রমবিকাশ। এমন কি ওই যে দাণ্ডী অভিযান ওটাও ট্রান্সভাল মার্চের পূর্বানুবৃত্তি।

পূর্বানুবৃত্তি বললুম। পুনরাবৃত্তি নয়। গান্ধীজী কখনো পুনরাবৃত্তি করতেন না। কিন্তু যেই যেখানে ছাড়তেন সেখান থেকেই আবার তুলে নিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই বিখ্যাত মার্চ যেখানে এসে থেমেছিল সেখান থেকে তাকে দাণ্ডীর সমুদ্রকূল অবধি সম্প্রসারিত করা গেল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে ব্রিটিশ কর্তারা বুয়র যুদ্ধে জিতলেও কিছুদিন বাদে তাঁদের অন্তঃপরিবর্তন হয়। তাঁরা মিটমাটের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেন। তখন দক্ষিণ আফ্রিকানরা যে সংবিধান রচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাই পাশ করে দেয়, তার একটি কমাও রদবদল করে না। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে বুয়র যুদ্ধের বিকল্প গণসত্যাগ্রহ। আপাতত ইংরেজরা সে আন্দোলন দমন করলেও আখেরে ভারতের অনমনীয় সংকল্প ও অদমনীয় বীরত্ব তাদের অন্তর স্পর্শ করবে। তাদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। তারা মিটমাটের জন্যে উদগ্রীব হবে। তখন ভারতীয়রা যে সংবিধান রচনা করবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সেই সংবিধানই পাশ করবে, তার একটি কমাও রদবদল করবে না। ভারতও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার পর ব্রিটেনের সঙ্গে সমান স্বাধীন দেশ হিসাবে যুক্ত থাকতে রাজী হবে।

এই যখন তাঁর বিশ্বাস তখন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সমান মর্যাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও স্বাধীনতা বিকিয়ে না দিয়ে চুক্তি করা তাঁর দিক থেকে ভুল হয়নি, ঠিকই হয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার দুয়ার তো খোলাই রইল, তার উপায় যে গণসত্যাগ্রহ তার দুয়ারও বন্ধ হয়ে গেল না। গোল টেবিল বৈঠকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা না মেলে, যদি তাঁকে সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়, তবে গণসত্যাগ্রহ পুনরারম্ভ করতে বাধা কী? অবশ্য একবার একটা ছেদ পড়লে আন্দোলনের মোমেণ্টাম নষ্ট হয়, গতিবেগ নতুন করে সঞ্চার করা তত সহজ নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে ভুল বই কি। গান্ধীজী ঈশ্বরবাদী মানুষ। ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিয়ে বর্তমান যেটা কর্তব্য সেইটেই করেন। বর্তমান কর্তব্য লর্ড আরউইনের বন্ধুতার কর গ্রহণ ও ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণ স্বীকার।

বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে চায়ের সময় হলো। বড়লাট গান্ধীজীকেও এক পেয়ালা খেতে বলেন। অমনিভাবে পরস্পরের স্বাস্থ্যের জন্যে টোস্ট করা যাবে। গান্ধীজী চায়ের বদলে চেয়ে নিলেন লেবুর রস। তাঁর সঙ্গে ছিল এক পুরিয়া বেআইনী নুন। তারই এক রত্তি বড়লাটকে-

দেখিয়ে লেবুর রসে ফেলে বলেন, "ইওর এক্সেলেন্সী, আমার মনে পড়ছে বোস্টন টী পার্টি।" বড়লাট তাঁর রসিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কি না বলা যায় না, তবে তিনিও তামাশা করতে ছাড়েন না, যখন দেখেন যে গান্ধীজী তাঁর চাদর ফেলে যাচ্ছেন। বড়লাট ওটি তুলে নিয়ে বললেন, "গান্ধী, আপনার পরণে এমন কিছু নেই, আপনি জানেন, যে এটি ফেলে গেলেও চলে।"

ওদিকে তর্জন গর্জন করছিলেন উইনস্টন চার্চিল। রাজপ্রতিনিধি ভবনের সোপান বেয়ে দৃপ্তপদে চলেছে এক অর্ধ উলঙ্গ ফকির!

দৃশ্যটা কেবল চার্চিলের নয়, আরো অনেকের অন্তর্দাহ ঘটায়। এইজন্যে যে গান্ধীকে যে-মর্যাদা দেওয়া হলো তা সমকক্ষের মর্যাদা। ভারতীয়দের আর কাউকে তা দেওয়া হয়নি।

এগারো

সেই একদিন আর এই একদিন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সদ্য উপনীত ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কর্ম উপলক্ষে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাচ্ছেন। রেলের ফার্স্ট ক্লাসে তিনিই প্রথম কালা আদমি। মারিৎসবুর্গে এক গোরা আদমি ওঠেন। কালা আদমির সঙ্গে এক কামরায় ভ্রমণ করতে হবে তা কি কখনো হয়? সাহেব তৎক্ষণাৎ গিয়ে রেল কর্মচারীকে ডেকে আনেন। যাত্রীর হাতে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দেখেও হুকুম দেওয়া হয় ভ্যানে সরে যেতে। গান্ধী সে হুকুম অমান্য করেন। তখন তাঁকে মালসমেত নামিয়ে দিয়ে ট্রেন চলে যায়। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে সারা রাত প্রখর শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে গান্ধীজী ভাবতে থাকেন কী তাঁর কর্তব্য। দেশে ফিরে যাবেন, না এই অন্যায়ের শেষ দেখবেন। সেদিন সেই যে উত্তর তিনি অন্তরে অনুভব করেন সে উত্তর কেবল একটি ব্যক্তির নয়, একটি জাতিরও উত্তর। আর কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নয়, ভারতের ভারতীয়দেরও উত্তর।

দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সংগ্রামের ক্রমান্বয় ভারতের অহিংস সংগ্রাম। গান্ধী স্মাটস চুক্তির ক্রমবিকাশ গান্ধী আরউইন চুক্তি। এটা আরো মর্যাদাযুক্ত। স্মাটস যদিও সরকারের শীর্ষ তবু আরউইনের মতো রাষ্ট্রের শীর্ষ নন। প্রধানমন্ত্রী, রাজপ্রতিভূ নন। রাজার সঙ্গে সমান হয়ে কথাবার্তা বলবে, স্বাক্ষর করবে, এত বড়ো স্পর্ধা কোন্ প্রজার? তাহলে রাজার মর্যাদা থাকে কোথায়? চার্চিল তো মাথার চুল ছিঁড়বেনই। ওদেশের রক্ষণশীল দলের এক দুর্মর অংশ, এদেশের সাহেব মহলের এক ঝানু অংশ, এ জ্বালা ভুলতে অপারগ। তা ছাড়া তাঁদের এখানকার আমীর ওমরাহ কি ভুলতে পারেন যে তাঁদের ভাগ্যে যা জোটেনি গান্ধীর ভাগ্যে তাই জুটবে?

ব্রিটিশ সরকারের চিরকেলে পলিসি আগে হিন্দুমুসলমানের বোঝাপড়া

হবে, পরে হিন্দুমুসলমানের যোগফল যে ভারত সেই ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বোঝাপড়া হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক ডাকা। তাতে এবার আর একটা নতুন অঙ্গ জুড়ে দেওয়া হয়। দেশীয় রাজন্য। তাঁদের সঙ্গেও অগ্রিম বোঝাপড়া চাই। ইতিমধ্যে বৈঠকের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। তাতে কংগ্রেস উপস্থিত না থাকায় কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়নি। দ্বিতীয় অধিবেশনও কি তেমনি অপূর্ণাঙ্গ হবে? যাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তার জন্যে আরউইনের উপর ভার পড়ে কংগ্রেসকে বৈঠকে যোগ দেওয়াতে হবে। তারই পরিণতি গান্ধী আরউইন চুক্তি। গোল টেবিল বৈঠকের পটভূমিকা না থাকলেও তেমন অঘটন ঘটবার কথা নয়। ব্রিটিশ পলিসির দিক থেকে ওটা প্রক্ষিপ্ত। তার জন্যে সাধুবাদ দিতে হয় সাধুপ্রকৃতির বড়লাট আরউইনকে, যাঁরা চোখে প্রেস্টিজের প্রশ্নটাই চূড়ান্ত নয়। আর তখনকার লেবার পার্টির গবর্নমেন্টকে, যাঁরা নিজেরা নিচের থেকে উঠেছেন বলে সাম্যবাদী।

গান্ধীজী গোল টেবিলে যোগ দেবার পূর্বেই শ্রমিক সরকার হঠাৎ পদত্যাগ করেন। যদিও তাঁদের মেজরিটি। সেটাও একটা অঘটন। অর্থনৈতিক মন্দা এসে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে ব্যাঙ্কগুলোর গায়ে হাত না দিলেই নয়। সে সাহস শ্রমিক সরকারের ছিল না। কারণ তাঁদের পেছনে সে স্যাঙ্কশন ছিল না। ভোটের জোরে ক্ষমতার আসনে বসলেই তো সংঘবদ্ধ কায়েমী স্বার্থের অঙ্গে অঙ্কুশ-প্রয়োগ করা চলে না। হাতিও ক্ষেপে গিয়ে মাহুতকে ফেলে দিতে পারে। শ্রমিক সরকার মানে মানে গদী ছেড়ে দেন। ক্ষমতায় যাঁরা আসেন তাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের লোক, কিন্তু তাঁদেরও সর্দার সেই র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।

গান্ধীজীকে প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হয়। গোল টেবিলের সভাপতি লর্ড স্যাঙ্কি তাঁকে মহাত্মা বলে আপনার বাম পার্শ্বের আসনে বসান। বিলিতী কেতায় সেটিই সেরা আসন। ম্যাকডোনাল্ডও তাঁকে মহাত্মা বলেন। বলড়ুইন ও হোর তাঁর সঙ্গে ভাব করেন। গোল টেবিলের তাৎপর্য এই যে উপস্থিত সকলেরই সমান মর্যাদা। ব্রিটেন যে গোল টেবিলে রাজী হয়েছে এটা নিশ্চয়ই একটা অগ্রগামী পদক্ষেপ। সকলেই গোড়ার দিকে আশাবাদী ছিলেন যে এইবার ভারতের সংবিধানগত সমস্যার আপসে মিটমাট হবে।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল যে যার জায়গায় অটল। সৌজন্যের অভাব নেই, অভাব সমঝোতার। গান্ধীকে কোণঠাসা করা হলো, করলেন মাইনরিটিরা। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁদের যোগসাজস ছিল। আর গান্ধীও যে লাইন নিলেন সেটাও তাঁকে কোণঠাসা করল। তারপর ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ঘরোয়া অর্থনৈতিক সংকটে অন্যমনস্ক থাকায় ভারতকে কী দেবেন না দেবেন খুলে বলতে পারছিলেন না। ব্রিটেন কী দিচ্ছে জানলে তবে তো ভাগাভাগি হবে।

মোটামুটি এইরকম আভাস পাওয়া গেল যে সাইমন কমিশন যা দিতে

বলেছেন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনমতকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে তার চেয়ে বেশী দিতে রাজী আছেন। পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিক অপূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় স্বায়ত্ত শাসন। কেন্দ্রেও ভারতীয়রা মন্ত্রিত্ব করবেন। কিন্তু তাঁরা দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির ভার পাবেন না। আর তাঁদের দায়িত্ব যার কাছে সেই আইনসভার সবাই যে নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন তাও নয়। আর নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা তাঁরা যে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের দ্বারা নির্বাচিত হবেন তাও নয়। আর নির্বাচকমণ্ডলী যে ধর্মনির্বিশেষে বর্ণনির্বিশেষে যৌথনির্বাচকমণ্ডলী হবে তাও নয়। আর বড়লাট যে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তে আদৌ হস্তক্ষেপ করবেন না তাও নয়। সিভিল সার্ভিস যে বিদায় নেবে তাও নয়।

গান্ধীজী বিদেশী বণিক স্বার্থের বিপক্ষে—এমন কি দেশীয় বণিক স্বার্থের বিপক্ষেও—বলেন, যদি তা স্বদেশের—বিশেষ করে স্বদেশের দরিদ্রদের—স্বার্থের বিরোধী হয়। তেমনি মনোনয়ন প্রথার বিপক্ষে বলেন, বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে আসবেন যাঁরা তাঁদের মনোনয়নের। তেমনি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করতে বলেন, যাতে ভোট দিতে গরিব লোকেরাও পারে। তেমনি দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে বলেন, যাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীন সরকারের মতো কাজ করতে পারেন। এমনি আরো অনেক বিষয়েই তিনি স্পষ্ট কথা বলেন।

কিন্তু সেসব কথা কার কথা? তাঁর নিজের, না তিনি যাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তাদের? কাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তিনি?

এই নিয়েই বেধে যায় গোল। গান্ধীজীর মতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি। আর কংগ্রেস হচ্ছে ভারতের সর্বজনের প্রতিনিধি। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান পার্শী ইত্যাদি সকলের। কংগ্রেস লড়াই করছে সকলের হয়ে। একমাত্র কংগ্রেসই লড়াই করছে। সন্ধির সময় যখন আসবে তখন সন্ধি হবে কংগ্রেসে ব্রিটিশে। কংগ্রেসই ভারত, সুতরাং ভারতে ব্রিটেনে। কংগ্রেস অন্যান্য দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাদের সঙ্গেও মিটমাট করবে। কিন্তু তারা এক একটা অংশের প্রতিনিধি। সমগ্রের নয়। কংগ্রেসই সমগ্রের প্রতিনিধি।

তিনি যে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি এটা মেনে নিতে কারো আপত্তি ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস যে ভারতের সর্বজনের একমাত্র প্রতিনিধি, কংগ্রেসই যে ভারত এবং ভারতের হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে সেটেলমেণ্টের অধিকারী এতে আপত্তি ছিল মাইনরিটিদের তথা দেশীয় রাজাদের তথা সরকারী বেসরকারী ইংরেজদের।

ইতিমধ্যেই এমনভাবে জোট পাকানো হয়েছিল যাতে ভাবী সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসকে ব্যালান্স করার জন্যে দুটি ব্লক থাকে। একটি প্রাক্তন অফিসিয়াল ব্লকের পরিবর্তে দেশীয় রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধিদের ব্লক। অপরটি যাবতীয় মাইনরিটিকে স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ সহযোগে

ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাদের সম্মিলিত ব্লক। এই দুটি ব্লক থাকতে কংগ্রেস কিছুতেই একক মেজরিটি পাবে না। তাকে বাধ্য হয়ে কোয়ালিশন করতে হবে।

ভারতের ভাবী সরকার ফেডারল সরকার হবে আর সেই সরকারের স্বরূপ হবে কোয়ালিশন এ বিষয়ে নিঃসংশয় হবার জন্যেই মাইনরিটি প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করেন। তাঁদের সঙ্গে বিদেশী বণিকরাও ছিলেন। তেমনি দেশীয় রাজারাও নিজেদের মধ্যে সেইরূপ বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের শর্ত তাঁদের রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদেরি মনোনীত পাত্রমিত্র হবেন, প্রজাদের মনোনীত প্রতিনিধি হবেন না।

এখন সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো মাইনরিটিদের দলে হিন্দুসমাজের একটি অবিভাজ্য অঙ্গ অবদমিত শ্রেণী। একে তো মাইনরিটিদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ও তার উপরে ওয়েটেজের দাবী মেনে নিলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র দুই ক্ষুণ্ণ হয়। ঐতিহাসিক কারণে মুসলমান ও শিখদের বেলা সেটা না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু হিন্দুসমাজের একটি অঙ্গের বেলা তেমন দাবী মেনে নিলে কেবল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র নয়, সামাজিক সংহতিও ক্ষুণ্ণ হয়। তা ছাড়া সংবিধানে যদি অস্পৃশ্যতা কায়েম হয় তো সমাজেও আইনত কায়েম হবে। কতকগুলি মানুষকে চিরকাল অস্পৃশ্য করে রাখা কি তাদের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে বা দেশের পক্ষে ভালো হবে?

গান্ধীজী কোনো মতেই হরিজনদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেবেন না, জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করবেন এটা ধ্রুব। ইতিমধ্যে অনেকে প্রস্তাব করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে যখন গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে তখন সমস্যাটার সমাধান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। তিনি সালিশী করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দেওয়া মানে তাঁর রোয়েদাদ চোখ বুজে মেনে নিতে রাজী হওয়া। সেইজন্যে গান্ধীজী তেমন প্রস্তাবে সায় দেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো রোয়েদাদ দেন তিনি ও কংগ্রেস তা গ্রহণ করবেন কি না বিবেচনা করবেন। কিন্তু সে রোয়েদাদে যদি হরিজনদের স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকৃত হয়ে থাকে তবে তিনি সে অংশটা প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করবেন। ম্যাকডোনাল্ডকে তিনি সতর্ক করে দেন।

ব্রিটেন ভারতকে যতবার শাসনসংস্কার দিয়েছে ততবার নিজের হাতে কিছু রেখেছে, ভারতের হাতে কিছু দিয়েছে। আর ভারতের হাতে যা দিয়েছে তাকে দু'ভাগ করে একভাগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদীদের, একভাগ মাইনরিটিদের। মর্লি মিণ্টো শাসন-সংস্কারের সময় থেকে এইরকম চলে আসছে। ভারতীয়দের যা দেবার তা দু'ভাগ করে দেবার আগে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করাও ব্রিটিশ রীতি। তারা যদি একমত হয় তবে তারাই ভাগাভাগি করার দায়িত্ব নেয়। পরে ব্রিটেন সেটাকে শাসনসংস্কারের সামিল করে আইনের স্বীকৃতি দেয়। তারা যদি একমত হতে না পারে তবে ব্রিটেনই নিজের দায়িত্বে ভাগাভাগি করে ও সেটা শাসনসংস্কারের সামিল হয়। তখন সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেটাকে অগ্রাহ্য করলে শাসনসংস্কারটাকেও অগ্রাহ্য করা

হয়। ততদূর যেতে কতক লোক রাজী হলেও কতক লোক রাজী নয়।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের প্রাক্‌কালে কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়ে যে ভাগাভাগি করে সেটার নাম লখ্‌নউ চুক্তি। সেটাতে ঝাঁপার হাত ছিল। শোনা যায় টিলকেরও হাত। তিনি ইঙ্গ ভারতীয় সংগ্রামের পাশাপাশি হিন্দুমুসলিম সংগ্রাম জিইয়ে রাখতে চাননি। তাই বাইরের সংগ্রামে সবটা জোর দেবার আশায় ভিতরের সংগ্রাম মিটিয়ে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। লখ্‌নউতে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন তো স্বীকার করেই, যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে উপরন্তু ওয়েটেজ বা অতিরিক্ত আসন কবুল করে। পরিবর্তে লীগও কবুল করে যেসব প্রদেশে অমুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে অমুসলমানদের জন্যে ওয়েটেজ বা অতিরিক্ত আসন। পরে দেখা গেল যে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন মানে অমুসলমানদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচন। মুসলমানরা যেমন শুধু মুসলমানদের ভোটেই নির্বাচিত হয় তেমনি অমুসলমানরাও কেবল অমুসলমানদের ভোটেই নির্বাচিত হয়। অপর সম্প্রদায়ের কাছে জবাবদিহির দায় থাকে না বলে মুসলমানরাও যেমন সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে অমুসলমানরাও তেমনি। সবাই যদি সমান সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয় তবে সাম্প্রদায়িক ঘাতপ্রতিঘাত লেগেই থাকে। জাতীয় সংগ্রামের জন্যে একাগ্রতা ও একতা কোথায়?

সেইজন্যে মোতিলাল নেহরু কমিটির পরিকল্পিত সংবিধানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়। সেইসঙ্গে ওয়েটেজ। তবে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে তাদের জন্যে আসন সংরক্ষণ বিহিত হয়, কিন্তু অনুপাতের অতিরিক্ত আসন নয়। এটা কতক মুসলমানের সমর্থন পেলেও প্রভাবশালী মুসলমানদের সম্মতি পায় না। এঁদের কাছে স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ যেন একপ্রকার সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ। গোল টেবিল বৈঠকে এঁদের সদলবলে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অন্যমতের প্রতিনিধি ছিলেন একমাত্র সার আলী ইমাম, কিন্তু তাঁকে মুখ খুলতে দেওয়া হলো না। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ কেবল নয়, প্রত্যেকটি মাইনরিটির জন্যও তাই। এমন কি হিন্দুসমাজভুক্ত অবদমিত শ্রেণীর জন্যেও। সবাই মিলে এই মর্মে একটা চুক্তি করেন, তাকে বলে মাইনরিটিজ প্যাক্‌ট। তাতে মাইনরিটি বলে গণ্য হন ইউরোপীয় বণিকরাও।

এঁদের দাবী মেনে নিলে এঁরা যে পরিবর্তে অন্যপক্ষের দাবী মেনে নেবেন তা নয়। হিন্দুরা—এখন থেকে বর্ণহিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও পূর্বের মতো ওয়েটেজ পাবে না। মাঝখান থেকে কেন্দ্রে সংখ্যাগুরুত্ব থেকে বঞ্চিত করে। লখ্‌নউ চুক্তি ছিল একটা বারগেন, তাতে দু'পক্ষের লাভক্ষতি সমান সমান। তার পেছনে ছিল একটা দেওয়া-নেওয়ার মনোভাব। গোল টেবিলের মাইনরিটিরা চান একতরফা লাভ। ক্ষতির বোঝাটা চাপিয়ে দেবেন অন্য তরফের উপর। যেমন করে বিজেতারা চাপিয়ে দেয় বিজিতের উপরে।

গান্ধী যদি মেনে নেন তাহলে যে পূর্ণ স্বাধীনতা সুগম হবে তা নয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম নিষ্প্রয়োজন হবে তাও নয়। সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সহযোগিতা পাবেন তাও নয়। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব বরাবরের জন্যে থেমে যাবে তাও নয়। তিনি মেনে নিন, আর নাই নিন মাইনরিটি প্যাক্‌ট-ওয়ালারা ব্রিটিশ সরকারের উপরেই শেষ ভরসা রাখেন, তাঁর উপরে নয়। তিনি যদি মেনে নেন তাহলে ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে ওটা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হবে। যদি মেনে না নেন তাহলে তো ব্রিটিশ সরকারের কাছে গিয়ে বলা হবে রক্ষাকবচ দিতে।

তিনি ও ফাঁদে পা দেন না। ব্রিটিশ সরকার যদি রক্ষাকবচ দিতে চান নিজেদের দায়িত্বে দেবেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের একভাগ যে অবদমিত শ্রেণী তাকে যা দেবার তা হিন্দুরাই দেবে, ব্রিটিশ সরকার না। অপরাপর সম্প্রদায় না। স্বতন্ত্র নির্বাচন যদিও সকলের পক্ষেই খারাপ তবু হরিজনদের পক্ষে আরো বেশী খারাপ। শিখ চিরকাল শিখ থাকতে পারে, কিন্তু অস্পৃশ্য চিরকাল অস্পৃশ্য থাকতে পারে না, থাকা অন্যায়। হিন্দু সংস্কারকরা ব্যর্থ হবেন, যদি সরকার ওভাবে অস্পৃশ্যতাকে কায়েমী হতে দেন। তা ছাড়া আবার এক সাম্প্রদায়িক বিবাদ শুরু হবে। বর্ণহিন্দু বনাম হরিজন। সমাজ দুর্বল হবে, রাষ্ট্র দুর্বল হবে।

গোল টেবিল বৈঠকে ঝাঁপা সাহেবও ছিলেন। তখনো তিনি পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক হননি। অন্যান্যদের তুলনায় কংগ্রেসের কাছাকাছি। তিনি আশা করেছিলেন লখ্‌নউ চুক্তির মতো এবার আরো একটি চুক্তি হবে। যদি গান্ধী কথাবার্তা চালাতে রাজী হন। গান্ধী একদা লখ্‌নউ চুক্তি সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে বিরূপ হয়েছিলেন। আর অমনধারা চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। ঝাঁপা চোখে অন্ধকার দেখেন। দেশে ফিরে আসেন না। বিলেতেই প্র্যাকটিস করেন। চার বছর পরে যখন ফেরেন তখন তিনি গান্ধীর কাছ থেকে কংগ্রেসের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। যদিও ব্রিটিশ সরকারের আরো কাছে নন। দুই শিবিরের মাঝামাঝি তিনি তাঁর তৃতীয় শিবির সন্নিবেশ করেন। মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করে তিনি হয়ে ওঠেন তার একমাত্র প্রতিনিধি। আর মুসলিম লীগ হয়ে উঠতে চায় মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি।

বারো

গোল টেবিল বৈঠকের কাছে বহু আশা ছিল। তা নইলে ও বৈঠক বসত না, ওতে কংগ্রেসের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হতো না, তার জন্যে গান্ধী আরউইন চুক্তির নজীর স্থাপন করতে ব্রিটিশ প্রভুরা সম্মত হতেন না।

আশাভঙ্গের জন্যে কে দায়ী কে দায়ী নয়, কে কতটুকু দায়ী, এ বিচার ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু তার ফল কী হলো তা দেখা যাক।

ফল হলো এই যে দেশীয় রাজারা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেলেন। ফেডারেশনে যোগ দিতে তাঁদের সত্যি তেমন কোনো তাগিদ ছিল না। কর্তারাই তাঁদের ধরে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারী ব্লকের মতো একটা আজ্ঞাবহ ব্লক গঠন করা যায়। সেই ছিদ্র দিয়ে কে জানে কখন দেশীয় রাজ্যে গণতন্ত্র ঢুকবে আর রাজাদের কর্তৃত্ব যাবে এই ভয়ে তাঁরা ক্রমে ক্রমে বিমুখ হলেন।

বাকী থাকে পরিকল্পিত মাইনরিটি ব্লক। কিন্তু তাকে দিয়ে কংগ্রেসকে ব্যালান্স করতে হলে এত বেশী ওয়েটেজ দিতে হয় যে মেজরিটি ও মাইনরিটি সমান হয়ে যায়। যাকে বলে প্যারিটি। তাহলে দাঁড়িপাল্লা থেকে যায় বড়লাটের হাতে। তার নাম স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস কখনো তাতে রাজী হতে পারে না।

তা ছাড়া ও জিনিস মাইনরিটিদের শিবিরে হরিজনদের না ঢোকালে সম্ভব নয়। সেটা করতে গেলে হিন্দুসমাজের বল কমে যায়, অস্পৃশ্যতাও আইনসিদ্ধ হয়। গান্ধীজী তার প্রতিরোধ করতে দৃঢ়সংকল্প। অথচ সেটা যদি না করা হয় তবে মাইনরিটি ব্লক কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে পারে না।

কংগ্রেসকে তাহলে ব্যালান্স করবে কে? কেউ যদি না করে তবে ফেডারেশনের হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেসরাজ। ফেডারেশনের আইডিয়াটা এসেছিল মুসলমানদের মহল থেকে। তাঁরা চেয়েছিলেন যে হিন্দুপ্রধান ভারতে হিন্দু মেজরিটি রাজত্ব করতে পারবে না, যদি মেজরিটি আর মাইনরিটির সমান ওজন হয়। কিন্তু মহাত্মার অনশনের পরে দেখা গেল হরিজন বিনা তাঁরা ওজনে হালকা। হরিজন সমেত কংগ্রেস ওজনে ভারী।

তাই যে-মুসলমানদের মহল একদিন ফেডারেশন দাবী করেছিলেন তাঁরাই আরেকদিন ফেডারেশন প্রত্যাহার করে পার্টিশনের প্রস্তাব তুললেন। অখণ্ড ভারত আর নয়। এখন চাই মোসলেম ভারত। যার অন্য নাম পাকিস্তান।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তান কথাটির উৎপত্তি ওই গোল টেবিল বৈঠকের পরেই। বৈঠকের বাইরে রহমৎ আলী বলে একজন ছাত্র মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির নামের আদ্য অক্ষর মিলিয়ে ওই পেটেন্ট শব্দটি উদ্ভাবন করেন। সে সময় মুসলিম জননায়করা কেউ ওতে গুরুত্ব আরোপ করেননি। সবাই তাঁরা ছিলেন অখণ্ড ও অবিভাজ্য ভারতে বিশ্বাসী। তাঁদের অবিশ্বাস শুধু ব্রিটিশরাজের উত্তরাধিকারীরূপে কংগ্রেসরাজের উপর। কারণ কংগ্রেসরাজ কার্যত হিন্দুরাজই হবে। তাঁদের ভরসা ছিল যে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির সূত্রে এমন এক মীমাংসায় পৌঁছনো যাবে যেটা মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য, অথচ কংগ্রেসের বর্জনযোগ্য নয়। গান্ধী যদি তাতে রাজী হয়ে যান ব্রিটিশকে রাজী করানোর দায় অন্যেরা নেবেন। তাঁরাও তো চান ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি। তবে তার আগে চান সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত।

ওইখানেই কাঁটা। সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত আর রাজনৈতিক অগ্রগতি দুটোর মধ্যে কোন্‌টা এক নম্বর ও কোন্‌টা দু'নম্বর এই প্রশ্নের উত্তরে গভীর

মতভেদ। কংগ্রেসের কাছে, গান্ধীজীর কাছে স্বরাজ হচ্ছে এক নম্বর ও সাম্প্রদায়িক মীমাংসা দু'নম্বর। মুসলিম নেতাদের কাছে ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হচ্ছে এক নম্বর, স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে দু'নম্বর। এ মতভেদ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতির একটা ফান্ডামেন্টাল রিয়ালিটি। মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটা আরো প্রকট হয়। মতভেদের উপসাগরের উপর সেতুবন্ধ করেছিলেন জীণা। তাঁর পেছনে ছিলেন টিলক। কিন্তু তাঁদের সেই লখ্‌নউ চুক্তির পরে দেখা গেল উপসাগর আরো প্রশস্ত হয়েছে, সুতরাং আরো প্রশস্ত সেতু চাই। এবার কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধী সেদিক দিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না, কারণ পরে সেই উপসাগর আরো বেশী প্রশস্ত হবে, আরও বেশী প্রশস্ত সেতুর দরকার হবে। অমন করে যে সমাধান হয় সেটা চূড়ান্ত নয়। আর তাতে করে সাম্রাজ্যের অন্ত হয় কোথায়? লড়তে তো হবেই বার বার। লড়াইয়ের সময় মুসলিম লীগ কোথায়?

লড়ুয়ে মুসলমানদের নিয়েই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যেকাজ আর কেউ কোনোদিন পারেনি। খেলাফতীদের সর্দার হবার পরেই তিনি কংগ্রেসীদেরও সর্দার হন। খেলাফতীরা এর মধ্যে পিছিয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও লড়ুয়ে মুসলমান বড়ো কম নেই গান্ধীজীর শিবিরে। গান্ধীজীর মন পড়ে রয়েছিল স্বদেশের অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত সংগ্রামে। হিন্দুমুসলমানের সংগ্রামী একতায়। গোল টেবিল বৈঠকের উপর তাঁর আস্থা থাকলে তিনি বড়ো বড়ো কংগ্রেস নেতাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। তা বলে মানব-প্রকৃতিতে তাঁর অবিশ্বাস ছিল না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সবাই মিলে একবার দেখতে হবে গোল টেবিলে সম্মানজনক মিটমাট হয় কি না। অহিংসাবাদী কখনো সম্মানজনক মিটমাটের সুযোগ ছাড়েন না। সুযোগ পেলে গ্রহণ করেন, প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ব্যর্থতাও সিদ্ধির সোপান।

তারপর অহিংসাবাদী সুযোগ পেলেই তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তনে প্রয়াসী হন। গোল টেবিল বৈঠক তাঁকে অভূতপূর্ব সুযোগ দেয়। বৈঠকের সভাপতি লর্ড সাঙ্কি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"How Mr. Gandhi managed to stand the physical and mental strain of that Conference has always been a marves to me. Without fail he was there at the beginning and he remained till the end of the day's work. A note made at the time tells me that on some days as many as 80,000 words were spoken. But Mr. Gandhi's real task only began when the Conference adjourned. Hour after hour till late in the night, and early in the morning, he was engaged in conversations and interviews with the different interests, doing his best to get them into line

and to bring them to his own way of thinking. Prime Ministers and Dictators have means and opportunities of imposing their views on their peoples, but it is doubtful whether there has ever been any man, other than Mr. Gandhi, who has in his lifetime won so many millions of men over to his side by his own efforts and example."

সাধারণতঃ তিনি দিনে একুশ ঘণ্টা খাটতেন। তাঁর মতে গোল টেবিল বৈঠকের বাইরেই আদত গোল টেবিল বৈঠক। তাঁর কাজ কেবল জনাকয়েক রাজনীতিককে নিয়ে নয়, সর্ব স্তরের ইংরেজকে নিয়ে। ইংরেজ জাতিকে নিয়ে। সেইজন্যে তাঁর আস্তানা ওয়েস্ট এণ্ডের সম্ভ্রান্ত হোটেলে নয়, ইস্ট এণ্ডের গরিবপাড়ায় অবস্থিত কিংসলী হল নামক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে। যাকে বলা হয় সেটলমেণ্ট। কতকটা আশ্রম, কতকটা ক্লাব। যুদ্ধে নিহত কিংসলী লেস্টারের বোন মুরিয়েল তার পরিচালিকা। আমার বন্ধুর বন্ধু। এর বছর দুই আগে আমিও সেখানে গেছি। উপর তলায় কয়েকটি সেল দেখেছিলুম, যেমন মঠবাড়িতে থাকে। সাধক কর্মীদের জন্যে। তারই একটিতে গান্ধীজী তিনমাস থাকেন। মীরা বেনকে নির্দেশ দেন তাঁর খোরাকের জন্যে দিনে দেড় শিলিং বা এক টাকার বেশী যেন খরচ না হয়। বিলেতে গিয়েও তিনি তাঁর বেশভূষা বদলান না। সেই অর্ধ উলঙ্গ ফকির।

কাজকর্মের সুবিধের জন্যে তিনি নাইটসব্রিজ অঞ্চলে রাখেন ছোট একটি আপিস। অসংখ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বা তিনি তাঁদের সঙ্গে। বার্নার্ড শ তাঁদের একজন। শ বলেন গান্ধী হচ্ছেন 'মহাত্মা মেজর' আর তিনি 'মহাত্মা মাইনর'। শ আরো বলেন, "আপনি ও আমি পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোক।"

চার্চিল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, চার্চিলেরই এক সম্পর্কিতা ভগিনী ক্লেয়ার শেরিডান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সরোজিনী নাইডুর সহায়তায় মহাত্মার মূর্তি মডেল করার অনুমতি পান। গান্ধীজী সহজে রাজী হননি। উনি পোজ করবেন না।

মিসেস শেরিডান লেনিনেরও মূর্তি মডেল করেছিলেন। এগারো বছর আগে। তখন লেনিনও একই রকম শর্ত করেছিলেন। দু'জনের মধ্যে কৌতূহলপ্রদ সাদৃশ্য ছিল।

The first time I found myself in his presence, the Mahatma said (just as Lenin had said), "I cannot pose, you must let me go on with my work, and do the best you can."

Gandhi squatting upon the floor proceeded with his weaving. Lenin in his office chair went on reading.

I sensed—on both occasions—a silent resentment, but in each case it ended on terms of great mutual friendship. One day

Gandhi in almost the same words and with the same ironical smile as Lenin, observed :

"So you are a cousin of Mr. Winston Churchill !"

It was the same old joke : Winston's relation fraternising (yes ?) with his arch enemy ! And Gandhi pursued :

"You know he refuses to see me ? But you will tell him, won't you, from me how glad I am to see you."

Lenin in much the same way : "You will tell your cousin··· etc."

And when their respective heads were finished and I asked one and the other the question : "What do you think of it ?" They answered identically, "I don't know—I cannot judge my own face, and I know nothing about Art—but you have worked well !"

লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর এই সাদৃশ্যের বর্ণনায় মনে পড়ে লেনিনের মৃত্যুর কিছুদিন বাদে "লেনিন ও গান্ধী" বলে একখানি নামকরা বই বেরোয়। লেখক একজন অস্ট্রিয়ান। রেনে ফ্যুএলপ-মিলার। এ যুগে এক-বন্ধনীভুক্ত করবার মতো নাম ওই দুটিই। যদিও মতবাদ ভিন্ন।

কিংসলী হলে আমোদ আহ্লাদের সময়েও গান্ধীজীকে ডাক পড়ত। প্রায়ই লোকনৃত্যস্থলে উপস্থিত থাকতেন। "মিঃ গান্ধী, আপনি কি আমাদের সঙ্গে নাচবেন না ?" শ্রমিক নরনারীর এই অনুরোধে গান্ধীজী বলতেন, "নিশ্চয়। আমার হাতের ছড়ি হবে আমার সঙ্গিনী।"

এটা হলো ওদের নির্দোষ বিনোদন। ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে এতে যোগ দিতে হয়। এ নিয়ে গান্ধীজীর এক পিউরিটান অনুবর্তী প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "যাদের সঙ্গে আমরা মিশতে চাই তাদের জীবনের ধারা বুঝতে হবে, তার সমঝদার হতে হবে। ভুলে যেয়ো না লোকনৃত্য হচ্ছে ইংরেজ জাতির একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রথা।"

সময় করে তিনি দিন-দুই কাটিয়ে আসেন ল্যাঙ্কাশায়ারের দিন মজদুরদের সঙ্গে। যারা তাঁরই বয়কট আন্দোলনের দরুন বেকার। তাদের সমবেদনা জানিয়ে তিনি বোঝান যে বেকার হলেও তারা বুভুক্ষু নয়, যেমন ভারতের কর্মহীন ও অর্ধকর্মহীন নরনারী। তারা কি ভারতের কাটুনি ও তাঁতীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেরা সমৃদ্ধ হবে ? তারা বোঝে ও তাঁর সঙ্গে একমত হয়। তাঁর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ফোটো তোলায়। চীয়ার দেয়। বেশীর ভাগই মজুরনী। তাদের মাঝখানে পড়ে গান্ধী যেমন সহাস তেমনি লজ্জাকুল।

একদিকে যেমন ইংলণ্ডের দীনদুঃখীদের সঙ্গে মেশা অন্যদিকে তেমনি ধার্মিক, বুদ্ধিজীবী জ্ঞানী-গুণী তথা রাজনীতিকদের সঙ্গে। 'কোথাও আমার

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। এমন কি রাজা পঞ্চম জর্জের বাকিংহাম প্রাসাদেও। সেখানেও সেই ফকিরের বেশ। রাজা বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাকে আমি দেখেছি। তখন ও তার পরেও ১৯১৮ সাল অবধি আপনি তো একজন ভালো মানুষ ছিলেন। পরে আপনার মধ্যে কিছু একটা বিগড়ে যায় বলে মনে হয়।" গান্ধী তাঁর সঙ্গে তর্ক করেন না। নীরব থাকেন। পরে যখন রাজা আরো বলেন যে বিদ্রোহ বরদাস্ত করা হবে না, দমন করা হবে, রাজসরকারকে চালু রাখতে হবে, তখন গান্ধীজী ভদ্রভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রতিবাদ করেন।

ধার্মিকরা তাঁকে তাঁদেরই মতো একজন খ্রীষ্টান বলে আপনার করে নেন। মড রয়ডেনের মতে শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান। যীশু খ্রীষ্টের তিনি যত কাছাকাছি আর কেউ তত নন। আরনেস্ট বারকারের মনে হলো যে গান্ধী হচ্ছেন এ যুগের সেণ্ট ফ্রান্সিস তথা সেণ্ট টমাস আকুইনাস। তাঁর মধ্যে যেমন এ দুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি একজন প্র্যাকটিকাল কাজের লোকের। মিশ্রণটাই সারকথা। অবিমিশ্র হলে ফল হতো না।

অক্সফোর্ডের পরম সম্মানিত অধ্যাপকগণ—তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেলিয়লের অধ্যক্ষ, গিলবার্ট মারে, মাইকেল স্যাণ্ডলার, পি সি লায়ন—তাঁকে তিন ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন—

"The conviction came to me, that not since Socrates has the world seen his equal for absolute self-control and composure; and once or twice, putting myself in the place of men who had to confront that invincible calm and imperturbility, I thought I understood why the Athenians made the 'martyr-sophist' drink the hemlock."

ঘরে ফেরার পথে গান্ধীজী সুইটজারল্যাণ্ডের ভিলনভ গ্রামে রম্যা রলাঁর সঙ্গে মিলিত হন। রলাঁ তাঁকে স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করেন, যদিও স্বয়ং অসুস্থ। আট বছর আগে রলাঁই 'মহাত্মা গান্ধী' লিখে তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিয়েছিলেন। মীরাবেনকেও গান্ধীসকাশে পাঠিয়েছিলেন তিনিই। পরের দিন রলাঁ বলেন, "আমার তো ভয় ছিল যে এ জীবনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। তার পূর্বেই চলে যেতে হবে।"

শোবার ঘরেই কথাবার্তা হয়। দেয়ালে দৃশ্যমান এই ক'জনের মস্তকের আলেখ্য—গ্যেটে, বেঠোফেন, টলস্টয়, গর্কি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, লেনিন ও গান্ধী। সেই গান্ধীই আজ উপস্থিত। কিন্তু সে লেনিন আর নেই। রলাঁর মহা খেদ লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর কোনো দিন সাক্ষাৎ হলো না। "যে লেনিন আপনার মতোই কোনদিন মিথ্যের সঙ্গে আপস করেননি।" অর্থাৎ সত্যের থেকে নড়েননি।

ফরাসীবিপ্লবের মানসপুত্র রলাঁ একদা টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন। যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে'। যুদ্ধের সময় থেকে সুইটজারলণ্ডেই

রয়েছেন। চার বছর আগেও আমি তাঁকে যুদ্ধবিরোধী দেখেছি। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে তিনি ধীরে ধীরে শান্তিবাদ অতিক্রম করে যেখানে উপনীত হন সেটা যদিও লেনিনবাদ নয় তবু লেনিনের দেশের বিপ্লবকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখার বজ্রকঠোর সংকল্প। তার মানে দরকার হলে যুদ্ধ।

হিংসা অহিংসা আর তাঁর কাছে মুখ্য ইস্যু নয়, যেমন ছিল 'মহাত্মা গান্ধী' রচনার কালে। এখনকার মুখ্য ইস্যু হচ্ছে বিপ্লব প্রতিবিপ্লব। গান্ধীর থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন। কিন্তু যে গান্ধী সত্যনিষ্ঠ সে গান্ধীর কাছ থেকে নয়। সত্যই উভয়ের যোগসূত্র। সত্য নিয়ে দু'জনের আলোচনা হয়। ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা নিয়ে রলাঁ যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না অবস্থার সঙ্গে খাপ খাবে কোন ব্যবস্থা।

"হিংসার উত্তর না দিয়ে সহ্য করার বীরত্ব যদি কোনো লোকের থাকে তবে সেইটেই হবে সব চেয়ে কার্যকর শিক্ষা। কিন্তু তার জন্যে চাই অখণ্ড বিশ্বাস।" ইতি গান্ধী।

"কোনোকিছুই আধাআধিভাবে করা উচিত নয়, তা সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।" ইতি রলাঁ।

গান্ধীর অনুরোধে রলাঁ তাঁকে বেঠোফেনের পঞ্চম সিম্ফনি পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনান। এমনি করে পাঁচদিন অতিবাহিত হলে রলাঁ তাঁকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বিদায় দেন। দু'জনে দু'জনের কাঁধে গাল রেখে মাথায় গাল ঠেকিয়ে সাদরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন। "ওটা হচ্ছে সেণ্ট ডমিনিক ও সেণ্ট ফ্রান্সিসের চুম্বন।" উপমাটা রলাঁর।

তেরো

যীশুর সব চেয়ে কাছাকাছি বলেই বোধহয় ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ গান্ধীজীর দর্শন দেন না। তবে তাঁর খাতিরে ভাটিকানের গ্যালারিগুলো খুলে দেওয়া হয়। অপূর্ব শিল্পসম্পদের মাঝখানে তিনি হারিয়ে যান।

রম্যা রলাঁ সতর্ক করে দিয়েছিলেন বলে তিনি রোমে ফাসিস্টদের অতিথি হন না। কিন্তু মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর মুখের উপর বলে আসেন যে, তিনি শুধু একটা তাসের কেল্লা গড়ছেন।

ব্রিন্দিসি থেকে জাহাজের ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাত্রা করেন গান্ধীজী। পেছনে পড়ে থাকে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের, তিনমাস। সেই তিন-মাসে যা তিনি করেছেন তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভারতের কাজ ও অহিংসার কাজ। ভারতের কাজে যেমন বিশ্রাম নেই, তেমনি অহিংসার কাজেও। পশ্চিমকে তিনি অহিংসার বাণী শোনাবেন।

হায়! তখনকার দিনের ইউরোপে কেই বা অহিংসার বাণীতে কান দেবে!

যখন ভারতেই চলেছে হিন্দু মুসলমানের অন্তহীন হানাহানি। আর থেকে থেকে সন্ত্রাসবাদী হামলা। আর ইউরোপের সঙ্কট তখন এমন গভীরভাবে ঘনিয়ে আসছে যে হিংসাকেই মনে হচ্ছে একমাত্র পন্থা। তা সে যতই বর্বর হোক। যতই অমানুষিক হোক।

ইউরোপকে তার স্বকীয় আধ্যাত্মিকতার উপর ছেড়ে দিয়ে গান্ধী ফিরে আসেন ভারতে। যেখানে সারা দেশ অধীরভাবে অপেক্ষা করছে নেতার জন্যে। নেতাবিহীন জনতা ঠিক যুদ্ধবিরতির নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেনি, এখানে ওখানে শান্তিভঙ্গ করেছে। আর সরকারপক্ষও যে মান্য করেছে তা নয়। চুক্তিতে সরকারের প্রেস্টিজ হানি হয়েছে, তাই কড়া হাতে সমবিয়ে দিতে হয়েছে যে সরকারই বলবান। সন্ত্রাসবাদীরাও যথেষ্ট কারণ দিয়েছে দমননীতি অনুসরণের। গোটা-তিনেক অর্ডিনান্স জারি করতে হয়েছে তিনটি প্রদেশে।

দু'পক্ষেই যুদ্ধং দেহি। সুতরাং যুদ্ধ বেধে যেতে সাতটা দিনও লাগে না। গান্ধীজীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয় পুণার য়েরওয়াদা জেলে। কংগ্রেস নেতারাও বন্দী হন। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হয়। আরো দশটা অর্ডিনান্স জারি করা হয়। খুব সম্ভব সেগুলি তিনমাস ধরে সরকারী কারখানায় তৈরি হচ্ছিল। যেমন তৈরি হচ্ছিল কংগ্রেসের আইন অমান্য পরিকল্পনা। যুদ্ধে নেমে নালিশ করা চলে না যে এটা অন্যায়, ওটা আইন-বিরুদ্ধ।

আমরা সেদিন লক্ষ করি যে কোনো পক্ষই আইনকে কানাকড়ি দাম দিচ্ছে না। কংগ্রেস তো সোজাসুজি আইনভঙ্গের প্রোগ্রামই নিয়েছে, হিংসা এড়ানো ভিন্ন তার আর কোনো দায় নেই। আইনের শাসন বলে ব্রিটিশ শাসকদের যে গর্ব ছিল সেটাও আর আইনের নয়, অর্ডিনান্সের শাসন। জেল, জরিমানা তো তুচ্ছ কথা, বেত্রদণ্ডও বিহিত করা হলো। ঘরবাড়ি, জমিজমা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, মোটরগাড়ি যেটা খুশি কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করলেই হলো! সব চেয়ে আজব কাণ্ড নাবালকদের অপরাধের জন্যে তাদের গুরুজনের শাস্তি।

চার্চিল পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন যে সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে এমনতর কঠোর দণ্ডবিধির প্রয়োজন হয়নি। আর সার স্যামুয়েল হোর তো সাফ কথা শুনিয়ে দিলেন যে, এবার যেটা হবে সেটা অসীমাংসিত যুদ্ধ নয়।

তবে গান্ধীজী যে বলেছিলেন এবার শুধু লাঠি চার্জ নয়, বুলেটের সম্মুখীন হতে হবে, সেরকম কিছু ঘটল না। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সরকারকেও সব ক'টা অর্ডিনান্স সর্বতোভাবে প্রয়োগ করতে হয়নি। কংগ্রেসের আন্দোলনও তেমন গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছয়নি।

"ব্যাপার কী, বলুন তো?" আমার এক ইউরোপীয় সহকর্মী বিস্মিত হয়ে শুধান। "এবারকার আন্দোলনটা হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা মেরে গেল কেন? আমরা তো ভেবেছিলুম অনেকদিন ধরে গড়াবে। কংগ্রেসের দম যে এত কম তা কে জানত!"

ওঁদের আফশোসটা আন্তরিক। আন্দোলনটা জোর চলেছে দেখলেই ওঁরা

যুদ্ধের স্বাদ পেতেন। সে স্বাদ ওঁদের জোগায় সন্ত্রাসবাদী দল। কিছুতেই তারা নিরস্ত হয় না।

ভারতের রাজধানীতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হলো হিংসার সঙ্গে হিংসার দ্বন্দ্ব বাধতে না দেওয়া। তার পরিবর্তে হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব বাধানো।

সাধারণ যুদ্ধ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে হিংসার দ্বন্দ্ব। আর সত্যাগ্রহ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব। ইতিহাসে এটা নতুন। যুদ্ধ যেখানে হাজার হাজার বছরের সত্যাগ্রহ সেখানে মাত্র পঁচিশ বছরের। যুদ্ধের নিয়মকানুন সকলের জানা। কিন্তু সত্যাগ্রহের নিয়মকানুন সত্যাগ্রহীদেরই অজানা।

সুতরাং কোনো পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। খেলার নিয়ম না জেনে খেলতে গেলে ভুলচুক যেমন হয়, বাড়াবাড়িও তেমনি হয়। আন্দোলনটাকে অমন কঠোর হস্তে দমন না করলেও চলত। কারণ ওর পরমায়ু সত্যি বেশীদিন ছিল না। যে কারণেই হোক মুসলমানরা দু'-তিনটি প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র সরে দাঁড়িয়েছিল। যোগ দিতে যাদের দেখা গেল তারা অন্ততঃ বাংলাদেশে মুষ্টিমেয়। গণ আন্দোলন, অথচ গণই নেই, কারণ অধিকাংশ জেলায় গণ বলতে বোঝায় মুসলমানগণ।

একজন হিন্দু আর একজন মুসলমানকে আমি একসঙ্গে জেলে আটক করতে পাঠিয়েছিলুম। অকারণে নয় অবশ্য। ইংরেজ জেলা শাসক মুসলমান-টিকে পত্রপাঠ ছেড়ে দেন ও বলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই।"

ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। তবে কিছুদিন বাদে হিন্দুটিকেও সতর্ক করে দিয়ে ছেড়ে দেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছিল। কত সহজে আয়ত্তে এল যখন ভাবি তখন আমারও আফশোস হয় যে কেন অত কড়াকড়ি করা।

তেরোটা অর্ডিনান্স যা পারেনি একা ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ তা পারল। দিল অতি সুস্পষ্ট আভাস যে বাংলাদেশের বরাতে আছে ইউরোপীয় সমর্থিত মুসলিম মেজরিটি গবর্নমেণ্ট। তা তুমি যতই লাফাও আর যতই চ্যাঁচাও আর যতই সাহেব নিপাত কর।

মিয়া ভাইরা যে ক'জন যোগ দিয়েছিলেন সে ক'জনও সরে গেলেন। কোথায় গান্ধীজীর সাধের স্বপ্ন যে তাঁর গণসত্যাগ্রহে সব সম্প্রদায়ের লোক সমানে ঝাঁপ দেবে! আর কোথায় অপ্রীতিকর বাস্তব! আন্দোলনটাকে নিমুসলমান করাই ছিল কর্তাদের উদ্দেশ্য। আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল তার বিপরীত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যর্থ। ইংরেজের কূটনীতি বাংলাকে তুলে দেয় ইউরোপীয় সমর্থিত মুসলিম মেজরটির হাতে।

ওটা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দুরস্ত করতে না পেরে হিন্দুদের—বিশেষ করে বর্ণহিন্দুদের—শায়েস্তা করার উপায়। কেমন! আর লাগবে আমাদের সঙ্গে! হুঁ! আমাদের এতকালের গদী তোমাদের ছেড়ে দিয়ে যাব!

এখানে বলে রাখা দরকার যে ১৯১৬ সালে লখ্‌নউ চুক্তি যখন সম্পাদিত হয় তখনো বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু চুক্তি অনুসারে বাংলার মুসলমানদের খরচে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদির মুসলমানদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। আর ওইসব প্রদেশের হিন্দুদের খরচে বাংলার হিন্দুদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। ম্যাকডোনালড যদি লখ্‌নউ চুক্তিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নতুন করে ভাবতেন তাহলে একরকম হতো। কিন্তু লখ্‌নউ চুক্তিকে মোটামুটি বহাল রেখেই তিনি তার ব্যালান্স নষ্ট করলেন। ব্যালান্স গেল মুসলমানদের অনুকূলে। যেখানে তারা মাইনরিটি সেখানে তাদের জন্যে ওয়েটেজ। যেখানে তারা মেজরিটি সেখানে হিন্দুদের জন্যে ওয়েটেজ নয়। তবে পাঞ্জাবে শিখদের ওয়েটেজ অব্যাহত। সেখানে মুসলমান অমুসলমান সমান সমান।

রোয়েদাদের এইদিকটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু মরণপণ অনশন করা অনুচিত। অনিষ্ট যেটা সেটা লখ্‌নউ চুক্তিই করে রেখেছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকার করে। শুধু স্বীকার করে নয়, তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে। মর্লি মিণ্টো যা করতে সাহস পাননি তখনকার দিনের কংগ্রেস জননেতারাই তা করেছিলেন। এখন তথাকথিত অস্পৃশ্যরাও যদি দাবী করে যে তাদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হোক ম্যাকডোনালড কোন যুক্তিবলে প্রত্যাখ্যান করবেন? তিনি মর্লি মিণ্টোর অনুসরণে কতক জায়গায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ও কতক জায়গায় যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতে ওটা হিন্দুসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। মাত্র গোটাকয়েক আসন স্বতন্ত্র। আর সব তো একত্র।

মর্লি মিণ্টোর সময়ও তো ছিল মাত্র কয়েকটি আসন মুসলমানদের বেলা স্বতন্ত্র। আর সব একত্র। আরম্ভটা একই রকম। পরিণতিটাও তো একই রকম হবে। ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়। একবার ওটা উপলব্ধি করার পর কেমন করে ওর প্রশ্রয় দেওয়া যায়? হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি যথেষ্ট অশান্তিকর। বর্ণহিন্দু অবর্ণহিন্দু ভেদবুদ্ধি কি আরো অশান্তিকর হবে না? এতে শুধু রাষ্ট্র নয়, সমাজও দুর্বল হবে। সমাজসংস্কার বাধা পাবে। অস্পৃশ্যতা কতক লোকের পক্ষে লাভজনক হয়ে কায়েমী স্বত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

রাজনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক কারণে গান্ধীজী স্থির করেন তিনি আমরণ অনশন করবেন। এটা যে রোয়েদাদের পর তাঁর মাথায় আসে তা নয়। গোল টেবিল বৈঠকেই তিনি এর আভাস দিয়েছিলেন, পরে ভারতসচিবকে জেল থেকে চিঠি লিখে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুভূতির গভীরতা কেউ পরিমাপ করেননি। সত্যি কি তিনি অমন তুচ্ছ কারণে আমরণ অনশন করবেন?

দেশবাসীদের অনেকের মতেও ওটা তেমন কিছু গুরুতর নয়, যেমন গুরুতর রোয়েদাদের অন্যান্য অংশ। মহাত্মার আমরণ অনশনের জন্যে বিশেষ কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। খবরটা তাই বোমার মতো ফেটে পড়ে। দেশময়

উদ্বেগের স্রোত বয়ে যায়। ম্যাকডোনালড জানিয়ে দেন যে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মধ্যে একমত না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য হয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে হয়েছে; সিদ্ধান্তের রদবদল একতরফা হবে না, হবে যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি একমত হয়।

অর্থাৎ নিজেরাই স্থির করে নিজেদের গ্রহণযোগ্য একটা বিকল্প। ম্যাকডোনালড সেটা মেনে নেবেন। যেমন লখ্‌নউ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন মণ্টেগু চেমসফোর্ড।

অনশনরত মহাত্মাকে ঘিরে দরবার বসে যায়। সরকার অনুমতি দেন। এবার কেন্দ্রীয় পুরুষ হচ্ছেন আম্বেদকর। মহাত্মার জীবনমরণ তাঁরই হাতের মুঠোয়। তিনি যদি পাষাণ হন তো মহাত্মার প্রাণের আশা নেই। তাই আম্বেদকরের হৃদয়ের উপর চাপ পড়ে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক তা বলে অভিভূত হয় না। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ছেড়ে দেন বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে আদায় করে নেন অনেক বেশী আসন। সেসব আসনের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমন এক পদ্ধতিতে যে হরিজন প্রার্থীদের হরিজনরাই প্রথমে ভোট দিয়ে মনোনয়ন করবে, তারপরে হিন্দুরা সমবেতভাবে ভোট দেবে। পুণা চুক্তি হিন্দুরা সবাই মেনে নিলে ব্রিটিশ সরকারও সেই অনুসারে রোয়েদাদের সংশোধন করবেন।

লখ্‌নউ চুক্তির সঙ্গে পুণা চুক্তির পার্থক্য এইখানে যে একটাতে যেমন স্বতন্ত্র নির্বাচনের নীতিটাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই ভিত্তির উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অপরটাতে তেমনি সেই নীতিটাকে অস্বীকার করে আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে বর্ণহিন্দু ও অবর্ণহিন্দুদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। হায়! এ বুদ্ধি কেন ১৯১৬ সালে কারো মাথায় আসেনি! কেউ কেন হৃদয়ঙ্গম করেননি যে স্বতন্ত্র নির্বাচন মেনে নেওয়া মুসলমানকে অমুসলমানের থেকে ও অমুসলমানকে মুসলমানের থেকে স্বতন্ত্র করে উভয়কে সাধারণের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা? আর সাধারণকেও প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা?

ম্যাকডোনালড আমাদের একটি গ্লানির থেকে মুক্ত করলেন। আমাদের আর অমুসলমান বলে পরিচয় দিতে হলো না। তার বদলে 'সাধারণ' শব্দটি চলিত হলো। বলা বাহুল্য মুসলমান বাদে ও শিখ বাদে সাধারণ। মাইনরিটির সংখ্যা ওই দুটিতে সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় মাইনরিটির কথা বলছি।

গান্ধীজী এখন থেকে তথাকথিত অবর্ণহিন্দুদের নিয়ে ব্যাপৃত রইলেন। তাদের নতুন নামকরণ হলো সরকারী মতে তফশিলী জাত, আর গান্ধীজীর মতে হরিজন। নামটা কিন্তু তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। এক অস্পৃশ্য পত্রলেখকের কাছে ওটি তিনি পান। গুজরাটের প্রথম কবি সন্ত নাকি ওটি প্রথমে ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে।

'হরিজন' বলে যে পত্রিকার উদ্বোধন হয় তার জন্যে আম্বেদকরকে একটি বাণী পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। তার উত্তরে তিনি বাণী দেন না, দেন তাঁর

অভিমত। তিনি বলেন,

"The outcaste is a by-product of the caste system. There will be outcastes as long as there castes. And nothing can emancipate the outcaste except the destruction of the caste system."

গান্ধীজী তখনো জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু অস্পৃশ্যতায় না। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর বিশ্বাস বদলায়। তিনিও তখন জাতিহীন সমাজের পক্ষপাতী হন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট। সেটি অস্পৃশ্য বলে কাউকে কোনো সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। মন্দির-প্রবেশেও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ থাকবে না।

এই যেমন লক্ষ্য তেমনি পদ্ধতি হলো বর্ণহিন্দুদের স্বতঃপ্রণোদিত অন্তঃপরিবর্তন। তার জন্যে অবর্ণহিন্দুদের সত্যাগ্রহ বা অন্যপ্রকার আন্দোলন করতে হবে না। যা করবার তা বর্ণহিন্দুরাই করবে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অবশ্য দু'রকম মত ছিল। সংস্কারকামী ও সংস্কারবিরোধী। যাতে দ্বন্দ্ব না বাধে তারই উপর ছিল গান্ধীজীর দৃষ্টি।

হরিজন আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজীকে আরো একবার অনশন করতে হয়। এটা সরকারের ব্যবহারে উত্তাক্ত হয়ে নয়, সংস্কারবিরোধীদের আচরণে মর্মাহত হয়ে। অনশনের কারণ জানতে পেরে সরকার তাঁকে বিনা শর্তে খালাস দেন। তিনি তখন জেলের বাইরে গিয়ে তাঁর অনশন সমাপন করেন। একুশদিনের অনশন।

এরপরে তিনিও ভদ্রতা করে গণসত্যাগ্রহ একমাসের জন্যে বন্ধ রাখেন। উদ্দেশ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। কথাবার্তা সফল হলে তিনি গণসত্যাগ্রহ একেবারেই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য কংগ্রেস নেতারা রাজী হলে। কিন্তু আলাপ আলোচনার প্রস্তাব শুনে সরকারপক্ষ জানিয়ে দেন যে সর্বপ্রথমে গণসত্যাগ্রহ বিনা শর্তে প্রত্যাহার করতে হবে। তার মানে পরাজিতের মতো অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। বিজিত দেশের সেনাপতি বিজেতা দেশের সেনাপতির কাছে যেমন তরবারী সমর্পণ করেন।

না, তেমন কিছু করবেন না গান্ধীজী। হিংসার তরবারি বহুপূর্বেই বিজেতা ইংরেজের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। তার উপর যদি অহিংসার অস্ত্রটিও সমর্পণ করা হয় তবে হাতে রইল কী? তিনি তাঁর বেদনাভরা অন্তর দিয়ে অনুভব করছিলেন যে অর্ডিনান্সের প্রহারে দেশবাসী জর্জর। শান্তির বোঝা বইতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। মনের জোর ভেঙে যাচ্ছে। চাই এখন সম্মানজনক সন্ধি। তা বলে অস্ত্র সমর্পণ? না; কদাচ নয়।

জেলের বাইরে সেসময় যেসব সহকর্মীকে পাওয়া গেল তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিশেষে এই স্থির হলো যে গণসত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হবে, ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চালিয়ে যাওয়া হবে। গান্ধীজী তখন সবরমতী যান, আশ্রম গুটিয়ে নেন, তেত্রিশজন সহচর নিয়ে যাত্রা করেন রাস অভিমুখে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবার সেই সেরওয়াদা জেলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে

দেওয়া হয় এই আদেশ দিয়ে যে পুণায় অবস্থান করতে হবে। তিনি সে আদেশ মান্য করবেন না বলায় তাঁর বিচার হয়, বিচারে একবছরের কারাদণ্ড।

এবারেও তিনি জেল থেকে হরিজন আন্দোলন চালাবার অনুমতি চান, কিন্তু পান না। কারণ এবার তিনি আটক বন্দী নন, দণ্ডিত কয়েদী। তিনি আবার অনশন করেন। তখন তাঁকে বিনা শর্তে খালাস দেওয়া হয়। এই বেড়াল ইঁদুর খেলা তাঁর ভালো লাগে না। তাঁর প্রাণ চায় হরিজনদের কাজ নিয়ে থাকতে। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ তার সঙ্গে বেখাপ। তিনি নিজের জন্যে বেছে নেন এক বছরের হরিজন সেবা। কিন্তু অপরের জন্যে ব্যক্তিসত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হয় না।

সেকালের পরিব্রাজকদের মতো তিনি পদব্রজে ভারতের অস্পৃশ্যবহুল অঞ্চলগুলি পর্যটন করেন। বুদ্ধের মতো প্রচার করেন অস্পৃশ্যদের মুক্তির বাণী। সেটাও তো স্বরাজের অঙ্গ।

চৌদ্দ

ব্যক্তিসত্যাগ্রহ অবশ্য যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় করতে পারেন, কিন্তু গণসত্যাগ্রহ হলো বিপ্লবের মতো অপৌরুষেয়। লেনিন বা গান্ধী তার নিমিত্তমাত্র। তাঁদের কান পেতে থাকতে হয় কখন জনগণের জীবনে জোয়ার আসবে। জোয়ার না এলে জনগণকে ডাক দেওয়া বৃথা। তারা সাড়া দেবে না। তেমনি জোয়ার এসে চলে গেলে, ভাঁটা পড়লে, জনগণকে ঝাঁপ দিতে বলা নিষ্ফল। তারা অসাড়।

গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহ ১৯৩০ সালে বিস্ময়কররূপে সফল হয়েছিল, কারণ সেটা ছিল জোয়ারের সময়। কিন্তু ১৯৩২ সালে অপ্রত্যাশিতরূপে বিফল হলো, কারণ ততদিনে ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে। সময় বা জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। মহাত্মার জন্যেও না। যা করবার তা সময় থাকতে করে নিতে হয়।

গান্ধী আরউইন চুক্তি একদিক থেকে একটা জয়। আরেকদিক থেকে একটা ছেদ। অবশ্য গণসত্যাগ্রহ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলেও যে পূর্ণ স্বরাজের ঘাটে পৌঁছে দিত তা নয়। ওকে দমন করবার শক্তি ভারত সরকারের ছিল। শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছিল শাঠ্য। ডিভাইড অ্যান্ড রুল। গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ না দিলেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ যথাকালে ঘোষিত হতো। জনগণ ভিন্ন হয়ে যেত।

এ সমস্যা লেনিনের দেশে ছিল না। ব্রিটিশ সরকার জানতেন যে তুরুপের তাস সব সময় তাঁদের হাতে। যাবার সময়ও হিন্দু মুসলমানের কান ধরাধরি করিয়ে দিয়ে যেতেন। তখন তাঁরাই মধ্যস্থ হয়ে যাকে যা দিয়ে যেতেন তাই তার পাওনা। তার বেশী নয়।

হরিজন পরিক্রমার সময় গান্ধীজীর কল্পনা ছিল নতুন কিছু না ঘটলে তিনি এক বছর বাদে জেলে ফিরে যাবেন। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চলতে থাকবে।

হঠাৎ ঘটে গেল বিহারের ভূমিকম্প। দক্ষিণের হরিজন সফর আধখানা ফেলে রেখে মহাত্মাকে ছুটতে হলো বিহারে। সেখানে যখন তিনি সেবাকর্মে ব্যাপৃত তখন দিল্লীতে এক বৈঠক সেরে পাটনায় উদয় হন ডাক্তার আনসারী, ডাক্তার বিধান রায় ও ভুলাভাই দেশাই। গান্ধীজীকে এঁরা বোঝান যে বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মীর মতে আরেকবার স্বরাজ পার্টি গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সামনেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন। কিন্তু পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার পূর্বে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করতে হবে। নইলে গবর্নমেণ্ট কংগ্রেসকে আইনসম্মত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন না। নির্বাচনে কংগ্রেসের জনবলের সাহায্য পাওয়া যাবে না। স্বরাজ পার্টি কী করে জিতবে? এখন মহাত্মা যদি দয়া করে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম তুলে নেন সরকার আবার কংগ্রেসকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন।

এর পরে রাঁচীতে আরো অনেক নেতা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আরো পরিষ্কার হয় যে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামের খাতিরে গণসত্যাগ্রহ তো বন্ধ করতে হবেই, ব্যক্তিসত্যাগ্রহও চলতে দেওয়া হবে না। এমন কি মহাত্মা যে কংগ্রেসের নামে বা কংগ্রেসের তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহ করার স্বাধীনতা হাতে রাখবেন তাতেও সরকারের আপত্তি হতে পারে।

গান্ধীজী শেষকালে উপলব্ধি করেন যে কংগ্রেস একই কালে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান ও আইন অমান্যকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। গান্ধীজীকে তার নামে ও তার তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা দিলে সরকারের দৃষ্টিতে তার কার্যকলাপ বেআইনী বলে প্রতিভাত হবে। তখন একজনের অপরাধে সমগ্র প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলে ঘোষিত হবে। সেটা কংগ্রেসের পক্ষে অস্তিত্বহানি। বিশেষত যদি সে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে থাকে।

আইনসভায় যাওয়া নিয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত মত অসহযোগের সময় যেমন ছিল এখনো তেমনি। কিন্তু কংগ্রেসের বহুসংখ্যক কর্মীর মত অন্যরূপ। তাঁদের সঙ্গে সেবারেও তিনি যেমন রফা করেছিলেন এবারেও তেমনি করলেন। কিন্তু এবারকার রফার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও রইলেন না। একেবারে কংগ্রেসের বাইরে চলে গেলেন।

কী দুঃখের কথা! গান্ধীহীন কংগ্রেস। শিবহীন যজ্ঞ। এ কি কখনো ভাবা যায়! কিন্তু এ না করে তাঁর উপায় ছিল না। গবর্নমেণ্ট জেদ ধরে বসেছিলেন যে কংগ্রেসকে তার অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। কোনোরকম আইন অমান্য চলবে না। না গণসত্যাগ্রহ, না ব্যক্তিসত্যাগ্রহ। আইন অমান্য চলতে থাকলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে কংগ্রেসকে পার্লামেণ্টারি কাজ করতে দেওয়া হবে না। প্রতিষ্ঠানের একটা বড়ো অংশ এখন পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামে

কৃতসংকল্প। এঁরা যদি আইনসভায় যাবার জন্যে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তবে কংগ্রেস ভেঙে যাবে। বেআইনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেঁচে থাকা না থাকা সমান।

তাহলে কি গান্ধীজীও কংগ্রেসের মতো অস্ত্রসমর্পণ করবেন? না, কিছুতেই না। তার চেয়ে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নেবেন। একজন সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেই একজন সদস্য যদি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তাঁর হাতের অহিংসার অস্ত্র সমর্পণ করেন তবে দেশের ক্ষতি, জগতেরও ক্ষতি, কারণ হিংসার উপরে অহিংসার জয় প্রমাণ করা হয় না। বরং তিনি যদি কংগ্রেস থেকে সরে থাকেন তাহলে কংগ্রেসকেও একদিন আপনার দিকে টানতে পারবেন। আর যদি নিতান্তই তা না পারেন তবে তাঁর একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা তো থাকছেই। তা ছাড়া থাকছে উপযুক্ত সময়ে গণসত্যাগ্রহের ডাক দেবার অবাধ স্বাধীনতা। কংগ্রেস ত্যাগ মানে গণসত্যাগ্রহ ত্যাগ নয়। বরং গণসত্যাগ্রহ রক্ষা।

তা ছাড়া আরো গভীর কারণ ছিল। গণসত্যাগ্রহ দিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করতে চাননি, চেয়েছিলেন বিদেশী শাসকদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে। সেই-সঙ্গে স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদেরও। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন কোনো পক্ষেরই অন্তঃপরিবর্তন হয়নি। হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব হিংসার অন্তরে ভাবান্তর আনেনি। গান্ধীজী যে-কাজের জন্যে পৃথিবীতে এসেছেন সে কাজ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেস তাঁকে যতটা সাহায্য করবার করেছে, এখন থেকে তিনি তাঁর একার উপর নির্ভর করতে চান। তিনি সরাসরি জনগণের কাছে যাবেন, কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় নয়। তাঁর বাণী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মারফৎ বিকৃতভাবে পৌঁছয়, তাই জনগণ ভুল বোঝে। একক সত্যাগ্রহী হয়েও তিনি অনেক দূর যেতে পারবেন, তাঁর বাণী অনেকের কানে পৌঁছে দিতে পারবেন। কংগ্রেসের বাইরে গেলেই বরং তাঁর আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তাঁর কর্মের স্বাধীনতাও। তাঁর যখন ইচ্ছা তখন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, কংগ্রেসের সমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি প্রতিষ্ঠানের ভারমুক্ত হতে চান। বিশেষত কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের, যে গঠনকর্মে মনোযোগী নয়, সুতরাং অহিংসা সম্বন্ধে সীরিয়াস নয়। গঠনকর্ম বিনা অহিংসা হয় না, অহিংসা বিনা সত্যাগ্রহ হয় না, সত্যাগ্রহ বিনা স্বরাজ হয় না। কংগ্রেস কি বোঝে এ যুক্তি? মানে এর যথার্থতা? গঠনকর্মই সেই নিত্য কর্ম যা সত্যাগ্রহীকে সংযুক্ত রাখে জনগণের সঙ্গে। সংযোগ ভিন্ন শক্তি নেই। শক্তিহীনের সত্যাগ্রহ কারো অন্তর স্পর্শ করে না। না বিদেশী শাসকদের। না স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের।

তার চেয়েও গভীর কারণ ছিল। বিশের দশকে কংগ্রেসে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই মোটের উপর গান্ধীপন্থী। যদিও তাঁদের একদল তাঁর অনিচ্ছা-সত্ত্বে পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থায় আগ্রহী। কিন্তু ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের ভিতরে এমন বহু কর্মীর সমাগম হয় যাঁরা গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহের চেয়ে

লেনিনের শ্রেণীসংগ্রামেই অধিকতর আস্থাবান, সেইজন্যে গান্ধীনেতৃত্বে কম আস্থাবান। এঁরা চান গণসত্যাগ্রহ যাতে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে মোড় নেয়। গান্ধী সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না। তেমন সংগ্রাম কিছুতেই অহিংসার সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। অথচ কংগ্রেসের মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এঁদেরও স্থান আছে। হয়তো এঁরাই হবেন সংখ্যায় ভারী। গান্ধীজী যদি কংগ্রেসে থাকেন তাঁকে এঁদের সঙ্গে ভোটদ্বন্দ্বে নামতে হতে পারে। এঁদের অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হওয়াও বিচিত্র নয়। এঁদের কাছে হেরে গেলে এঁদের বিরোধীপক্ষ হিসাবেও কাজ করতে হতে পারে। তার চেয়ে কংগ্রেসের থেকে নাম কাটিয়ে নেওয়া শ্রেয়। বাইরে থেকেই বরং তিনি কংগ্রেসকে আরো বেশী কাছে টানতে পারবেন।

সত্যি তাই হলো। সন্ন্যাসী কমলীকে ছাড়লেন, কিন্তু কমলী সন্ন্যাসীকে ছাড়ল না। তাঁর উপর কংগ্রেসের আস্থা বহুগুণ বেড়ে গেল। কংগ্রেসের বম্বে অধিবেশনে তিনি যখন উপনীত হন তখন আশী হাজার সভ্য ও দর্শক এক-সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বের উপর আস্থাসূচক প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়। যাঁর পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ লোকের জেল জরিমানা বেত্রদণ্ড সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো, কারো কারো প্রাণ গেল, শেষ পর্যন্ত কী এনে দিলেন তিনি? পূর্ণ স্বরাজও নয়, আংশিক স্বরাজও নয়। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ নেই কারো। সকলেই ব্যথিত যে তিনি কংগ্রেস সদস্য থাকবেন না।

আসলে গণসত্যাগ্রহ ছিল এমন এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে তাতে অংশ গ্রহণ করাটাই পরম সৌভাগ্য। যেমন স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান। সেই মহামূল্য অভিজ্ঞতা যিনি এনে দিয়েছেন তাঁর কাছে মানুষ এমনিতেই কৃতজ্ঞ। সিদ্ধি এনে দিলেন কি না সেটা অতিরিক্ত। সিদ্ধি কি কেবল একজনের উপর নির্ভর? আর ব্যর্থতার নিরিখ কী? লক্ষ লক্ষ নরনারীর এই যে আত্ম উপলব্ধি এটা কি আর কোনো উপায়ে হতো? এটা কি সার্থকতা নয়?

পরাজয়ও পরাজয় নয়, যদি সৈন্যদলের সংগঠন অটুট থাকে, যদি মনোবল অটুট থাকে, যদি সেনাপতির উপর সৈন্যদলের আস্থা অটুট থাকে, আনুগত্য অটুট থাকে। গান্ধীজীর অস্ত্র তাঁর আপনার হাতেই রয়ে গেছে, আর কারো হাতে সমর্পণ করা হয়নি। তিনি আর একদিন লড়বেন বলেই বেঁচে আছেন। তার আগে প্রাচীরগুলো ভালো করে সারাবেন। কংগ্রেসকে পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিমত হতে দেবেন না, বিভক্ত হতে দেবেন না। যখন যে কর্মপন্থা নেওয়া হবে তখন সেটা একমত হয়ে নেওয়া হবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে মানা হবে। তিনি নিজে ভিন্নমত পোষণ করলেও আপাতত পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থাকেও একটা সুযোগ দেবেন অন্যান্য নেতাদের খাতিরে।

পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থা সম্বন্ধে এই যে নরম ভাব এটার আরো একটা গূঢ় কারণ ছিল। সেটা তখন কেউ জানতেন না। পরে জানা গেল। সরকারী নিপীড়ন কংগ্রেসের সহায় হলো। নিপীড়িত জনগণ কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল। যেসব প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো

সেসব প্রদেশে কি কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে? যদি গ্রহণ করে তবে গভর্নররা কি তাঁদের অঙ্কুশ প্রয়োগে বিরত থাকবেন? এ দুটি প্রশ্ন পরস্পর-নির্ভর। গান্ধীজীই কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে বলেন। প্রায় মাস ছয়েক ধরে সরকার-পক্ষের সঙ্গে বিতর্ক চলে। ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য দলের মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়ে যায়। নতুন শাসনসংস্কার আইন অনুসারে ছ'মাসের মধ্যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা চাই, নয়তো গভর্নরের শাসন। নতুন শাসনসংস্কার আইনের প্রণেতারা সেটা পরিহার করতে ব্যস্ত। তাই একটা ফরমুলা পাওয়া গেল যাতে দু'পক্ষের মানরক্ষা হয়।

কংগ্রেস মন্ত্রীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হবে না। বাধা পেলে তাঁরা পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু গভর্নরের সঙ্গে গুরুতর মতভেদ না ঘটলে সে রকম উপলক্ষ জুটবে না। এর পরে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়। মন্ত্রীরা শুধু অফিস লাভ নয়, 'পাওয়ার' লাভ করেন। তখন যাদের উপর নিপীড়ন হয়েছিল তারা জেলে থাকলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়, তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে থাকলে বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওয়া হয়, তারা বরখাস্ত হয়ে থাকলে সে বরখাস্ত রদ হয়। এককথায় গান্ধী যাদের বিপদে ফেলেছিলেন গান্ধীই তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কংগ্রেসের জন্যে যারা রাজরোষে পড়েছিল কংগ্রেস তাদের রক্ষা করে। গান্ধী উইলিংডন চুক্তি হয়ে থাকলে যেটা চুক্তির দ্বারা হতো সেটা এইভাবে হয়। ততদিনে এসেছেন লর্ড লিনলিথগাউ। তিনি স্বচক্ষে দেখেন যে গান্ধী নত হয়েই জিতেছেন। বুদ্ধির যুদ্ধে তাঁকে হারানো শক্ত।

গান্ধী ছিলেন বিদেশী পুরাণের সেই ফিনিক্স পাখী, যে পাখী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তারপর ভস্মের ভিতর থেকে তরুণ রূপ নিয়ে উঠে আসে।

ইংরেজরা কেউ ভাবতেই পারেনি যে কংগ্রেস ছ'টি প্রদেশে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে একদলীয় মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে ও গভর্নরদের অঙ্কুশ অকর্মণ্য হবে। ভারতীয়রাও কেউ ভাবতে পারেনি যে ছ'টি মন্ত্রীমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনজন কংগ্রেসনেতার একটি ত্রয়ী—যার চলতি নাম কংগ্রেস হাই কমাণ্ড। বল্লভভাই পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ ছিলেন গান্ধীর তিনখানি হাত। গান্ধীর থেকে তাঁদের পৃথক করা যেত না। আইনসভায় গিয়েও কংগ্রেস তার সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিল। এর একমাত্র তুলনা সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। সেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল স্টালিনের বেপরোয়া মারণশক্তি। না মানলে নির্মম লিকুইডেশন। কিন্তু বিশুদ্ধ নৈতিক শক্তি দিয়ে সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইতিহাসে এই প্রথমবার লক্ষিত হলো।

এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। মন্ত্রীরা দায়ী হবেন পার্লামেণ্টের কাছে, পার্লামেণ্ট তাঁদের ইচ্ছা করলে সরাতে পারবে, এই তো নিয়ম। কিন্তু এদেশে কেউ তাঁদের

গায়ে হাত দিতে পারে না, যতক্ষণ তাঁরা তাঁদের পার্টি হাই কমাণ্ডের বিশ্বাস-ভাজন। অপরপক্ষে হাই কমাণ্ডের বিরাগভাজন হলে আর তাঁদের রক্ষা নেই। বড়লাট যেমন সর্বশক্তিমান হাই কমাণ্ডও তেমনি সর্বশক্তিমান। বড়লাটের পেছনে যেমন ব্রিটিশ বড়কর্তা হাই কমাণ্ডের পেছনে তেমনি গান্ধী।

যে কোনো মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হতে পারে, কিংবা পদচ্যুত হতে পারে, এ রকম একটা সম্ভাবনা মাথার উপর খড়্গের মতো ঝুলছিল। তাই গান্ধী ও হাই কমাণ্ড, ওয়ার্কিং কমিটি তথা পার্লামেণ্টারি নেতারা মিলে এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা একপ্রকার আপৎকালীন ব্যবস্থা। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলি এক একটি দুর্গ। অন্য পার্টির লোককে সেখানে নিলে যৌথ দায়িত্ব পালন করা শক্ত। তবে কোয়ালিশন একেবারে অনভিপ্রেত নয়, যদি কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য থাকে। তাহলে আবার স্বকীয় দলের প্রতি আনুগত্য থাকে না।

যে প্রদেশে একাধিক সম্প্রদায় বাস করছে সে প্রদেশে মাইনরিটিও ক্ষমতার স্বাদ চাইবে। এটাই তো স্বাভাবিক। সেইজন্যে নতুন শাসনসংস্কার আইনে এমন কথাও ছিল যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সময় গভর্নর মাইনরিটি থেকেও মন্ত্রী নেবেন। কিন্তু কংগ্রেস এর ব্যাখ্যা করল এই বলে যে, সে দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলের যৌথ দায়িত্বের অন্তর্গত। যে ব্যক্তি অন্য দলের প্রতি অনুগত, কংগ্রেসের প্রতি নয়, কংগ্রেস তাঁকে নিলে যৌথ দায়িত্ব অসম্ভব হয়। যৌথ দায়িত্বই তো বৃটিশ ক্যাবিনেট সিস্টেমের গ্রন্থিবন্ধন। মাইনরিটি থেকে মন্ত্রী নিতে হবে, এর কংগ্রেসী ব্যাখ্যা হলো আইনসভার কংগ্রেস দলের ভিতর থেকেই নিতে হবে। আইনসভায় কংগ্রেস দলে বহু মুসলমান ছিলেন বিহারে, যুক্তপ্রদেশে। কিন্তু খুব কম ছিলেন মাদ্রাজে, মধ্যপ্রদেশে। একেবারেই ছিলেন না বম্বেতে, ওড়িশায়। বম্বেতে একজন স্বতন্ত্র মুসলমানকে মন্ত্রীমণ্ডলে নেওয়া হয়। ওড়িশায় কাউকেই না।

এখন প্রশ্ন হলো এঁরা কাদের প্রতিনিধি? আইনসভায় বিস্তর অকংগ্রেসী মুসলমান ছিলেন। এঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রতিনিধি নন। তাঁদের পেছনে যে নির্বাচকমণ্ডলী তাদেরও প্রতিনিধি নন। আবার একই প্রশ্ন দেখা দিল বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের হিন্দু মন্ত্রীদের বেলা। এঁরা ব্যক্তি হিসাবে সকলেই উপযুক্ত, কিন্তু প্রতিনিধিত্ব আর ব্যক্তিত্ব দুই আলাদা জিনিস। কোয়ালিশন হলে প্রতিনিধিদের সমস্যার সমাধান হতো, কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলের একভাগ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ মুসলিম লীগ সভাপতি জীণা সাহেবের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ কৃষক প্রজা দলপতি ফজলুল হক সাহেবের অনুগত হলে সঙ্কট চরমে উঠত।

কোনোখানেই মাইনরিটি সমস্যার মিটমাট হলো না, তবে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দল ছিল হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের বিস্তর প্রতিনিধি নিয়ে গড়া। সিকন্দর হায়াৎ খান ছিলেন সকলের আস্থাভাজন।

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলো থাকতে আসেনি, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাতে

চায়নি, কিন্তু পরে দেখা গেল আরো দুটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়েছে, তার জন্যে কংগ্রেসের বাইরে থেকে লোক নিতে হয়েছে, কংগ্রেসকে মান্য করার অঙ্গীকারনামা সই করিয়ে। এতে কংগ্রেসের ছত্রতলে এল আটটি প্রদেশ, বাইরে রইল তিনটি। ইংরেজ সরকারের একটা অদৃশ্য ব্যালান্স ছিল। হিন্দু ছয়, মুসলমান পাঁচ। আসামকেও তর্কের খাতিরে মুসলিম বলে ধরা হতো। বাংলার মতো সেখানেও ইউরোপীয় স্বার্থ সর্বাধিক। তেমনি উত্তরপশ্চিম সীমান্তের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক। আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত কংগ্রেসের ছত্রতলে দেখে ইংরেজের ব্যালান্স নড়ে যায়। তেমনি মুসলিম লীগেরও একটা ব্যালান্স ছিল, সেটা প্রকাশ্য! সেটাও নষ্ট হয়। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থী দাঁড় করিয়ে লীগকে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রেস তাকে শত্রু করেছিল। এবার ব্যালান্স নাশ করে চিরশত্রু করল।

পনেরো

প্রাদেশিক স্তরে ব্যালান্স হানি হলো বলে যারা মনে মনে মহাক্রুদ্ধ কেন্দ্রীয় স্তরে তারা প্রাণ থাকতে ব্যালান্স হাতছাড়া করবে না। মানুষ অত ভালো-মানুষ নয়। কেন্দ্রীয় স্তরেও মেজরিটি রুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কংগ্রেসকে একজোড়া যুদ্ধ জয় করতে হতো। একটা তো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে, আরেকটা সম্প্রদায়বাদী মুসলমানদের সঙ্গে।

যুদ্ধ অবশ্য অহিংস পদ্ধতিতে হতে পারত, কিন্তু কতটুকুই বা আমাদের অহিংসায় বিশ্বাস, কতটুকুই বা ট্রেনিং, কতটুকুই বা মৃত্যুবরণের প্রস্তুতি। হাতে অস্ত্র নেই বলেই আমরা অহিংস, অস্ত্র থাকতে তো নয়।

কংগ্রেস যখন আটটি প্রদেশ গণতান্ত্রিক উপায়ে হস্তগত করে তখনি বুঝতে পারা যায় যে বাকী তিনটি প্রদেশ কোনো মতেই সে উপায়ে লাভ করা যাবে না, যদি না মুসলিম নির্বাচক মণ্ডলীতেও কংগ্রেস জয়ী হয়। তেমন সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না যে তা নয়! কিন্তু তার জন্যে জেল জরিমানা ইত্যাদি নয়, অন্য পন্থায় ত্যাগ স্বীকার করতে হতো। জমিদারকে ছাড়তে হতো জমিদারি, মহাজনকে মহাজনী। অন্তত বহু পরিমাণে খাজনা মাফ করতে হতো, সুদ মকুব করতে হতো। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু তিন প্রদেশেই শোষক শ্রেণীর লোকেরা ছিল হিন্দু, শোষিত শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান। বাংলার আইনসভায় রায়ত আর খাতকদের বোঝা হালকা করার জন্যে যে সব আইন আসে সেসব আনে মুসলিমরা, তাতে বাধা দেয় হিন্দুরা। হাঁ, কংগ্রেসের হিন্দুরা। সেইদিনই বোঝা গেল বাংলাদেশে কংগ্রেসরাজ হবার নয়। হতে পারে কোয়ালিশন, কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাতে রাজী হবে না। তাহলে আবার কংগ্রেস ছাড়তে হয়। যারা কংগ্রেসের স্রষ্টা তারাই কংগ্রেস ছাড়বে! কংগ্রেস ছাড়লে স্বাধীন হবে কাকে সংগ্রামের সৈন্যদল করে?

কংগ্রেস নেতারা জানতেন বাংলার জন্যে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারছেন না, তাঁদের হাতে প্রাদেশিক সরকার নেই। কোয়ালিশনেও তাদের অনিচ্ছা। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি পদে বরণ করে তাঁরা বাঙালীকে একপ্রকার ক্ষমতার স্বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কিছুদিন পরে টের পান যে সভাপতি হলেও তিনি আসলে হর্তাকর্তা নন, হর্তাকর্তা হচ্ছেন বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ। কংগ্রেস মন্ত্রীরা এঁদের কাছ থেকেই নির্দেশ নেন, এঁরাই তাঁদের কাজকর্মের পরিদর্শক। বলতে গেলে আটটি ক্যাবিনেটের উপর এঁরাই একরকম সুপার-ক্যাবিনেট। অথচ এ সুপার-ক্যাবিনেট কংগ্রেস সভাপতির নয়। যাঁকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাহীন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। তাঁর স্টালিন বল্লভভাই।

মহাত্মাজীর মুঠোয় গণসত্যাগ্রহ, সর্দারজীর মুঠোয় পার্লামেন্টারি শাসন-ক্ষমতা, তাঁদের দু'জনেরই বাছা বাছা সহকর্মীদের মুঠোয় পার্টি মেশিন। কংগ্রেস সভাপতির মুঠোয় তাহলে কী? শূন্যগর্ভ রাষ্ট্রপতি মর্যাদা? সে রাষ্ট্রও তাঁর নয়, বড়লাটের মুঠোয়। সুভাষচন্দ্রের মতো স্বভাববিদ্রোহী পুরুষ এ রকম ভাগবাঁটোয়ারায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না। অন্তত পার্টি মেশিনটা তাঁর চাই। তিনি ওটাকে গড়ে পিটে সংগ্রামের উপযোগী করতে ইচ্ছা করেন। কয়েক বছর আগে ভিয়েনায় থাকতে বিঠলভাই পটেল ও তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন,

"The latest act of Mahatma Gandhi in suspending civil disobedience is a confession of failure. We are of opinion that the Mahatma as a political leader has failed. The time has come for a radical recognisation of the Congress on new principles with a new method for which a new leader is essential, as it is unfair to expect the Mahatma to work a programme not consistent with his lifelong principles."

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, এই তিনটিকে ঘিরে কংগ্রেসের শিকড়শুদ্ধ টেনে পুনর্গঠন। এই যদি হয় লক্ষ্য তবে পুরাতন নেতা, পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতির স্থান হবে কোথায়! কংগ্রেসে না কংগ্রেসের বাইরে? গান্ধী মানে মানে কংগ্রেসের বাইরে সরে গিয়ে পুনর্গঠনকামীদের একটা বিষয়ে নিষ্কণ্টক করেছিলেন। নেতা নিয়ে ভাববার সময় তাঁরা তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারতেন। বাকী থাকে নীতি আর কর্মপদ্ধতি। এই দুই বিষয়ে দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব পুরাতনের সঙ্গে নতুনের।

যাঁরা পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক তাঁদের প্রতিপক্ষরা তাঁদের নাম দিলেন দক্ষিণপন্থী। আর নিজেদের নামকরণ করলেন বামপন্থী। এর একটা সহজ কারণও ছিল। দুনিয়ার সব দেশেই তিনটে বড়ো বড়ো আইডিয়াল দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ন্যাশনালিজম,

ডেমোক্রাসী, সোশিয়াল জাস্টিস। সোশিয়াল জাস্টিসের প্রকারভেদ ছিল সোশিয়ালিজম বা কমিউনিজম বা অ্যানারকিজম। আবার তার শত্রু ছিল ফাসিজম। ভারতবর্ষ দুনিয়ার বার নয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ন্যাশনালিজম ও ডেমোক্রাসী তার আদর্শ হয়েছে। তবে সোশিয়াল জাস্টিস অপেক্ষাকৃত নতুন। স্বয়ং গান্ধীজীই তাকে বহন করে আনেন, কিন্তু টলস্টয়ের শিষ্যরূপে, কার্ল মার্কসের শিষ্যরূপে নয়। অথবা ফেবিয়ানদের একজন হিসাবে নয়। বিশের দশকের কংগ্রেসীরা তাতে প্রেরণা পেলেও ত্রিশের দশকের একদল কংগ্রেসী তার চেয়ে সোজাসুজি সোশিয়ালিজম পছন্দ করেন। ফরাসী কেতায় এঁরাই হলেন বামপন্থী।

দক্ষিণপন্থীদের হাতে মন্ত্রিত্ব ছিল, বামপন্থীদের হাতে ছিল না। বাম-পন্থীরা ধরে নিলেন যে মন্ত্রীর দল অত সাধের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে স্বেচ্ছায় সরে আসবেন না! গদী আঁকড়ে পড়ে থাকবেন ও আরো উঁচু গদীর জন্যে ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে আপস করবেন। আপসে ফেডারেশন হাসিল হলে আর সংগ্রামের দিকে মন যাবে না। অথচ সংগ্রাম না করে স্বাধীনতা লাভ কোনো দেশে কোনো কালে ঘটে নি। ফেডারেশন একটা মরীচিকা।

সুভাষচন্দ্রের প্রথমবারের নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। তাঁর মতবাদ জানা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থীরা অন্তরায় হন নি। গান্ধী তো সুভাষ-চন্দ্রকেই চেয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এমন কী ঘটল যার দরুন সুভাষ-চন্দ্রকে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচন করতে তাঁদের অসম্মতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নিল। সকলে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি হলে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে বিদায় দিতেন, সেই সঙ্গে পুরাতন নীতি ও কর্মপদ্ধতিকেও খারিজ করতেন। ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বন্ধ হতোই, ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই মন্ত্রীদের অকালে পদত্যাগ করতে হতো, গণসত্যাগ্রহের অনুকূল জোয়ার আসবার আগেই কংগ্রেসকর্মীদের অকালে জেলখানায় যেতে হতো। গান্ধীজীর ইচ্ছায় নয়, সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছায়। তেমন অবস্থায় কংগ্রেসের যে অংশটা গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস রাখত সে অংশটা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেত। কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে যেত। ফলে জনগণও দু'ভাগ হয়ে যেত।

সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করলে গান্ধীজী বলেন তিনিও পরাজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আনন্দিত। তাঁর বিবৃতিতে ছিল—সুভাষচন্দ্র এখন ইচ্ছামতো স্বমতের লোকদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেন।

সেই বিবৃতির কিছুদিন পরে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি বামপন্থী ও সুভাষচন্দ্রের পক্ষপাতী। জানতে চাই ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি থাকছেন কিনা। তাঁর প্রদেশ থেকে তাঁরই তো থাকার কথা।

"এই বছরই মহাযুদ্ধ।" তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দেন। "দক্ষিণপন্থী বামপন্থী ভেদবিভেদ ভুলে গিয়ে কংগ্রেসকে এখন এক হয়ে দাঁড়াতে হবে।

সুভাষচন্দ্রকে আমরা বলে এসেছি তিনি যেন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে মিটিয়ে ফেলেন।"

পরে বোঝা গেল সুভাষচন্দ্রেরও সেই ইচ্ছা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তো গোবিন্দবল্লভ পন্তের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল যে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে সুভাষচন্দ্র যেন তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। মহাত্মা যাঁদের যাঁদের নিতে বলবেন তাঁদের নিতে রাজী ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু মহাত্মাই তাঁকে ঐ প্রস্তাবের দায়মুক্ত করে দিয়ে বলেন তাঁর আপনার ইচ্ছামতো সদস্য মনোনয়ন করতে। গান্ধী তাঁর উপর ইচ্ছা খাটাবেন না। কারো নাম দেবেন না।

সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। তাঁরা যদি আসেন পুরোপুরি আসবেন, আধাআধি আসবেন না। হয় পুরোনো ওয়ার্কিং কমিটিকে সমগ্রভাবে পুনর্নিয়োগ করতে হবে, নয় সমগ্রভাবে বাতিল করতে হবে। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী জগাখিচুড়ি ক্যাবিনেট চলবে না।

প্রথমটাই যদি হলো তবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরকারটা কী ছিল? আর দ্বিতীয়টাই যদি হয় তবে শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হয়। তেমন কমিটি সমগ্র কংগ্রেসকে প্রতিফলিত করবে না। গান্ধীজীরও আশীর্বাদ পাবে না। যুদ্ধের সময় কোন কাজে লাগবে, যদি গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে? যুদ্ধ না বাধলে তো সামাজিক ন্যায় নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সঙ্গেই ঠোকাঠুকি বেধে যাবে। তাঁরা বামপন্থী হাই কমান্ড মানবেন কি? আর তাঁরা যদি বামপন্থী হাই কমান্ডের নির্দেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন তাহলে কি নতুন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হবে বামপন্থীদের দিয়ে? না আদৌ কোনো মন্ত্রীমণ্ডল থাকবেই না? সরকারকে ছ'মাসের আলটিমেটাম দিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুরু করা হবে? সে গণসত্যাগ্রহ যখন গান্ধী অনুমোদিত নয় তখন তাতে গান্ধীবাদীরা বা দক্ষিণপন্থীরা কেউ যোগ দেবেন কি? পারবেন বামপন্থীরা একা সে সংগ্রাম চালাতে?

সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী কমরেডরা বারো রাজপুত। তাঁদের সবাইকে একত্র করে নির্বাচনে জেতা যায়। কিন্তু সবাইকে একমত করে ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা যায় না, হাই কমান্ডও না, আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলও না। তাহলে কী করা যায়? গণসত্যাগ্রহ? না, তাতেও তাঁরা সবাই রাজী নন। গান্ধীজীকে পুরোভাগে না রেখে, দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে না নিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুধুমাত্র বামপন্থীদের দিয়ে হবার নয়। হতে পারে বিপ্লব বা বিদ্রোহ, কিন্তু তার জন্যে কংগ্রেসকে নিয়ে টানাটানি কেন? আর বিপ্লব বা বিদ্রোহ যদি হবার থাকে তো বিনা আলটিমেটামেই হবে। শত্রুকে ছ'মাস নোটিস দিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বাধাতে গেলে শত্রুই আগে থেকে প্রস্তুত হবার সময় পায়।

সভাপতি পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করবার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করেছিলেন গান্ধীজী। নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বামপন্থীরা জয়ী হতে পারেন, কিন্তু গান্ধীজীর দ্বারা পরিচালিত বা দক্ষিণ-

পন্থীদের দ্বারা সমর্থিত নয় যে সংগ্রাম তেমন কোনো সংগ্রামে অসময়ে ঝাঁপ দিতে গেলে নিজেরাও মজবেন, দেশকেও মজাবেন। আর যদি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার অভিপ্রায় না থাকে তবে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম ছাড়া আর কী কর্মসূচী আছে তাঁদের? তাই যদি তাঁরা চালিয়ে যান তবে তাঁরাও তো দক্ষিণপন্থী বনে যাবেন।

সুভাষচন্দ্রকে অবশেষে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতেই হলো। কংগ্রেসের ইতিহাসে এটা একটা শোচনীয় অধ্যায়। যেমন অনমনীয় গান্ধীজী, তেমনি অনমনীয় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি, নমনীয় কেবল সুভাষচন্দ্র আর তাঁর বামপন্থী বান্ধবরা। কিন্তু আর কত নুইবেন? একটা পয়েণ্ট পর্যন্ত নোয়া যায়। তারপর আর না। তাই পদত্যাগই শ্রেয়।

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, কোনোটাই হলো না। কংগ্রেসের পুনর্গঠনও না অথচ কংগ্রেসের পুনর্গঠনের সত্যি দরকার ছিল। গান্ধীজীর মতে "I would go to the length of giving the whole Congress organisation a decent burial, rather than put up with the corruption that is rampant."

যে কংগ্রেস কণামাত্র ক্ষমতা হাতে পেয়েই বেসামাল কেমন করে সে সর্বময় ক্ষমতার অপরিসীম দায়িত্ব বহন করবে? আকণ্ঠ ডুবে আছে যে আপন দুর্নীতির পাঁকে কে তার কাছে আশা করবে প্রশাসনিক শুদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিপুল প্রলোভনের মুখে সততা? ক্ষমতাই তো সব কথা নয়। তার সঙ্গে চাই অথরিটি। নৈতিক শক্তি না হলে অথরিটি আসে না। কংগ্রেসের যেটুকু অথরিটি সেটুকু মহাত্মার জন্যে। মহাত্মার জনাকতক বাছা বাছা সহকর্মীর জন্যেও। কিন্তু সেই ক'জনকে নিয়ে তো ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশ নিখুঁত ভাবে শাসন করা যায় না। গান্ধীজী সেইজন্যেই চেয়ে-ছিলেন আগে কংগ্রেসের পঙ্কোদ্ধার, তারপরে দেশোদ্ধার। লেনিনও তাঁর পার্টি তৈরি না করে বিপ্লবের দিকে পা বাড়াননি।

দেশকে স্বাধীন করার জন্যে হয়তো পার্টির দরকার ছিল না, জনগণ তৈরি হলেই যথেষ্ট। কিন্তু স্বাধীন হতে না হতেই ক্ষমতা হাতে নিতে হবে, দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে। পার্টি তখন একান্ত আবশ্যক। গান্ধী তো একা এতবড়ো দেশ শাসন করতে পারবেন না। আর জনগণও কি শাসনব্যবস্থার সব ক'টা বিভাগ নিজেরাই চালাতে পারবে? গান্ধীজী মুখে যাই বলুন মনে মনে জানেন যে কংগ্রেস ভিন্ন আর কেউ সে গুরুভার ঘাড়ে নিতে পারবে না। অতএব কংগ্রেসকেই ভেদমুক্ত করতে হবে। সে কর্তব্য তাঁরই।

আরো ক্ষমতা নয়, তা পেলে তো কংগ্রেস আরো বকে যাবে। উল্টে ক্ষমতার রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আসা চাই। ক্ষমতার পরিধি আরো বাড়ানো নয়, কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা নয়। প্রত্যুত প্রাদেশিক বৃত্ত থেকে মহা-নিষ্ক্রমণ। সেটাও এক আধ বছরের জন্যে নয়। আরো দীর্ঘকালের জন্যে। যুদ্ধ বাধার পরে শোনা গেল মহাত্মা ভাবছেন সাত বছরের জন্যে কংগ্রেসের

কপালে লিখবেন অজ্ঞাতবাস।

তিনি নিজেও মনঃস্থির করেন জীবনে কোনদিন নিজের হাতে ক্ষমতার দায়িত্ব নেবেন না। ক্ষমতার আসনে বসবেন না। ক্ষমতা থাকলেই তাকে খাটাতে হয়। তিনি হলেন অহিংস মানুষ। আর রাষ্ট্র হলো সহিংস যন্ত্র। রাষ্ট্রকে যতদিন না অহিংস করে গড়ে তুলতে পারা যাচ্ছে ততদিন তাঁর ভূমিকা হবে পরামর্শদাতার। রাজা উজিরের নয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের কথা অন্য। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা যদি অহিংস থাকতে না পারেন সেটা মার্জনীয়। তবে সেরকম পরিস্থিতি পরিহার করাই সুবুদ্ধি। মুসলীম লীগের পাল্টা দিতে গিয়ে যেন গুলী চালাতে না হয়। লীগ যেমন দিন দিন ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠেছে তার উত্তরে কংগ্রেস যেন ভায়োলেণ্ট না হয়। তার চেয়ে যুদ্ধ উপলক্ষে অপসরণ শ্রেয়।

ওদিকে মুসলিম লীগও মনঃস্থির করে যে কংগ্রেস যেদিন ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হবে সেদিন মুসলিম লীগও কংগ্রেসের হাত থেকে মুক্ত হবে। তার কাম্য পাকিস্তান।

ষোল

কংগ্রেসের তথাকথিত দক্ষিণপন্থী নেতাদের ধারণা ছিল আটটি প্রদেশের গভর্নমেণ্ট যেভাবে হস্তগত হলো কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টও সেইভাবে কুক্ষিগত হবে। গভর্নরদের মতো বড়লাটও হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবেন। মুসলিম লীগকে গোটাকয়েক আসন ও দপ্তর ছেড়ে দিলেই চলবে। তা বলে তার হাতে ভীটো থাকতে দেওয়া হবে না। ভোটাভুটিতেও তাকে সমান ওজন দেওয়া অসম্ভব। কাস্টিং ভোট বড়লাটের হাতে কিছুতেই নয়।

কী মধুর স্বপ্ন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নও ছিল যে অত সহজে ওসব হবার নয়, ওর জন্য আবার একটা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যার নেতা মহাত্মা গান্ধী। যাঁর নীতি অহিংসা। যাঁর পদ্ধতি সত্যাগ্রহ। অথবা যেতে হবে সম্ভবপর এক মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে। যার একপক্ষে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নসমূহ। ডোমিনিয়ন না হলেও ভারত যার পক্ষভুক্ত। স্বাধীনতার প্রশ্নে বোঝাপড়া হলে কংগ্রেসও যার সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। মহাত্মা কিন্তু আবদ্ধ নন।

একদিন সত্যি সত্যি মহাযুদ্ধ বেধে যায় ও ব্রিটেনের মতো ভারতও যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সে কোন ভারত? ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য বৈদেশিক রাজপুরুষদের দ্বারা শাসিত ব্রিটিশ সরকারের পলিসিবাহক ভারত।

গান্ধী ভালো করেই জানতেন যে যুদ্ধকালে ব্রিটেন এমন কোনো পরিবর্তনে সম্মত হবে না যার ফলে পলিসিটাই যুদ্ধবাদী না হয়ে শান্তিবাদী

হতে পারে, সহিংস না হয়ে অহিংস হতে পারে। ইংরেজদের বদলে ভারতীয়দের দিয়ে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার অনিবার্য শর্ত হবে যুদ্ধকার্যে সক্রিয় সহযোগিতা। ধন জন রসদ জোগানো। পরিবর্তে দেশের লোক কী পাবে? স্বাধীনতা। ব্রিটেন যদি যুদ্ধে হেরে যায় ভারতও তো হেরে যাবে। তখন স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার সাত হাত জলে। জিতলেও কি ব্রিটেন কথা রাখবে?

ব্রিটেনের বিপদে সহানুভূতি জানানো এক কথা, আর বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করা আরেক। কে জিতবে কে হারবে কেউ সেটা বলতে পারে না। নাৎসীবাদ যদি হারে সাম্রাজ্যবাদ জিতবে। সাম্রাজ্যবাদ যদি হারে নাৎসীবাদ জিতবে। একটা মন্দের জায়গায় আরেকটা মন্দ জিতবে। মন্দের বদলে ভালোর জয় কোথায় যে ভারতের ছেলেদের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে। ভালোর জয় না হয়ে পরাজয় হলেও তার মধ্যে সার্থকতা আছে। গান্ধীজী তাই সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত হন। সহযোগিতার আশ্বাস দেন না। অপরপক্ষে যুদ্ধরত সরকারকে বিব্রত করতেও কুণ্ঠিত হন। সত্যাগ্রহের আভাস থাকে না তাঁর কথায়।

সহযোগও নয়, সত্যাগ্রহ নয়, বিশুদ্ধ অসহযোগ, এই যদি হয় গান্ধীনীতি তবে এতে কংগ্রেসের বাম দক্ষিণ উভয় অঙ্গের আপত্তি ছিল। যুদ্ধকালে যুদ্ধ না করে তাঁরা ছাড়বেন না। হয় সেটা হিটলারের সঙ্গে সশস্ত্র সমর, নয় সেটা ইংরেজের সঙ্গে নিরস্ত্র সংগ্রাম। হয় তাঁরা নাৎসীদের গ্রাস থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করবেন, নয় তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভারতকে উদ্ধার করবেন। যুদ্ধকালে তাঁরা শান্তিতে থাকবেন না, শান্তিতে থাকতেও দেবেন না।

বলা বাহুল্য হিটলারের সঙ্গে সশস্ত্র সমর চালাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারটা হাতে আসা চাই। তাহলে প্রথম কাজই হয় সাম্রাজ্যবাদীদের হটানো। কিন্তু তাহলে যে আবার উল্টো বুঝলি রাম হবে। ওরা বুঝবে যে এরা আসলে হিটলারেরই পঞ্চম বাহিনী। আর গান্ধীজীও তেমন কর্মে নেতৃত্ব দেবেন না। যুদ্ধকালে ইংরেজকে তাড়াতে গেলে ওরাও প্রতিশোধ নেবে।

কংগ্রেস কর্তারাও ভারত সরকারকে ঘাঁটাতে চান না। তাঁরা চান এমন একটা বন্দোবস্ত যাতে সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা নিজেদের তাস হাতে রেখে ব্রিটেনকেই বলেন তার তাসখানা দেখাতে। সে কি সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করবে? সে কি গণতন্ত্র প্রবর্তন করবে? সে কি যুদ্ধশেষে ভারতীয়দেরকে তাদের ইচ্ছামতো সংবিধান প্রণয়নে প্রতিশ্রুতি দেবে? সে কি যুদ্ধকালে ভারতীয় স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেখাবে? সে কেন যুদ্ধ করছে, কী তার উদ্দেশ্য সেটা ঘোষণা করবে কি?

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্টেটমেণ্ট যে কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে গৌরবজনক একটি সাহিত্যকীর্তি। জবাহরলালের সেই সৃষ্টি দেখে গান্ধীজী বলেন ওর স্রষ্টা একজন আর্টিস্ট। গান্ধীজীও কমিটির বিবেচনার জন্যে

একটি স্টেটমেন্ট খসড়া করেছিলেন। কিন্তু জবাহরলালেরটি তাঁর এত পছন্দ হয়ে যায় যে নিজেরটি তিনি প্রত্যাহার করেন। শিষ্যাং ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্। শিষ্যের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করবে।

অমন যে চমৎকার ইংরেজী ওর ফল হলো ব্রিটিশ কর্তাদের দিক থেকে কয়েকটা পিঠ চাপড়ানি ভাষণ ও বিবৃতি। কাজের কথা শুধু এইটুকু যে যুদ্ধকালে বড়লাট একটা পরামর্শ পরিষদ গঠন করবেন, তাতে ভারতীয় নেতারা থাকবেন, কেমন করে যুদ্ধ চালানো হবে সে বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ নেওয়া হবে। যুদ্ধশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ করে মাইনরিটি-দের মতামত জেনে ভারতশাসন আইনের সংশোধন করা হবে। হাঁ, ডোমিনিয়ন স্টেটাসই লক্ষ্য।

ঘোষণাপত্র পড়ে কংগ্রেস নেতাদের চক্ষুঃস্থির। ওটা মুসলিম লীগকে চোখের সামনে রেখে তৈরি। লীগ বলে রেখেছিল তার অমতে যেন শাসন-তান্ত্রিক অগ্রগতি না হয়। সাম্রাজ্যের পর রামরাজ্য আসবে ওতে কৈকেয়ীর আপত্তি।

বেশ বোঝা গেল সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর না দিলে স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেসের হাতে নয়। লীগের হাতে। লীগ মেহেরবানী না করলে ব্রিটেন মেহেরবানী করবে না। এক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ অবান্তর। হিটলারের আক্রমণ অবান্তর। কিছুতেই কিছু হবে না, তা তুমি যতই বন্দুক ঘাড়ে করে উত্তর ফ্রান্সে বা উত্তর আফ্রিকায় যাও। যতই জান মান রুপেয়া সরকারের পায়ে ঢালো।

কংগ্রেস নেতারা হতাশ হলেন বইকি। অমন চমৎকার একখানি সাহিত্য-সৃষ্টি বিলকুল বৃথা গেল। ইংরেজের প্রাণে এতটুকুও সাড়া তুলল না। ওদের ধারণা কংগ্রেস ভারী তো সহযোগিতা করবে! তার জন্যে তাকে দিতে হবে যুদ্ধের পর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের উপর সর্দারী। ওদিকে পাঞ্জাবের মুসলমানরা যদি চটে যায় তো যুদ্ধের জন্য রংরুট হবে কারা? মুসলমানরা রংরুট না হলে শিখরাও কি হবে? শিখরা রংরুট না হলে হিন্দুরাও কি হবে?

ইংরেজরা এ যুদ্ধে সব চেয়ে বেশী নির্ভর করছিল সিকন্দর হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস্ট পার্টির উপর, তাঁর পাঞ্জাব সরকারের উপর। তাঁর সৈনিক সংগ্রহের কৌশল ছিল অসাধারণ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, নাৎসীবাদ উৎসাদনের জন্য যুদ্ধ ইত্যাদি বললে একজনও জওয়ান নাম লেখাবে না। বলতে হবে, "ভাই শিখ, তুমি যদি যুদ্ধে না যাও মুসলমান যাবে, সেই উপায়ে হাতিয়ার যোগাড় করবে, সেই হাতিয়ার দিয়ে পাঞ্জাব দখল করবে ও পাকিস্তান হাসিল করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার জোগাড় করো। তারপর একদিন পাঞ্জাব কেড়ে নেবে। আবার রণজিৎ সিংহের রাজত্ব।"

তেমনি মুসলমানকে বলতে হবে, "ভাই মুসলমান, তুমি যদি যুদ্ধে না যাও শিখ যাবে। সেই উপায়ে হাতিয়ার হাত করবে। তাই দিয়ে পাঞ্জাব দখল

করে রণজিৎ সিংহের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার হাত করো। তারপর একদিন পাকিস্তান হাসিল করবে। আবার সেই মোগল রাজত্ব।"

তেমনি হিন্দু ডোগরাকে, রাজপুতকে। মুসলমানের আগে, শিখের আগে ওরাই তো পাঞ্জাবের মালিক ছিল। আবার হবে। হাতিয়ার সংগ্রহ করাটাই তো সমস্যা। রংরুট বনে যাও। সমস্যার সমাধান জলের মতো সহজ।

দেখা গেল গোড়ায় যাদের অনিচ্ছা ছিল তারা হিন্দু মুসলিম শিখ নির্বিশেষে রংরুট হয়ে বন্দুক ঘাড়ে করে চলল। মুখে তাদের "আল্লা হো আকবর", "সৎ শ্রী অকাল" ও "দুর্গা মাইকী জয়"। যুদ্ধে যদি বাঁচে তো পাঞ্জাবের জন্যে পরে গৃহযুদ্ধে মারবে ও মরবে।

চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না। যুদ্ধে সহযোগিতাও একটা চালাকি। যখন দেশবাসীকে কোনোমতে বোঝাবার জো নেই যে হিটলার কেবল ব্রিটেনের শত্রু নয় ভারতেরও শত্রু। সত্যি কথা বলতে কী, হিটলারের পক্ষেও সেদিন বহুলোক ছিল। তারা মনে মনে বলছিল, যা শত্রু পরে পরে। হিটলার ব্রিটেনকে হারিয়ে দিক, রাশিয়াও হিটলারকে কাহিল করুক, বাকীটুকু আমরাই পারব। তার জন্যে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে কেন? কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব এমন কী মূল্যবান যে তার জন্যে অত বেশী দাম দিতে হবে?

সেদিন ইংরেজ শাসন ও কংগ্রেস শাসন দুটোই একই রকম অন্তঃসারশূন্য ঠেকছিল। ওপথে আর যাই আসুক নূতন শৃঙ্খলা আসবে না। বামপন্থীরা বরঞ্চ ছল খুঁজছিলেন দুটোকেই একসঙ্গে সরাবার। লেনিনের মতো বিপ্লব করবার। তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস দেশ প্রস্তুত, নেতারাই প্রস্তুত নন। জোয়ার এসে গেছে, তার সুযোগ নিতে হবে, নইলে সে বৃথা ফিরে যাবে। ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ।

বিপ্লবের লক্ষণ কী কী বিষয়ে আমাদের বামপন্থীদের গুরু লেনিনের উক্ত স্মরণীয়।

"When a revolutionary party has not the support of a majority either among the vanguard of the revolutionary class, or among the rural population, there can be no question of a rising. A rising must not only have this majority, but must have: (1) the incoming revolutionary tide over the whole country; (2) the complete moral and political bankruptsy of the old regime, for instance, the Coalition Government; and (3) a deep-seated sense of insecurity among all the irresolute elements."

এসব লক্ষণ কি মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোনোখানে ছিল? ছিল হয়তো বামপন্থী নেতাদের ভক্তজনের মধ্যে। ছিল হয়তো সভাস্থলে। কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। থাকলে থাকত ওই কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে, কিন্তু সেখানে

যে বিক্ষোভ জড়ো হচ্ছিল সেটা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেস সরকারেরই বিরুদ্ধে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতায় স্বাধীনতা প্রশ্নের সমাধান হবে না বুঝতে পেরে হাই কমাণ্ডের নির্দেশে যেই পদত্যাগ করলেন অমনি সব বিক্ষোভ মুহূর্তে জল হয়ে গেল। বামপন্থীরা তখন আর ওর মধ্যে বিপ্লবের লক্ষণ খুঁজে পেলেন না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেনের মতিগতি জানতে চেয়েছিলেন। জানতে পেরেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভের আটটি প্রদেশ থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বলেন। অভূতপূর্ব সামরিক শৃঙ্খলা ও বাধ্যতার সঙ্গে আটটি প্রদেশ একই কালে মন্ত্রীশূন্য হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই অমান্য করতে পারতেন কেউ কেউ। কিন্তু সেটা হতো বিশ্বাসঘাতকতা। জনমত ক্ষমা করত না। বলা বাহুল্য মন্ত্রীরা মুহূর্তেই বীরপুরুষ বনে গেলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবার গান্ধীজীর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যা করবার তিনিই করবেন। না করার দায়িত্বও তাঁর। এতকাল অপেক্ষার পর কংগ্রেসের পরিপূর্ণ নেতৃত্ব মহাত্মার হাতে এল। তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর ফিরে পেলেন।

গান্ধীজী এককালে বিশ্বাস করতেন যে সহযোগিতার পথেই স্বরাজ আসবে। সহযোগিতারই একটা অঙ্গ যুদ্ধে সহযোগিতা। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি তাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। প্রথমদিকে খাস ইংলণ্ডের মাটিতে, পরে ভারতভূমিতে। জনমতও সে সময় সহযোগিতার অনুকূলে ছিল। যদিও সেকালের চরমপন্থীরা তখনি বলতে শুরু করেছিলেন যে ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। কেউ কেউ সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে সাগর পাড়ি দেন। মহাত্মার কাজ হলো হিংসা নামক উপায়টাকে অচলিত করে তার জায়গায় অহিংসা নামক অপর এক উপায়কে জনগণের সামনে তুলে ধরা। যুদ্ধ থামতে না থামতে তার উপলক্ষও জুটে যায়। দেশের লোক সহযোগিতার পরিণাম দেখে অসহযোগের নীতি অবলম্বন করে। গান্ধীই হন তাদের নেতা। সেই থেকে তিনি অসহযোগের প্রবর্তক। অহিংসার প্রোফেট।

মাঝে মাঝে দেশকে দম নেবার অবকাশ দিলেও অসহযোগ নীতি ত্যাগ করে সহযোগিতার নীতি তিনি পুনর্গ্রহণ করবেন, এমন কী ঘটেছে? আর একটা মহাযুদ্ধ? না, তার জন্যেও নীতি পরিবর্তন করা যায় না। এমন কি স্বরাজের জন্যেও নয়, ওটা যদি শর্তাধীন স্বরাজ হয়। যদি হয় এই শর্তে স্বরাজ যে মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে। তাঁর কাছে তেমন স্বরাজ মূল্যহীন। তিনি চান জনগণের জন্য স্বরাজ। জনগণের স্বার্থ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়া নয়। যুদ্ধবিগ্রহের স্থলে শান্তি স্থাপন করা। ভারত যদি স্বাধীন হয় তবে তা বন্দুক ঘাড়ে করে হিটলারের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে নয়। গান্ধীজীর মতে ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের সাম্রাজ্য-পিপাসাও দূর হবে, কারণ ব্রিটেন যখন সাম্রাজ্য রাখতে পারল না জার্মানীও

কি পারবে?

ভারতের স্বাধীনতা যদি যুদ্ধকালে আসে বিশ্বশান্তিও দু'দিন আগে আসবে। আর যদি যুদ্ধকালে না আসে তা হলেও ক্ষতি নেই। ভারত অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার দিকে আরো কয়েক পা এগিয়ে যাবে। সেটা যোদ্ধাদের বিব্রত না করে। অহিংসভাবে। মোট কথা গান্ধীজী অসহযোগ ত্যাগ করবেন না, কংগ্রেসকেও ত্যাগ করতে দেবেন না। অথচ সরকারী যুদ্ধোদ্যমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। তাঁর বক্তব্যটা যেন এই যে, তোমরা যুদ্ধ করতে চাও করো, আমরা অসহযোগ করতে চাই করি, আমরা তোমাদের পথে কাঁটা দেব না, তোমরাও আমাদের পথে কাঁটা দেবে না। কেমন? এটাই কি ফেয়ার গেম নয়?

ইতিহাসে কেউ কখনো দেখেনি যে, রাজারা করছেন যুদ্ধ আর প্রজারা করছে অসহযোগ। যেটা দেখা যায় সেটা সেই—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এই প্রথম শোনা গেল উলুখাগড়া বলছে সেও অসহযোগ করবে। উলুখাগড়া অসহযোগ করলে রাজারা যুদ্ধ করবেন কী করে? ভারতের প্রজাদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের প্রজারাও যদি অসহযোগ করে তবে যুদ্ধই বা চলতে পারে কদ্দিন? তখন যে শান্তি আপনি আসবে।

মহাত্মার যুদ্ধকালীন অসহযোগ নীতি প্রকারান্তরে শান্তিবাদীদের যুদ্ধবিরোধী নীতি। টলস্টয় বেঁচে থাকলে গান্ধীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, তুমিই মানবজাতির আশাভরসা। আর তোমাদের দেশ যদি তোমার সঙ্গে থাকে তবে সেই বয়ে আনবে বিশ্বশান্তি।

বোধহয় এই সময় কিংস্‌লি মার্টিন তাঁর নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন যে, গান্ধীর নীতি হচ্ছে যুদ্ধকালে লেনিনের নীতি। এরই নাম বৈপ্লবিক পরাজয়বাদ। রেভলিউশনারি ডিফিটিজম। মার্টিন আরো কী কী লিখে-ছিলেন ঠিক মনে নেই। তবে তার মর্ম ছিল কতকটা এইরকম যে, গভর্নমেণ্টকে পরাজিত হতে দেওয়াই বিপ্লবকে সফল হতে দেওয়া।

বার্নার্ড শ এমনি এক সময় বলেন যে গান্ধীর স্ট্রাটেজী ঠিক আছে। তার মানে, তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি ও হবেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর কর্তব্য নয়।

গান্ধীসেবাসঙ্ঘের সম্মেলনে যোগ দিতে গান্ধীজী যখন মালিকান্দায় যান তখন কুমিল্লা থেকে আমিও যাই তাঁকে দর্শন করতে। পোলাণ্ডের পতনের পর আমার মনের ভিতর একটা মন্থন চলছিল। হিংসার উপরে নির্ভর করে যুদ্ধে নামার চেয়ে অহিংস প্রতিরোধ শ্রেয়। এই কথাটাই গান্ধীজীকে নিবেদন করে আসি। তিনি ধরাছোঁয়া দেন না। মুচকি হাসেন।

সেই সময়ই লক্ষ করি তিনি অসাধারণ গম্ভীর। দেশের গুরুভার বইতে হচ্ছে তাঁকে। শুনতে হচ্ছে বিদেশেরও নিন্দাবাদ। যুদ্ধকালে অসহযোগ নাকি শত্রুপক্ষের মনোবলবর্ধক। মন্ত্রীরা সরে যাওয়ায় বামপন্থীরা ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু মুসলিম লীগ এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সেই বর্তে গেছে। তার প্রতিজ্ঞা

সে এর পরে মন্ত্রীদের ফিরতে দেবে না। মন্ত্রীরাও ফেরার জন্যে ব্যাকুল।

কংগ্রেস তখন এমন একটা পার্টি যে একই কালে সহযোগিতাও করবে, অসহযোগও করবে। হিটলারের সঙ্গে লড়বে, ইংরেজের সঙ্গেও লড়বে। হিংসাও মানবে, অহিংসাও মানবে। মহাত্মার মাথাব্যথা কংগ্রেসকে নিয়ে, যেমন বুদ্ধের মাথাব্যথা সঙ্ঘকে নিয়ে।

সতেরো

পোলাণ্ডের পতনের পর যে জিজ্ঞাসা আমার মনে জেগেছিল ও যেকথা আমি মহাত্মার সম্বন্ধে মুখ ফুটে নিবেদন করেছিলুম ফ্রান্সের পতনের পরে দেখি তিনি সেটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিবেচনা করতে বলেছেন। ভারতের পরিস্থিতি যদি পোলাণ্ডের বা ফ্রান্সের অনুরূপ হয় তবে ভারতীয়রা কি হিংসা দিয়ে দেশরক্ষা করবে, না অহিংসা দিয়ে?

যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না তবু বলা তো যায় না। ভবিষ্যতে দেশ আক্রান্ত হতে পারে। ততদিনে যদি কংগ্রেসের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব এসে থাকে তবে কংগ্রেস কীভাবে দেশরক্ষা করবে? যেভাবে সকলে করে থাকে সেইভাবে? না গান্ধী যেভাবে করতে বলেন সেইভাবে? সৈন্যবল দিয়ে না গণসত্যাগ্রহ দিয়ে?

ওয়ার্কিং কমিটি গভীরভাবে চিন্তা করেন। খান আবদুল গফর খান ভিন্ন আর সকলের সিদ্ধান্ত হলো, অহিংসা দিয়ে দেশোদ্ধার হতে পারে, কিন্তু অহিংসার নীতি দেশরক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যায় না। তার বেলা হিংসার নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতারা প্রয়োজনমতো কখনো অহিংস কখনো সহিংস। যখন যেটা কার্যকর। পোলাণ্ডের ও ফ্রান্সের দশা দেখেও তাঁদের শিক্ষা হয়নি। গান্ধীজী নিরাশ হন।

ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেস স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে ভারতের জন্যে চাই পূর্ণ স্বাধীনতা আর সংবিধান রচনার জন্যে কন্‌স্টিট্যুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি। যুদ্ধের জন্যে কংগ্রেস তার দাবী খাটো করবে না, তার সংগ্রাম বন্ধ করবে না। গান্ধীজীর উপরেই সব ভার দেবে। তিনিই সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। তিনি সবাইকে প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আপাতত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দেবেন না।

ওদিকে বড়লাটও চিন্তা করছিলেন কংগ্রেসকে কী করে সহযোগিতায় সম্মত করা যায়। আটটি প্রদেশ কেবল যে মন্ত্রীশূন্য ছিল তা নয়, মেজরিটি অনুপস্থিত থাকায় আইনসভাও অকেজো হয়েছিল। মাইনরিটিও বাধ্য হয়ে বেকার। সুতরাং রুদ্ধ।

মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে পার্টিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজনৈতিক সমাধানকে আরো জটিল করে তুলেছে। তার আশঙ্কা যুদ্ধের ঠেলায় ব্রিটেন

কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করবে, তখন মুসলিম লীগ তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তার বখরাটা সে পৃথক রাষ্ট্ররূপে পেতে চায়। না পেলে অন্য কোনো সমাধানে সন্তুষ্ট হবে না।

দেশরক্ষা অহিংসা দিয়ে হবে না এই সিদ্ধান্ত নেবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আবার দেশরক্ষার অনুরোধে দাবী করেন যে কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট গঠন করা হোক। কংগ্রেস তাহলে পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করবে। যাতে দেশরক্ষা ব্যবস্থা আরো ফলপ্রদ, আরো সুশৃঙ্খল হয়।

বড়লাট কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে কংগ্রেস নেতারা আর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন দেখতেন না। সুতরাং গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে যেত। তিনি একলা চলতেন ও বিবেকের নির্দেশ পেলে একাই সত্যাগ্রহ করতেন।

কংগ্রেসের গতিগতি দেখে তিনি আবার নতুন করে সরে দাঁড়ান। তবে বেশীদিন সরে থাকতে হলো না। বড়লাট জানিয়ে দিলেন যে তাঁর শাসন পরিষদ্ পুনর্গঠিত হবে না, কিন্তু পরিবর্ধিত হবে। অর্থাৎ ইংরেজ সদস্যরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, ভারতীয় সদস্য যে দু'-একজন আছেন, তাঁরাও তেমনি থাকবেন, অধিকন্তু যুক্ত হবেন কংগ্রেস ও লীগ নেতারা। যুদ্ধের পরে ভারতীয়রা তাঁদের ইচ্ছামতো সংবিধান রচনার সুযোগ পাবেন, তবে দুটি শর্তে। ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। আর সংখ্যালঘুদের সম্মতি থাকা চাই।

বড়লাটের জবাব পেয়ে কংগ্রেস নেতাদের দেশরক্ষায় সহযোগিতার সাধ সঙ্গে সঙ্গে মিটে যায়। অন্তত তখনকার মতো। আবার তাঁরা গান্ধীজীর শরণ নেন। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। অন্তত যতদিন না বড়লাট আবার ডাক দেন।

হয় পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা নয় পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যম পণ্ড করা, এই দুই চরমপন্থার মধ্যপন্থা তাঁরা মানতেন না। মহাত্মা কিন্তু সেই সঙ্কটকালে কোনরকম চরমপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার পন্থা ছিল ক্ষুরধার পন্থা। ব্রিটেন যুদ্ধে বিশ্বাস করে, যুদ্ধ কেমন করে করতে হয় তা জানে। কেন তাকে বিব্রত করা? তার দিকেও তো বহু ভারতীয় রয়েছে। যোদ্ধার দলকে যুদ্ধ করতে দাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোককেও জাগাও, জাগিয়ে বল যে যুদ্ধবিগ্রহে তোমাদের বিশ্বাস নেই, অন্ততপক্ষে বর্তমান যুদ্ধ তোমাদের দেশের স্বাধীনতার পোষক নয়। তোমাদের স্বাধীন উক্তির জন্যে যদি তোমাদের কারাদণ্ড হয় তো যাও কারাগারে। যুদ্ধকালটা কাটিয়ে দাও সেখানে।

এরই নাম ব্যক্তি সত্যাগ্রহ। এর ইস্যু হচ্ছে যুদ্ধকালে সত্যকথনের স্বাধীনতা। সত্যে আগ্রহ। যুদ্ধকালে কোথাও কাউকে সত্য বলতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধের প্রথম বলি হচ্ছে সত্য। পৃথিবীতে অন্তত একটি দেশের

রাজনৈতিক কর্মীরা সত্য বলতে গিয়ে দণ্ডবরণ করুন। ইতিহাসে নাম থাকবে। জনগণকে সেইভাবে নেতৃত্ব দিন। তারা গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হবে।

গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বড়লাট বিবেকচালিতদের সহ্য করবেন, কিন্তু তাঁদের প্রচারকার্য সহ্য করবেন না। কোনো গভর্নমেণ্ট করেন না। নতুবা যুদ্ধোদ্যম বাধা পাবে।

নিঃশ্বাস ফেলতে না পারলে যেমন মানুষ বাঁচে না তেমনি মন খুলে কথা বলতে না পারলে সভ্য মানুষ বাঁচে না। গণতন্ত্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বাক্যের স্বাধীনতা আদায় করা ও অক্ষুণ্ণ রাখা। নইলে গণতন্ত্রই থাকে না। সিভিল লিবার্টি হচ্ছে ভিত্তিশিলা। তারই উপর দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের সৌধ। যুদ্ধকালে যারা সিভিল লিবার্টি হারায় তারা গণতন্ত্রও রাখতে পারে না। গণতন্ত্র যাদের নেই তাদের সিভিল লিবার্টি থাকলে সেটা আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরতে হয়।

কাজেই এ প্রশ্নে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বড়লাটও গান্ধীজীর সঙ্গে। বড়লাটের শঙ্কা যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য যোদ্ধাদের মনোবল ভঙ্গ করবে। যুদ্ধে যাবার জন্যে সৈনিক পাওয়া যাবে না। রংরুট না জুটলে যুদ্ধ চলবে কী করে?

ওটা এমন একটা ইস্যু যে যুদ্ধবাদীতে শান্তিবাদীতে আপস হতে পারে না। এমন কি কংগ্রেস যদি যুদ্ধে যোগ দিত তার সঙ্গেও গান্ধীজীর আপস হতো না। তিনি একাই যুদ্ধবিরোধী ভাষণ ও লেখা দিয়ে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে রাখতেন। তাঁকে তাঁর সেই প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তিনি কারাবরণ করতেন বা অনশনে দেহত্যাগ করতেন।

সিভিল লিবার্টির ইস্যুতে যুদ্ধকালীন ব্যক্তিসত্যাগ্রহ যাতে ব্যাপক না হয় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। আসলে ওটা একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নিয়ে আন্দোলন। আর সেই প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ছিল নৈতিক। তবে তার সঙ্গে রাজনীতিরও সম্পর্ক ছিল। প্রথম সত্যাগ্রহী মনোনীত হন বিনোবাজী। তিনি রাজনীতির লোক নন। তাঁর যুদ্ধবিরুদ্ধতা রাজনৈতিক কারণে নয়। তিনি যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী। কংগ্রেস যুদ্ধে যোগ দিলেও তিনি বিরুদ্ধতা করতেন।

আন্দোলনটাকে শুধুমাত্র বিনোবাজীর মতো নীতিনিপুণদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে পারতেন গান্ধীজী, যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায় তাঁর উপর না বর্তাত। কংগ্রেস কর্মীদেরও আন্দোলনে যোগদানের সুযোগ না দিলে নয়। যদিও তাঁদের প্রতিরোধ কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সেইজন্যে দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী মনোনীত হন জবাহরলালজী। নীতিনিপুণ ও রাজনীতিনিপুণ দু'রকমের কর্মীকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়। অমনি করে প্রায় সব ক'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ও তাঁদের সমর্থক আইনসভার সদস্যকে জেলখানায় পাঠানো হয়। বাইরে যে ক'জন পড়ে থাকেন তাঁরা হয় অসুস্থ নয় যুদ্ধবিরোধী প্রচারে অনিচ্ছুক। সেটা জেলের ভয়ে নয়। তাঁদের মতে সহযোগিতাটাই ঠিক বিরোধিতাটাই ভুল। যুদ্ধটাকে এককথায় সাম্রাজ্যবাদী বলে খারিজ করতে

তাঁরা নারাজ। তাঁরা যখন সত্যাগ্রহের মনোনয়ন চান না তখন পান না।

মনোনয়ন দিয়ে বাছা বাছা কর্মীদের সত্যাগ্রহ করতে দেওয়া গান্ধীজীর বহুদিনের কামনা। সত্যাগ্রহ তাহলে সংখ্যাগত না হয়ে গুণগত হয়। আর তাতেই বেশী প্রভাব। সত্যি সত্যি কয়েক মাসের মধ্যে রাজভয় ভেঙে গেল। লোকে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। তবে ছাপাখানা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রিত বলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখে ছাপতে পারল না। তার দরকারও হলো না। কারণ যুদ্ধে আর চাঁদা উঠছিল না, পাঞ্জাবের বাইরে রংরুটও জুটছিল না। তবে যাদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন তারা অবাধে যোগ দিচ্ছিল। কংগ্রেস বাধা দিচ্ছিল না। প্রচারকার্যের চেয়ে জোরালো কিছু করা গান্ধীজীর বারণ ছিল। তিনি সরকারী যুদ্ধোদ্যমকে অচল করে দিতে চাননি। চাইলে তাঁকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা হতো, দণ্ড দেওয়া হতো। সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্যে এবার তিনি মুক্ত থাকতে মনস্থ করেছিলেন।

ব্যক্তি সত্যাগ্রহ কি স্বরাজ এনে দিল? না, স্বরাজ তার লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য গণসত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ক্ষেত্র মানুষের মন। অন্য কোনো উপায়ে সেটা সম্ভব হতো না। তার আরো একটি লক্ষ্য ছিল দুনিয়াকে জানানো যে ভারতের জনসাধারণ এ যুদ্ধের পক্ষভুক্ত নয়। ভারতের নামে লড়াই চললেও লড়ছে যারা তারা বিদেশী সরকারের বেতনভুক সৈনিক। ভারতীয়রা তবে কি হিটলারের পক্ষে? না, তেমন কথাও বলা যায় না। কারণ তারা সরকারী যুদ্ধোদ্যমে ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না। সরকার বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাদের নিয়ে যাচ্ছেন তাদের যাওয়ার অধিকার কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু জোর জুলুম করলে প্রতিবাদ করছে।

তবে জোর জুলুমও কোথাও তেমন শোনা যাচ্ছিল না। বড়লাট লিনলিথ-গাউ জানতেন যে জোর জুলুম গান্ধীজী সহ্য করবেন না। জোর জুলুম হলে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। গান্ধীজীও সমস্তক্ষণ সজাগ ছিলেন সরকার পক্ষ থেকে জোর জুলুম যাতে না হয়। খবর পেলে নিষ্ক্রিয় থাকতেন না। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর একটা অলিখিত বোঝাপড়া হয়েছিল যে কোনো পক্ষই সীমা লঙ্ঘন করবেন না। বড়লাটও করবেন না কন্‌স্ক্রিপশন, গান্ধীজীও করবেন না ব্যাপক সত্যাগ্রহ। দাবাখেলার এই দুই খেলোয়াড় পরস্পরের চাল জানতেন। তাই খেলাটা চলেছিল ভালো। শেষের দিকে তো যুদ্ধবিরোধী প্রচারের জন্যে পুলিশ কারো গায়ে হাত দিত না। ফলে প্রচারকার্যও আপনা থেকে থেমে এসেছিল।

দেশকে শান্ত রেখেছিলেন বলে বড়লাট গান্ধীজীর কদর বুঝেছিলেন। তাঁকে ঘাঁটাননি। তিনিও নিজের জন্যে বা কংগ্রেসের জন্যে ক্ষমতার আসন চাননি। ফলে বড়লাটের সঙ্গে তাঁর সদ্‌ভাব ছিল। কিন্তু সেটা দেশের খরচে নয়। দেশ স্বাধীনতার অভিমুখে মার্চ করে চলেছিল। গণতন্ত্রের বেদীনির্মাণ করছিল। গুণগত সত্যাগ্রহ নাটকীয় নয় বলে নিষ্ক্রিয় নয়। আর কোনো দেশের নাগরিক যুদ্ধকালে এদেশের নাগরিকের মতো স্বাধীন ছিল না।

ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমরাই ছিলুম অগ্রগণ্য। নিরপেক্ষ দেশগুলি বাদে।

ওদিকে হিটলারের সৈন্য মার্চ করে চলেছিল সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে। আমাদের সকলেরই সহানুভূতি রাশিয়ার প্রতি। কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করা এক জিনিস আর 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' বলা আরেক। অমন করলে নিজেদের দেশের জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। ওরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গণসত্যাগ্রহ করতে গেলে দেখবে ওদের একভাগ রাশিয়ার কথা ভেবে সত্যাগ্রহবিমুখ ও যুদ্ধে সহযোগী। যুদ্ধটা নাকি 'জনযুদ্ধ'।

কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বাইরে। তাঁদের পলিসির উপর গান্ধীজীর হাত নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল জাপান আর আমেরিকাও যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছে ও জাপান একলম্ফে সিঙ্গাপুর অধিকার করেছে। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হবে কেউ ভাবতে পারেনি। আরো ঘোরালো হলো যখন মালয় আর বর্মা জাপানের অধিকারে চলে গেল। ব্রিটেনের দোরগোড়া যেমন বেলজিয়াম ভারতেরও দোরগোড়া তেমনি বর্মা। বেলজিয়াম আক্রমণ করলে যেমন ব্রিটেনকেও আক্রমণ করা হয় তেমনি বর্মা আক্রমণ করলে ভারতকেও। আমরা সকলেই নিজেদের জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠি। এবার অপরের প্রতি সহানুভূতি নয়। এবার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ভারত আক্রমণ এখন শুধু একটা সুদূর সম্ভাবনা নয়, সেটা অল্পদিনের মধ্যেই ঘটবে।

ইংরেজদের আচরণেও বোঝা গেল যে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ওঁদের ডিফেন্স সীস্টেম বিফল হয়েছে। সেটাকে যতদিন না সারাতে পারা যাচ্ছে ততদিন শত্রুর আক্রমণের মুখে অপসরণই ওঁদের নীতি। সরকার থেকে আমাদের কাছে সার্কুলার আসছিল অপসরণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে। অনেক সরকারি অফিস সমুদ্রকূল থেকে সরানো হচ্ছিল। বর্মার পর আসাম ও বঙ্গ এটা একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ সামরিক কর্মচারীদের কারো কারো সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি তাঁরা বাংলার আশা ছেড়ে দিয়ে রাঁচীতে লাইন টানছেন। সেই লাইন রক্ষা করবেন। আমার এক বন্ধু বিহারে চাকরি করতেন। তাঁকে তাঁর প্রাদেশিক সরকার জানিয়ে রেখেছিলেন যে যথাকালে তিনি বার্তা পাবেন, "বেঙ্গল কামিং।"

হাসির কথা নয়। বাংলার পাঁচ কোটি লোক অবশ্য বিহারে মামার বাড়ী যেত না, অধিকাংশই জাপানীদের অধীনে বাস করত। কিন্তু আইনে থাকে বেঙ্গল বলে সে কলকাতা থেকে বিহারে গিয়ে হাজির হতো। বর্মা যেমন হাজির হয়েছিল সিমলায় না মুসৌরীতে। আমার কাছে যে সার্কুলার এসেছিল তা পড়ে আমার বুঝতে বাকী ছিল না যে ইংরেজরা যদি যুদ্ধ করতে না পারে বা করা নিরর্থক মনে করে তবে বাংলাদেশ থেকে বিহার প্রভৃতি প্রদেশে সরে যাবে। তখন ইংরেজ পক্ষের প্রতিনিধিরা জাপানী পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার সঁপে দেবেন। বিধিমতো নয়, কার্যত। কিন্তু ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে নয়। অর্থাৎ বাংলাকে বাঙালীর হাতে সঁপে দিয়ে যাবেন না। পরাধীনকে স্বাধীনতা দেবেন না।

ব্রিটিশ অপসরণের স্বরূপ তো বর্মাতেই লক্ষ করা গেল। ওরা নিজেরাই নিজ রাজ্যের কলকারখানা খনি ইত্যাদি বোমা দিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে আসে। যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে বা শত্রুর কাজে না লাগে। একেই বলা হয় নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। রুশদেশের লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে এর নাম পোড়ামাটি। এবার হিটলারের আক্রমণের মুখেও রুশরা পোড়ামাটি করে নিজেদের নাক কেটেছে ও নাৎসীদের যাত্রাভঙ্গ করেছে। নীতিটা রুশদের পক্ষে ভালো। তা বলে বর্মীদের পক্ষেও কি ভালো? তা যদি হতো বর্মীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওটা প্রয়োগ করত, ব্রিটিশ ফৌজকে করতে হতো না। তেমনি বাংলার পক্ষে যদি ভালো হয় বাঙালীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলকাতা শহর পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ব্রিটিশ ফৌজকে ও কাজ করতে হবে না।

যেটা আক্রমণের দিন জনগণ করবে, জনফৌজ করবে সেটা কি এদেশের লোক ব্রিটিশ আর্মিকে বা তার ভারতীয় শাখাকে করতে দেবে? ভারতীয় সিপাহীরা বেতনভুক, তারা দেশের জন্যে প্রাণ দেবার জন্যে সৈন্যদলে যোগ দেয়নি। দেশরক্ষার জন্যে নতুন আর্মি সৃষ্টি করতে হবে। কে সে কাজ করবে? ইংরেজ করতে না দিলে কেমন করেই বা করবে? তার জন্যে যত সময় চাই তত সময়ই বা কোথায়? জাপানীরা কি তত সময় দেবে? তাহলে কি আমাদের কপালে আছে প্রভুপরিবর্তন ও পলায়মান প্রভু কর্তৃক কলকাতার বন্দর, হাওড়ার পুল, জামশেদপুরের ইস্পাতের কারখানা ধ্বংস? ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বরিশালের নৌকার উপর দিয়ে হাতেখড়ি হয়েছিল। জাপানীরা যাতে খেতে না পায়। ফলে বাঙালীরাই না খেয়ে মরে।

যুদ্ধ যতদিন বহুদূরবর্তী ছিল ততদিন যুদ্ধবিরোধী নীতি হয়তো সমীচীন ছিল। যুদ্ধ যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়ল তখনো কি সেই নীতি তেমনি সমীচীন হবে? যুদ্ধক্ষেত্র এখন আর বেলজিয়ামে বা রাশিয়ায় নয়, এখন বর্মায় ও এর পরেই আসামে অথবা বাংলায়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্বাচিত নয়, নির্বাচন যারা করবে তারা বিদেশী ও তাদের পক্ষে অপসরণ যেমন সহজ পোড়ামাটিও তেমনি অকাতর ও নির্মম। জাতির জীবনে এত বড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে, অথচ জাতি পড়ে থাকবে শঙ্কির চরণতলে শিবের মতো অসাড়। শবের সঙ্গে যার তুলনা। দেশ কি তাহলে মৃত?

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চার্চিল ক্যাবিনেট ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। সত্যাগ্রহী বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী তাঁরা তো মুষ্টিমেয়। যাঁরা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী তাঁরা পড়ে যান বিষম ধাঁধায়।

আঠারো

কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে জাপান ভারতের মিত্র নয়, গণতন্ত্রের শত্রু। সে যদি এই ফাঁকে ঘরে ঢুকে পড়ে তাহলে ইংরেজদের যা ক্ষতি হবে তার চেয়ে শতগুণ ক্ষতি হবে ভারতীয়দের। জাতীয়তাবাদের দিক থেকে, গণতন্ত্রের দিক থেকে জাপানী অনুপ্রবেশ বা আক্রমণ একটা অশুভ সূচনা। এর বিরুদ্ধে ভারতের নিজের স্বার্থেই রুখে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং ইংরাজরাও যখন রুখতে যাচ্ছে তখন ওদের সঙ্গে হাত মেলানোই প্রকৃষ্ট নীতি। তবে, হ্যাঁ, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের মতো নয় মিত্রের সঙ্গে মিত্রের মতো। ক্রিপসের প্রস্তাব যদি মিত্রোচিত হয়ে থাকে তবে কেন গ্রহণ করা হবে না ?

অপরপক্ষে এমন কর্মীও ছিলেন যাঁদের ধারণা জাপানের উদ্দেশ্য ভারতকে আবার পরাধীন করা নয়। সে ভারত অধিকার করতে আসেনি, সুতরাং তার সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়। শত্রুতা করতে পারে ইংরেজ, কিন্তু ভারতবাসী কেন করতে যাবে ? সুতরাং ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলাতে যাওয়া সুবুদ্ধি নয়। ইংরেজরা লড়তে চায় লড়ুক। ওটা ওদের যুদ্ধ ভারতীয়দের নয়। তা বলে ইংরেজকে বিব্রত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধু এইটুকু দেখলেই চলবে যে ওরা পোড়ামাটি করছে না। ভদ্রভাবে অপসরণ করে চলে যাচ্ছে।

আবার এমন কর্মীও ছিলেন—সাধারণত কংগ্রেসের বাইরে—যাঁরা মনে করতেন ওটা একটা মওকা। জাপান এলেই ভারত স্বাধীন হবে। জাপানের সাহায্য নিয়ে ইংরেজকে উচ্ছেদ করা যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ক্ষতি যা হবার তা ইংরেজেরই হবে, ভারতের ক্ষতির মধ্যে হবে শিকল হারানো। জাপান কখনো এদেশকে ইংরেজের মতো দাবিয়ে রাখতে পারবে না। জাপান যাবেই, রেখে যাবে ভারতের স্বাধীনতা।

সেদিন ভারতের চিন্তাজগৎ যেমন বিভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল তেমন আর কোনোদিন হয়নি। জাপানের মতো এক মহাশক্তিকে হঠাৎ প্রতিবেশী-রূপে পাওয়া একটা অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। কারো মতে ওটা মন্দ কারো মতে ভালো, কারো কারো মতে ভালোও নয় মন্দও নয়। কেউ জাপানের বিপক্ষে, কেউ পক্ষে, কেউ নিরপেক্ষ। কেউ তার বিরুদ্ধে লড়বেন, কেউ লড়বেন না, কেউ তার সাহায্য নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়বেন।

এই হলো ক্রিপস প্রস্তাবের পটভূমিকা। মহাত্মা সেবাগ্রাম থেকে নড়তে চাননি, নেহাৎ ক্রিপসের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুতার খাতিরে দিল্লী যান। মনে রাখতে হবে যে গান্ধীজীকে বড়লাট ডাকেননি, ওটা সরকারী আহ্বান নয়, কথাবার্তা বড়লাটের সঙ্গে হচ্ছে না। বড়লাট যে কী ভাবছেন তা গান্ধীজীকে জানাননি।

ক্রিপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মহাত্মা বলেন, "এই যদি হয় আপনার সমগ্র প্রস্তাব তবে আমার পরামর্শ আপনি পরের প্লেনে বাড়ী ফিরে যান।"

প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এইরূপ। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বলে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে। তার মর্যাদা হবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস। ইচ্ছামাত্র সে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করতে পারবে। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংবিধান সংরচক সংস্থা স্থাপন করা হবে। সে যে সংবিধান সংরচন করবে ব্রিটিশ সরকার তাকেই স্বীকার করে নেবেন ও সেই অনুসারে কাজ করবেন, কিন্তু দুটি শর্তে। প্রথম শর্ত যদি কোনো এক বা একাধিক প্রদেশ সে সংবিধানে সায় না দেয় তবে সে বা তারা স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে ও ব্রিটেন তাকে বা তাদের ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সমান মর্যাদা দিতে পারবে। তেমনি কোনো এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্য যদি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে চায় তার বেলা ও তাদের বেলাও তাই হবে। সংবিধান সংরচক সংস্থায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিও থাকবেন। দ্বিতীয় শর্ত, ব্রিটিশ সরকার ও সংবিধান সংরচক সংস্থার মধ্যে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদন করতে হবে, তাতে থাকবে ব্রিটিশ হস্ত থেকে ভারতীয় হস্তে সমূহ দায়িত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা।

এসব তো যুদ্ধোত্তর কালে। যদি যুদ্ধে জয় হয়। যুদ্ধকালে যুদ্ধজয়ের জন্যে যা হবে তা বড়লাটের শাসনপরিষদের ভারতীয়করণ। পারিষদরা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি। কিন্তু সামরিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব থেকে যাবে জঙ্গীলাটের হাতে। তিনিও পূর্ববৎ পরিষদের সভ্য থাকবেন। আর বড়লাটও তাঁর হস্তক্ষেপের অধিকার রাখবেন।

প্রস্তাবটা এককথায় নাকচ করবার মতো হলে কংগ্রেস নেতারা পনেরো ষোলো দিন ধরে ক্রিপস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন না। মানুষকে ভগবান ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি দেননি। দিলে হয়তো গান্ধীজীও পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করতেন না সে প্রস্তাব। তার কোথাও কি হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের উল্লেখ ছিল ? সাম্প্রদায়িক কারণে ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ছিল কি ? হিন্দু মেজরিটি বা মুসলিম মেজরিটিরও নামগন্ধ ছিল না। সেদিন যদি কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করত তাহলে ভাবী ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রথমেই রচনা করত একটি এঙমালী সংবিধান। যাদের আপত্তি হতো তারা যোগ দিত না তা ঠিক, কিন্তু প্রদেশকে প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হতো না। হলে পারস্পরিক চুক্তিতে হতো। পরের মধ্যস্থতায় নয়।

আসলে যুদ্ধজয় ছিল একটা অনিশ্চিত প্রশ্ন। যুদ্ধে সহযোগিতা চোখ বুজে করলে পোড়ামাটির দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপত। বড়লাট ও জঙ্গীলাট তো নিরাপদস্থলে অপসরণ করতেন, দেশের নেতাদেরই জাপানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতো, যেমন বর্মায়। যেটা অনিশ্চিত সেটাকে সুনিশ্চিত করতে হলে চার্চিলের মতো একজন ভারতীয় জননায়ককে রণনায়ক করতে হয়। যেমন জবাহরলাল নেহরুকে। তিনি সে ভূমিকা নিতে ইচ্ছুকও ছিলেন। তিনি রণনায়ক হলে জনগণ তাঁর পেছনে দাঁড়াত। জাপানকে প্রাচীরের মতো রোধ করত। কিন্তু সে ভূমিকা তাঁকে দিচ্ছে কে ? ক্রিপস

পরিষ্কার করে বলেন যে বড়লাটের পরিষদে জঙ্গীলাটের যে ভূমিকা তার বিশেষ কোনো রদবদল হবে না।

তৎকালীন শাসনতন্ত্র অনুসারে জঙ্গীলাট কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। এমন কি বড়লাটের কাছেও না। তাঁর নিয়োগ ভারতবর্ষে হলেও দায়িত্ব ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদের কাছে। ব্রিটেন থেকেই বোতাম টেপা হয়, সাম্রাজ্যের সতরঞ্চে সৈন্যচলাচল হয়। ইণ্ডিয়ান আর্মি আসলে ব্রিটিশ আর্মির একটি শাখা। মিলিটারি সীক্রেট একজন ভারতীয় সমরসচিবকে জানতে দেওয়া হবে, এ কি কখনো ভাবতে পারা যায়? তেমন একজন ভারতীয় যদি সচিব পদে মনোনীত হন তবে তিনি হয়তো মহামান্য আগা খান বা বিকানীরের মহারাজা জাতীয় রাজভক্ত পুরুষ। জবাহরলাল নেহরু তো ননই, মৌলানা সাহেবও না। ভারতীয়করণ ততদূর যেতে পারে না। জাপানের ভয়েও না। ভারত বা তার একাংশ যদি জাপান কেড়ে নেয় তবে ইংরেজ পরে ফেরৎ পাবে। কিন্তু যুদ্ধ বেধেছে বলে ভারতের জিনিস ভারতকে দেওয়া হবে এটা যে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অভাবনীয়।

ক্রিপস প্রস্তাব চার্চিলগোষ্ঠীর দিক থেকে বিরাট কনসেশন। কিন্তু কংগ্রেসের দিক থেকে স্বাধীনতার চেয়ে অনেক কম। সাম্রাজ্যবাদকে তার বিপদে সাহায্য করলে সে আরো শক্ত হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসবে। বিপদটা অবশ্য তার একার নয়, ভারতেরও। সেইজন্যে জবাহরলাল ও আজাদ ক্রিপসের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে আপ্রাণ করেছিলেন। কিন্তু ওদিকে চার্চিলের ও এদিকে বড়লাটের দলবল পাষাণের মতো নিরেট। যুদ্ধকালে সিভিল পাওয়ার অনেকটা ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মিলিটারি পাওয়ার কণামাত্র নয়। অথচ মিলিটারি পাওয়ার না হলে দেশ রক্ষা করা যায় না। সেই নিয়ে মতবিরোধ থেকেই ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলো। যদিও যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা নিয়েও মতবিরোধ ছিল।

কংগ্রেস নেতারা আশা করলেন যে রুজভেল্ট চার্চিলের উপর চাপ দেবেন। দিয়েওছিলেন, কিন্তু চার্চিল তাতে রুষ্ট হন। অগত্যা কংগ্রেস নেতাদের আবার সেই নাঙ্গা ফকিরের কাছে ফিরে যেতে হয় চার্চিলের সঙ্গে যাঁর উত্তরেরু দক্ষিণেরু সম্পর্ক। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন যাঁরা তাঁরা মহাত্মার শিবিরে গিয়ে যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহী হন। অহিংসার থেকে হিংসা, হিংসার থেকে অহিংসা, একটার থেকে আরেকটায় যাওয়া আসা কত সহজ!

সরকারপক্ষ ও কংগ্রেসপক্ষ উভয়পক্ষই ধরে নিয়েছিলেন যে সিঙ্গাপুরের পর যেমন মালয়, মালয়ের পর যেমন বর্মা, বর্মার পর তেমনি আসাম ও বাংলা। অন্তত সামরিক ঘাঁটিগুলোর ওপর জাপানীরা বোমাবর্ষণ করবেই, যাতে ভারত থেকে পাল্টা আক্রমণ না হয়। কলকাতাও একটা সামরিক ঘাঁটি। একটা বিরাট সামরিক ঘাঁটি। সুতরাং বিপদের আশঙ্কা শুধু যে ছিল তাই নয় বিপদ সেদিন পা টিপে টিপে আসছিল আর তার জন্যে মনটাকে আমরা বাঁধছিলুম। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে পারে সেখানে পালিয়েছিল।

পালিয়েও কি বাঁচত? পেটের খোরাকে টান পড়তই, কারণ সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্য সরকারী ভাণ্ডারে মজুত হতো ও অনটন দেখে মুনাফাশিকারীরা বাকী ফসল গুদামজাত করত ও চোরাবাজারে বেচত।

কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে, অথচ করবার কিছু নেই, যা করবার করবে জাপানীরা আর ইংরেজরা, আমরা ভারতীয়রা সাক্ষীগোপাল বা উলুখাগড়া। এই যে নিষ্ক্রিয় মনোভাব এটা দেবোচিত হতে পারে, মনুষ্যোচিত নয়। মানুষের রক্ত আছে, সে রক্ত যদি কখনো গরম হয়ে ওঠে তো এই তার সময়। গান্ধীর সাধ্য কী যে তিনি সেই সংকটক্ষণে হাত গুটিয়ে পা গুটিয়ে কচ্ছপের মতো খোলার ভিতরে থাকেন?

তিনি স্পষ্ট দেখতে পান যে দেশের বহু লোক জাপানীদের পক্ষে চলে যাবে ও সেটাকেই ঠাওরাবে দেশের মুক্তি। অপরপক্ষে কংগ্রেসেরই একাংশ হীন শর্তে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যত হবে। ছেড়ে আসা প্রাদেশিক গদীতে ফিরে যেতে চাইবে। এতদিনের সাধনা ব্যর্থ হবে। সময় থাকতে সত্যাগ্রহ না করলে সত্যাগ্রহের সুযোগ হয়তো আর কোনোদিন মিলবে না। কারণ জাপানী অধিকৃত এলাকায় তো আর সত্যাগ্রহ চলবে না। চলতে অবশ্য থিয়োরির দিক থেকে বাধা নেই, কিন্তু ও জিনিস বাইরে থেকে চালানো যায় না। ওর জন্যে গান্ধীজীকে জাপানী অধিকৃত এলাকাতেই গিয়ে বসবাস করতে হবে। ওরা তা করতে দেবে কেন? তিনি গেলে ইংরেজ অধিকৃত এলাকাতেই বা সত্যাগ্রহ চালাবার ভার নেবে কে? দেশ বিভক্ত হলে কংগ্রেসও বিভক্ত হবে, নেতারাও হবেন বিভক্ত।

এই হচ্ছে অগাস্ট অভ্যুত্থানের পটভূমিকা। গান্ধীজী যদি কিছু না করতেন তাহলে পরে হয়তো আর করবার সুযোগ পেতেন না। বলতে গেলে ওই তাঁর শেষ সুযোগ। অথচ ওই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কিছু করতে যাওয়াও মারাত্মক। ইংরেজ কর্তারা তাঁকে ও তাঁর দলের লোকজনকে রাজদ্রোহের অভিযোগে কোর্টমার্শাল করে মারতেও পারতেন। গান্ধী ভিন্ন আর কেউ অত বড়ো ঝুঁকি নিতে সাহস পেতেন না। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত যেমন অসমসাহসিক তাঁর নামের মহিমাও তেমনি অসীম নৈতিক শক্তিময়। তাঁকে কোর্টমার্শাল করে গুলী করলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লব। ব্রিটিশ কর্তারা সে ঝুঁকি নিতেন না, তাই তিনি কিছু করতে যাবার আগেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে ও তাঁর দলবলকে। সবাইকে ধরবার আগেই কতক কর্মী ছিটকে পড়েন ও ছিটিয়ে যান। যাকে বলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান।

"কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি" একটি মন্ত্র। উচ্চারণ যিনি করেছিলেন তিনি একজন ঋষি। শ্রবণ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা দুই আগুনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামকে গ্রাম শহরকে শহর শাসনমুক্ত করতেন। থাকতে দিতেন না ইংরেজের শাসনে। পড়তে দিতেন না জাপানীর শাসনে। এবারকার আন্দোলন জেলযাত্রায় নয়। জেলযাত্রা অতিশয় নরম। ওর চেয়ে কঠিন কিছুর দরকার ছিল। কর্মীরা নিজেরাই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সেটা করেন। গান্ধীজীর

ঢালা হুকুম ছিল, "করো, নয়তো মরো"। মরতে বলা হয়েছিল, কিন্তু মারতে বলা হয়নি, এটা স্মরণযোগ্য।

তবে জনতা মারমুখো হয়ে বিপুল সম্পত্তি বিনাশ করেছিল। মানুষও মেরেছিল অল্পস্বল্প। সরকারপক্ষ গোড়ার দিকে সামলাতে পারেননি, কিন্তু পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যে সামলে নেন। তারপর দারুণ প্রতিশোধ নেওয়া হয়। বন্ধুদের মুখে শোনা, গ্রামকে গ্রাম ঘেরাও করে নিরীহ মানুষগুলোকেও গুলী করে মারা হয়। গাছের ডালে লটকিয়ে দেওয়া হয়।

ওদিকে 'জাতীয় সরকার'ও নেহাৎ অহিংস ব্যাপার ছিল না। সেও মোটা লোক দেখলে মোটা জরিমানা আদায় করত, না দিলে জেলে পাঠাত। তখন শুনিনি, বছর দু-তিন আগে কোনো এক স্থানের 'জাতীয় সরকারের' তখনকার দিনের একজন কর্তাব্যক্তির রচনায় পড়েছি, জাতীয় সরকারও কতক লোককে ঝুলিয়েছিলেন। গাছের ডালে ঝুলন্ত শব থেকে কাদের ঝোলানো তা কি এতকাল পরে জানবার উপায় আছে? তখন তো আমি সরল বিশ্বাসে ধরে নিয়েছিলুম যে ওটা মিলিটারির কাজ।

"কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি" বলতে এটাও বোঝায় যে কোনো পক্ষ আদালতে যাবে না, জজদের জানতে দেবে না। একপক্ষ ঝোলাবে দেশদ্রোহীদের, অপরপক্ষ ঝোলাবে রাজদ্রোহীদের। কেই বা কার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছে! পুলিশ তো ঢুকতে পারবে না। ঢুকলে সেও তো গুঁতোবে। যাই হোক, এ অবস্থা বেশীদিন ছিল না। তবে দুটো-একটা জায়গায় 'জাতীয় সরকার' দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। বাংলার গভর্নর আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন, "আমি সারা বাংলার গভর্নর, বাদ রামনগর থানা!"

অহিংসা তখন প্রথম প্রশ্ন নয়, প্রথম প্রশ্ন কিছু একটা করা, করে দেখানো যে আমরা উলুখাগড়া নই, আমরাও রাজা। আমরা সবাই রাজা। হোক না কেন অরাজকতা। অরাজকতাও মন্দের ভালো, তবু পরাধীনতা ভালো নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি এ নীতি মানতেন তবে অরাজকতার ভয়ে ব্রিটিশ শাসন স্বীকার করতেন না। ইংরেজ রাজত্বের পেছনে বেয়োনেট ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা অরাজকতার হাত থেকে নিস্তারের উপায় ছিল।

গান্ধীজী কেবল যে বেয়োনেটের হাত থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন তাই নয়, তিনি ইংরেজ রাজত্বের মূল প্রয়োজনের হাত থেকেও চেয়েছিলেন মুক্তি। অরাজকতার দিন লোকে নিজেরাই নিজেদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করবে। গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠবে গণ পঞ্চায়েৎ। ভিলেজ রেপাবলিক। বিনা হাতিয়ারেই তারা চোর ডাকাত ও বাইরের আক্রমণকারীদের রুখবে। মরবে, মারবে না। মার খাবে; তবু খাজনা দেবে না। সম্পত্তি খোয়াবে, তবু মান খোয়াবে না। এরকম সাত লক্ষ রেপাবলিক যে দেশের আছে তার কিসের ভয়? বেয়োনেট তার কী করতে পারে?

তিনি প্রথম যেবার গণসত্যাগ্রহ করতে যান সেবার সাত লক্ষ রেপাবলিকই ছিল তাঁর ধ্যান। বারদোলির থেকে শুরু হতো পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ।

শেষ হতো কবে আর কোথায় তা ভগবানের ভাবনা। তড়িৎগতিতে গণসত্যাগ্রহ সারা হবে এমন কথা তিনি বলেননি। পরে আর তিনি ও ধরনের গণসত্যাগ্রহ করলেন না। যেটা হলো সেটা লবণ আইন ও অন্যান্য আইনভঙ্গ। অথবা বরকট। ১৯২২ সালের মনের সাধ মনেই রয়ে যায়। ঠিক বিশ বছর পরে ১৯৪২ সালে সেই পুরাতন স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। এবারকার গণসত্যাগ্রহ গ্রামে গ্রামে গণ-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করবে, নিচের দিক থেকে পিরামিডের মতো গড়ে উঠবে নতুন শাসনব্যবস্থা, যার অধোভাগ প্রশস্ত, ঊর্ধ্বভাগ সঙ্কীর্ণ।

ততদিনে তিনি রক্তাক্ত অরাজকতার ভীতি কাটিয়ে উঠেছেন। চৌরীচৌরা আর তাঁকে নিবৃত্ত করবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

"That is the consideration that has weighed with me all these twenty-two years. I waited and waited, until the country should develop the non-violent strength necessary to throw off the foreign yoke. But my attitude has now undergone a change. I feel that I cannot afford to wait. If I have to wait, I might have to wait till doomsday. For the preparation that I have prayed for and worked for may never come, and in the meantime, I may be enveloped and overwhelmed by the flames that threaten all of us. That is why I have decided that even at certain risks, which are obviously involved, I must ask the people to resist the slavery."

উনিশ

অগাস্ট অভ্যুত্থান গণসত্যাগ্রহ নয়। গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ করবার পূর্বেই গান্ধীজীকে বন্দী করা হয়। সুতরাং ওটা অনারব্ধ থেকে গেল। ইতিহাসের গর্ভে অজাত সন্তানের মতো।

তার বদলে যেটা ঘটে সেটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক উচ্ছ্বাস। বন্যা বা ভূমিকম্প। কিন্তু তার পেছনেও কংগ্রেস কর্মীদের হাত ছিল। বেশীর ভাগই বামপন্থী, কিছু কিছু আবার গোঁড়া গান্ধীপন্থী। সচরাচর যাঁরা খাদির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। রাজনীতির ঘোলাজলের বাইরে পবিত্র জীবন যাপন করেন।

কলকাতায় তখন নিষ্প্রদীপ। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালে কেই বা টের পাচ্ছে? একদিন আঁধার রাতে কলকাতার এক নির্জন পথে আমরা তিনজন পায়চারি করছিলুম। আমার স্ত্রী, আমি ও আমাদের গান্ধীবাদী বন্ধু। অবাক কাণ্ড। তিনি তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরছেন। আসাম থেকে তাঁর কাছে কর্মীরা আসেন নির্দেশ নিতে।

ফিরে গিয়ে সেই নির্দেশ পালন করেন। কী রকম নির্দেশ? টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেল লাইন ভেঙে ফেলা এসব শুনলে আমি স্তম্ভিত হতুম না, কারণ বিহারেও এসব হয়েছিল, আর আমি তখন বাঁকুড়ায়। স্তম্ভিত হলুম যখন বন্ধুর মুখে শুনলুম যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন রেলের পুল ধ্বংস করতে। কী সর্বনেশে কথা!

তিনি আমাকে বোঝান যে রেলের পুল ধ্বংস করলে মিলিটারি যাতায়াত বন্ধ হবে। জাপানীরা এগিয়ে আসতে পারবে না, ইংরেজরাও এগিয়ে যেতে পারবে না। মাঝখানে একটা এলাকা থাকবে, সেটা নো ম্যানস ল্যাণ্ড। সেখানে আমরাই রাজা। তা ছাড়া সেটা হবে যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ চলবে না। দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্যেই যাতায়াতের ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে।

দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্যে দুই পাগলা ষাঁড়কে পরস্পরের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখা যে শান্তিবাদীর কর্তব্য সে বিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ছিল, "উপায়টা কি অহিংস? রেলের পুল ধ্বংস করা—।"

"আমাদের সম্পত্তি, ইংরেজদের সম্পত্তি নয়। আমাদের সম্পত্তি আমরা যদি ধ্বংস করি তবে হিংসা হবে কেন? মানুষকে তো মারছিনে। বরং মানুষকে যুদ্ধের মুখ থেকে বাঁচাতে চাইছি। নির্দেশ দেওয়া আছে যেন একটিও প্রাণ নষ্ট না হয়।" বন্ধুর উক্তি।

অর্থাৎ এটাও এক প্রকার পোড়ামাটি। তফাৎ এই যে এটা দুই যুধ্যমান পক্ষের বিরুদ্ধে। ইংরেজরা বলবে সাবোটাশ। কিন্তু ইতিহাস বলবে আত্মরক্ষা।

ওই পুল হয় ইংরেজরা ওড়াত, নয় জাপানীরা ওড়াত। ওসব রেললাইন হয় ইংরেজরা ওপড়াত, নয় জাপানীরা ওপড়াত। ওসব টেলিগ্রাফের তার হয় ইংরেজরা কাটত, নয় জাপানীরা কাটত। জাপানীরা যদি আক্রমণ করত তাহলে ওর নাম হতো মিলিটারি নেসেসিটি। তখন সকলের মুখ বন্ধ। কিন্তু শান্তিবাদীরা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়। ও যে অহিংসা নয়।

গান্ধীজীকে আগা খান্ প্রাসাদে বন্দী করে বড়লাট তাঁকেই দায়ী করেন অগাস্ট অভ্যুত্থানের যাবতীয় যুদ্ধবিরোধী সমাজবিরোধী আইনবিরোধী ঘটনার জন্যে। তিনি সে দায়িত্ব অস্বীকার করেন ও বড়লাটকে পরামর্শ দেন আদালতে বিচারের জন্যে পাঠাতে। এই নিয়ে পত্রব্যবহার অনেকদিন ধরে গড়ায়। তারপরে বেরোয় সরকারী প্রচারপুস্তিকা, তাতে অভ্যুত্থানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কংগ্রেসকে ও গান্ধীকে বিনা বিচারে অপরাধী করা হয়। দুনিয়ার চারিদিকে রটে গান্ধী ও কংগ্রেস যে কেবল ব্রিটেনের শত্রু তাই নয়, জাপানের মিত্র ও তাঁদের কার্যকলাপ যুদ্ধজয়ের পরিপন্থী। গান্ধীর বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ তিনি অহিংসার বদলে হিংসার বিধান দিয়েছেন।

এর কোন প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে গান্ধীজী অনশনের সংকল্প নেন।

তখন জানানো হয় তাঁকে অনশন কালের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি তার উত্তরে বলেন, ছেড়ে দিলে তিনি অনশন নাও করতে পারেন। তখন প্রতিকারের অন্য উপায় পাবেন। তা শুনে বড়লাট সিদ্ধান্ত করেন যে অনশনটা বিনা শর্তে মুক্তি পাবার জন্যে একটা চাল। কাজেই অনশনের একুশ দিন ছেড়ে দেওয়া হবে এরূপ প্রস্তাব রদ করেন।

এমনি করে শুরু হয় সেই হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা। গান্ধীজীর না হোক আমাদের। কিছুই করতে পারিনে আমরা। এত অসহায়। ওই অনশন পর্যন্তই আমাদের দৌড়। সেটা আর কতটুকু সময়ের জন্যে! একুশ দিন ধরে চলে তাঁর অনশনের ম্যারাথন। কী করে যে বাঁচলেন!

লোকে একটি আঙুলও নাড়ল না। দার্শনিকের মতো মৌন হয়ে দেখল। ছ'মাস আগে যারা অত বড়ো একটা বিদ্রোহ করতে পারল ছ'মাস পরে তারা একেবারে ঠাণ্ডা। এই হচ্ছে হিংসার পরিণাম। হিংসাকে প্রতিহিংসা দিয়ে দমিয়ে দিলে পরে সে আর মাথা তুলতে পারে না। সিপাহী বিদ্রোহীর বেলাও তাই হয়েছিল।

গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টির জন্যে গভর্নমেণ্ট উদার ব্যবস্থা করেছিলেন। চন্দনকাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটদেরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে শান্তিভঙ্গ না হয়। আমার ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু খবরটা আমাকে দেন। না, শান্তিভঙ্গের লেশমাত্র লক্ষণ ছিল না। গান্ধীজীর প্রয়াণ লোকে শান্তভাবেই নিত। কিন্তু ক্ষমা করত না ইংরেজদের।

ইতিহাসের রায় কী বলতে পারিনে, কিন্তু আমার নিজের রায়, ওই অগাস্ট মাসটাই তাঁর জীবনের ফাইনেস্ট আওয়ার, সুন্দরতম ঘটিকা। যুদ্ধকালে আর কখনো কেউ যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী জন আন্দোলনের ডাক দিয়ে যাননি। রেজিস্টান্স বা প্রতিরোধ হয়েছে হিটলার অধিকৃত ফ্রান্সে। যুগোস্লাভিয়ায় হয়েছে নাৎসী আক্রমণের পর সশস্ত্র বিদ্রোহ। কিন্তু ওসব সংগ্রাম যুদ্ধকালীন হলেও শান্তির জন্যে নয়, দুই আগুনের মধ্যবর্তী নয়। তা ছাড়া ওসব দেশের সাময়িক শাসকগণ অনবচ্ছিন্ন দুই শতাব্দীর বন্ধমূল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঊর্ধ্বতম অঙ্গ নন। গান্ধীর ওই কীর্তি যদিও গণসত্যাগ্রহ নয় তা হলেও ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বাইরে যদিও থাকতে দেওয়া হলো না তাঁকে, তবু নিছক আত্মিক বল দিয়ে তিনিই নেপথ্য থেকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন মনে আছে যে শরীর না থাকাটাই সব চেয়ে ভালো, শরীরটা কেবল বাধা দেয়। অবারিত আত্মা তাহলে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। তিনি যদি শুধু চিন্তাই করেন, আর কিছু না করেন, তা হলেও কাজ তাঁর চিন্তামতো হবে। অর্থাৎ তাঁকে জেলেই পোরা হোক আর গুলীই করা হোক, যে চিন্তা সেই কাজ। এখন চিন্তাটাই আসল। চিন্তার সাহস ক'জনের আছে? আর সে চিন্তা এমন চিন্তা হওয়া চাই যা ইতিহাসের গতিপথের নির্দেশক। ব্যক্তিবিশেষের দিবাস্বপ্ন নয়।

গান্ধীজী সেদিন ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গেই

তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলী করা হতো যদি জাপান সেই মুহূর্তে জয়যাত্রা করে ইংরেজকে কোণঠাসা করত। গান্ধীজী সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই এমন লগ্নে বিদ্রোহ করেন যে লগ্ন জাপানী আক্রমণের প্রতিকূল। যখন বাংলায় আসামে চতুর্মাস্যা। তা ছাড়া একথাও তিনি বলে রাখেন যে জাপানীরা তাঁর আন্দোলনের সুযোগ নিলে তিনি তা বন্ধ করে দেবেন।

কিন্তু এহো বাহ্য। এর চেয়ে গূঢ় সত্য হলো তাঁর হৃদয় ছিল ইংরেজদের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি ওঁদের আন্তরিক ভালোবাসতেন। আর ওঁরাও সেটা অনুভব করতেন। অগাস্টের আগে বড়লাট বলেছিলেন প্রখ্যাত মার্কিন লেখক লুইস ফিশারকে—

"Make no mistake about it.···The old man is the biggest thing in India.···He has been good to me.···If he had come from South Africa and been only a saint he might have taken India very far. Butt he was tempted by politics.···I have been here six years and I have learned restraint···but if I felt that Gandhi was obstructing the war effort I would have to bring him under control."

তা ছাড়া ইংরেজ প্রধানরাও দেয়ালের লিখন পড়তে জানতেন। সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মার পতন তাঁদের প্রেস্টিজে নাড়া দিয়েছিল। শুধুমাত্র গায়ের জোরে তো এত বড়ো সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় না। প্রভাব প্রতিপত্তিও চাই। বড়লাটই লুইস ফিশারকে বলেছিলেন, "আমরা ভারতবর্ষে থাকতে যাচ্ছিনে। অবশ্য, কংগ্রেস একথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা এদেশে থাকব না। আমরা প্রস্থানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।"

স্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাকসওয়েল তো আরো খোলসা করে বলেছিলেন ফিশারকে, "যুদ্ধ শেষ হবার দু'ছর বাদেই আমরা এদেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

এসব কথা অগাস্ট ঘটনাবলীর পূর্বের। পূর্বের থেকেই প্রস্থানের ভাব মনে উদয় হয়েছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের খুব বেশী মতভেদ ছিল না। মাত্র পাঁচ বছর এদিক ওদিকের। একটা জাতির ইতিহাসে পাঁচটা বছর এমন কী বেশী সময়! তবু গান্ধীর কাছে ব্যবধানটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটিকায় তিনি ভারতকে এমন এক মহত্ত্ব দিতে চেয়েছিলেন যার দরুন আর সব দেশের লোক তার দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাত। তার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত। কে জানে সে হয়তো বিশ্বশান্তির দূত হতো।

অনেকেই ধরতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য জাপানের সঙ্গে সম্মানজনক সন্ধি করা। সেটা ইংরেজ থাকতে হবার নয়। ইংরেজ আমেরিকানরা জাপানের আত্মসমর্পণ চায়। জাপানও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। এরাও শর্তাধীন আত্মসমর্পণ গ্রাহ্য করবে না। তাহলে ভারত কেনই বা এই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বে! জাপান এমন কী ক্ষতি করেছে ভারতের!

তাহলে দেখা যাচ্ছে ওর পেছনে ছিল পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন। সে প্রশ্নে গান্ধী বড়লাট কখনো একমত হতে পারতেন না। গান্ধী চার্চিল তো উত্তর-মেরু দক্ষিণমেরু। রুজভেল্ট ভারতের বন্ধু হলেও জাপানের শত্রু। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি যদি ভারতেরও পররাষ্ট্রনীতি হয় তবে রুজভেল্টের সৌজন্যে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে কংগ্রেস রুজভেল্টেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ও জাপানের শত্রু হবে। অমন করলে জাপানকে অকারণে খোঁচানো হয়। সে কি সন্ধি করবে ভারতের সঙ্গে? দেশ কি যুদ্ধক্ষেত্র হবে না? গান্ধী যুদ্ধ ডেকে আনতে চান না। কিন্তু জাপান যদি আসে প্রতিরোধ করবেন।

গান্ধীজীর পররাষ্ট্রনীতি ছিল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশের মতো। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটাও স্বাধীন মানুষের মতো। চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার নাম ভারতীয় স্বাধীনতা নয়। জাপানকে রুখতে হবে একশো বার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তাও চালাতে হবে। তাতে যদি যুদ্ধ একটু আগে শেষ হয় তাহলে তো বিশ্বের আরাম, আর যদি কোনো পক্ষকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ না করতে হয় তবে তো আরো উত্তম।

যেখানে সামরিক কর্তৃত্ব নিয়ে গভীর মতবিরোধ, যেখানে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মূলগত মতভেদ সেখানে যুদ্ধকালীন গভর্নমেণ্ট গঠন করা যায় না, যুদ্ধকালীন অসহযোগই সেখানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নীতি। অগাস্ট অভ্যুত্থান গভর্নমেণ্ট পরিবর্তনের জন্যে পরিকল্পিত হয়নি, যদিও কংগ্রেসের অগাস্ট প্রস্তাবটা পড়লে সেইরকম মনে হবে। পরিকল্পনাটা জনগণকে জাগানো ও তাদের ভাগ্য তাদের হাতে নিতে শেখানো। যুদ্ধে নয়, যুদ্ধবিরোধিতাতেই তাদের আত্মশক্তির উপলব্ধি।

অগাস্ট আন্দোলন অল্পদিন স্থায়ী হলেও আত্মউপলব্ধির একটা মধুর স্বাদ রেখে যায়। তার সঙ্গে অহিংসার স্বাদ থাকলে সে মাধুরী তিক্ততাহীন হতো। সেটা হবার নয়। স্বাধীনতা যেমন অনেকদূর এগিয়ে গেল, অহিংসা তেমনি অনেকদূর পিছিয়ে রইল। অগাস্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বাধীনতার দিক থেকে প্রগতি, অহিংসার দিক থেকে অগতি। গান্ধীজী একই সঙ্গে জিতলেন ও হারলেন। দেশ দিনকের দিন সহিংস ও অরাজক হলো। তবে তার আগে কিছুকাল বলহীন ও অবসন্ন।

সেই অবসাদের সময়টাতেই বাংলার মন্বন্তর ঘটে যায়। বাংলা সরকার চরম অপদার্থতার পরিচয় দেন। আশ্চর্যের কথা বড়লাট লিনলিথগাউ ছিলেন কৃষিবিশারদ। প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন কৃষি কমিশনের সভাপতি হয়ে। ভারত সরকারের সর্বময় কর্তা-হিসাবে তিনিও দায়িত্ব এড়াতে পারতেন না। মন্বন্তর বিহারে ও যুক্ত প্রদেশেও ছড়াতে যাচ্ছিল। সেসব প্রদেশের গভর্নররা কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করেন। ছুটি নিয়ে আলমোড়ায় বসে আমি গভর্নর হ্যালেটের সুব্যবস্থার সাক্ষী হই।

বাংলা আর যুক্ত প্রদেশ এই দুই জায়গার অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই শিক্ষা হয় যে ভারতীয় ধনিকদের বিশ্বাস করা যায় না, তাদের উপরে অঙ্কুশ

প্রয়োগ করা চাই। আর সেকাজ ইংরেজরাই ইচ্ছা করলে পারতেন। যেখানে নির্বোধ নন।

কথাগুলো আমি গান্ধীজীকে শোনাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু শোনাতে পারিনি। শোনালে লাভ কী হতো? ভারতীয় ধনিকদের সুমতি উদ্রেক করা তাঁরও সাধ্যের বাইরে। অহিংসার সব চেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল কী করে গরিবকে বড়লোকের শোষণ থেকে বাঁচাতে হয়। সে সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার আগেই আরেক সমস্যা তাঁর কাল হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা।

গান্ধীজী যখন জেলে তখন তাঁর পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব ছিল না সাম্প্রদায়িক দলগুলি কী ভাবে পরস্পরবিরোধী কার্যক্রমের দ্বারা পরস্পরের বলবৃদ্ধি করে চলেছে। দৃশ্যত শত্রু, বস্তুত মিত্র। সাম্প্রদায়িকতা উভয়ক্ষেত্রেই জাতীয়তার নামাবলী ধারণ করেছিল। মুসলিমরা নাকি এখন একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। তেমনি হিন্দুরাও একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। এ যেমন মুসলিম লীগের নয়া থীসিস তেমনি হিন্দু মহাসভার নতুন তত্ত্ব হলো হিন্দুরাই একমাত্র নেশন, মুসলমান খ্রীষ্টানরা নেশন নয়, এলিয়েন। কতকটা জার্মান ইহুদীর মতো। সেদিন জনমত এমন বিভ্রান্ত ছিল যে জাতীয়তার মুখোশপরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তা বলে অনেকে ভুল বুঝেছিল ও প্রশ্রয় দিয়েছিল।

যে প্রদেশে ত্রিশ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একটু ফ্যান না পেয়ে একমুঠো ভাত না পেয়ে পথে ঘাটে মারা যায় সেই প্রদেশেই শোনা গেল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ জিতেছে। আমার ধারণা ছিল লীগ হেরে যাবে, কারণ যুদ্ধের সময় যখন চট্টগ্রাম নোয়াখালী বরিশাল বিপন্ন তখন লীগ অগাস্ট অভ্যুত্থানের মতো কোনো আন্দোলন করেনি, যা করবার তা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। অগাস্ট অভ্যুত্থানে মুসলমানরা প্রায় জায়গায় সরে দাঁড়িয়েছে। আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তার সময় তিনি বলেন, "আমার প্রদেশের মুসলমানরা তো কংগ্রেসকে অভিশাপ দিচ্ছে।"

তিনি যুক্ত প্রদেশের মুসলমান। সিপাহীবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তাঁর স্মরণে জ্বলজ্বল করছে। হিন্দু মুসলমান একযোগে বিদ্রোহ করে ফায়দা কী হলো? মুসলমানদের ধরে ধরে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ওদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। আর হিন্দুরা সেসব কিনে নিয়ে বড়লোক হয়ে গেল। এই অগাস্ট অভ্যুত্থানও তো সেই রকম একটা বিদ্রোহ। এতে যোগ দিলে মুসলমানরাই পশতাবে।

আমার অপর এক মুসলমান বন্ধু খাকসার। এমন ত্যাগবীর আমি দেখিনি। মন্বন্তরের সময় তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা করলে বহু লোক প্রাণে বাঁচত। স্বার্থপর মুসলমান মন্ত্রীরা তাঁকে তা করতে দেননি বলে তিনি পদত্যাগ করেন। আমাকে বলেন, "আমরা সবাই এই দুর্ভিক্ষের দায়ে দায়ী। কারো বিবেক নির্মল নয়। আপনারও না।" আমি বলি, "আমি তো জজ। আমার কী দায়!" তিনি বললেন, "আপনি এই সরকারের কর্মচারী।"

আমার সেই গান্ধীভক্ত খদ্দরভক্ত অথচ খাকসার বন্ধুও আমাকে এর আগেই বলেছিলেন যে, "আপনি আশা করছেন আমরা ও আপনারা এক নেশন গঠন করব। তা হবে না।" পরে তিনি এক খাকসার পত্রিকা পাঠিয়ে দেন। দেখি তিনি পাকিস্তান চান।

অগাস্ট অভ্যুত্থান একটা প্যারাডক্স। পাকিস্তানকেও সে কয়েক কদম এগিয়ে আনে। গান্ধী কী করে জানবেন যে স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানরা কংগ্রেসের ভয়েই পাকিস্তানী হবে।

বিশ

অগাস্ট অভ্যুত্থানের মূলে এই ভয়টাও একটা প্রেরণা ছিল যে ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালাবে, আমাদের প্রভুবদল ঘটবে। প্রভুবদলের ভয়েই আমরা সেদিন অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলুম। অহিংসার নিয়ম মানতে পারিনি। প্রভুবদলের আশঙ্কা না থাকলে সেই আমরাই অহিংসার দৃষ্টান্ত দেখাতুম।

তেমনি ঝীণা সাহেবের ও তাঁর অনুবর্তীদের প্রাণেও ছিল আরেক রকম প্রভুবদলের ভয়। ইংরেজ তাঁদের কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আর কংগ্রেস তখন অহিংসার কথা ভুলে গিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে ব্রুট মেজরিটির শাসন চালাবে। হিন্দুদের বুটের তলায় পড়ে থাকবে আর সব সম্প্রদায়। মাইনরিটি কোনোদিন গণতন্ত্রের পথ ধরে মেজরিটি হবে না। সুতরাং কংগ্রেস মেজরিটিই চিরন্তন হবে। সেটা হবে ব্রিটিশ রাজত্বের চেয়েও চিরস্থায়ী। ইংরেজরা বিদেশী লোক। তারা একদিন বিদায় নিতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা তো যাবার মানুষ নয়, তাদের যাবার জায়গাও নেই। কাজেই তারা মুসলমানদের মাথায় চড়ে বসে থাকবে। সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে যেমন সেই বুড়ো।

এই ভয়টাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারাই, মায় গান্ধী। তারা খোলাখুলি বলে বেড়িয়েছিলেন যে ইংরেজের পরে কংগ্রেস। কংগ্রেসের হাতেই ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবে। মুসলমানরা যদি ক্ষমতার অংশ চায় তো কংগ্রেসে যোগ দিক ও স্বাধীনতার জন্যে লড়ুক। মুসলমানদের জন্যে আবার আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী কেন? তেমন মণ্ডলী যতদিন না রহিত হয়েছে ততদিন তাতে কংগ্রেসও প্রার্থী দেবে। মুসলিম প্রার্থী অবশ্য। কংগ্রেস মুসলিম প্রার্থীরা জয়ী হলে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাঁদের ভিতর থেকেই মুসলিম মন্ত্রী নেওয়া হবে। বাইরে থেকে যদি কাউকে নেওয়া হয় তো তিনি কংগ্রেস অঙ্গীকারনামায় সই করবেন। ইতিমধ্যে আটটা প্রদেশ কংগ্রেসের ছত্রতলে এসেছিল। এর পরের ধাপটা কেন্দ্রে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব। অন্যনিরপেক্ষ মেজরিটি যদি সে পায় তবে তাকে হটাবে কে ও কবে?

প্রয়োগ করা চাই। আর সেকাজ ইংরেজরাই ইচ্ছা করলে পারতেন। যেখানে নির্বোধ নন।

কথাগুলো আমি গান্ধীজীকে শোনাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু শোনাতে পারিনি। শোনালে লাভ কী হতো? ভারতীয় ধনিকদের সুমতি উদ্রেক করা তাঁরও সাধ্যের বাইরে। অহিংসার সব চেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল কী করে গরিবকে বড়লোকের শোষণ থেকে বাঁচাতে হয়। সে সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার আগেই আরেক সমস্যা তাঁর কাল হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা।

গান্ধীজী যখন জেলে তখন তাঁর পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব ছিল না সাম্প্রদায়িক দলগুলি কী ভাবে পরস্পরবিরোধী কার্যক্রমের দ্বারা পরস্পরের বলবৃদ্ধি করে চলেছে। দৃশ্যত শত্রু, বস্তুত মিত্র। সাম্প্রদায়িকতা উভয়ক্ষেত্রেই জাতীয়তার নামাবলী ধারণ করেছিল। মুসলিমরা নাকি এখন একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। তেমনি হিন্দুরাও একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। এ যেমন মুসলিম লীগের নয়া থীসিস তেমনি হিন্দু মহাসভার নতুন তত্ত্ব হলো হিন্দুরাই একমাত্র নেশন, মুসলমান খ্রীষ্টানরা নেশন নয়, এলিয়েন। কতকটা জার্মান ইহুদীর মতো। সেদিন জনমত এমন বিভ্রান্ত ছিল যে জাতীয়তার মুখোশপরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তা বলে অনেকে ভুল বুঝেছিল ও প্রশ্রয় দিয়েছিল।

যে প্রদেশে ত্রিশ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একটু ফ্যান না পেয়ে একমুঠো ভাত না পেয়ে পথে ঘাটে মারা যায় সেই প্রদেশেই শোনা গেল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ জিতেছে। আমার ধারণা ছিল লীগ হেরে যাবে, কারণ যুদ্ধের সময় যখন চট্টগ্রাম নোয়াখালী বরিশাল বিপন্ন তখন লীগ অগাস্ট অভ্যুত্থানের মতো কোনো আন্দোলন করেনি, যা করবার তা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। অগাস্ট অভ্যুত্থানে মুসলমানরা প্রায় জায়গায় সরে দাঁড়িয়েছে। আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তার সময় তিনি বলেন, "আমার প্রদেশের মুসলমানরা তো কংগ্রেসকে অভিশাপ দিচ্ছে।"

তিনি যুক্ত প্রদেশের মুসলমান। সিপাহীবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তাঁর স্মরণে জ্বলজ্বল করছে। হিন্দু মুসলমান একযোগে বিদ্রোহ করে ফায়দা কী হলো? মুসলমানদের ধরে ধরে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ওদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। আর হিন্দুরা সেসব কিনে নিয়ে বড়লোক হয়ে গেল। এই অগাস্ট অভ্যুত্থানও তো সেই রকম একটা বিদ্রোহ। এতে যোগ দিলে মুসলমানরাই পশতাবে।

আমার অপর এক মুসলমান বন্ধু খাকসার। এমন ত্যাগবীর আমি দেখিনি। মন্বন্তরের সময় তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা করলে বহু লোক প্রাণে বাঁচত। স্বার্থপর মুসলমান মন্ত্রীরা তাঁকে তা করতে দেননি বলে তিনি পদত্যাগ করেন। আমাকে বলেন, "আমরা সবাই এই দুর্ভিক্ষের দায়ে দায়ী। কারো বিবেক নির্মল নয়। আপনারও না।" আমি বলি, "আমি তো জজ। আমার কী দায়!" তিনি বললেন, "আপনি এই সরকারের কর্মচারী।"

আমার সেই গান্ধীভক্ত খদ্দরভক্ত অথচ খাকসার বন্ধুও আমাকে এর আগেই বলেছিলেন যে, "আপনি আশা করছেন আমরা ও আপনারা এক নেশন গঠন করব। তা হবে না।" পরে তিনি এক খাকসার পত্রিকা পাঠিয়ে দেন। দেখি তিনি পাকিস্তান চান।

অগাস্ট অভ্যুত্থান একটা প্যারাডক্স। পাকিস্তানকেও সে কয়েক কদম এগিয়ে আনে। গান্ধী কী করে জানবেন যে স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানরা কংগ্রেসের ভয়েই পাকিস্তানী হবে।

বিশ

অগাস্ট অভ্যুত্থানের মূলে এই ভয়টাও একটা প্রেরণা ছিল যে ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালাবে, আমাদের প্রভুবদল ঘটবে। প্রভুবদলের ভয়েই আমরা সেদিন অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলুম। অহিংসার নিয়ম মানতে পারিনি। প্রভুবদলের আশঙ্কা না থাকলে সেই আমরাই অহিংসার দৃষ্টান্ত দেখাতুম।

তেমনি ঝীণা সাহেবের ও তাঁর অনুবর্তীদের প্রাণেও ছিল আরেক রকম প্রভুবদলের ভয়। ইংরেজ তাঁদের কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আর কংগ্রেস তখন অহিংসার কথা ভুলে গিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে ব্রুট মেজরিটির শাসন চালাবে। হিন্দুদের বুটের তলায় পড়ে থাকবে আর সব সম্প্রদায়। মাইনরিটি কোনোদিন গণতন্ত্রের পথ ধরে মেজরিটি হবে না। সুতরাং কংগ্রেস মেজরিটিই চিরন্তন হবে। সেটা হবে ব্রিটিশ রাজত্বের চেয়েও চিরস্থায়ী। ইংরেজরা বিদেশী লোক। তারা একদিন বিদায় নিতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা তো যাবার মানুষ নয়, তাদের যাবার জায়গাও নেই। কাজেই তারা মুসলমানদের মাথায় চড়ে বসে থাকবে। সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে যেমন সেই বুড়ো।

এই ভয়টাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারাই, মায় গান্ধী। তারা খোলাখুলি বলে বেড়িয়েছিলেন যে ইংরেজের পরে কংগ্রেস। কংগ্রেসের হাতেই ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবে। মুসলমানরা যদি ক্ষমতার অংশ চায় তো কংগ্রেসে যোগ দিক ও স্বাধীনতার জন্যে লড়ুক। মুসলমানদের জন্যে আবার আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী কেন? তেমন মণ্ডলী যতদিন না রহিত হয়েছে ততদিন তাতে কংগ্রেসও প্রার্থী দেবে। মুসলিম প্রার্থী অবশ্য। কংগ্রেস মুসলিম প্রার্থীরা জয়ী হলে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাঁদের ভিতর থেকেই মুসলিম মন্ত্রী নেওয়া হবে। বাইরে থেকে যদি কাউকে নেওয়া হয় তো তিনি কংগ্রেস অঙ্গীকারনামায় সই করবেন। ইতিমধ্যে আটটা প্রদেশ কংগ্রেসের ছত্রতলে এসেছিল। এর পরের ধাপটা কেন্দ্রে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব। অন্যনিরপেক্ষ মেজরিটি যদি সে পায় তবে তাকে হটাবে কে ও কবে?

পুরাতন শাসনসংস্কার আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্যে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কংগ্রেস অন্যনিরপেক্ষ মেজরিটি পায়নি, কারণ মনোনীত সদস্য ও সরকারী সদস্যদের একটা ব্লক ছিল, সেটা কংগ্রেসের পথ-রোধ করেছিল। কোনো মতে সেটাকে সরাতে পারলে কংগ্রেসকে রোখে কে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলে সে ব্লক আর কংগ্রেসবিরোধী হবে না। তখন কংগ্রেস নিজের খুশিমতো স্টীমরোলার চালাবে।

সেকথা ভাবতেই ঝীণা সাহেব চোখে সরষে ফুল দেখেন। ছিলেন তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা। তাঁর পার্টিতে ছিলেন কৌয়াসজী জাহাঙ্গীর প্রমুখ পার্শী, হিন্দু, মুসলমান সভ্য। ওটা একটা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। কখনো সরকারের পক্ষে ভোট দেয়, কখনো কংগ্রেসের পক্ষে। কারো কাছে কোনো অনুগ্রহ চায় না। ঝীণা সাহেব তেমন মানুষই নন। তাঁর নিজের যথেষ্ট আয় ছিল। তাঁর সঙ্গীরাও ধনিক। তা ছাড়া ঝীণা সাহেবের জীবনের রেকর্ড এমন যে সরকারী পদমর্যাদা বা উপাধির জন্যে কোনোদিন তিনি তাঁর স্বাধীনতা বিকিয়ে দেননি।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি তা ঠিক। তা বলে তিনি সহযোগীও ছিলেন না। উইলিংডন যখন বম্বের গভর্নর ছিলেন তখন ঝীণা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলেন। বম্বের কংগ্রেসকর্মীরা চাঁদা করে তাঁর নামে একটা হল প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁর স্ত্রী পার্শী ও বন্ধুরা অধিকাংশ হিন্দু বা পার্শী, যিনি আহারে বিহারে আহেল বিলিতী, তাঁকে মুসলমান বলতেই অনেকের আপত্তি ছিল। তাঁর স্ত্রীর নাম রতনপ্রিয়া, তাঁর নিজের নামের পদবী ঝীণা, যে নাম হিন্দুদেরই নাম হয়। গান্ধী নাকি প্রথম পরিচয়ে জানতেনই না যে ঝীণা একজন হিন্দু নন। পাকিস্তানের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন ইসমাইলিয়া খোজা। উত্তরাধিকার আইনে বলে, **"The term 'Hindu' includes an Ismailia Khoja."**

আইনসভায় যিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নায়ক হিসাবে ভারতীয় স্বার্থ দেখতেন তিনিই আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখতেন মুসলিম লীগ নেতা হিসাবে। এই দ্বৈত সত্তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষত্ব ছিল প্রথমাবধি। গান্ধীযুগের পূর্বে তিনি ছিলেন একাধারে কংগ্রেস নেতা ও মুসলিম লীগ নায়ক। সেইজন্যে দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। লখ্‌নউ চুক্তি তাঁর সেতুবন্ধনের নিদর্শন। সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু মুসলিম একতার রাজদূত বলে অভিহিত করেছিলেন।

ঝীণা সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের আদিতে তিনি কংগ্রেসম্যান, শুনেছি দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবে। আইনসভায় নির্বাচনের সূত্রপাত হলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করেন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত থাকেন। দাঁড়াতে হতো তাঁকে স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্র থেকে। জিততে হতো কেবলমাত্র মুসলমানদের ভোটে। সাম্প্রদায়িক জনপ্রিয়তা ভিন্ন সেটা সম্ভব নয়। তা হলেও তিনি যেমন তাঁর সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করতেন তেমন আর কেউ নয়।

না পড়তেন নামাজ, না রাখতেন রোজা, না পরতেন মুসলমানী পোশাক, না জানতেন উর্দু, না ছাড়তেন মদ। চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করে বসলেন রতনপ্রিয়া পেতিতকে। তাঁর কন্যার বয়সী। বিয়েটা ইসলামী মতে হয়েছিল, তা ছাড়া ইসলামের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ভদ্রমহিলা সেকালের পক্ষে স্বাধীনা ছিলেন।

মুসলমান সমাজ তো চটলই, ওদিকে সরকারী মহলও যে খুব খুশি হলো তা নয়। একবার লর্ড চেমসফোর্ডের সকাশে সেই তেজস্বিনী মহিলাকে প্রেজেণ্ট করা হলে তিনি রাজপ্রতিনিধিকে হাতজোড় করে নমস্কার করেন। তখনকার দিনে ওটা ছিল অকল্পনীয় এক স্পর্ধা। প্রায় বমশেল বললেও চলে। বড়লাট ছিলেন বাপের বয়সী, তাই ক্ষমা করলেন।

"মিসেস জিনা, যখন আপনি রোমে তখন রোমানদের মতো ব্যবহার করবেন।" চেমসফোর্ডের হিতোপদেশ।

"ইওর এক্সেলেন্সী, ওছাড়া আমি আর কী করেছি? যখন আমি ভারতে তখন আমি ভারতীয়দের মতোই নমস্কার করেছি।" রতনপ্রিয়ার প্রত্যুক্তি।

ঝীণা বা তাঁর পত্নী শাসককুলের কাছে মাথা নত করবার পাত্র বা পাত্রী ছিলেন না। তেমনি সমাজের কাছে সুলভ বাহবা কুড়োবার জন্যে খাটো হতেন না। ঝীণার উচ্চাভিলাষ বলতে ওই দুটোই ছিল: আইনসভায় গিয়ে ডিবেটে যোগ দেওয়া। আর কংগ্রেস লীগের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা। ইংরেজরা তখন তাঁকে তাঁদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতিতে আকৃষ্ট করতে পারেননি। সে খেলায় তাঁর কোনো হাত ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে তাঁর কার্যকলাপ ছিল সে নীতির বিপরীত।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে ঝীণাকে আর কংগ্রেসে দেখা গেল না। লীগেও যে দেখা গেল তা নয়। কিছুদিনের জন্যে তিনি অজ্ঞাতবাস করেন। নানা কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। রতনপ্রিয়া একটি কন্যা সন্তান রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন। ঝীণার সংসারজীবন তখন থেকেই চিরদুঃখের। ওই মেয়েটিকেও কি তিনি রাখতে পারলেন? ওর যখন বিয়ের বয়স হলো তখন ও চলল সাগরপারে এক পার্শী খ্রীষ্টান কুবেরনন্দনের বধূ হয়ে। পিতার অমতে।

সে ঘটনার কিছু আগেই কলকাতায় ঝীণা ও তাঁর দুহিতাকে আমি চাক্ষুষ করি। ফিরপো থেকে বেরিয়ে মোটরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। ওঁদের পেছনে একসার বোরা বা খোজা বণিক। বোধহয় লাঞ্চনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি তখন দর্জির দোকানে ঢুকছি। সালটা ১৯৩৭। বাংলায় প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, কিন্তু যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মেজরিটি সেসব প্রদেশে হয়নি।

ঝীণা প্রত্যাশা করেছিলেন যে নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে যেসব প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবে তাতে পুরাতন রীতি রক্ষিত হবে, গভর্নর উদ্যোগী হয়ে আপনার দায়িত্বে মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও মেজরিটি মাইনরিটি

পুরাতন শাসনসংস্কার আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্যে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কংগ্রেস অন্যনিরপেক্ষ মেজরিটি পায়নি, কারণ মনোনীত সদস্য ও সরকারী সদস্যদের একটা ব্লক ছিল, সেটা কংগ্রেসের পথ-রোধ করেছিল। কোনো মতে সেটাকে সরাতে পারলে কংগ্রেসকে রোখে কে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলে সে ব্লক আর কংগ্রেসবিরোধী হবে না। তখন কংগ্রেস নিজের খুশিমতো স্টীমরোলার চালাবে।

সেকথা ভাবতেই ঝীণা সাহেব চোখে সরষে ফুল দেখেন। ছিলেন তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা। তাঁর পার্টিতে ছিলেন কৌয়াসজী জাহাঙ্গীর প্রমুখ পার্শী, হিন্দু, মুসলমান সভ্য। ওটা একটা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। কখনো সরকারের পক্ষে ভোট দেয়, কখনো কংগ্রেসের পক্ষে। কারো কাছে কোনো অনুগ্রহ চায় না। ঝীণা সাহেব তেমন মানুষই নন। তাঁর নিজের যথেষ্ট আয় ছিল। তাঁর সঙ্গীরাও ধনিক। তা ছাড়া ঝীণা সাহেবের জীবনের রেকর্ড এমন যে সরকারী পদমর্যাদা বা উপাধির জন্যে কোনোদিন তিনি তাঁর স্বাধীনতা বিকিয়ে দেননি।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি তা ঠিক। তা বলে তিনি সহযোগীও ছিলেন না। উইলিংডন যখন বম্বের গভর্নর ছিলেন তখন ঝীণা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলেন। বম্বের কংগ্রেসকর্মীরা চাঁদা করে তাঁর নামে একটা হল প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁর স্ত্রী পার্শী ও বন্ধুরা অধিকাংশ হিন্দু বা পার্শী, যিনি আহারে বিহারে আহেল বিলিতী, তাঁকে মুসলমান বলতেই অনেকের আপত্তি ছিল। তাঁর স্ত্রীর নাম রতনপ্রিয়া, তাঁর নিজের নামের পদবী ঝীণা, যে নাম হিন্দুদেরই নাম হয়। গান্ধী নাকি প্রথম পরিচয়ে জানতেনই না যে ঝীণা একজন হিন্দু নন। পাকিস্তানের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন ইসমাইলিয়া খোজা। উত্তরাধিকার আইনে বলে, **"The term 'Hindu' includes an Ismailia Khoja."**

আইনসভায় যিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নায়ক হিসাবে ভারতীয় স্বার্থ দেখতেন তিনিই আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখতেন মুসলিম লীগ নেতা হিসাবে। এই দ্বৈত সত্তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষত্ব ছিল প্রথমাবধি। গান্ধীযুগের পূর্বে তিনি ছিলেন একাধারে কংগ্রেস নেতা ও মুসলিম লীগ নায়ক। সেইজন্যে দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। লখ্নউ চুক্তি তাঁর সেতুবন্ধনের নিদর্শন। সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু মুসলিম একতার রাজদূত বলে অভিহিত করেছিলেন।

ঝীণা সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের আদিতে তিনি কংগ্রেসম্যান, শুনেছি দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবে। আইনসভায় নির্বাচনের সূত্রপাত হলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করেন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত থাকেন। দাঁড়াতে হতো তাঁকে স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্র থেকে। জিততে হতো কেবলমাত্র মুসলমানদের ভোটে। সাম্প্রদায়িক জনপ্রিয়তা ভিন্ন সেটা সম্ভব নয়। তা হলেও তিনি যেমন তাঁর সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করতেন তেমন আর কেউ নয়।

না পড়তেন নামাজ, না রাখতেন রোজা, না পরতেন মুসলমানী পোশাক, না জানতেন উর্দু, না ছাড়তেন মদ। চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করে বসলেন রতনপ্রিয়া পেতিতকে। তাঁর কন্যার বয়সী। বিয়েটা ইসলামী মতে হয়েছিল, তা ছাড়া ইসলামের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ভদ্রমহিলা সেকালের পক্ষে স্বাধীনা ছিলেন।

মুসলমান সমাজ তো চটলই, ওদিকে সরকারী মহলও যে খুব খুশি হলো তা নয়। একবার লর্ড চেমসফোর্ডের সকাশে সেই তেজস্বিনী মহিলাকে প্রেজেণ্ট করা হলে তিনি রাজপ্রতিনিধিকে হাতজোড় করে নমস্কার করেন। তখনকার দিনে ওটা ছিল অকল্পনীয় এক স্পর্ধা। প্রায় বমশেল বললেও চলে। বড়লাট ছিলেন বাপের বয়সী, তাই ক্ষমা করলেন।

"মিসেস জিনা, যখন আপনি রোমে তখন রোমানদের মতো ব্যবহার করবেন।" চেমসফোর্ডের হিতোপদেশ।

"ইওর এক্সেলেন্সী, ওছাড়া আমি আর কী করেছি? যখন আমি ভারতে তখন আমি ভারতীয়দের মতোই নমস্কার করেছি।" রতনপ্রিয়ার প্রত্যুক্তি।

ঝীণা বা তাঁর পত্নী শাসককুলের কাছে মাথা নত করবার পাত্র বা পাত্রী ছিলেন না। তেমনি সমাজের কাছে সুলভ বাহবা কুড়োবার জন্যে খাটো হতেন না। ঝীণার উচ্চাভিলাষ বলতে ওই দুটোই ছিল: আইনসভায় গিয়ে ডিবেটে যোগ দেওয়া। আর কংগ্রেস লীগের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা। ইংরেজরা তখন তাঁকে তাঁদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতিতে আকৃষ্ট করতে পারেননি। সে খেলায় তাঁর কোনো হাত ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে তাঁর কার্যকলাপ ছিল সে নীতির বিপরীত।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে ঝীণাকে আর কংগ্রেসে দেখা গেল না। লীগেও যে দেখা গেল তা নয়। কিছুদিনের জন্যে তিনি অজ্ঞাতবাস করেন। নানা কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। রতনপ্রিয়া একটি কন্যা সন্তান রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন। ঝীণার সংসারজীবন তখন থেকেই চিরদুঃখের। ওই মেয়েটিকেও কি তিনি রাখতে পারলেন? ওর যখন বিয়ের বয়স হলো তখন ও চলল সাগরপারে এক পার্শী খ্রীষ্টান কুবেরনন্দনের বধূ হয়ে। পিতার অমতে।

সে ঘটনার কিছু আগেই কলকাতায় ঝীণা ও তাঁর দুহিতাকে আমি চাক্ষুষ করি। ফিরপো থেকে বেরিয়ে মোটরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। ওঁদের পেছনে একসার বোরা বা খোজা বণিক। বোধহয় লাঞ্চনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি তখন দর্জির দোকানে ঢুকছি। সালটা ১৯৩৭। বাংলায় প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, কিন্তু যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মেজরিটি সেসব প্রদেশে হয়নি।

ঝীণা প্রত্যাশা করেছিলেন যে নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে যেসব প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবে তাতে পুরাতন রীতি রক্ষিত হবে, গভর্নর উদ্যোগী হয়ে আপনার দায়িত্বে মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও মেজরিটি মাইনরিটি

দুই সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন দু'সেট লোক নেবেন। যেমন হতো মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার অনুসারে। একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও তাঁদের মধ্যে মাইনরিটির আস্থাভাজন ব্যক্তিকে না নিয়ে অনাস্থাভাজন ব্যক্তিকেও নেবেন ঝীণা এতটা ভাবতে পারেননি। কিন্তু গান্ধী ভেবেছিলেন। গভর্নরকে প্রধানমন্ত্রীর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে, নইলে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে কংগ্রেসকে অনুমতি দিতেন না। ভেবে দেখার জন্য ছ'মাস দেরিও করিয়ে দেন তিনি।

ফলে দাঁড়ায় এই যে মন্ত্রীপদগুলো হয় কংগ্রেসের দান। কংগ্রেস দান করলেই লীগ পাবে। তার জন্যে কংগ্রেসের কাছেই হাত পাততে হবে, গভর্নরদের কাছে গিয়ে চাইলে মিলবে না। ঝীণার মতো মানী মুসলমান হিন্দুর কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করবেন? ইংরেজ তাঁকে এমন করে পথে বসাবে এটা কি হলো ইংরেজের মতো কাজ! কেন্দ্রীয় সরকারেও এই নতুন রীতি প্রসারিত হবে নাকি! সেখানেও কি কংগ্রেস দেবে, লীগ নেবে? সম্বন্ধটা হবে দাতা ও গ্রহীতার? যেটা এতদিন ছিল ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের।

ঝীণা ইতিমধ্যে তাঁর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে তার বদলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় লীগ পার্লামেণ্টারি পার্টি গড়েছিলেন ও তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। মূল মুসলীম লীগের সভাপতিত্বও তাঁর করতলগত হয়। তিনিই হয়ে দাঁড়ান স্থায়ী সভাপতি। তাঁর যৌবনের মুসলিম লীগের সঙ্গে বার্ধক্যের মুসলিম লীগের পার্থক্য ছিল। সে মুসলিম লীগ কল্পনা করতে পারেনি যে ক্ষমতা একদিন ভারতীয়দের হাতে আসবে ও কংগ্রেসের হাতে পড়বে। যদি করত তবে লখ্‌নউ চুক্তিতে তার জন্যে ব্যবস্থা থাকত। লখ্‌নউ চুক্তির মতো আর একটা চুক্তি ছিল ঝীণার ধ্যান। কিন্তু এ কংগ্রেস সে কংগ্রেস নয়। এ কংগ্রেস সংগ্রামী কংগ্রেস, যে সংগ্রাম করবে না তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না।

তা ছাড়া কংগ্রেস তো জানিয়ে দিয়েছে যে দেশে দুটিমাত্র পক্ষ আছে, ইংরেজ আর কংগ্রেস। মুসলমানদের কংগ্রেসেই যোগ দিতে হবে। ওদের যা পাবার ওরা পাবে কংগ্রেসের ভিতর থেকে ও তার সভ্য হিসাবে। আর নয়তো ইংরেজদের কাছ থেকে ওদের বাহন হিসাবে। শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়ে একটা তৃতীয়পক্ষ কংগ্রেস স্বীকার করে না, করে ইংরেজ। ঝীণা সাহেবের মনের জ্বালা এইখানে।

তারপর তিনি ভুলে যান যে তিনি যখন লখ্‌নউ চুক্তির ঘটকালী করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের আস্থাভাজন নেতা, শুধু মুসলিম লীগের নন। সে সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি মুসলমান হয়ে কংগ্রেসে আছেন কী করে, ওরা না হিন্দু? তিনি উত্তর দেন, কংগ্রেসে আছি ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরে আর লীগে রয়েছি মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থের খাতিরে। তখনকার দিনে ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থ ও

মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ পরস্পরবিরোধী বলে বিবেচিত হতো না। তাই ঝীণা, ফজলুল হক, মজহরুল হক, এমন কি আবুল কালাম আজাদ পর্যন্ত দুই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। যতদূর জানি। তখনো কংগ্রেস একটা পার্টিতে পরিণত হয়নি। লীগও না। পার্টির ধারণা আসে স্বরাজ পার্টি সংগঠনের সময়। ঝীণা তারপরে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি গড়েন। ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টিতে থাকেন। তাঁর কাছে ওই হয় কংগ্রেসের বিকল্প।

তখনো ক্ষমতার রাজনীতি ভূমিষ্ঠ হয়নি। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা স্বরাজ পার্টিরও অন্বিষ্ট ছিল না। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির তো নয়ই। ত্রিশের দশকে যখন ক্ষমতার রাজনীতি এসে কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দেয় তখন অনেকগুলি পার্টি গজিয়ে ওঠে। কৃষক প্রজা পার্টি, ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রভৃতি নির্বাচনে নামে। যেখানে যেখানে পারে মন্ত্রিত্ব করে। তখন এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না যে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা কংগ্রেস টিকিটে মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়াতে পারবে না। তাই উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও বলতে গেলে হিন্দুশূন্য তবু সেখানেও কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা আধিপত্য করেন। কংগ্রেস আর হিন্দু যে সমার্থক নয় সেটার দৃষ্টান্ত উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

ইংরেজদের তো একটা শ্রুতিই আছে, তাঁরা যা দেখতে চান না তা দেখেন না। নেলসন তাঁর কানা চোখে দূরবীন দিয়ে কোপেনহাগেন বন্দরের দিকে তাকিয়ে ডেনমার্কের শ্বেত পতাকা দেখতে পান না, সমানে গোলা চালিয়ে যান। তেমনি এ-দেশের ইংরেজরাও মেনে নিতে পারেন না যে কংগ্রেস বলতে মুসলমানও বোঝায়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দেন ঝীণা সাহেব যখন তাঁর থীসিস হয় মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। তার মানে দাঁড়ায় কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই যদি হতো তবে খোদ ঝীণা সাহেব ওর মেম্বর ছিলেন কী করে, দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন কী সূত্রে! ইতিহাসকে এক-কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কংগ্রেসের নতুন নীতি বা নতুন নেতৃত্ব তাঁর মনঃপূত হয়নি বলেই কি উক্ত প্রতিষ্ঠান ষোল আনা হিন্দু বনে গেল? আর লীগই বা মুসলমানদের ষোল আনার হয় কী করে? যখন ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাব চালাচ্ছে আর কৃষক প্রজারা বাংলায় মুসলিম লীগকে প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে?

নেলসনের মতো ঝীণা সাহেবেরও ছিল দূরবীন নয়, মনোক্‌ল চশমা। সেটা এক-চোখে পরতেন। তাই তিনি সেই এক চোখেই দেখলেন যে, মুসলিম লীগ ষোল আনা মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আসলে এর পেছনে কূটনীতি ছিল। একবার যদি কংগ্রেসকে দিয়ে এটা মানিয়ে নেওয়া যায় তবে একধার থেকে যেখানে যত কংগ্রেসপন্থী মুসলমান মন্ত্রী আছেন সবাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তেমনি একবার যদি ব্রিটিশ

কর্তাদের দিয়ে এটা মানিয়ে নেওয়া যায় তবে যেখানে যত কংগ্রেসপন্থী মুসলিম মন্ত্রী আছেন সবাই পদচ্যুত হন। তখন তাঁদের পরিবর্তে মন্ত্রিত্ব করেন লীগ মনোনীত ব্যক্তিরা।

লীগ মন্ত্রীরা কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দিলে ওর নাম আর কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল থাকে না। প্রধানমন্ত্রী বেচারারও ক্ষমতা যায়, তিনি হন শুধু কংগ্রেসের বা হিন্দুদের মন্ত্রী-প্রধান। অন্য যে কোনো মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সমান। ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার সীস্টেম সবে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। সেটা এককথায় খারিজ হয়। তেমনি মন্ত্রীমণ্ডলের সমবেত দায়িত্ব নামক তত্ত্বকেও অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়। ক্যাবিনেট সীস্টেম বলে কিছু গড়ে ওঠে না। ঝীণা সাহেবের সাহচর্য এতই মূল্যবান যে তার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসীর দুটি কীর্তিস্তম্ভ—প্রধানমন্ত্রী ও যৌথ দায়িত্ব—বিসর্জন দিতে হয়।

ঝীণা সাহেব বলতে আরম্ভ করেন, পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী ভারতের জন্যে নয়। অবিকল ইংরেজদের মতো কথা। তা যদি সত্য হয় তবে তাঁর নিজের জীবনটাই বৃথা গেছে। কারণ তিনিই আমাদের সব চেয়ে অভিজ্ঞ পার্লামেণ্টারিয়ান। নির্বাচিত আইনসভার গোড়া থেকেই তিনি রয়েছেন ও শেষ পর্যন্ত আছেন, মালবীয়জীর বেলাও যা খাটে না। ওটা সত্য হলে বাংলাদেশে নাজিমউদ্দিন সাহেবেরও স্থান হয় না। পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী না থাকলে তিনিও থাকেন না। তারপর ঝীণা সাহেব মেজরিটির উপর মাইনরিটির ভীটো দাবী করে বসেন। সেটা কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মুসলমান-দের দেওয়া হলে বাংলায় পাঞ্জাবে হিন্দু শিখদেরও দিতে হয়। এর পরে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্যে একতৃতীয়াংশ ওয়েটেজের প্রস্তাবও তোলেন। কেই বা তাতে রাজী হচ্ছে? ম্যাকডোনালডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ঠেলাতেই মানুষ অস্থির।

প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলগুলোতে কোয়ালিশনের বাসনা তাঁর ছিল, সেইজন্যে তিনি কোনো চরম পদক্ষেপ নেননি। কিন্তু যেই সেগুলি যুদ্ধের ইসুতে পদত্যাগ করে চলে গেল অমনি তিনি বুঝতে পারলেন যে ওদের পদত্যাগের উদ্দেশ্য ইংরেজের উপর চাপ দিয়ে কেন্দ্রীর গভর্নমেণ্ট গঠন করা। সেটাও হতো একটা কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট। অন্তত কংগ্রেস প্রভাবিত গভর্নমেণ্ট। সেখানেও সেই মেজরিটি রুল। মাইনরিটির প্রতিনিধিরা যাবেন না, যাবেন মেজরিটির দ্বারা বাছাই করা 'তথাকথিত মুসলমান'। ঝীণা সাহেব হিন্দু রাজত্বের ভয়ে ঝাঁপ দিয়ে বলেন, মা ধরণী, দ্বিধা হও। ভারতবর্ষ, দ্বিধাবিভক্ত হও।

একুশ

ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করতে হবে, মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব খাকসার বাদে আর কোনো মুসলিম দল সমর্থন করেননি। সে প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী মারা। একটি তো কংগ্রেসের মিশ্র নেতৃত্ব, আরেকটি লীগ বহির্ভূত মুসলিম নেতৃত্ব। পাকিস্তানের ইসুতে নির্বাচনে নামলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের তো হারিয়ে দেওয়া যাবেই, কৃষকপ্রজা, ইউনিয়ন-নিস্ট, আহ্‌রার প্রভৃতি মুসলিম দলগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করা যাবে। তখন দুটিমাত্র একচেটে দল থাকবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। হিন্দু নির্বাচকদের প্রতিনিধি কংগ্রেস, মুসলিম নির্বাচকদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ। একটির সর্বাধিনায়ক গান্ধী, অপরটির সর্বাধিনায়ক ঝীণা। দুই দলের দুই হাই কমাণ্ডও থাকবে। দুই পার্লামেণ্টারি বোর্ড।

সত্যি সত্যি পার্টিশন হবে মুসলিম লীগ নেতারা কেউ অতদূর দেখতে পাননি বা চাননি। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন যে মেজরিটি রাজত্ব চলবে না। মেজরিটি মাইনরিটি মিলে একপ্রকার দ্বৈরাজ্য স্থাপন করতে হবে, যাতে উভয়ের মর্যাদা ও ক্ষমতা সমান সমান। যেমন এক সিংহাসনে দুই রাজা। ব্রিটিশ রাজ্যের দুই উত্তরাধিকারী। কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোট নয়। তোমার ভোটসংখ্যা বেশী বলে তোমার কথায় কাজ হবে, আমার কথায় হবে না, এমন নয়। তোমার যেমন মেজরিটি ভোট, আমার তেমনি মাইনরিটি ভীটো। মোটের উপর তোমাতে আমাতে প্যারিটি। বিরোধ বাধলে নিষ্পত্তি করবার জন্যেও মাথার উপরে একজন থাকবেন। তিনি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি।

তবে যদি এ ব্যবস্থা একেবারেই বিকল হয়, যদি ইংরেজরা সত্যি সত্যি অপসরণ করে তবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো সমাধান মুসলীম লীগ গ্রাহ্য করবে না। আর মুসলিম লীগ গ্রাহ্য না করার অর্থ মুসলিম সম্প্রদায় গ্রাহ্য করবে না। মুসলিম সম্প্রদায় কেন বলা হবে? বলতে হবে মুসলিম নেশন। যার জন্যে চাই স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড। যার একটা নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজস্ব সৈন্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠী। হিন্দুরাও তেমনি হিন্দু নেশন, তাদের স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড, নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজস্ব সৈন্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠী। এই তো কেমন চমৎকার বন্দোবস্ত। দ্বিকেন্দ্রীকরণ।

এই পর্যন্ত পৌঁছতে ঝীণা সাহেবের বছর দশেক লেগেছিল। রোম যেমন একদিনে নির্মিত হয়নি তেমনি ঝীণা সাহেবও একদিনে দ্বৈরাজ্য থেকে দ্বিকেন্দ্রীকরণে উপনীত হননি। কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব নেয় তখনো তিনি ছিলেন দ্বৈরাজ্যবাদী। যখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধকালীন অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পন্থা ধরে তখন কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসের হাতে আসার আশঙ্কায় তিনি হন দ্বিকেন্দ্রীকরণবাদী।

গোল টেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজীর কথাবার্তা শুনে ঝীণা সাহেবের মনে ধাঁধা লাগে। তার কারণও ছিল। গান্ধী ইতিমধ্যে বহু মুসলমানকে

কংগ্রেসে আনতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামও করেছেন, সংগ্রামের শেষে যখন সংগ্রামের ফল পরিবেশনের সময় আসবে তখন তাঁদের একভাগ না দিয়ে আর কোনো মুসলিম দলকে তো দিতে পারা যাবে না। তাই তিনি কোনরূপ কমিটমেণ্ট করেন না। ঝীণা চোখে অন্ধকার দেখেন।

গোল টেবিলের পর ঝীণা বিলেতেই বসবাস করতে শুরু করেন। চার বছর বাদে লিয়াকৎ আলী খান্ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন হয়। সেই চার বছর ঝীণা যে কেবল প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করেছিলেন তা নয়, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ও গভর্নমেণ্টের গতিগতি অনুধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশ পলিসি তিনি যেমন বুঝতেন গান্ধীজীও তেমন নয়। আর ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও কনভেনশন ছিল তাঁর নখদর্পণে। যেটা গান্ধীর মতে পার্লামেণ্টারি প্রথাবিরোধীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ঝীণা কল্পনাও করতে পারেননি যে গান্ধী একদিন প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সায় দেবেন ও সর্বপ্রকার পার্লামেণ্টারি কনভেনশন উপেক্ষা করে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামকেও একটা সংগ্রামে পরিণত করবেন। ওটাও যেন ইংরেজে কংগ্রেসে যুদ্ধ। মাঝখান থেকে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থ অবহেলিত। তারা তো লড়াই করতে যায়নি, গেছে মন্ত্রিত্বের ভাগ নিতে, ক্ষমতার অংশীদার হতে। আর এটাও ওরা আশা করেছে যে ওদের যারা আস্থাভাজন তারাই হবে মন্ত্রী! হিন্দুদের যারা আস্থাভাজন তারা কেন হবে?

ঝীণা সাহেব বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সাধারণ স্বার্থ যেমন সত্য মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থও তেমনি সত্য। একটার কাছে আরেকটাকে বলি দিতে তিনি চাননি, চেয়েছেন সামঞ্জস্য। কিন্তু গোল টেবিলে গিয়ে দেখেন সাধারণ স্বার্থ ভিন্ন আর কোনো বিষয়ে গান্ধীর আগ্রহ নেই, আর সবই অপেক্ষা করতে পারে। আগে তো স্বাধীনতার সংগ্রাম সারা হোক। কিন্তু ঝীণার চিন্তাধারা সেরূপ নয়। স্বাধীনতার পূর্বেই মাইনরিটিদের অভয় দিতে হবে যে মেজরিটিই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে না। এতগুলো মাইনরিটি যেদেশে আছে সেদেশে ঢালা গণতন্ত্র চলতে পারে না। বিশুদ্ধ মেজরিটি রুল সে দেশের জন্য নয়। স্বরাজের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত অনেকরকম চেক আর ব্যালান্স। স্বরাজ চাই বইকি, কিন্তু তার আগে স্থির হয়ে যাক চেক আর ব্যালান্স।

ভারতবর্ষ বিলেত নয় যে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মতো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পালা করে গভর্নমেণ্ট গঠন করবে ও দেশ শাসন করবে। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও ছয়টি প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ কোনোদিনই মেজরিটি পাবে না, সুতরাং অন্যানিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। অপরপক্ষে কংগ্রেস চিরদিন মেজরিটি পাবে ও অন্যানিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে।

তাহলে মুসলিম লীগের দৌড় বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক আইনসভা ও বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক সরকার পর্যন্ত। এদের মধ্যে আসাম ঠিক মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ও পার্বত্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট পাকানো যায়। আর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও কংগ্রেসের অনুগত তবু ইসলামের নামে আবেদন করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া যায়। মুসলিম লীগের প্রভাব পাঞ্জাবেও নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ, যদি পাকিস্তানের প্রলোভন সামনে তুলে ধরা হয়! আর বাংলাদেশে কোনো মতে একবার কৃষকপ্রজাদের হাত করতে বা কাত করতে পারলেই হলো। বাকীটা ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সৌজন্য।

ঝীণা সাহেব মনে মনে ধরে নেন যে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে হটে যাবে, ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাব থেকে। সিন্ধু নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সিন্ধু তাঁর ভাগে। বাংলা নিয়েই ভাবনা। ফজলুল হক অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যাতে লীগে ফিরে আসেন সেই চেষ্টা হবে। তাহলে আর বাংলা নিয়ে ভাবনা থাকবে না।

এমনি করে পাঁচটি প্রদেশে সরকার গঠন করতে পারলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রায় সমকক্ষ হবে। কংগ্রেসের ছয়, লীগের পাঁচ। এমন কী তফাৎ! এরই জোরে লীগ কি দাবী করতে পারে না যে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস ছ'টা আসন পেলে লীগ পাঁচটা আসন পাবে? ছ'জন মন্ত্রী তো আর পাঁচজন মন্ত্রীকে কথায় কথায় পরাস্ত করতে পারেন না। তেমন যদি করেন তবে বড়লাট হস্তক্ষেপ করবেন। নয়তো লীগ দাবী করবে পার্টিশন।

কিন্তু এটা একটা চরম দাবী। ঝীণা সাহেব জানতেন যে পার্টিশন মানেই মুসলিম লীগের নিজের পার্টিশন, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজের পার্টিশন। লীগ রাজী হবে কেন? সম্প্রদায় সম্মত হবে কেন? কতক লোকের লাভ হবে ঠিক, কিন্তু কতক লোকের লোকসানও তো হবে। কেমন করে তিনি বলবেন যে পাকিস্তানই মুসলমানমাত্রের কাম্য, মুসলমানমাত্রের বাসভূমি?

কাজেই দ্বিধা তাঁর আপনার অন্তরেই ছিল। লীগের ১৯৪০ সালের প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তার জায়গায় ছিল 'Independent States'—একটা নয়, একাধিক। মুসলিম লীগ সদস্যদের ও সমর্থকদের সকলের আশঙ্কা ছিল কেন্দ্রটা হিন্দুরা একচেটে করবে। তাই তারা যা চেয়েছিলেন তা একটিমাত্র কেন্দ্রে নয়, উত্তরপশ্চিম ও পূর্বে মুসলমান প্রধান দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র।

আঠারো দিন ধরে গান্ধী ঝীণা সংবাদ চলে। গান্ধীই বার বার ঝীণার বাড়ী যান। ঝীণা একবারও আসেন না। পরিশেষে কথাবার্তা ভেস্তে যায়। এটা ১৯৪৪ সালের ঘটনা।

হিন্দু আর মুসলমান এক নেশন না দুই নেশন এ নিয়ে বিস্তর কথাকাটাকাটি চিঠি চালাচালি হয়। কিন্তু কাজের কথা অতি সামান্য। যেটা হলে পার্টিশন নিবারিত হতো সেদিক দিয়ে গান্ধীজী যান না, সেটা হলো

কংগ্রেসে আনতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামও করেছেন, সংগ্রামের শেষে যখন সংগ্রামের ফল পরিবেশনের সময় আসবে তখন তাঁদের একভাগ না দিয়ে আর কোনো মুসলিম দলকে তো দিতে পারা যাবে না। তাই তিনি কোনরূপ কমিটমেণ্ট করেন না। ঝীণা চোখে অন্ধকার দেখেন।

গোল টেবিলের পর ঝীণা বিলেতেই বসবাস করতে শুরু করেন। চার বছর বাদে লিয়াকৎ আলী খান্ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন হয়। সেই চার বছর ঝীণা যে কেবল প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করেছিলেন তা নয়, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ও গভর্নমেণ্টের গতিগতি অনুধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশ পলিসি তিনি যেমন বুঝতেন গান্ধীজীও তেমন নয়। আর ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও কনভেনশন ছিল তাঁর নখদর্পণে। যেটা গান্ধীর মতে পার্লামেণ্টারি প্রথাবিরোধীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ঝীণা কল্পনাও করতে পারেননি যে গান্ধী একদিন প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সায় দেবেন ও সর্বপ্রকার পার্লামেণ্টারি কনভেনশন উপেক্ষা করে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামকেও একটা সংগ্রামে পরিণত করবেন। ওটাও যেন ইংরেজে কংগ্রেসে যুদ্ধ। মাঝখান থেকে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থ অবহেলিত। তারা তো লড়াই করতে যায়নি, গেছে মন্ত্রিত্বের ভাগ নিতে, ক্ষমতার অংশীদার হতে। আর এটাও ওরা আশা করেছে যে ওদের যারা আস্থাভাজন তারাই হবে মন্ত্রী! হিন্দুদের যারা আস্থাভাজন তারা কেন হবে?

ঝীণা সাহেব বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সাধারণ স্বার্থ যেমন সত্য মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থও তেমনি সত্য। একটার কাছে আরেকটাকে বলি দিতে তিনি চাননি, চেয়েছেন সামঞ্জস্য। কিন্তু গোল টেবিলে গিয়ে দেখেন সাধারণ স্বার্থ ভিন্ন আর কোনো বিষয়ে গান্ধীর আগ্রহ নেই, আর সবই অপেক্ষা করতে পারে। আগে তো স্বাধীনতার সংগ্রাম সারা হোক। কিন্তু ঝীণার চিন্তাধারা সেরূপ নয়। স্বাধীনতার পূর্বেই মাইনরিটিদের অভয় দিতে হবে যে মেজরিটিই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে না। এতগুলো মাইনরিটি যেদেশে আছে সেদেশে ঢালা গণতন্ত্র চলতে পারে না। বিশুদ্ধ মেজরিটি রুল সে দেশের জন্য নয়। স্বরাজের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত অনেকরকম চেক আর ব্যালান্স। স্বরাজ চাই বইকি, কিন্তু তার আগে স্থির হয়ে যাক চেক আর ব্যালান্স।

ভারতবর্ষ বিলেত নয় যে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মতো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পালা করে গভর্নমেণ্ট গঠন করবে ও দেশ শাসন করবে। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও ছয়টি প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ কোনোদিনই মেজরিটি পাবে না, সুতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। অপরপক্ষে কংগ্রেস চিরদিন মেজরিটি পাবে ও অন্যনিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে।

তাহলে মুসলিম লীগের দৌড় বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক আইনসভা ও বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক সরকার পর্যন্ত। এদের মধ্যে আসাম ঠিক মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ও পার্বত্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট পাকানো যায়। আর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও কংগ্রেসের অনুগত তবু ইসলামের নামে আবেদন করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া যায়। মুসলিম লীগের প্রভাব পাঞ্জাবেও নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ, যদি পাকিস্তানের প্রলোভন সামনে তুলে ধরা হয়! আর বাংলাদেশে কোনো মতে একবার কৃষকপ্রজাদের হাত করতে বা কাত করতে পারলেই হলো। বাকীটা ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সৌজন্য।

ঝীণা সাহেব মনে মনে ধরে নেন যে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে হটে যাবে, ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাব থেকে। সিন্ধু নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সিন্ধু তাঁর ভাগে। বাংলা নিয়েই ভাবনা। ফজলুল হক অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যাতে লীগে ফিরে আসেন সেই চেষ্টা হবে। তাহলে আর বাংলা নিয়ে ভাবনা থাকবে না।

এমনি করে পাঁচটি প্রদেশে সরকার গঠন করতে পারলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রায় সমকক্ষ হবে। কংগ্রেসের ছয়, লীগের পাঁচ। এমন কী তফাৎ! এরই জোরে লীগ কি দাবী করতে পারে না যে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস ছ'টা আসন পেলে লীগ পাঁচটা আসন পাবে? ছ'জন মন্ত্রী তো আর পাঁচজন মন্ত্রীকে কথায় কথায় পরাস্ত করতে পারেন না। তেমন যদি করেন তবে বড়লাট হস্তক্ষেপ করবেন। নয়তো লীগ দাবী করবে পার্টিশন।

কিন্তু এটা একটা চরম দাবী। ঝীণা সাহেব জানতেন যে পার্টিশন মানেই মুসলিম লীগের নিজের পার্টিশন, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজের পার্টিশন। লীগ রাজী হবে কেন? সম্প্রদায় সম্মত হবে কেন? কতক লোকের লাভ হবে ঠিক, কিন্তু কতক লোকের লোকসানও তো হবে। কেমন করে তিনি বলবেন যে পাকিস্তানই মুসলমানমাত্রের কাম্য, মুসলমানমাত্রের বাসভূমি?

কাজেই দ্বিধা তাঁর আপনার অন্তরেই ছিল। লীগের ১৯৪০ সালের প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তার জায়গায় ছিল 'Independent States'—একটা নয়, একাধিক। মুসলিম লীগ সদস্যদের ও সমর্থকদের সকলের আশঙ্কা ছিল কেন্দ্রটা হিন্দুরা একচেটে করবে। তাই তারা যা চেয়েছিলেন তা একটিমাত্র কেন্দ্রে নয়, উত্তরপশ্চিম ও পূর্বে মুসলমান প্রধান দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র।

আঠারো দিন ধরে গান্ধী ঝীণা সংবাদ চলে। গান্ধীই বার বার ঝীণার বাড়ী যান। ঝীণা একবারও আসেন না। পরিশেষে কথাবার্তা ভেঙ্গে যায়। এটা ১৯৪৪ সালের ঘটনা।

হিন্দু আর মুসলমান এক নেশন না দুই নেশন এ নিয়ে বিস্তর কথাকাটাকাটি চিঠি চালাচালি হয়। কিন্তু কাজের কথা অতি সামান্য। যেটা হলে পার্টিশন নিবারিত হতো সেদিক দিয়ে গান্ধীজী যান না, সেটা হলো

কংগ্রেস লীগ পার্টনারশিপ। অর্থাৎ কেন্দ্রে ও প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট। পার্টনারশিপের বিকল্প যে পার্টিশন এটা কে না জানে? পার্টনারশিপও নয়, পার্টিশনও নয়, এমন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা যদি থাকে তবে তার নাম রোটেশন। অর্থাৎ পাঁচ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করবে, পাঁচ বছর লীগ রাজত্ব করবে। চক্রবৎ পরিবর্তিত হবে দেশের কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক সরকার।

তা নয়, গান্ধীজী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন। ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আবার ওই প্রস্তাবের একটি সূত্র উত্থাপন করেন তিনি। বেলুচিস্থান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এই তিনটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ আর বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব এই তিনটি প্রদেশের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে পারা যায়, তারা ভোট দিয়ে বলবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর থাকবে না বাইরে যাবে। যদি তারা বাইরে যেতে চায় তবে ভারতের স্বাধীনতার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। তারপর দুই রাষ্ট্রই একটি যৌথ অথরিটির উপর অর্পণ করবে পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কাস্টমস ইত্যাদি বিভাগের ভার।

মোট কথা কংগ্রেস ও লীগ দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসক হলেও তাদের মাথার উপরে থাকবে একটি সাধারণ অথরিটি, যার হাতে সত্যিকার ক্ষমতা। সেটাতেও কি মেজরিটি মাইনরিটির প্রশ্ন থাকবে না? প্রত্যেকটি নিযুক্তি ও পদোন্নতি নিয়ে মতভেদ হবে না? হলে কার কথা খাটবে? কংগ্রেসের না লীগের? গান্ধীজী কি ভেবেছিলেন পররাষ্ট্রনীতি বা দেশরক্ষার মতো বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগ একমত হবেই? লীগের পলিসি বরাবরই ইংরেজ ঘেঁষা। ইংরেজের সঙ্গে ওদের একটা প্রচ্ছন্ন ডোর ছিল। সেটা কি ওরা কংগ্রেসের জন্যে ছেদ করত? ঝীণা নারাজ হন। তিনি এর মধ্যে কংগ্রেসে প্রাধান্যের গন্ধ পান। ইংরেজকে ছেড়ে উনি কংগ্রেসকে উপরওয়ালা করবেন না। তা ছাড়া পদ্ধতিগত বিষয়েও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর অমিল। গান্ধী চেয়েছিলেন ব্রিটিশ বিদায়ের পর ওসব হবে। ঝীণা চাইলেন ব্রিটিশ থাকতেই। গান্ধীর মতে ওটা 'সেসেসন', ঝীণার মতে 'পার্টিশন'। ঝীণা এমন কথাও বলেন যে শুধুমাত্র মুসলমানদের ভোটেই হিন্দু মুসলমান উভয়ের অধিকৃত অঞ্চল পাকিস্তানে চলে যাবে।

গান্ধী জানতেন যে তাঁর দিকে বিস্তর মুসলমান আছেন, কিন্তু যেটা জানতেন না সেটা এই যে অগাস্ট অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিলেন খুব কম মুসলমান। তাঁদের অনেকেই গান্ধীর শিবির থেকে ঝীণার শিবিরে যান কিংবা নিরপেক্ষ থাকেন। আর যাঁরা আগে থেকে নিরপেক্ষ ছিলেন তাঁরা ঝীণার শিবিরে যোগ দেন। বাংলাদেশের মুসলিম লীগ চাষী ও খাতকদের সুবিধার জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নেয়। চাষী ও খাতকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান। তাদের শ্রেণীস্বার্থের কাছে আবেদন করে মুসলিম লীগ তাদের কাছে পায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থন। শ্রেণীস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ একাকার হয়ে যায়। অপরপক্ষে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট যদি পদত্যাগ না করে চাষী ও খাতকদের সুবিধের জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নিত তাহলে তাদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা সম্ভবত কংগ্রেসকেই ভোট দিত। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বত্যাগ এদিক থেকে কতকটা আত্মঘাতী হয়েছিল।

ঝীণা তাঁর লক্ষ্য স্থির করার পর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। গান্ধী ঝীণা সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হলো বলে ঝীণার ক্ষতি হলো না। একই কালে তিনি মুসলিম জনগণের আস্থাভাজন হন, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ভরযোগ্য। কী করে যে তিনি শ্যাম আর কুল দুই রাখতে পারলেন এটা একটা রহস্য। মুসলিম জনগণ কি ভারতীয় নয়? ভারতীয় জনগণ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপরীত মেরু হয়ে থাকে তবে মুসলিম জনগণ কী করে অন্যরূপ হয়?

ঝীণা এককালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন। এখন করলেন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মাঝখানে সেতুবন্ধন। এর ফলে আবার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবাদীদের পোলারাইজেশন হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানে এমন মনোমালিন্য আমরা কস্মিন্‌কালে প্রত্যক্ষ করিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে যা ছিল না শেষের দিকে তাই কেমন করে সম্ভব হলো। স্বাধীনতা পেলে হিন্দু মুসলমান এক রাজত্বে বাস করবে না। এই যে 'না' এটাকে দৃঢ় করার জন্যে এলো দুই নেশন থিয়োরি। এত বড়ো মিথ্যাও মানুষ মুখে আনে! আনবার সাহস রাখে!

তবে এটাও ঠিক যে মুসলমানরা কখনো হিন্দুর অধীনে বাস করেনি, করেছে ইংরেজের অধীনে। কংগ্রেসের আমলে বাস করা তাদের বিচারে হিন্দু মেজরিটির শাসনে বাস করা। গত শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের এক বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসের প্রতি অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন, "কী! আমরা হব কিনা আমাদের গোলামদের গোলাম!" তা বটে! মুসলমানরা যে বাদশার জাত। ইংরেজদের সঙ্গেই বরং ওদের মিল বেশী। কারণ ইংরেজরাও রাজার জাত।

গোল টেবিল বৈঠকের সময়ও মুসলিম নেতারা ন্যাশনাল মাইনরিটি বলে গণ্য হতে সম্মত ছিলেন। পরে একটু একটু করে তাঁদের মন বদলায়। তাঁরা আর সে মর্যাদায় পরিতুষ্ট হন না। তাঁরাও হতে চান কেন্দ্রস্থলে মেজরিটি। অতএব স্বতন্ত্র এক নেশন। তাঁদের হোমল্যাণ্ড সর্বভারত নয়। ভারতের মুসলিমপ্রধান অংশ, তার সঙ্গে আসাম। এই চিন্তাপরিবর্তন ত্রিশের দশকে ঘটে। তখনো ঝীণা ততদূর যাননি। তাঁর চিন্তাপরিবর্তন লক্ষিত হয় চল্লিশের দশকে। তখন তিনিও আর মাইনরিটি মর্যাদায় তৃপ্ত থাকতে চান না।

গান্ধীজীর কাছে যেমন স্বরাজ মানে স্টেটাস, ঝীণা সাহেবের কাছেও তেমনি পাকিস্তান মানে স্টেটাস। স্টেটাসের প্রশ্নে মহাত্মা যেমন নাছোড়বান্দা, কায়দে আজমও তেমনি। লক্ষ্যপথে কংগ্রেসের অন্তরায় ব্রিটিশরাজ, লীগের অন্তরায় হিন্দু মেজরিটি। বিরোধটা ফাণ্ডামেণ্টাল। এর কাটান ছিল না। বড়জোর এই পর্যন্ত হতো যে আগে ইংরেজরা ভারত ছাড়ত, তারপরে হিন্দু মুসলিম একমত না হলে কয়েকটি প্রদেশ বা অঞ্চল ভারত ছেড়ে যেত। তারপরে হয়তো কয়েকটা বিষয় উভয়পক্ষের ইচ্ছায় একসঙ্গে পরিচালিত হতো। একপ্রকার কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হতো।

কিন্তু সেইপর্যন্ত হতো বেশ কিছু মূল্যের বিনিময়ে। বিনামূল্যে নয়। গান্ধীজী যা দিতে চেয়েছিলেন তা ঝীণা সাহেবের গ্রহণযোগ্য হয়নি, কংগ্রেসেরও হতো কি? কংগ্রেস একটি দুর্বল কেন্দ্র নিয়ে সন্তুষ্ট হতো না। বিকেন্দ্রীকরণ কংগ্রেস নীতি নয়।

বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় ও ব্রিটিশ কর্তারা তাঁদের প্রতিশ্রুতি মতো আবার কথাবার্তা শুরু করেন। সিমলায় বৈঠক বসে, নতুন বড়লাট ওয়েভেল এবার তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর শাসন পরিষদ রদবদল করবেন। জঙ্গীলাট ভিন্ন তাতে আর কোনো ইংরেজ থাকবেন না। বড়লাটের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে, কিন্তু তিনি ভদ্রতা করে যথাসম্ভব বিরত থাকবেন। ভারতীয় সভ্যরা প্রায় সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব করবেন।

ওয়েভেলের পরিকল্পনায় মুসলিমদের ও বর্ণহিন্দুদের আসনসংখ্যা ছিল সমান সমান। কংগ্রেসের আপত্তি ছিল, তবু সে তার আপত্তি খাটাতে গেল না। কিন্তু ঝীণাসাহেব জেদ ধরলেন যে মুসলমানদের তালিকা তাঁর কথামতো হবে। তাতে কংগ্রেসপন্থী মুসলিম থাকলে চলবে না। এমন কি ইউনিয়নিস্ট মুসলিমও অপাঙ্‌ক্তেয়। ঠিক এই জায়গায় বড়লাটের বাধে। সব চেয়ে রাজভক্ত মুসলমান হলেন পাঞ্জাবের হায়াৎ খান্ বংশ। সিকন্দর তখন নেই। তাঁর আত্মীয় খিজর হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রী কথাটা ছিল না। এখন ঝীণাকে খুশী করতে গিয়ে খিজরকে তো চটানো যায় না। তার চেয়ে সিমলা বৈঠক পণ্ড হোক। ওয়েভেল সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দেন।

বাইশ

যাঁরা একটানা সাড়ে পাঁচ শতাব্দী ধরে শাসকের জাত ছিল তারা পলাশীকে মনে করেছিল একটা সাময়িক বিপর্যয়। তাই এই শতাব্দীকাল কেঁদেছিল ও দিন গুণেছিল। ইংরেজী শেখেনি, ফিরিঙ্গীর চাকরি নেয়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীকেই স্বীকার করেনি।

তারপরে সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দিয়ে ভাবে এইবার চাকা ঘুরে যাবে। আবার মুঘল বাদশাহী। আরো সাড়ে পাঁচ শতক। কিন্তু ইংরেজরা অতি নিষ্ঠুরভাবে তাদের মোহ ভঙ্গ করে। লাল কেল্লার অনেকগুলি মহল কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। মুঘল বংশের উত্তরাধিকারীদের বধ করে। আর বাদশাহকে ভারতের বাইরে নির্বাসন দেয় রেঙ্গুনে। মুসলমানরা আর কখনো মাথা তুলতে পারবে না এই ছিল নতুন শাসকদের নীতি।

ইতিমধ্যে হিন্দুরা বাস্তববাদীর মতো ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি নিয়েছে, যুগের সঙ্গে পা মিলিয়েছে, অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে রয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমান সমাজের নেতারা দেখেন যে জীবনের ও জীবিকার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুরা পেয়ে গেছে পঞ্চাশ বছরের স্টার্ট। প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। মুসলমানদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা চাই। আর সেটা সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে যদি সদ্‌ভাব বজায় রাখা যায়। এই নতুন নীতির জনক সার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত করেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এঁর অক্ষয় কীর্তি।

কংগ্রেসকে সার সৈয়দ সন্দেহের চোখে দেখতেন। কংগ্রেসই একদিন ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে। অপোজিশনই তো আখেরে গভর্নমেণ্ট হয়। তখন মুসলমানের কী দশা হবে? "ইংরেজ রাজত্ব যাক" বলে একশো বছর প্রার্থনা করার পর সার সৈয়দের মতো লোকের প্রার্থনা হলো "ইংরেজ রাজত্ব থাক।" ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে যারা কোমর বেঁধেছিল তারাই কোমর বাঁধল তাকে রাখতে। পরের ধাপ মুসলিম লীগ গঠন। তারই একটু আগে বাংলাদেশের পার্টিশান।

তখনকার দিনে বেঙ্গল বলতে যা বোঝাত তার মধ্যে পড়ত বিহার ওড়িশা ও মাঝখানে কিছুকাল আসাম। সেই বেঙ্গল একান্ত অশাসনীয় হয়ে পড়ায় তার একাংশ নিয়ে নতুন একটা প্রদেশ গড়ার কথাবার্তা লর্ড কার্জনের পূর্বেও চলেছিল। নতুন প্রদেশটা হবে ওড়িশার কতক অংশ ও ছোটনাগপুরের কতক অংশ নিয়ে। ঝাড়খণ্ড কি ওইরকম কিছু একটা নাম হবে তার। কার্জন একবার ময়মনসিং সফরে যান। সেখান থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট দেন যে পদ্মানদীই হচ্ছে স্বাভাবিক সীমান্তরেখা। তার দুদিকে দুই প্রদেশ হলে ভালো হয়। নতুন প্রদেশটার নাম হবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম। খরচ বাঁচবে, কারণ আসাম তো আগে থেকে ছিলই।

নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা সত্যি অশাসনীয় ছিল। লাটসাহেব তো দূরের কথা চুনোপুঁটিরাও ও অঞ্চলে পা দিতেন না। ঢাকা রাজধানী হলে পদার্পণ করতে বাধ্য। কার্জনের প্রস্তাবের উত্তর এলো সেক্রেটারি অভ স্টেট বুঝতে পারছেন না কেন ঝাড়খণ্ড না কী যে ওর নাম পরিত্যক্ত হবে। যখন এতকাল ধরে ওই লাইনে কাজ করা হয়েছে ও এগিয়ে রয়েছে। তখন পূর্ববঙ্গ ও আসামের কেসটাকে জোরালো করার জন্যে কার্জন তাঁর ঝুলি থেকে বেড়াল বার করেন। ওটা হবে একটা মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ। হলে বেশ হয়।

কেই বা জানত যে বাঙালীরা ইতিমধ্যে এক 'নেশন' হয়ে উঠেছে ! কথাটা আমার নয়, পার্টিশন রদ করার জন্যে যে ইস্তাহার রচনা হয় তার রচয়িতাদের। শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বোমা ফাটে। রিভলভার ছোটে। সাহেব মেম মারা যায়। তখন কাটা বাংলা আবার জোড়া লাগে, কিন্তু বিহার ওড়িশা আসাম আলাদা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা তাঁদের পলিসি ঘুরিয়ে দেন। সাম্প্রদায়িক কারণে প্রদেশ ভাগ করা আর নয়, সাম্প্রদায়িক কারণে নির্বাচক-মণ্ডলী ভাগ করাই সুবুদ্ধি। এতে মুসলমানকে শিখকে কোনো কোনো জাতের হিন্দুকে সন্তুষ্ট করা হয়, অথচ অন্যান্যদের অসন্তুষ্ট করা হয় না।

স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী তোলা হয় নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের তরফ থেকে। মহামান্য আগা খান্ নিবেদন করেন লর্ড মিণ্টোকে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলিতে হিন্দুরা ভোট দেবে হিন্দু প্রতিনিধিদের, মুসলমানরা ভোট দেবে মুসলিম প্রতিনিধিদের। লর্ড মর্লি তখন সেক্রেটারি অভ স্টেট। বড়লাটের সুপারিশ তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেন। উপর থেকে তাই মনে হয়। ভিতরের খবর শুনেছি উল্টো। অর্থাৎ কর্তারাই ওটা চেয়েছিলেন।

পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসীর পত্তন হলো গোড়ায় গলদ নিয়ে। এ যেন জরাসন্ধের জন্ম। দুই আধখানা শিশু। একে পূর্ণাঙ্গ করার সাধনারই নাম ভারতীয় জাতীয়তার সাধনা, ভারতীয় গণতন্ত্রের সাধনা। কর্তারা যেন বিধান দেন কংগ্রেস হবে হিন্দুদের, লীগ হবে মুসলিমদের, আর উপর থেকে যখনি যা পাওয়া যাবে তার একভাগ পাবে হিন্দু, একভাগ পাবে মুসলমান। তারপর তাকে জুড়ে একাকার করলেই হবে জরাসন্ধের একতা।

তা সত্ত্বেও কংগ্রেসে সব সম্প্রদায়ের রাজনীতিক যোগ দেন, বেশীর ভাগই রাজভক্ত, কিন্তু চরমপন্থীরাও বাদ যান না। অপরপক্ষে লীগে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই রাজভক্ত, তবে সেখানেও দুটি একটি স্বাধীনচেতার প্রবেশ ঘটে। যেমন ঝীণা সাহেবের। তিনি কংগ্রেসেও স্থান পান ও সামনের সারিতে আসন নেন। লাল, বাল, পালের মতো না হলেও ঝীণা ও মিসেস বেসাণ্ট ছিলেন তাঁদেরই কাছাকাছি। অবশেষে টিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লখ্নউ চুক্তির ঘটকালি করেন ঝীণা।

সে সময় তাঁর মনোভাব কেমন ছিল তার একটি নিদর্শন তাঁর এই উক্তি—

"The main principles on which the first all-India Muslim political organisation was based was the retention of the Muslim communal individuality strong and unimpaired in any constitutional readjustment that might be made in India in all the course of its political evolution. The creed has grown and broadened with the growth of political life and thought in the community. In its general outlook and ideal as regards the future the All-India Muslim League stands abreast of the Indian National Congress and is ready to participate in any patriotic

efforts for the advancement of the country as a whole."

তখনকার দিনের আর কোন মুসলিম রাজনীতিক তাঁর চেয়ে দেশভক্ত ছিলেন না। তিনিই সেদিনকার বিচারে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম। আলীগড়-পন্থীদের থেকে ভিন্ন।

আরও একশ্রেণীর মুসলিম নেতা ছিলেন যারা আলীগড়ের পলিসিও মানতেন না, লীগের পলিসিও না। তাঁরা পার্লামেণ্টারি পলিটিকসে বিশ্বাস করতেন না, সরকারের কাছে চাকরিবাকরিও চাইতেন না। তাঁরা কাজ করতেন ইসলামের গৌরবের জন্যে। কী করে বিশ্বময় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয় এই ছিল তাঁদের ধ্যান। আর শক্তি বলতে রাজনৈতিক শক্তি সামরিক শক্তিও বুঝতেন। ভারতে তাঁদের যে স্থান সেটা ভারতীয় হিসাবে ততটা নয়, যতটা মুসলমান হিসাবে। যে মুসলমান সাড়ে পাঁচ শতাব্দী জুড়ে রাজত্ব করেছিল। আরো দীর্ঘকাল করত, যদি না ফিরিঙ্গীরা শত্রুতা করত। ফিরিঙ্গীদের এঁরা ক্ষমা করেননি। এখনো এঁদের আশা যে তুরস্কের অভ্যুদয়, ইরানের অভ্যুদয়, আফগানিস্থানের অভ্যুদয় ভারত থেকে ফিরিঙ্গীদের হটতে বাধ্য করবে।

হিন্দুদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ। সাধারণ ভূমি তো কিছু নেই। এঁরা যেদিন রাজত্ব ফিরে পাবেন হিন্দুরা এঁদের রাজভক্ত প্রজা হবে। কংগ্রেস যে ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে এটা এঁদের কাছে অবিশ্বাস্য। যদি হয় তবে ওই ইংরেজেরই বেনামদার হবে, গুরু যখন ইংরেজ। ইংরেজী শিক্ষায় এঁদের ঘোর বিরাগ ছিল। আলীগড় এঁদের চোখে ইংরেজীস্থান। মুসলিম রাজ-নীতিকদের এঁরা শ্রদ্ধা করতেন না। ঝীণা তো মুসলমানই নন। আগা খান্ই বা কিসের মুসলমান !

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজভক্ত মুসলমানরা তুরস্কের বিপক্ষে যান, কেউ কেউ অস্ত্র ধরেন। সে সময় বিশ্ব ইসলামীরা বিপাকে পড়ে যান। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে গিয়ে অনেকের জেল হয়। অনেকের নির্বাসন। অনেকে আবার দেশত্যাগ করেন। সাধারণ মুসলমান টুঁ শব্দটি করে না। এরা যে কত বিচ্ছিন্ন এঁরা সেই প্রথম উপলব্ধি করেন। সাধের তুরস্ককে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে না পেরে রব তোলেন খলিফার অধীনেই ইসলামের ধর্মস্থান সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু সংরক্ষণ করবে কে ? কী দিয়ে সংরক্ষণ করবে। তার জন্যে অস্ত্র চাই। সেসব কোথায় ? যেখানে হাতী ঘোড়া গেল তল, স্বয়ং তুরস্কই হেরে গেল, সেখানে খেলাফতীরা বলেন কত জল।

তাঁদের সেই দুঃসময়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হন গান্ধী। তাঁর হাতে সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্ত্র। খেলাফতীরাই তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের নেতা করেন। অসহযোগ প্রথমে খেলাফতীদের জন্যে কল্পিত হয়। পরে কংগ্রেস ওটা গ্রহণ করেন। গান্ধীজী আগে খেলাফতীদের নায়ক, পরে কংগ্রেসীদের।

তাঁর নেতৃত্ব অবশ্য সত্যাগ্রহ দিয়ে শুরু। সে সময় সেটা কংগ্রেসের তরফ

থেকে নয়। তখন তার জন্যে ছিল অন্য প্রতিষ্ঠান। সত্যাগ্রহ সভা।

দেখতে দেখতে কংগ্রেসটাই একটা সত্যাগ্রহ সভায় পরিণত হয়। তখন পূর্বতন নেতারা একে একে বিদায় নেন। ঝীণা তাঁদের একজন। মালবীয় আরেকজন। মিসেস বেসাণ্ট আরো একজন। এঁরা অসহযোগ, গণসত্যাগ্রহ ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। বিশেষ্য পদের সামনে 'অহিংস' বলে একটি বিশেষণ পদ বসিয়ে দিলে কী হবে, সাধারণ লোক তার জন্যে প্রস্তুত নয়। আর ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনা কেন? হিন্দুরই হোক আর ইসলামই হোক ও জিনিস আধুনিক যুগে আর কোনো দেশে রাজনীতির সঙ্গে মিশ খায় না। জনগণকে অবশ্য ও দিয়ে আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু ফল যা হয় তাতে ধর্মেরও মহিমা বাড়ে না, রাজনীতিরও শিক্ষা হয় না।

এঁরা যে কারাভয়ে ভীত বলে চলে গেলেন সেটা ভুল। কিংবা আদালতের মায়া কাটাতে না পেরে। এঁরা আবহাওয়াটাই পছন্দ করলেন না বলে চলে গেলেন। কিন্তু চলে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। গান্ধীপন্থী কংগ্রেস এত বেশী শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে এঁদের বাদ দিয়েও তার বলহানি হয় না। বিকল্প যতগুলো দল সব নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ঝীণাসাহেব ছিলেন দুই নৌকার মাঝি। একটা নৌকার থেকে পা সরিয়ে নিয়ে আরেকটাতেও কি টিকতে পারলেন?

সেকালে গান্ধীতে ঝীণাতে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। ঝীণাই তো একদিন বারদোলীতে গিয়ে মহাত্মাকে সতর্ক করে দেন যে গণসত্যাগ্রহ দমন করার জন্যে সরকারপক্ষ সৈন্য আনিয়েছেন। তার চেয়ে বড়লাট লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার শ্রেয়। ঝীণাই ঘটকালি করবেন।

গণসত্যাগ্রহ বন্ধ হলো, মহাত্মার জেল হলো, খেলাফতীরা হতাশ হলেন, ধীরে ধীরে গান্ধী নেতৃত্ব থেকে সরে গেলেন। যে কয়জন মুসলমান কংগ্রেসে থেকে গেলেন তাঁদের মোহভঙ্গ হয় কামাল পাশার হাতে খলিফার হাল দেখে। তাঁরা বিশ্ব ইসলাম ছেড়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মনোনিবেশ করেন। সাম্রাজ্যবাদ একদিকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আর একদিকে। তাঁরা দুটোর থেকে একটাকে বেছে নেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যান। তেমনি খান্ আবদুল গফর খান্। তেমনি হাকিম আজমল খান্। তেমনি ডাক্তার আনসারী।

এখন এঁদের মতো সহকর্মীদের পথে বসিয়ে গান্ধীজী ঝীণার কথায় কাজ করবেন এটা কী করে হয়? এঁরাই তাঁর আপনার লোক। সুখে দুঃখে তাঁর সাথী। এঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে হিন্দু মুসলিম সমস্যার মীমাংসা করা তাঁর রীতি নয়। ফলে ঝীণা নিরাশ হন। শেষের দিকে মহম্মদ আলী, শওকত আলী এঁরাও। মহাত্মা তাঁর এককালের সহযাত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছিলেন, কিন্তু পরামর্শ যখন নিতেন তখন তাঁর সব চেয়ে একনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধুদের। আজমল খাঁর, আনসারীর, আজাদের, আবদুল গফর খাঁর।

এর মধ্যে হিন্দুয়ানী কোথায়? মহাত্মার এই সব বন্ধুরা কি হিন্দু? এঁরা কি মুসলমান হিসাবে নিরেস? এঁদের পরামর্শ কি ইসলামবিরোধী, মুসলিম স্বার্থবিরোধী? কংগ্রেসে সব সময়েই একদল মুসলমান ছিলেন যাঁদের এক নম্বর শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তাকে আগে নিপাত করো, তারপরে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠবে। তার সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে যেয়ো না। তার হাত যাতে শক্ত হয় তেমন কিছু কোরো না। মহাত্মাই এঁদের মনের মানুষ। হিন্দু বলে নয়। এক নম্বর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে।

তারপর এঁরা বিশ্বাস করতেন না যে হিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু। পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়ে গেছে, তার জন্যে হিন্দুদের দোষ দিয়ে কী হবে? দৌড়লে ওদের ধরে ফেলা যায়। তা ছাড়া চাকরিই মানুষের জীবনে মোক্ষ নয়। তাই যদি হতো এত ছেলে অসহযোগ করত কেন? ঢের বড়ো বড়ো প্রশ্ন আছে যেখানে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সবাই ভারতীয়, বেশীর ভাগই দরিদ্র। সেইজন্যেই তো গান্ধীজীর গঠনের কাজ। পার্লামেণ্টে যাওয়া তো নিপীড়িতদের স্বার্থে। পার্লামেণ্ট থেকে চলে আসাও তেমনি বৃহত্তর স্বার্থে।

গান্ধীজী সব মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। সব মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিলে তার দ্বারা প্রমাণ হতো যে ভারতীয়দের সকলের সাধারণ স্বার্থ এক। কিন্তু মুসলিম মাইনরিটির বিশেষ স্বার্থ তো ছিল। প্রতিযোগিতায় তারা হিন্দুদের সমকক্ষ নয়, বিশেষ ব্যবস্থা না করলে আপিসে আদালতে কাউন্সিলে ক্যাবিনেটে কোথাও যথেষ্ট সংখ্যায় প্রবেশ পেতো না। স্কুলকলেজেও তাদের সংখ্যা যথেষ্ট হতো না। এইসব কারণে বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন মুসলমান রাজনীতিকরা কংগ্রেসের বাইরেও একটা প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক বোধ করতেন। সেই আবশ্যকতা বোধ থেকেই লীগের উৎপত্তি। কিন্তু এটাও তাঁরা জানতেন যে তাঁদের বিশেষ স্বার্থ ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের উপরে নয়। তাই কংগ্রেসেও তাঁদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন। দুই নৌকায় পা দেওয়া বারণ ছিল না। পরে ওটা আপনা থেকে অপ্রচলিত হয়। কারণ বিশেষ স্বার্থের প্রতি কংগ্রেসের চেয়ে ব্রিটিশ সরকারই অনুকূল। কংগ্রেস তো স্বরাজের আগে কোনো কমিটমেণ্টই করবে না।

অপরপক্ষে কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা হলো যখনি তাঁরা কিছু দিতে রাজী হয়েছেন ব্রিটিশ সরকার নীলাম দর চড়িয়ে দিয়েছেন। আগাম দিয়েছেন। আর মুসলমানরা ইংরেজের দান পকেটে পুরে কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়িয়েছেন আরও বেশীর জন্যে। বেশীর ভাগই তো হিন্দুর যোগ্যতার পাওনা থেকে। এই পদ্ধতির মধ্যে কোনো চূড়ান্ততা নেই। মুসলমানরা বলছেন না যে এই তাঁদের শেষ দাবী। যখনি একটা দাবী মিটিয়ে দেওয়া হয় তখনি আর একটা হাজির হয়। কংগ্রেস যা দেয় ব্রিটিশ সরকার তার চেয়ে বেশী দেয় বা দেবার আশা দেয়।

ক্রমে উপলব্ধি হয় যে এ খেলা কংগ্রেসের বাইরে থেকেই ভালো চলে,

ভিতর থেকে নয়। বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন তাঁরা কংগ্রেসের বাইরেই থাকবেন ও তাঁদের একটা হাত সব সময়েই ইংরেজের দিকে প্রসারিত থাকবে, আর একটা হাত কংগ্রেসের দিকে। কংগ্রেস সাধারণ স্বার্থের উপরে নিবন্ধ-দৃষ্টি। লীগ বিশেষ স্বার্থের উপর নিবন্ধদৃষ্টি। কেউ কারো দিকে তাকায় না। তাকাবার সময় বয়ে যায়। কংগ্রেস তার ভিতরকার মুসলমান সভ্যদের অগ্রস্থান দেয়, লীগ মুসলিমদের স্থান তার পরে। আর লীগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকেই অগ্রস্থান দেয়, কংগ্রেসকে তার পরে। এমনি করে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন অসম্ভব হয়। লীগের যে হাতটা কংগ্রেসের দিকে প্রসারিত ছিল সেটা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়।

লর্ড কার্জন যে ভাগ্যচক্র প্রবর্তন করেছিলেন সেটা চল্লিশ বছর পরে পূর্ণবৃত্ত হয়ে ঘুরে এলো। বেঙ্গল পার্টিশন, তার থেকে সেপারেট ইলেক-টোরেট, তার থেকে ইণ্ডিয়া পার্টিশন, তথা বেঙ্গল পার্টিশন।

তেইশ

এক হাতে তালি বাজে না। একপক্ষ যদি অহিংস হয় অপরপক্ষ হিংসার দ্বন্দ্ব একা একা চালাতে পারে না। আপনা হতেই নিরস্ত হয়। তেমনি একপক্ষ যদি অসাম্প্রদায়িক হয় তবে অপর পক্ষ অসাম্প্রদায়িকতার কুস্তি একা একা লড়তে পারে না। আপনা হতেই থামে।

কিন্তু একপক্ষ অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক হলে তো? অগাস্ট অভ্যুত্থানের সময় থেকেই লক্ষ করি অহিংসার উপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে গেছে। যদিও গান্ধীর উপরে আছে। ওটাও একটা প্যারাডকস। তারপর আরো চমৎকৃত হই যখন শুনি সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে সশস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে ভারতের অভিমুখে অভিযান করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের বাড়ীর মেয়েরা গাইতে শুরু করেছেন "কদম কদম বড়ায়ে যা"। হিংসার তেমন মরসুম আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। মহাত্মার অহিংসার শিক্ষা কারো মনে বসেনি।

তেমনি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে দিকে দিকে মাথা তুলছে সাম্প্রদায়িকতা। ওই ১৯৪৪ সালেই আমি ছুটি নিয়ে বিহারে কিছুদিন থাকি। সেখানে শুনি একদিকে যেমন খাকসার অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকসঙ্ঘ সশস্ত্রভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। শস্ত্র অবশ্য তেমন কিছু নয় যাকে ইংরেজরা ভয় করে। তাই সরকার থেকে নিষেধ নেই। কিন্তু সাধারণ হিন্দু তো ভয় করে। সাধারণ মুসলমান তো ভয় করে। আমার বন্ধু একজন সরকারী অফিসার। তিনি তখনি আমাকে বলেন যে ইংরেজ চলে যাবার সময় সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে।

এই হচ্ছে গান্ধী ঝীণা সংবাদের সমসাময়িক অবস্থা। ঝীণা কেমন করে

বিশ্বাস করবেন যে হিন্দুরা অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক থাকবে, তাদের ব্রুট মেজরিটি দিয়ে পার্লামেণ্টের ভিতরের ও বাইরের মাইনরিটিকে দাবিয়ে রাখবে না? তিনি যদি তাঁর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন সেটার জন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি?

স্বাধীন মানুষ যখন খুশি খেলার নিয়ম পালটে দিতে পারে। আজ তোমার খেলার নিয়ম অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। কাল যখন ইংরেজ থাকবে না, তার বেয়োনেট থাকবে না, তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে হিংসা ও হত্যাগ্রহ। আজ তোমার খেলার নিয়ম পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র। কাল যখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রভাব থাকবে না, অঙ্কুশ থাকবে না, তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে ডিকটেটরশিপ ও রণতন্ত্র। আজ তোমার খেলার নিয়ম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী। কাল যখন আধুনিক যুগের থেকে দেশ কয়েকশতক পেছিয়ে যাবে তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে হিন্দুরাষ্ট্র ও মুসলিম দলন।

মেজরিটি যখন বৈদেশিক অঙ্কুশমুক্ত হবে তখন সে যে মাইনরিটির সঙ্গে কখন কী ব্যবহার করবে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। এমন কি সংবিধানে লিপিবদ্ধ সেফগার্ডও যথেষ্ট নয়। মেজরিটি ইচ্ছা করলে সংবিধান ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে দেশ শাসন করতে পারে। তখন মাইনরিটি পালাবার পথ পাবে না। পাকিস্তান হচ্ছে সেই পালাবার পথ। সেখানে পালাবার জন্যে সমুদ্র পার হতে হবে না, গিরিসঙ্কট পার হতে হবে না। একবার পা চালিয়ে দাও, তারপর পাকিস্তান।

এর অনুরূপ দাবী আয়ারল্যাণ্ডেও উঠেছিল। ঝীণাসাহেব তা জানতেন। আলস্টার কবুল না করে আইরিশ ন্যাশনালিস্টদের গতি ছিল না। কংগ্রেসকেও তেমনি পাকিস্তান কবুল করতে হবে। নইলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন পাশ করবে না। বেআইনী স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা কঠিন। আর্মির লয়ালটি পাওয়া সহজ হবে না। অন্তত মুসলিম রেজিমেণ্টগুলির লয়ালটি তো নয়ই। সৈন্যবলহীন স্বরাজ আকাশকুসুম।

এখন তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্র-গুলিকে দিয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করিয়ে নেওয়া। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলি যদি একবাক্যে পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করে তবে তো অর্ধেক লড়াই ফতে। বাকি অর্ধেক হবে হাটে বাটে মাঠে। এডওয়ার্ড টমসনকে ঝীণা তার আভাস দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। তখন কেউ সেটাকে সীরিয়াসভাবে নেয়নি। কিন্তু ক্রমেই আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল যে ইংরেজ থাকতে যদি মিটমাট না হয় তো পরে কুরুক্ষেত্র বাধবে।

শেষপর্যন্ত ওটা একটা উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারী কে হবে? ষোল আনা ভারতীয় প্রজা? না বারো আনা হিন্দু প্রজা? ঝীণা সাহেবের মতে ষোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেটা তেমন দাবী করে সেটা প্রকৃতপক্ষে বারো আনা হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। ষোল

আনা ভারতীয় প্রজার কোনো যৌথ ইলেকটোরেট নেই, আছে মুসলিমদের স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট, ফলে হিন্দুদেরও স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট। আর্মিতেও স্বতন্ত্র মুসলিম রেজিমেণ্ট, শিখ রেজিমেণ্ট, রাজপুত রেজিমেণ্ট। এই যে দেশের চেহারা সেখানে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি ডেকে কী হবে? নিচের দিক থেকে সংবিধান তৈরি করতে চাইলে হবে কেন? মেজরিটি রুল অচল। এদেশে মেজরিটি বলতে পলিটিকাল মেজরিটি বোঝায় না, বোঝায় সাম্প্রদায়িক মেজরিটি। আইনসভায় কংগ্রেসের মেজরিটি কার্যত হিন্দু নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছেই দায়ী। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছে দায়ী নয়। কংগ্রেসপন্থী মুসলিমরা ব্যতিক্রম।

কায়েদ আজম সাধারণ নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেখে কাজ করছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচকরা অধিকাংশ স্থলে তাঁর পার্টিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়। কিন্তু কার উপরে জিতিয়ে দেয়? হিন্দুদের উপরে নয়, শিখদের উপরে নয়, অন্যান্য মুসলিম পার্টিগুলির উপরে। এইসব পার্টির অপরাধ এরা পাকিস্তান চায় না। এদের পক্ষেও অনেক ভোট পড়েছিল, তবে অপেক্ষাকৃত কম। লীগ যদি শতকরা ৫১টা ভোট পায় তাহলে নির্বাচনে জয়ী হতে পারে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে শতকরা ৪৯টা ভোট যারা পেলো তারা মুসলিম নয় বা তাদের মতের কোন দাম নেই। তা ছাড়া বহু মুসলিম ভোটার ছিল নিরপেক্ষ। বহু মুসলিম ভোটার না বুঝে ভোট দিয়েছিল। বহু মুসলমান ভোটাধিকার পায়নি। ভোটাধিকার প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের অধিগত ছিল না। সব মুসলমান মুসলিম লীগের পেছনে ছিল এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অনেকেই জানত না পাকিস্তান হলে তারা অবশিষ্ট ভারতে এলিয়েন হয়ে যাবে।

তা হলেও ঝীণাসাহেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে তাঁর পেছনে অধিকাংশ মুসলিম ভোট। এখন তাঁকে হিন্দু শিখের সম্মতি পেতে হবে, আর যদি তিনি মনে করেন যে তাদের সম্মতি অবান্তর তাহলে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয়ী হতে হবে। এটা তত সহজ নয়। তবু তিনি সে ঝুঁকিও নিতেন। কারণ তিনি জানতেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মার খেলেও তিনি সেটাকে পাকিস্তানের পক্ষে একটা যুক্তি বলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পেশ করতে পারতেন। পাকিস্তান না হলে মাইনরিটির জান মান নিরাপদ নয়। তাদের পালাবার একটা স্থান থাকা চাই।

সাধারণ নির্বাচনের পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন মন্ত্রী ভারতবর্ষে আসেন সরেজমিনে অবস্থাটা দেখতে ও দেখে ব্যবস্থা করতে। কংগ্রেস লীগ যাতে একমত হয় সেটাই তাঁদের মিশন। সেটা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যা করবার তা করতেন। তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কথাবার্তা চালান, কারণ ততদিনে কংগ্রেস ও লীগ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ করেছে। তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গেও পরামর্শ করেন, তবে সেটা ঠিক নেগোশিয়েশনস বলতে যা বোঝায় তা নয়। এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ইংরেজরা

গান্ধীর উপরে আগুন হয়ে রয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস কংগ্রেস তো ভালো ছেলের মত ক্রিপস প্রস্তাব গিলতে যাচ্ছিল, গান্ধীই তার কান ধরে টান দিলেন। গান্ধীর থেকে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করাই তার পর থেকে ব্রিটিশ পলিসি। তাই গান্ধীকে তাঁরা বাপ হিসাবে সম্মান দেখালেও ছেলেকে হাত করার তালে ছিলেন। তাতে কংগ্রেসের কদর বেড়েছিল, লীগের কমেছিল।

ক্যাবিনেট মিশন কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দিতে পারতেন না। শুধু প্রস্তাব করতে পারতেন। সে প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতেও পারে, না করতেও পারে। তবে তাঁদের থলিতে ছিল একটি লোভনীয় জিনিস। সেটি তারা তাঁকেই দেবেন যে তাঁদের প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করবে। এবার বড়লাট তাঁর শাসন পরিষদ্ ঢেলে সাজাবেন। তাতে জঙ্গীলাট থাকবেন না। ভারতীয়রাই সব ক'টি পদ পাবেন। ওটা হবে সত্যিকারের একটা ক্যাবিনেট। বড়লাট পররাষ্ট্র বিভাগও বিলিয়ে দিয়ে রাজসন্ন্যাসী হবেন। হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে, কিন্তু সাধারণত প্রয়োগ করা হবে না। এর নাম ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট।

হ্যামলেটের প্রশ্ন টু বী অর নট টু বী। কংগ্রেসেরও তেমনি, টু গো অর নট টু গো। লীগেরও তাই। কারণ ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব সামনে রেখেছিলেন সে যে ছুঁচো গেলার প্রস্তাব। গিলবে কি গিলবে না?

ক্যাবিনেট মিশন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা মিলে মিশে যে সংবিধান প্রণয়ন করবে ব্রিটেন সেই সংবিধানই স্বীকার করবে। নিজের জন্যে কিছু হাতে রাখবে না। এখন ভারতীয়দের একমত হওয়া চাই। একটি পার্টির উপর মেজরিটির সিদ্ধান্ত চাপাতে না চায়। অপরপক্ষে মাইনরিটিও যেন মেজরিটির পথ রোধ না করে। দু'পক্ষের বিবেচনার জন্যে ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পনা দেন তার সার কথা ভারতের জন্যে একটাই কেন্দ্র হবে, দুটো নয়। সেই একমাত্র কেন্দ্রের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রবিভাগ, চলাচল ও সেসব বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ। আর সমস্ত বিষয়ে তুলে দেওয়া হবে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠীর হাতে। একটি গোষ্ঠীতে থাকবে মাদ্রাজ, বম্বে, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা। আরেকটিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শেষেরটিতে বাংলা, আসাম। এই তিন গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে স্থির করবে কোন কোন বিষয় গোষ্ঠীর সকলের পক্ষে সাধারণ বিষয়, কোন কোন বিভাগ সাধারণ নয়, প্রদেশের নিজস্ব। গোষ্ঠীতে যোগ দিতে কাউকে বাধ্য করা হবে না, যোগ দিলে বেরিয়ে যেতেও পারবে। কিন্তু গোড়ায় যোগ দেওয়া চাই। তেমনি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধেও পরিকল্পনায় ব্যবস্থা ছিল।

প্রথমটা বুঝতে পারা যায়নি যে ওর ভিতরে একটু কৌশল ছিল। ওদিকে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর এদিকে আসাম অর্থাৎ উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ দুই যাচ্ছে লীগের বগলে। লীগ পাচ্ছে পাঁচটা প্রদেশ। ব্যালান্স অফ পাওয়ার। তা ছাড়া সীমান্ত দুটোর অবস্থানগত গুরুত্ব যেমন তাতে লীগের বল বাড়বে। বারগেনিং পাওয়ার।

এটা গান্ধী আজাদের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ নয়, কায়দে আজমের পরিকল্পিত দ্বিকেন্দ্রীকরণ নয়, এটা দুয়ে এক, একে দুই। দুই পাশে দুই পাকিস্তান, মধ্যিখানে হিন্দুস্থান। মাথার উপরে কেন্দ্রস্থান। তাতে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরাও থাকবেন, কিন্তু তাঁরা মনোনীত না নির্বাচিত তা পরিষ্কার নয়। শিখদের ভাগ্যও অনিশ্চিত।

এ পরিকল্পনা মেনে নিলে আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মায়া কাটাতে হয় কংগ্রেসকে। গান্ধী তাতে রাজী হতে পারেন না। তাহলে কি ক্যাবিনেট মিশনকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে? তা যদি হয় তবে ব্রিটেনের দিক থেকে আর কোনো প্রস্তাব আসবে না। নেগোশিয়েশনস ছিন্ন হয়ে যাবে। কিছুদিন বাইরে থেকে কংগ্রেসকেও ফিরতে হবে জেলে। কেন্দ্রে কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটলে শুধুমাত্র প্রাদেশিক সরকার চালিয়ে কংগ্রেসের মানসম্মান থাকবে না। লোকে হাসবে। বামপন্থীরাও বিদ্রোহ করবে।

তাহলে কি ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গিলতে হবে? অগত্যা। গান্ধীরও ইচ্ছা নয় অসময়ে আবার এক গণ আন্দোলন করা। জোয়ারের লক্ষণ ছিল না। যেটা ছিল সেটা অরাজকতার। তিনি আর অগাস্ট অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি চান না। তাঁর মতে কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়াই ভালো। কন্‌স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির প্ল্যান মেনে নেওয়াই ভালো, তবে আসাম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা যে অন্যরূপ এটাও তিনি জানিয়ে রাখেন। ওদিকে লীগও স্কীম গিলতে রাজী ছিল। যাতে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যাওয়া সুগম হয়।

কিন্তু ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট নিয়ে দুই পক্ষের সামঞ্জস্য হলো না। লীগ চায় কংগ্রেসের সঙ্গে প্যারিটি। না পেলে ভীটো। কংগ্রেস চায় লীগের চেয়ে অন্তত একটা আসন বেশী পেতে। ভীটোতে কংগ্রেস নারাজ। বড়লাট চোদ্দটা আসনের থেকে লীগকে অফার করেন পাঁচটা, কংগ্রেসকে ছ'টা, তার মধ্যে একটা আসন হরিজনের জন্যে সংরক্ষিত। কংগ্রেস বলে সে তার ছ'জনের মধ্যে একজন মুসলমানকেও নেবে, কারণ কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের দল নয়, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের। লীগের ঠিক এইস্থানেই গলায় কাঁটা। সে অমন সরকারে থাকবে না। বড়লাট কিছুতেই দু'দিক মেলাতে পারলেন না। তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হলো।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন অ্যাটলী। তিনি ওপার থেকে নির্দেশ পাঠান যে লীগ যোগ দিক আর নাই দিক ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করতেই হবে। না করলে কংগ্রেস হয়তো আবার সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স বাধাবে। তিনি আর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স চান না। সুতরাং বড়লাটকেও সে আজ্ঞা করতে হয়। জবাহরলালকে আমন্ত্রণ করতে হয় ক্যাবিনেট গঠনে সাহায্য করতে। তিনিই যখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি কায়দে আজমের সঙ্গে মোলাকাৎ করেন ও কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাব তোলেন।

ঝীণা ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের মিটিং ডেকে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম খারিজ করেছিলেন। কাজেই ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দিতে পারেন না।

আসলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ তাঁর দাবীর পরিপরূণ নয়। তিনি চেয়েছিলেন দ্বিকেন্দ্রীকরণ। একটিমাত্র কেন্দ্র যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন সেখানেও মেজরিটি মাইনরিটির দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। মেজরিটি তার বাড়তি ভোট দিয়ে মাইনরিটিকে পরাস্ত করবে। গণতন্ত্রের নিয়ম যদি খাটে তো কংগ্রেস প্রত্যেকবার জিতবে। সেইজন্যে তিনি চেয়েছিলেন প্যারিটি। আপাতত বড়লাটের পরিষদে। সেইজন্য তিনি চেয়েছিলেন ভীটো। আপাতত বড়লাটের উপস্থিতিতে। পরে বড়লাটের অবর্তমানে তিনি হয়তো কাস্টিং ভোট চেয়ে বসতেন। তা নইলে কোয়ালিশন পোষায় না। তা ছাড়া তাঁর পক্ষে এটিও একটি জীবনমরণ প্রশ্ন কে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি। লীগ না কংগ্রেস। লীগ যদি সব মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি না হয়ে থাকে তবে কোয়ালিশনে লীগের আগ্রহ নেই। কংগ্রেসী মুসলমানদের সঙ্গে এক টেবিলে বসলে লীগ মুসলমানের জাত যাবে।

ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে তাঁর দাবী মিটবে না। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিতেও তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। তাহলে কেন আর পিছুটান? তারপর সবচেয়ে বড়ো কথা বড়লাটের শাসনপরিষদের সব পারিষদের সমান মর্যাদা। কেউ প্রধানমন্ত্রী নন। জবাহরলাল ধরে নিয়েছেন যে তাঁকে কার্যত প্রধানমন্ত্রী করা হবে। ওয়েভেলও সেটা ধরে নিয়েই তাঁকে গভর্নমেণ্ট গঠনে সহায়তার ভার দিয়েছেন। ঠিক যেমন বিলেতে হয়। কিন্তু দেশটা তো বিলেত নয়। এখানে এখনো সেরকম কোনো কনভেনশন গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হলে লীগের উপর সর্দারি করবেন। লীগের মান-ইজ্জৎ থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে গোটা ক্যাবিনেট পদত্যাগ করে। সেটাও মুসলিম লীগ মেনে নেবে না।

ঝীণা তাঁর চালগুলো ঠিক করে রেখেছিলেন। একটার পর একটা ক্রমশ প্রকাশ্য। জবাহরলালকে তিনি "না" বলে দেন। তখন বড়লাট তা শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হন। ব্রিটিশ পলিসি নয় লীগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেসকে ক্ষমতা দেওয়া। গান্ধী গিয়ে ওয়েভেলকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে পরিণাম ভালো হবে না। ওয়েভেল বেকায়দায় পড়ে জবাহরলালের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গভর্নমেণ্ট গঠন করেন। গান্ধীর কাছে সেটি একটি স্মরণীয় দিবস। তাঁর মনে বিজয়োল্লাস।

ওদিকে ঝীণার কাছে ওটি একটি কালো দিন। ইতিমধ্যেই তিনি লীগকে দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। শুরু হয়ে গেছল "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। চারদিনেই পাঁচ হাজার নিহত। এক কলকাতায়।

চব্বিশ

ঝীণা মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের যখন একটা 'ডীল' হবে তখন তাঁকে তার থেকে বাদ দিলে তিনি অনর্থ বাধাবেন। সেই অনর্থটা কী হতে পারে, তা নিয়ে আমরা দু'বছর আগে বলাবলি করেছি যে ঝীণা আর যাই করুন ফৌজদারি করবেন না। তাঁর মেজাজটা দেওয়ানি। কিন্তু আমাদের সে ধারণা যে ভুল সেটা প্রতিপন্ন হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট। তাঁর কথা হলো তিনি এতকাল শাসনতান্ত্রিক পথ ধরে কিছু পাননি। এবার দেখাবেন তাঁরও একটা পিস্তল আছে।

তা তিনি দেখিয়ে ছাড়লেন। সাতশো বছর যারা সুখে দুঃখে একত্র বাস করে এসেছে, যারা ধর্মে এক না হলেও রক্তে এক, ভাষায় এক, সাধারণ স্বার্থে এক তারাও সাত মাসের মধ্যেই পরস্পরের উপর ঘেন্নায় রাগে অনাস্থায় বলতে লাগল, এর চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো। পাঞ্জাবী হিন্দু শিখরাই আওয়াজ তুলল যে পাঞ্জাব ভাগ করতে হবে। সে আওয়াজ ভারতের পূর্ব প্রান্তেও প্রতিধ্বনিত হলো। বাংলা ভাগ করতে হবে।

ঝীণা সাহেব ভোট নিয়ে মুসলমানের সম্মতি পেয়েছিলেন। এবার পিস্তল দেখিয়ে হিন্দু শিখের সম্মতিও পেলেন। বাকী রইল ইংরেজের অনুমোদন। সেটার জন্যে পিস্তলের দরকার হবে না। তবে সরকারী খেতাব বর্জন করে একটা প্রতীকী প্রতিরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। তোমরা যদি ধরে নিয়ে থাকো যে আমরা মুসলমানরা চিরকাল ভালো ছেলে হব সেটা ভুল। আমরাও দুষ্টু ছেলে হতে জানি। কেন আমাদের মিউটিনির মুখে ঠেলে দিচ্ছ?

মুসলমানরা ক্ষেপলে তাদের শায়েস্তা করার ক্ষমতা বা রুচি কোনোটাই ছিল না ইংরেজের। সে কাজ যদি করতে হয় হিন্দুরাই করুক। কিন্তু ইংরেজ থাকতে নয়। তার আগেই ওরা বিদায় নেবে। শুধুমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটলমেণ্ট হবে এ প্রস্তাবে তারা নারাজ। একমাত্র কংগ্রেসই সারা ভারতের প্রতিনিধি এ ঘোরণায় তারা বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসে অহিন্দুরাও থাকতে পারে, তা বলে কংগ্রেসের হাতে অহিন্দুদের সঁপে দেওয়া যায় না।

স্বাধীনতা বলতে যদি বোঝায় ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে ক্ষমতা আত্মসাৎ করা তবে নেগোশিয়েশনসের কী দরকার? শক্তি থাকে তো কেড়ে নাও। কিংবা ছেড়ে যাচ্ছি, দখল করো। আর যদি ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত বোঝায় তবে যেটা হবে সেটা ক্ষমতা হস্তান্তর। সেটাতে মাইনরিটিরও একটা অংশ থাকবে। তবে সেটা পাকিস্তান আকারে না অন্য কোনো আকারে সে প্রশ্ন ব্রিটেনের মাথাব্যথা নয়। মাইনরিটির পক্ষে কথা বলবার পাত্র মুসলিম লীগ। তাকে বাদ দিয়ে নেগোশিয়েশনস নয়। তা সে যতই দস্যিপনা করুক। ডাইরেক্ট অ্যাকশন করতে তাকে বাধ্য করল কে?

স্বাধীনতা বলতে গান্ধী বুঝতেন ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি। আর ঝীণা বুঝতেন হিন্দু মেজরিটির মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি। একজনের

প্রতিপক্ষ ইংরেজ, অপরজনের হিন্দু মেজরিটি। এঁদের মধ্যে মিটমাট ইংরেজ থাকতে হবার নয়। কিন্তু ইংরেজ গেলেও কি হবার? ইংরেজ গেলে কি হিন্দু মেজরিটিও যাবে? হিন্দু মেজরিটি যেত শুধু একটি উপায়ে। সেটি দেশভাগ। সেইজন্যে ঝীণা অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পাওনা একপাউণ্ড মাংস তিনি না পেয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু খেয়াল ছিল না যে কংগ্রেসও একপাউণ্ড মাংস চাইবে। প্রদেশভাগ।

তবে কংগ্রেসকে তিনি চিনতেন। গান্ধীর কাছে যেমন নীতি বড়ো কংগ্রেসের কাছে তেমনি ক্ষমতা বড়ো। একটা সর্বশক্তিমান কেন্দ্র পেলে কংগ্রেস মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বা অঞ্চল ত্যাগ করতেও পারে। যদি ইংরেজ সেটা রোয়েদাদ হিসাবে দেয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিও কি কংগ্রেস অমনি নিত? নিল সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ হিসাবে। স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট থেকে ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র নেশন। একই বিবর্তনধারা। খানিকটা গিলবে, বাকীটা গিলবে না, এ কি কখনো হতে পারে? কংগ্রেস যদি গিলতে আপত্তি করে তবে ইংরেজরা সেটলমেণ্ট না করেই বিদায় নেবে। ক্ষমতার হস্তান্তর যদি আইন অনুসারে না হয় তবে কংগ্রেসকে মানবে কে? মুসলিম সৈন্য কি লয়ালটির শপথ নেবে? মুসলিম রাজপুরুষরাও কি আনুগত্য জানাবেন? মুসলিম প্রজারাও কি বিদ্রোহ করবে না?

সত্যি তাই। নেহরু ও পটেল দেখেন যে মুসলিম সৈনিক, রাজপুরুষ প্রভৃতির আনুগত্য বড়লাটের শাসনপরিষদের মুসলিম সদস্যদেরই প্রতি। কংগ্রেস সদস্যদের তাঁরা আপনার মনে করেন না। এসব ডিসলয়াল কর্মচারী নিয়ে গভর্নমেণ্ট চলবে কী করে, যখন ইংরেজ থাকবে না? বড়লাট চলে গেলে কি একটা দিনও এদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে? একটা হুকুমও কি এরা মানবে? তাহলে কেন এদের ধরে রাখা? হোক পাকিস্তান। যাক পাকিস্তানে।

ইতিমধ্যে বড়লাট মুসলিম লীগকে রলে কয়ে তাঁর শাসনপরিষদে নিয়ে এসেছিলেন। তা না হলে ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা সম্ভব হতো না। দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা এগোত না। ইংরেজরা কেবলমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটল করত না। সেটলমেণ্ট বলতে ওরা বুঝত ত্রিপাক্ষিক সেটলমেণ্ট। ওর মধ্যে কোন নূতনত্ব ছিল না। অন্যান্য বারের শাসন-সংস্কারেও ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা হয়েছিল। দ্বিপাক্ষিকটা গান্ধীজীর আইডিয়া। যেমন গান্ধী আরউইন চুক্তি। ইংরেজরা একবারমাত্র ওটা হতে দিয়েছে। আর দেয়নি ও দিত না। তার চেয়ে বিনা সেটলমেণ্টে প্রস্থান করত। গৃহযুদ্ধ বাধলে বাধত। সেটা যে অহিংস ব্যাপার হতো না ঝীণার ডাইরেকট অ্যাকশন তারই প্রস্তাবনা।

ঝীণার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেবার জন্যেই গান্ধীজী নোয়াখালী যাত্রা করেন। সেখানে যদি তিনি হিন্দু মুসলমানকে শান্তিতে রাখতে পারেন তো গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। তখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা পিস্তলের মুখে নয়, শান্ত মনে। কিন্তু তাঁর নোয়াখালীতে পদার্পণের পিঠ পিঠ ঘটে গেল বিহারের ঘটনাবলী। আরো ভয়ংকর, আরো ব্যাপক। তার

কিছুকাল পরে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী। আরো পৈশাচিক, আরো ব্যাপক। গান্ধীজী একসঙ্গে ক'টা জায়গায় যাবেন? ক'টা জায়গায় শান্তি স্থাপন করবেন? তাঁর সহকর্মীরা বিহারে সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু সেখানেও জবাহরলালকে বোমাবর্ষণের হুমকি দিতে হলো। স্টেট ভায়োলেন্স যদি সঙ্গে সঙ্গে চালানো যায় তাহলে অহিংসার উপর লোকের নির্ভরতা থাকে কোথায়? নোয়াখালীতে দেখা গেল লোকে মিলিটারির উপস্থিতি চায়। গান্ধী বার বার বারণ করা সত্ত্বেও মিলিটারি গিয়ে সেখানে হাজির হয় ও তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, গান্ধী না থাকলে মিলিটারি থাকে না, সুতরাং মহাত্মা থাকুন, তাঁর থাকার ফলে মিলিটারিও থাকবে। কী সুন্দর লজিক!

গান্ধীর থাকার উপর মিলিটারির থাকা নির্ভর করছে এটা বুঝতে পেরে নোয়াখালীর মুসলমানরাও বেঁকে বসে। ওরা বলে, গান্ধীর চলে যাওয়াই উচিত, তাহলে মিলিটারিও চলে যাবে। ওদের দোষে মিলিটারি এসেছে এটা ওরা বুঝবে না। দোষ অস্বীকার করবে। তাহলে আর অন্তঃপরিবর্তন হলো কোথায়? রাষ্ট্রই কতক লোককে ধরে নিয়ে যায়, বিচার করে, কারো কারো সাজা হয়। হিন্দুদের আস্থা ফিরে আসে মুসলমানদের গ্রেপ্তার, বিচার ও সাজা দেখে। কিন্তু তার ফলে মুসলমানদের রাগ চড়ে যায়। তারা আরও জোরসে পাকিস্তান দাবী করে।

গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে তিনি এতকাল যে অহিংসা শিখিয়ে এসেছেন সে অহিংসা নয়, দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। সে বস্তু অরাজকতার দিনে কাজ দেয় না। তিনি অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেন। তাঁর মনে বোধহয় একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে ব্রিটেনের সদিচ্ছায় আস্থা হারিয়ে কংগ্রেসের নেতারা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। তখন মুসলিম লীগের ষাঁড়ের সামনে আর কংগ্রেসের লাল ন্যাকড়া থাকবে না। ষাঁড়ের ষণ্ডামি থামবে। মুসলিম লীগের ষণ্ডামি থামলে হিন্দুরা নিরাপদ হবে। তখন জন বুলের বিরুদ্ধে গণ সত্যাগ্রহের কথা ভাবা যাবে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব ছিল ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মতো। তাঁরা অনেককাল ভ্রমণ করেছেন। আর ভ্রমণে যাবেন না বলে মনঃস্থির করেছেন। ইংরেজরাও চান যে কংগ্রেস নেতারা পদত্যাগ করে আবার গণ সত্যাগ্রহে উদ্যোগী হন। দুপক্ষেই একটা দীয়তাং নীয়তাং ভাব। বড়ো বড়ো সমস্যা ছিল তিনটে কি চারটে। সেগুলোর যদি সমাধান হয়ে যায় ব্রিটেন কালকেই যেতে রাজী। গান্ধীজী যে ভেবেছিলেন কংগ্রেস পদত্যাগ করে আবার সংগ্রাম করবে তার দরকারই হয় না।

বড়ো বড়ো সমস্যার প্রথমটা ছিল সিভিল সার্ভিস ও আর্মির ভবিষ্যৎ। স্থির হয়ে গেল যে যারা অবসর চায় তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পাবে। যারা কাজ করতে রাজী তারা যদি ভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা অবসর নেবার সময় পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পাবে। আর যারা অভারতীয় তাদের কপালে ক্ষতিপূরণ নেই, কিন্তু আর যা

সব আছে। অবসর নিলে তারা পেনশন পাবে, কাজ করলে তারা মাইনে ইত্যাদি আগের মতো পাবে। তাদের প্রস্‌পেক্টস বরং আরো ভালো হবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণের কথা মুখে এনেছ কি মরেছ।

এরপরের সমস্যা হলো মাইনরিটির ভবিষ্যৎ। তারা যদি তাদের জন্যে আলাদা একটা রাষ্ট্র চায় তবে কি মেজরিটি তাতে রাজী হবে? এই যে প্রশ্ন এটা ওয়েভেল থাকতে মিটল না, তিনি বা অন্যান্য ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা সৈন্যদল ভেঙে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কত কষ্টে গড়া হয়েছে যাকে তাকে কি এককথায় তছনছ করে দেওয়া যায়? ওয়েভেলকে গান্ধী ভুল বুঝেছিলেন, আরো অনেকে ভুল বুঝেছেন। তিনি কিন্তু পার্টিশনের বিপক্ষেই ছিলেন। তাঁর ছিল আজব এক পরিকল্পনা। তাতে ব্রিটিশ নরনারীর জীবন নিরাপদ হতো, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের জীবন বিপন্ন হতো। কে জানে হয়তো বিপন্ন হয়েই ওরা নিজেদের মধ্যে একটা ঘরোয়া মিটমাট করত। তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিত না। গান্ধী তো একটা ঘরোয়া মিটমাটই চেয়েছিলেন, তাতে তৃতীয় পক্ষের হাত থাকত না।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়েভেলকে সরিয়ে দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে পাঠালেন ও তার আগেই ঘোষণা করে দিলেন যে ইংরেজেরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই অপসরণ করবে। ক্ষমতা হস্তান্তর কার হাতে করবে সেটা নির্ভর করবে দেশের নেতারা একমত না একাধিকমত তারই উপর। একাধিকমত হলে একাধিক হাতে, একমত হলে একহাতে। তার মানে ভারত ভাগ হয়ে যেতে পারে। যদি কংগ্রেস লীগ ভিন্নমত হয়। এই ওয়ার্নিংটা পেয়ে কংগ্রেস নেতারা যে লীগ নেতাদের সঙ্গে হাত মেলাবার চেষ্টা করলেন তা নয়। আর লীগ নেতারা যে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হলেন তাও নয়। তাঁদের কাছে ওটা ওয়ার্নিং না হয়ে গ্রীন সিগনাল। দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে এর মধ্যে আশঙ্কার কী আছে? এ তো পরম আশ্বাসনার কথা।

মাউণ্টব্যাটেন আসার আগেই রব উঠেছিল পাঞ্জাব ভাগ করা হোক। কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রতিধ্বনি উঠল বাংলা ভাগ করা হোক। গান্ধীজীর অমতে কংগ্রেস প্রদেশ ভাগে রাজী হয়ে যায়। মাউণ্টব্যাটেন যখন বলেন যে ঝীণা দেশভাগের বেসিস ছাড়া অন্য কোনো বেসিসে মিটমাট করবেন না তখন কংগ্রেস নেতারা বলেন, বেশ তো, সেই সঙ্গে প্রদেশ ভাগও হয়ে যাক। তখন দ্বিতীয় সমস্যাটার মীমাংসা হলো। একটা নয়, দুটো কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তাদের মধ্যে সরকারী বিভাগগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে। অখণ্ড ভারত নয়, দ্বিখণ্ড ভারত। অখণ্ড বঙ্গ নয়, দ্বিখণ্ড বঙ্গ। অখণ্ড পাঞ্জাব নয়, দ্বিখণ্ড পাঞ্জাব। আসামের থেকে সিলেট বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গের সামিল হবে, যদি লোকে তাই চায়। তেমনি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের সামিল হবে, যদি লোকে চায়।

অতি সহজ সমাধান। কিন্তু কেউ ভেবে দেখলেন না উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মুসলমানদের কী দশা হবে। তাদের একূলও গেল, ওকূলও

গেল। তেমনি দুই রাষ্ট্রের মাইনরিটিদের কী হবে। এসব ভাববেন আর কে? সেই গান্ধী। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা যখন মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মীমাংসা করে ফেলেছেন আর মুসলিম লীগও যখন সে মীমাংসায় সম্মত তখন তিনি একা কী করতে পারেন? দেশকে ডাক দিয়ে বলতে পারেন, এ সমাধান ঠিক নয়। এটা অগ্রাহ্য করো। কিন্তু কোন সমাধানটা ঠিক? কোনটা নির্ভুল? ক্যাবিনেট মিশনের সমাধান তো তিনি নিজেই সংশোধন করতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন।

আসামের মায়া না কাটালে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অপরের গ্রাহ্য হবে না। আর তাতে যে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা কংগ্রেস নেতাদের অগ্রাহ্য। তাঁরা বরং দ্বিকেন্দ্রীকরণ নেবেন, তবু বিকেন্দ্রীকরণ নয়। কিন্তু দ্বিকেন্দ্রীকরণ নিলে এই শর্তে নেবেন যে বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হবে।

গান্ধীজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে বাংলা অন্তত ভাগ না হয়। তেমনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ঝীণা। তেমনি বাংলার গভর্নর বারোজ। তিনি ইউরোপীয়দের দিক থেকে। কিন্তু সেটা সম্ভব হতো অন্য একটি ফরমুলা মেনে নিলে। পার্টিশন ফরমুলা নয়, বলকান ফরমুলা। অর্থাৎ ক্ষমতার হস্তান্তর হবে প্রদেশওয়ারি। পরে প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের জোড়া লেগে অখণ্ড ভারতও হতে পারে, দ্বিখণ্ড ভারতও হতে পারে, বহুখণ্ড ভারতও হতে পারে। ওই ফরমুলাটিও মাউণ্টব্যাটেনের ঝুলিতে ছিল। তাঁর ইউরোপীয় সাঙ্গোপাঙ্গরা ওটি উদ্‌ভাবন করেছিলেন। কতকটা ইউরোপীয় স্বার্থে, কতকটা মুসলিম স্বার্থে। ও ফরমুলা মেনে নিলে বাংলা স্বতন্ত্র হতে পারত, আসামও স্বতন্ত্র হতে পারত, দুই মিলে অর্ধপাকিস্তান হতে পারত। কিন্তু জবাহরলাল জানতে পেরে ওটা নাকচ করেন ও পার্টিশনের ভিত্তিতেই মীমাংসা করেন। দুটো মন্দের মধ্যে যেটা কম মন্দ সেটাই বেছে নেন। জনমতও সেইটের পক্ষে।

এমনি করে দ্বিতীয় বৃহৎ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। মাইনরিটির ভবিষ্যৎ কী হবে তার উত্তর। এর পরে তৃতীয় বৃহৎ প্রশ্ন। ইউরোপীয়দের ভবিষ্যৎ কী? তাঁরা এদেশে দুই শতাব্দী ধরে ব্যবসাবাণিজ্য করে আসছেন। তাঁদের কি তবে পাততাড়ি গুটোতে হবে? সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া মানে কি বাণিজ্য গুটিয়ে নেওয়া? এর উত্তর, ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে কমনওয়েলথে অবস্থান করতে সম্মত। একবার যখন এই প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে গেল তখন মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে ১৫ই অগাস্টের মধ্যে সব কিছু সেরে ভারত থেকে অপসরণ করবেন। আর দেরি করার কারণও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

ইংরেজরা গান্ধীজীর সঙ্গে মীমাংসার আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিছুতেই তিনি মাইনরিটিদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে আপস করতেন না। তাঁর মতে ওর মীমাংসা ব্রিটেন থাকতে নয়। ওটা আমাদের ঘরোয়া প্রশ্ন। আমরা দু'ভাই

যেমন করে পারি মেটাব। দরকার হলে লড়ব। আর নয়তো দেশ ভাগাভাগি করব। কিন্তু কেউ আমাদের মাঝখানে থেকে নীলাম দর চড়িয়ে দেবে না। আগে ইংরেজ যাক, হয় কংগ্রেসের হাতে সারা দেশটা দিয়ে যাক, নয় লীগের হাতে। কিন্তু তাঁর ও প্রস্তাব কেউ সমর্থন করে না। ওটা কাজের কথা নয়।

অথচ মাইনরিটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রেখে ব্রিটেন এদেশ থেকে বেরোতে পারছিল না। দেশীয় রাজাদের সে তাদের নিজেদের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল। প্যারামাউণ্ট পাওয়ার নিজেও থাকবে না, আর কাউকেও করবে না। কার্যত ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেই জুড়ে যাবে। ওদের জন্যে ব্রিটেনের মাথাব্যথা ছিল না। ছিল মুসলিমদের জন্যে। তার একটা কারণ তো এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে ওরা মোটের উপর সংগ্রামের বাইরে থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। সেটা আমার এক ইউরোপীয় বন্ধুর মুখে শুনি। পার্টিশন হতে যাচ্ছে এইজন্যে যে, "ওদেশের মিডল ইস্টার্ন পলিসির অঙ্গ হচ্ছে এদেশের মুসলিম পলিসি। এখানকার মুসলমানদের চটালে মিডল ইস্টে আমরা টিকতে পারব না।"

পার্টিশনে রাজী না হলে যা হতো তা বলকান সৃষ্টি। গান্ধীজীর তাতে আপত্তি না থাক কংগ্রেসের ছিল। রাজনীতিতে সেইটেই বরণীয় যেটাতে কম মন্দ। পরে গান্ধীজীও সেটা বুঝতে পেরে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন করেন। সিদ্ধান্তটা তাঁদের, সমর্থনটা তাঁর। এরপর তিনি নোয়াখালীতে ফিরে যাবার জন্যে রওনা হন। কিন্তু পথে কলকাতায় সুহরাবর্দী তাঁকে আটক করেন। কলকাতার মুসলমানরা সন্ত্রস্ত। কে জানে ১৫ই অগাস্ট কী হয়! হিন্দুরা হয়তো প্রতিশোধ নেবে। তারপর সারা বাংলা জুড়ে হিংসা প্রতিহিংসার তাণ্ডব চলবে। গান্ধীজী কলকাতায় থাকেন ও তাঁর অলৌকিক প্রভাবে অবস্থা শান্ত হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

পঁচিশ

অবশেষে এল সেই অমৃতময় দিন যেদিন আমরা জেগে দেখলুম যে আমরা স্বাধীন। দু'শো বছরের বিদেশী রাজত্ব কখন একসময় স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। যাবার সময় ইংরেজরা আমাদের হৃদয় জয় করে গেল। আমরাই মাউণ্টব্যাটেনকে আরো কিছুদিনের জন্যে ধরে রাখলুম, যাতে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়।

গান্ধীজী যখন কুইট ইণ্ডিয়া বলেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে ইতিহাস তার অন্যরকম অর্থ করবে? ভারতেরই একাংশ হবে পাকিস্তান? সেখান থেকে কুইট করে আসবেন যাবতীয় হিন্দু ও শিখ রাজকর্মচারী? আর পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আধকোটি হিন্দু ও শিখের জনতা? তিনি যদি কলকাতায় একটি মিরাক্ল না ঘটাতেন তবে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরাও

পুরোপুরি না হোক বহু পরিমাণে পশ্চিমপাকিস্তানের হিন্দুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও।

অপরপক্ষে ভারতের যে অংশ নিজের নাম হিন্দুস্থান না রেখে ভারত রাখে সেখান থেকেও কুইট করে যান অধিকাংশ মুসলিম রাজকর্মচারী, কিন্তু কতক থেকে যান এই কারণে যে ভারত ঘোষণা করেছে তার রাষ্ট্র ধর্মনির্বিশেষ রাষ্ট্র, সেকুলার স্টেট। সেখান থেকেও কুইট করে যায় আধকোটি মুসলমানের জনতা, কিন্তু তার বহু গুণ থেকে যায় এইজন্যে যে ভারত কেবল হিন্দুদের দেশ নয়, এদেশ ধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর।

গান্ধীজী যখন কলকাতায় বসে পূর্বদিকটা সামলাচ্ছেন তখন পশ্চিম-দিকটা সামলাবার জন্যে তাঁর মতো কেউ ছিলেন না। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা গান্ধী যদি সে সময় পাঞ্জাবে থাকতেন তাহলে অত বড়ো একটা বিপর্যয় সেখানে ঘটত না। অহিংসার চরণে নৌসেনাপতি ও রাজবংশীয় পুরুষের এই নতিস্বীকার সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজীকে আখ্যা দেন 'ওয়ান ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স'।

কিন্তু বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের এমন কয়েকটা তফাৎ ছিল যা মনে রাখলে পশ্চিমের ট্র্যাজেডীর হেতু বোঝা যায়। সেখানে কাজ করছিল তিন পক্ষের উচ্চাভিলাষ। শিখ, মুসলমান ও হিন্দু। প্রত্যেকেই ষোল আনার মালিক হবে। তার জন্যে হাতিয়ার সংগ্রহ করা সাত বছর ধরে চলেছিল। শেষের দিকে প্রদেশভাগের রব ওঠে, সেটা কিন্তু মুসলমানের তরফ থেকে নয়। মুসলমান তার ষোল আনার দাবীতে অটল। তারপর, ভাগাভাগির প্রস্তাব যারা তোলে তারা ভেবেছিল তাদের খুশিমতো ভাগ হবে, অন্তত লাহোরটা তাদের ভাগে পড়বে। হলো নিরপেক্ষভাবে, শিখ ও হিন্দুর বিস্তর প্রিয় স্থান ও প্রচুর ভূসম্পত্তি মুসলমানের ভাগে পড়ল। লাহোর—রণজিৎ সিংহের লাহোর—শতবর্ষ পরে শিখরা ফিরে পেলো না, তাদের বদলে পেলো মুসলমানরা। ওটা যেন কলকাতা শহর পাকিস্তানকে দেওয়া। সেরূপ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও কি লালে লাল হয়ে যেত না?

পাকিস্তানের নেতারা হিন্দু ও শিখকে পাকিস্তানেই রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের জাতীয় পতাকার একতৃতীয়াংশ সফেদ। ঝীণা সাহেব তো পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এখন থেকে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলিম নয়, সকলেই পাকিস্তানী, সকলের জন্যেই পাকিস্তান। কিন্তু সেই তিনিই সরকারীভাবে পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট আখ্যা দিয়ে মুসলমানকেই দেন তার প্রথমশ্রেণীর নাগরিকত্ব। যারা মুসলমান নয় তারা হলো জিম্মি। না, মূর্তিপূজক যারা তারা জিম্মি হবারও যোগ্য নয়। অনেকেই জানেন না যে ইসলামিক স্টেট মূর্তিপূজকদের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, যেমন স্বীকার করে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের অস্তিত্ব। ইসলামিক স্টেটে মূর্তিপূজা যারা করে তারা হয় ওকাজ ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, নয় দেশত্যাগ করবে, নয় কোতল হবে। চতুর্থ পন্থা নেই।

তবে কার্যত এর প্রয়োগের বেলা উদারতা আসে। ভারতের মাটিতে মূর্তিপূজকদের সংখ্যা এত অধিক, আর তাদের হাতে এত বেশী অস্ত্রশস্ত্র যে তাদের সবাইকে মুসলমান করা সম্ভব হয় না। কোতল করাও কাজের কথা নয়। চাষ করবে কে? খাজনা দেবে কে? আর দেশত্যাগ করে যাবেই বা তারা কোথায়? মুসলিম সুলতানরা ক্রমে দেশের রীতিকেই রাষ্ট্রের নীতি করেন। যার যার ধর্ম তার তার। তবে তাঁরা ইসলামকেই করেন রাজধর্ম। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে যা গড়ে ওঠে তা ধর্মরাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রধর্ম। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হয়েই ক্ষান্ত হয়, ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপনের স্বপ্ন বিসর্জন দেয়। আকবর তো তাকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদাও দেন না, তবে সেটা পরবর্তী আমলে ফিরে আসে।

এতকাল পরে আবার শোনা গেল ইসলাম যা দেড় হাজার বছর আগে গড়তে চেয়েছিল, কিন্তু সাতশো বছর হলো পারেনি সেই জিনিসই আবার গড়বে পাকিস্তান। ঐসলামিক ধর্মরাষ্ট্র। বলতে গেলে সাতশো বছরের ভারতীয় ইতিহাসকেই সে উল্টে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে পুনঃপ্রবর্তন করবে। এতকাল মন্দির ও মসজিদ পাশাপাশি দেখা গেছে, যেমন মুসলিম রাজ্যে তেমনি হিন্দু রাজ্যে। মুসলিম রাজার হিন্দু প্রজারা প্রাণভয়ে হিন্দু রাজ্যে পালায়নি। হিন্দু রাজার মুসলিম প্রজারাও মুসলিম রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে নিরাপত্তা চায়নি। সাতশো বছর পরে কী এমন হয়েছে যে হিন্দু শিখরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ভারতরাষ্ট্রে ছুটে আসবে আর মুসলমানরা পাকিস্তানে দৌড় দেবে? এমন যদি চলতে থাকে তবে তো পাকিস্তান অচিরেই হিন্দুশূন্য হবে, আর ভারতরাষ্ট্র মুসলিমশূন্য।

এপারেও একদল ধুয়ো ধরলেন যে ভারতরাষ্ট্রকেও করতে হবে হিন্দুরাষ্ট্র আর হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম। এটাও সেই পাকিস্তানী দুই নেশনতত্ত্বের অনুসরণ, ভারতীয় এক নেশনতত্ত্বের অস্বীকৃতি। পাকিস্তানীরা যেমনটি করবে এঁরাও ঠিক তেমনটি করবেন। ওরা যদি হাজার বছর পিছিয়ে যায় এঁরাও যাবেন হাজার বছর পিছিয়ে। ওরা যদি আত্মহত্যা করে এঁরাও করবেন আত্মহত্যা। দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওরা কড়ে আঙুলটি নাড়েনি, দেশ আবার পরাধীন হলে ওদের কী আসে যায়? কিন্তু এঁরা তো স্বাধীনতার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন, তার মূল্য বোঝেন। তবে কেন সেই চোরাগলিতে পা দিচ্ছেন যা একদিন পরাধীনতাতেই পৌঁছে দিয়েছিল ও আবার দিতে পারে। আসলে ওটা ছিল পাকিস্তানকে জব্দ করার ও তার উপর চাপ দেওয়ার কৌশল। সেই কৌশলের অঙ্গ মুসলমানদের যেতে বাধ্য করা, হিন্দুদের আসতে বাধ্য করা, বেআইনী ও বেসরকারীভাবে একটা লোকবিনিময় ঘটানো।

হিন্দুরাও যে সমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে, হতে পারে রাতারাতি, এটা সেদিন আমাদের চোখে একান্ত বিস্ময়কর ঠেকে। এক এটা দেশের এক একটা প্যাটার্ন থাকে, সে প্যাটার্ন বুনে যায় তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। এদেশের প্যাটার্ন ইংরেজ আসার আগেও ছিল নানা জাতির নানা বর্ণের নানা

ধর্মের নানা ভাষার মিশ্র প্যাটার্ন। যা হাজার হাজার বছর ধরে ঘোরতর রূপে মিশ্র তাকে আজ হঠাৎ ক্ষমতা হাতে পেয়ে অমিশ্র করতে পারে কেউ! একজন মানুষ ধর্মে মুসলমান, কিন্তু ভাষায় বাঙালী, পেশায় চাষী, মতবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। সে কি থাকবে, না যেতে বাধ্য হবে? তাকে বাধ্য করার দায়িত্ব কে নেবে? রাষ্ট্র না বেসরকারী এক সংগঠন না উচ্ছৃংখল এক জনতা?

আমার এক বন্ধু দিল্লী থেকে ঘুরে এসে বলেন, "কংগ্রেস তো নামেই রাজা। প্রকৃত রাজা আর এস এস। ভোট নিলে দেখা যাবে ওদের মেজরিটি, কংগ্রেসের নয়।"

আমি হতবাক হই। যাঁর মুখে শুনি তিনি নিজেই কংগ্রেস মন্ত্রী। তিনি ভাবতেই পারেননি যে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার দিল্লীতেই পুত্তলিকা হবেন।

তাঁদের অবস্থা আরো পরিষ্কার হলো যখন খবর এল ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য করতে গিয়ে আমার আরেক বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন কার হাতে, না তাঁরই স্বধর্মী এক হিন্দু সিপাহীর হাতে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুসলমানের উপর হামলা নিবারণ করতে, তা সে নিবারণ করল নিবারণকর্তাকে গুলী করে।

হামলা চলবে, তাকে নিবারণ করা চলবে না। একদিকে আর এস এস, আরেকদিকে পুলিশ, মাঝখানে ফাঁদে পড়া মুসলমান। গভর্নমেণ্ট কি হিন্দু হয়ে হিন্দুকে মারবে? না, হিন্দুর সাত খুন মাফ? মুসলমান যেথা ইচ্ছা যাক।

সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তা সেবন করলেন দুই রাষ্ট্রের নতুন দেবগণ। আর যে হলাহল উঠেছিল তা পান করলেন নীলকণ্ঠ গান্ধী। তিনি তাঁর কলকাতার মিশন সেরে নোয়াখালী যাত্রা করছেন, সেখানে গিয়ে তাঁর অসমাপ্ত ব্রত সমাপন করতে হবে, এমন সময় দিল্লী থেকে এল জরুরি তলব। সেখানেও হলাহল উঠেছে, পান করবার জন্যে নীলকণ্ঠকে চাই। পুব মুখে যাবার মানুষকে পশ্চিম মুখে যেতে হলো। কে জানত যে অগস্ত্য যাত্রা!

পশ্চিমপাকিস্তানের হিন্দু শিখ শরণার্থীরা দিল্লীতে এসে মুসলমানদের ঘরবাড়ী মসজিদ দখল করে বসেছে। তাদের ধারণা তারাই ভারতরাষ্ট্রের যথার্থ নাগরিক আর মুসলমানরা এখানে অনধিকারী। বহু হিন্দুর বিশ্বাস যে মুসলমানরা পঞ্চম বাহিনী, তাদের আনুগত্য সীমান্তের ওপারে, সুতরাং তাদের বহিষ্কার ও লোকবিনিময়ই প্রকৃত সমাধান।

মহাত্মাকে প্রতিদিন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলো। এই অসত্যের বিরুদ্ধে। একটা অন্যায়ের উত্তর যে আরেকটা অন্যায় নয়, হিংসার উত্তর যে প্রতিহিংসা নয়, বহিষ্কারের উত্তর যে বহিষ্কার নয়, সমস্যার সমাধান যে প্রতিশোধ নয় এসব কথা দিনের পর দিন জনসাধারণকে বোঝাতে হলো। দেশ ভাগ হয়ে গেছে, সেটা দুঃখের বিষয়। তা বলে লোকভাগ হবে কেন? জনগণ

যে এক ও অবিভাজ্য। জনগণ যদি অবিভক্ত থাকে তাহলে দেশভাগও তেমন ক্ষতি করবে না, কিন্তু লোকভাগ হবে ক্ষতিকর। আর সেটা যদি হয় বেসরকারী ও বেআইনী, তার পদ্ধতি যদি হয় নিরীহ নির্দোষ সংখ্যালঘু প্রতিবেশীর উপর প্রতিশোধ তবে তো সম্পূর্ণ অহিতকর।

এ যেমন তাঁর জনসাধারণের প্রতি উপদেশ তেমনি রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি পরামর্শ তাঁদের সেকুলার পলিসিতে স্থির থাকা, পাকিস্তানের কাছে সমান সদাচার প্রত্যাশা করা, তার বদ আচরণের জবাব বদ আচরণ নয়। এক্ষেত্রেও যা করবার তা একতরফা ভাবেই করতে হবে। কিন্তু এইখানেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মতভেদ ঘটে। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক খেলার নিয়ম হলো রেসিপ্রোসিটি। একপক্ষ যা দেবে অপরপক্ষ তার পাল্টা দেবে। ভালোর বদলে ভালো। মন্দের বদলে মন্দ। বদলা নেওয়াই আন্তর্জাতিক নীতি। নইলে ওরা এদের দুর্বল ভাববে। অন্যায়ের উপর আরো বেশী অন্যায় চাপাবে।

হিংসা আর প্রতিহিংসার, অন্যায় আর পাল্টা অন্যায়ের দুষ্ট বৃত্ত ভঙ্গ করাই হলো গান্ধীজীর কাজ। তিনি রাষ্ট্রনায়ক নন। কিন্তু মন্ত্রণাদাতা। জবাহরলাল সেকুলার স্টেটের রাষ্ট্রীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করলেন। শান্তি-স্থাপনের জন্যে ডাক দিলেন মাদ্রাজী সৈন্যদের। তারা গুলী চালিয়ে হাঙ্গামা বন্ধ করল। রাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে সংখ্যালঘুর পক্ষ নিল।

হিন্দুদের জন্যেই হিন্দুস্থান, না ভারতীয়দের জন্যে ভারত এই প্রশ্নে সংঘাত গান্ধীজীর উত্তরজীবনকে যেমন মহিমাময় তেমনি ট্র্যাজিক করে। হিন্দুর দেশে হিন্দুর উপর গুলী চলছে দেখে কংগ্রেসেরই একভাগ জবাহর-লালের বিপক্ষে চলে যায়, আর গান্ধী যেহেতু জবাহরলালের পক্ষে সেহেতু গান্ধীরও বিপক্ষে। যাঁরা ছিলেন পরম গান্ধীভক্ত তাঁরাও তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে ভাবেন তাঁর হিমালয়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিংবা আর কোথাও। তাঁদের স্বাধীনতায় যেন তিনি হস্তক্ষেপ না করেন। স্বাধীনতাটা যে গান্ধীরই পুণ্যবলে অর্জিত এটা ভুলে যেতে বেশীদিন লাগে না। গান্ধীর পণ, তিনি মাইনরিটিকে পরিত্যাগ করবেন না। দিল্লীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রেখেই তিনি নোয়াখালীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রাখবেন। অপরপক্ষে তাঁর সমালোচকরা মনে করেন যে পাকিস্তানের উপর চাপ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে, আর যদি নাও হয় তাতে কী হয়েছে? চলে যাক না এখানকার মাইনরিটিরা ওখানে। চলে আসুক না ওখানকার মাইনরিটিরা এখানে। এই তো হিন্দুর আপনার দেশ। আর ওই তো মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র। যেন ওটাও হিন্দুর আপনার দেশ নয়, এটাও মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র নয়।

শত্রুর অভাব ছিল না। তারা তো শেল হানবেই। বন্ধুরও অভাব ছিল না, তারা হাত ধরাধরি করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ান না, তাঁর চারদিকে অভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন না। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি স্বজনপরিত্যক্ত অথচ

সংকল্পে অটল। তাঁর বন্ধুরা ইচ্ছা করলেই তাঁর অনশনের পূর্বক্ষণেই তাঁর দাবীগুলো মিটিয়ে দিতে পারতেন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে। আটাত্তর বছর বয়সের একটি বৃদ্ধকে ছয়দিন ধরে অনশন করতে হলো, তার কারণ সরকারী সহকর্মীদের হৃদয় পাষাণ হয়েছিল। বাইরের সহধর্মীদের হৃদয়ও। লোকের ধারণা তিনি পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তানের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি দুটি রাষ্ট্রের একটিতে বা আরেকটিতে যোগ দিলেও হায়দরাবাদের নিজাম ও কাশ্মীরের মহারাজা মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। সুযোগ বুঝে একদল ট্রাইবাল কাশ্মীর আক্রমণ করেও তাতে পাকিস্তানের যোগসাজস ছিল জেনে মহারাজা ভারতে যোগ দেন। তৎক্ষণাৎ ভারতীয় সৈন্য গিয়ে কাশ্মীর উদ্ধার করে। হায়দরাবাদে যেরূপ রজাকরদের উপদ্রব চলেছিল তা অন্য উপায়ে না মিটলে সেখানেও সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু গান্ধী কি সেটা সমর্থন করবেন? সরকারী মহলে ক্রমেই একটা ধারণা দৃঢ় হচ্ছিল যে গান্ধী থাকতে বলপ্রয়োগের স্বাধীনতা নেই, সুতরাং গান্ধীর থাকাটা অনাবশ্যক। তাঁর ও তাঁর অহিংসার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তেমনি গান্ধীজীরও মনে হয় যে কংগ্রেসেরও ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

লবণ যদি তাঁর লবণত্ব হারায় তবে আর কিসে তাকে লবণাক্ত করবে? কংগ্রেস তার লবণত্ব হারিয়েছে। গান্ধী-মতবাদ পরিত্যাগ করেছে। এখন পরিত্যাগ করছে গান্ধীকেই। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়তেই তাঁর অস্তিত্ব। সাম্রাজ্যবাদ আর নেই। লড়াইও চুকে গেছে। এখন তাহলে কংগ্রেসকে লোক-সেবক সঙ্ঘে রূপান্তরিত করতে হবে। ক্ষমতা যে জনাকয়েক নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত হবে এটা তো তিনি চাননি, যেমন ধনসম্পদ গুটিকয়েক পরিবারে কেন্দ্রীভূত হবে এটাও তিনি চাননি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, হয়ে দাঁড়ায় দ্বিকেন্দ্রীকরণ। তিনি জনগণের ক্ষমতার হস্তান্তর কামনা করেন।

জীবনের শেষদিনের আগের দিন মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন তিনি যে একশো পঁচিশ বছর বয়স অবধি বাঁচবেন সে আশা তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু কেন? মার্কিন লেখিকা ও ফোটোগ্রাফার জানতে চান।

"Because of the terrible happenings in the world. I do not want to live in darkness and madness. I cannot continue...." He paused and I waited.

Thoughtfully he picked up a strand of cotton, gave it a twist, and ran it into the spinning wheel. "But if my services are needed," he went on, "rather I should say, if I am commanded, then I shall live to be one hundred and twenty-five years old."

এর পরে আরো কয়েকটি প্রশ্ন। তারপরে পরমাণু বোমার প্রশ্ন। পরম

হিংসার প্রশ্ন। পরমাণু বোমার সঙ্গে তিনি কী ভাবে মোকাবিলা করবেন?

"Ah, ah!" he said, "How shall I answer that!" The charkha turned busily in his agile hands for a moment, and then he replied. "I would meet it by prayerful action." He emphasised the word "action," and I asked what form it would take.

"I will not go underground. I will not go into shelters. I will come out in the open and let the pilot see I have not the face of evil against him."

He turned back to his spinning for a moment before continuing.

"The pilot will not see our faces from his great height, I know. But that longing in our hearts that he will not come to harm would reach up to him and his eyes would be opened."...

পরের দিনই তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। প্রার্থনাপূর্ণ ক্রিয়াসহযোগে তিনি মৃত্যুবাণের সম্মুখীন হন। সম্পূর্ণ প্রস্তুতভাবে ভগবানের নাম করেন, "হে রাম! হে রাম!" তাঁর মুখমণ্ডলে মন্দের আভাস নেই। তাঁর সাধনা সার্থক। তাঁর জীবন সুসমাপ্ত। ওই তাঁর ক্রুশিফিকশন।

২০শে অগাস্ট ১৯৬৯

পরিশিষ্ট

গান্ধীত্ব

আলমোড়া বেড়াতে গিয়ে এক বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি সার্জন। অগাস্ট আন্দোলনের পর বছর ঘুরতে চলল। গান্ধীজী তখন পুণায় খান্ প্রাসাদে বন্দী।

ডাক্তার সাহেব যখন লণ্ডনে পড়াশুনা করতেন তখন গান্ধী এলেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে। সত্যাগ্রহ ততদিনে আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু খুব কম লোকেই তার খবর রাখে। সাবারকর সে সময় লণ্ডনে ছিলেন। একদিন গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। হিংসা অহিংসা নিয়ে তর্ক ওঠে।

সাবারকর বলেন, "গান্ধী, মনে করুন একটা বিরাট বিষধর সাপ আপনার দিকে তেড়ে আসছে। আর আপনার হাতে আছে একগাছা লাঠি। আপনি কী করবেন? মারবেন না মরবেন?"

গান্ধী উত্তর দেন, "লাঠিখানা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। পাছে ওকে মারবার প্রলোভন জাগে।"

"ধর্মে আপনি আমার গুরু হতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিতে নয়।" এই বলে সাবারকর শেষ করে দেন।

দু'জনেই ওঁরা হিন্দু। কেউ কারো চেয়ে কম হিন্দু নন। কারণ হিন্দুদের ঐতিহ্য কেবল অহিংসারও নয়; কেবল হিংসারও নয়। শাস্ত্রগ্রন্থে যেমন অহিংসার প্রশস্তি আছে তেমনি অস্ত্রধারণের সমর্থন আছে। ইতিহাসে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটেছে, আবার কলিঙ্গবিজয়ের পর যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্তি দেবার মহৎ দৃষ্টান্তও আছে।

গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরেও সেই একই তর্ক বার বার বিভিন্ন জনের সঙ্গে উঠেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় উঠেছে, তার দশ বছর পরে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় উঠেছে, আরো দশ বছর বাদে অগাস্ট আন্দোলনের সময় উঠেছে। ইংরেজ যখন আপনা হতে ভারত ছেড়ে যেতে উদ্যত মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় উঠেছে। দেশ যখন দু'ভাগ হয়ে গেল তখনো সেই একই তর্ক জনমতকে দু'ভাগ করে দিল। আজও সে বিতর্কের অবসান হয়নি।

হিংসাবাদীরা অবশ্য দলে ভারী, কিন্তু অহিংসাবাদীদেরও একটা শিবির আছে, সে শিবির একটা দিনও নিষ্ক্রিয় ছিল না ও থাকেনি। গান্ধী নেই, কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব আছে। তাঁর আত্মা মার্চ করে চলেছে। কিছু লোক তাঁর অনুসরণ করে চলেছে।

শুধু ভারতে নয়। ভারতের বাইরে ইটালীতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়। প্রায় প্রত্যেক দেশেই অহিংসাবাদী ব্যক্তি আছেন, কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা

মাত্র কয়েকটি দেশেই। সেসব গোষ্ঠী প্রধানত শুদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা করতেই ব্যাপৃত। প্রচার বা আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ করতে প্রস্তুত নন। সংঘবদ্ধ ক্রিয়া দেখা যাচ্ছে দলচির নির্দেশে সিসিলিতে। মার্টিন লুথার কিং-এর নির্দেশে আমেরিকায়।

'ক্যাথলিক ওয়ার্কার' পত্রিকার নাম এদেশের লোক জানেন না। আমেরিকার এই পত্রিকাটি যাঁদের মুখপত্র তাঁরাও একটি গোষ্ঠী। কিন্তু তাঁদের প্রেরণা খ্রীষ্টধর্মের আদি ঐতিহ্য। ভারতীয় অহিংস ঐতিহ্য নয়। অথচ তাঁরা গান্ধীকেও আপনার করে নিয়েছেন। প্রায়ই তাঁর দৃষ্টান্ত দেন, উক্তি উদ্ধার করেন। গত কয়েক শতকের মধ্যে গান্ধীর ধারে কাছে দাঁড়াবার মতো কোনো খ্রীষ্টশিষ্য না থাকায় গান্ধীই তাঁদের একমাত্র আধুনিক পথ-প্রদর্শক। হিন্দু বলে তারা তাঁকে পর ভাবেন না।

গান্ধীজীর শিবির এখন বহুদূর বিস্তৃত। যেমন খ্রীষ্টানদের মধ্যে তেমনি বৌদ্ধদের মধ্যেও তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী আছেন। তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও। ইহুদীদের মধ্যেও। অহিংসা এমন এক তত্ত্ব যার কোনো দেশ-বিদেশ বা ধর্মবিধর্ম নেই। হিন্দু জনমত যেমন দুই ভাগে বিভক্ত খ্রীষ্টান জনমতও তেমনি। বৌদ্ধ জনমতও তেমনি। মুসলিম জনমতও তেমনি। আধুনিক জগতের সর্বত্র হিংসা অহিংসার দোটানা দেখা যাচ্ছে। কোথাও বেশী কোথাও কম। যেখানেই অহিংসাবাদী মণ্ডলী আছেন সেখানেই গান্ধীর চিন্তা ও কর্ম তাঁদের আলো দিচ্ছে।

তবে পথটা কঠিন। এত কঠিন যে গান্ধীর অনুসরণ করতে সাহস হয় না। বিষধর সাপ যার দিকে তেড়ে আসছে সে কি গান্ধীজীর কথায় লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দেবে? সাপ যদি অত বড়ো ত্যাগের মহিমা না বোঝে, যদি ছোবল মারে, তখন? তার চেয়ে লাঠিখানা থাকলে সাপকেই ভয় দেখানো যায়। খবরদার, সাপ! আর এগিয়েছ কি মরেছ!

সাপের দাঁত ইতিমধ্যে পারমাণবিক হয়েছে। লাঠিও আর বাঁশের তৈরি নয়। সেও নিউক্লিয়ার না হলেও কন্‌ভেনশনাল। অবশ্য দুই রাষ্ট্রের মধ্যে। সংঘাতটা যেক্ষেত্রে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে নয়, একটি রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে, সেক্ষেত্রে নাগরিকরা অপেক্ষাকৃত নিরস্ত্র। গোটাকতক বন্দুক রিভলভার হাতে থাকতে পারে, কিন্তু সেরকম লাঠিতে সাপ মরে না। মাঝখান থেকে প্রাণ যায়। সে প্রলোভন না জাগাই ভালো। পাছে প্রলোভন জাগে সেকথা ভেবে ওরকম হাতিয়ার হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই শ্রেয়।

তার মানে কি সাপের পায়ে আত্মসমর্পণ? না, অহিংসার অর্থ আত্ম-সমর্পণ নয়। অহিংসাও একপ্রকার অস্ত্র। সে অস্ত্র অদৃশ্য থেকে কাজ করে। সাপ তার পাল্টা দিতে জানে না। সাপ যদি পাল্টা দিতে চায় তো তাকেও অহিংস হতে হবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে তার প্রতিপক্ষও তাঁরই মতো মানুষ, হিংসাবাদী হলেও হিংস্র প্রাণী নয়। আর হিংস্র প্রাণী হলেই বা কী? প্রাচীন ঋষিরা হিংস্র প্রাণীদেরও অহিংসা দিয়ে বশ করতেন। অহিংসা

যদি সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম হয় তবে তার ক্রিয়া হিংস্র প্রাণীর অন্তরেও হবে।

কথা হলো পৃথিবীতে ক'জন মানুষ সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম? শতকরা একজনও নয়। ভিতরে ভয় আর দ্বেষ, বাইরে অহিংসার অভিনয়, এ কি কখনো সংকটকালে উদ্ধার করতে পারে? প্রাচীন ঋষি বা মধ্যযুগীয় সন্ত কবে কোন্ সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, জিতিয়ে দিয়েছেন? ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসা অবলম্বন করেছেন অনেকেই। প্রাণও দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য হলো বহুলোককে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় জীবনেও অহিংসার প্রয়োগ করা, একটার পর একটা ইস্যুতে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে নামা। ইতিহাসে অহিংসার নজীর অনেক আছে, কিন্তু অহিংস পদ্ধতির বলপরীক্ষা গান্ধীজীর নেতৃত্বেই প্রথম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নজীর অনেক আছে, কিন্তু সক্রিয় সত্যাগ্রহের এপিক উদাহরণ অভূতপূর্ব।

কী করে সম্ভব হলো এ কীর্তি, যখন শতকরা একজনও সম্পূর্ণ নির্ভীক বা সপ্রেম নয়, যখন ভয় আর দ্বেষ অতি ব্যাপক? এর উত্তর, একজন তো সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম ছিলেন, তাঁর তো কোনো ভয়ডর বা দ্বেষহিংসা ছিল না। তাঁর প্রভাব আর সকলের উপর সর্বক্ষণ কাজ করছিল। তাই তারাও কতক পরিমাণে নির্ভীক ও সপ্রেম হয়েছিল, ভীতি আর বিদ্বেষ কাটিয়ে উঠেছিল। সেই একজন না থাকলে এ কীর্তি সম্ভব হতো না।

অবশ্য গান্ধী না হলে যে ভারত স্বাধীন হতো না তা নয়। অহিংসা না হলে যে জনগণ লড়াই করত না তা নয়। কলম্বস না হলে যে আমেরিকা আবিষ্কার হতো না তা নয়। কিন্তু একটি বিশেষ দেশে ও একটি বিশেষ কালে যেটা হয় সেটা নিশ্চয়ই কোনো এক আকস্মিক কারণে নয়। তার পেছনে বহু কার্যকারণের সংযোগ আছে, একমুখীনতা আছে। তাছাড়া ব্যক্তিকেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিতে হবে। ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক। তার জগন্নাথের রথ ব্যক্তিমুখাপেক্ষী নয়। তা হলেও দেখা যায় ব্যক্তিবিশেষের হাতেই তার সারথির ছড়ি। সেই ছড়িখানা দেখেই লোকে রথের রশি ধরে টানে। তাদের রথ টানার সাধ তিনিই মেটান। সেইজন্য তারা তাঁর ডাক শোনে।

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি আন্দোলনই তাঁর ঘাড়ে চাপানো। অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন যে আন্দোলন না করে তাঁর উপায় ছিল না। চাহিদা ছিল বলেই জোগান দিতে হলো। অর্জুনের মতো তিনিও নিমিত্তমাত্র। ইতিহাসের নিমিত্ত। তিনি করেছিলেন, তা নয়। তাঁকে দিয়ে করানো হয়েছিল।

অনেকের ধারণা গান্ধীজীই তাঁর ব্যক্তিগত অহিংসা দেশের লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধের অহিংসাও গেছে। যেটুকু আছে সেটুকু বরাবরই ছিল। জৈন ও বৈষ্ণবদের জীবে দয়া। নিরামিষভোজন। প্রাণীহত্যার অপ্রবৃত্তি। রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

যে অহিংসা জীবনের সর্ববিধ প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সে কখনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হতে পারে না। গান্ধীজীর মতে রাজনীতিতেও অহিংসার স্থান আছে, যেমন ব্যবসাবাণিজ্যেও সাধুতার স্থান আছে। যারা প্রতিদিন মানুষকে ঠকায় তারা নিরামিষভোজী বলেই অহিংস নয়। অপর পক্ষে একজন আমিষভোজীও সাধু হতে পারে। অহিংস হতে পারে। মানুষের সঙ্গেই মানুষের প্রধানত কারবার। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শোষণশূন্য ও হিংসাশূন্য হওয়া দরকার। শোষণ ও হিংসা যেখানে আছে মানুষকে তার প্রতিকার করতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। তা হলেই রাজনীতি এসে পড়ে। আর রাজনীতি যদি আসে তবে অহিংস পদ্ধতিও আসে বা আসা উচিত।

যতদিন না মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শোষণমুক্ত তথা হিংসামুক্ত হচ্ছে ততদিন রাজনীতির সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক থাকবেই। রাজনীতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত যে অহিংসা সে যেমন চিরকাল ছিল তেমনি চিরকাল থাকুক, কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অহিংসার প্রয়োজন যতদিন না ফুরোয় ততদিন তার জন্যেও জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। সত্যাগ্রহের যুগ চলে যায়নি। উপযুক্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হলে লোকে তাদের নিজেদের গরজেই গান্ধীজীর মতো একজন নেতার সন্ধান করবে ও তাঁকে সারথির আসনে বসিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশে রথের দড়ি টানবে।

অহিংস মানুষ জীবনের কোনো অঙ্গকেই বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না। এমনি করেই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে এসে হাজির হলেন। নইলে গোড়ায় সেরূপ কোনো স্বপ্ন তাঁর ছিল না। আর রাজনীতির মূলগত প্রশ্নগুলো নিয়েই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা, যুদ্ধকালে যুদ্ধে যোগ না দেবার স্বাধীনতা। দৃশ্যত রাজনৈতিক হলেও তলে তলে নৈতিক প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্ন। নৈতিক বলেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নিছক রাজনৈতিক হলে হতেন না। প্রশ্নগুলির মতো উত্তরগুলিও নৈতিক হবে এই ছিল তাঁর ধ্যান।

গান্ধীজীর অহিংসা চিরাচরিত অহিংসার অন্তর্ভুক্ত হলেও বেশ কিছু ভিন্ন। এ অহিংসা নৈতিক তথা রাজনৈতিক তথা সংগ্রামী তথা সমষ্টিগত।

১৯৬৮

ক্ষুরধার পন্থা

মা ছেলেকে ভালোবাসেন বলে তার মন্দ কাজকেও ভালোবাসেন না। মন্দ কাজকে ঘৃণা করেন। ছেলেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেন যে, তোমার মন্দ কাজ তুমি যদি না ছাড়ো তবে আমি তোমাকেই ছাড়ব। তোমার মন্দ কাজের জন্য তোমাকে সাজা পেতে হবে। তা যদি তুমি না পাও তবে আমিই আমার আপনার গায়ে পেতে নেব সব রকম দুঃখ আর দুর্ভোগ। তা দেখে যদি

তোমার শুভবুদ্ধি জাগে, মতিগতি শোধরায়।

বহুক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে মা তাঁর ছেলের অন্যায়ের প্রতিকার করেন দণ্ড দিয়ে। যেখানে দণ্ড দিতে হাত ওঠে না সেখানে আপনাকে অভুক্ত রেখে। যেখানে আরও কঠিন হওয়া দরকার সেখানে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে। কিন্তু ভালোবাসার তা বলে বিরতি হয় না। কমতি হয় না।

বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই প্রথমত সন্তানের উপর মাতৃহৃদয়ের অহেতুক ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। বিনা শর্তে ভালোবাসা।

দ্বিতীয়ত মন্দের প্রতি ভালোর সহজাত বিরাগ, সক্রিয় বিরুদ্ধতা, সংশোধনকামী প্রতিবাদ বা প্রতিকার বা প্রতিরোধ প্রয়াস।

তৃতীয়ত সন্তানকে আঘাত করতে অনিচ্ছা বোধ করলে আত্মনিগ্রহ বা অসহযোগ। ছেলের গায়ে আঁচটি লাগবে না, কিন্তু তার যদি মন বলে কোনো পদার্থ থাকে তবে মনে লাগবে। ছেলে বুঝবে যে তারই জন্যে তার মা এত কষ্ট পাচ্ছেন, তার মন্দ কাজের জন্যেই। দু-দশ ঘা বেত খেলে সে যা ছাড়ত না তা মাকে সুখী করার জন্য ছাড়বে।

দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ আছে। সেটির নাম জননীর স্বেচ্ছাদুর্ভোগ। জননী সে অস্ত্র নিজের উপরেই প্রয়োগ করেন। সন্তানের অনিষ্ট কামনা করে নয়। তার শুভবুদ্ধির উদ্রেক কামনা করেই।

মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসা যদি অসত্য হয় তবে গোড়াতেই গলদ। সেইজন্যে অহিংসার প্রয়োগের পূর্বে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তার প্রয়োগকারীর হৃদয়ে আছে ভালোবাসা, যে ভালোবাসা সত্যিকার। প্রাথমিক সত্য হচ্ছে অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাসা। তার পরের কথা হচ্ছে অন্যায়কার্যের প্রতি বিরাগ বা বিরুদ্ধতা। শেষ কথা হচ্ছে হিংসামিশ্রিত দণ্ডদানে অনিচ্ছা ও অহিংসাত্মক স্বেচ্ছাদুর্ভোগে আগ্রহ।

গান্ধীজীর পূর্বেও নানা দেশে ও নানা যুগে অহিংসার সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছে। গান্ধীজীর চেয়ে তাঁরা কেউ কম মানবপ্রেমিক নন। অন্যায়কে তাঁরা অন্যায়ই বলেছেন। কিন্তু তাঁদের অহিংসা অন্যায়কারীকে নিরস্ত্র করার জন্যে দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ ধারণ করেনি। যদি করে থাকে তো সেটাকে জীবনের ব্রত করেনি।

গান্ধীজীই সেই সাধক যিনি মানবপ্রেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছেন, অথচ আঘাত প্রতিঘাতের পথ দিয়ে যাননি, স্বেচ্ছাদুর্ভোগ বহন করেছেন। তাঁর একমাত্র পূর্বসাধক যীশু। কিন্তু যীশুর মন্ত্র অপ্রতিরোধ। অহিংস প্রতিরোধ নয়।

তা ছাড়াও দু'জনের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। গান্ধীর চেতনায় অন্যায়বোধ একান্ত তীব্র। অন্যায় দেখলে তাঁর মনে বিরোধিতার ভাব জাগে। সংগ্রাম না করে তিনি শান্তি পান না। অন্তরে আগুন জ্বলতে থাকে। যীশু অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির ও শান্ত।

খ্রীষ্টীয় সন্তদের মধ্যেও কেউ কেউ আর সহ্য করতে না পেরে তরবারি

হাতে নিয়েছেন। তাঁরা কেবল সন্ত নন, তাঁরা যোদ্ধা। সেই যে যোদ্ধা-সন্তদের ঐতিহ্য সেটাই গান্ধীজীর আসল ঐতিহ্য। শুধু সন্তানকে সাজা দেবার বদলে আপনাকে দুঃখ দেওয়াটুকুই যা তফাত।

একদা এটা হয়তো একটা সামান্য তফাৎ ছিল। কিন্তু তরবারি কালক্রমে বন্দুকের রূপ নেয় ও বন্দুক আমাদের কালে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। বিষবাষ্প, ব্যাধিবীজ ইত্যাদি মারণাস্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব নয়। যোদ্ধা সন্তরা কি তাহলে তরবারি ধরতে গিয়ে পরমাণু বা বীজাণু বাণ ছুঁড়বেন?

মানবজাতি বেঁচে থাকলে তো মানুষের অন্তঃপরিবর্তন হবে? তা ছাড়া বালবৃদ্ধবনিতাও কি যোদ্ধা সন্তদের তরবারির লক্ষ্য হতে পাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে খ্রীষ্টীয় সাধুরাও উপলব্ধি করছেন যে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে হিংসার ব্যবহার নীতিবিগর্হিত না হলেও অহিংসাই উন্নততর নীতি। ভালোবেসে নিজের ছেলেকে সাজা দেওয়া বলতে যখন তাকে মিসিল বা রকেট দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা বোঝায় তখন সেটা না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে গান্ধী প্রদর্শিত মার্গই অবলম্বনীয়। খ্রীষ্টই যার আদিপ্রবর্তক।

মূল সত্যটা হচ্ছে মানবজাতির প্রতি প্রেম। সে প্রেম যদি সত্য না হয়ে অসত্য হয়ে থাকে তবে মন্দ কর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে মন্দ মানুষকে হত্যা করা আর মন্দ মানুষকে হত্যা করতে গিয়ে নিরীহ নারী ও শিশুকে ধ্বংস করা কোনটাই নীতিবিগর্হিত মনে হয় না। তবে খ্রীষ্টীয় সন্তের আদর্শ যে পরমাণু যুদ্ধের দিন ম্লান দেখায় এটাও স্বতঃসিদ্ধ। কোনো প্রকার কূটতর্ক দিয়েই পরকে বা আপনাকে বোঝানো যায় না যে মন্দের উপর ভালোকে জয়ী করতে হলে মানবজাতিকে সাবাড় করাও সমর্থনযোগ্য। বলা বাহুল্য ভালো মন্দ সকলেই জয়ের আগে লয় পাবে।

অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি না করে সংগ্রাম করে অন্যায়কারীকে ঘৃণা না করে ভালোবেসে সর্বপ্রকার দুঃখদুর্ভোগ স্বেচ্ছায় বরণ করার নামই গান্ধীপ্রদর্শিত অহিংস পন্থা। ক্ষুরধার পন্থা। এ পন্থা যারা গ্রহণ করবে তারা মূল সত্যে ফাঁকি দেবে না। মানুষ যত মন্দই হোক, যত মন্দ কাজই করুক তাকে ভালোবাসবে। ভালোবাসতে যদি না পারে তবে গান্ধীজীর অনুসরণ করা নিষ্ফল। অহিংসার বনিয়াদ সেই সত্য যে সত্যের অপর নাম প্রেম।

গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীরা ইংরেজবিদ্বেষী ছিলেন না। ইংরাজ জাতিকে তাঁরা কমবেশী ভালোবাসতেন। তাঁদের সংগ্রাম ভারতের পরাধীনতা নামক অভিশাপের বিরুদ্ধে। দীনদরিদ্রের শোষণ নামক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করা নীতিবিগর্হিত নয়। বরং সেইটেই হচ্ছে নীতি। কিন্তু মন্দের সঙ্গে সংগ্রামে নেমে মন্দকে ঘৃণা করতে গিয়ে মানুষকে ঘৃণা করা ও তার অনিষ্ট করা গান্ধীজীর বিচারে নীতিবিগর্হিত। তা যদি তুমি কর তবে তুমিও মন্দ কর্ম করলে। তুমিও ভলো থাকলে না।

মন্দের সঙ্গে যারা লড়াই করবে তারাই যদি মন্দ হয় তবে যে পক্ষই জিতুক

না কেন মন্দেরই জয় হলো। গান্ধীশিষ্যরা সেরূপ জয় চাননি। তাঁদের কাম্য ছিল ইংরেজের চিত্তপরিবর্তন। বহুবার দুঃখবরণের ফলে তাঁরা সেই চিত্ত-পরিবর্তন ঘটালেন। ইংরেজরা শত্রু না হয়ে বন্ধু হলো। কিন্তু গোড়ায় ভালোবাসার অভাব থাকলে ও সংগ্রামপদ্ধতি হিংসাপ্রতিহিংসায় রক্তাক্ত হলে স্বাধীনতা হয়তো আসত, কিন্তু বন্ধুতা আসত না। মুখে একটা তিক্ত স্বাদ লেগে থাকত দুই পক্ষেরই। এক শতাব্দী লেগে যেত তিক্ততার ভাব কাটিয়ে উঠতে।

অহিংসা মানব ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তাহলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অহিংসার পরীক্ষা। অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তাহলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রামে হিংসার দশ প্রহরণ ত্যাগ করে অহিংসার একমাত্র প্রহরণ গ্রহণ করা।

গান্ধীজীর পূর্বেও কেউ কেউ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর হাতে অহিংসা একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞান। একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজ-নীতি। একই কালে জীবনদর্শন ও রণনীতি। এমনটি ইতিহাসে আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি। আমরা তাঁর সমসাময়িকরা ইতিহাসের একটি অপূর্ব অধ্যায়ের অংশভাগী অথবা সাক্ষী।

একথা বলা শক্ত যে গান্ধীজীর ডাকে যারা সাড়া দিয়েছিল তাদের সকলের অন্তরে অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাসা ছিল বা সকলের চেতনায় অন্যায়-বোধের তীব্রতা ছিল বা সকলেই তারা মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অপর পক্ষকে সাজা না দিয়ে স্বেচ্ছাদুর্ভোগ বরণ করতে আগ্রহী হয়েছিল। এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে তারা গান্ধীজীর আদেশে যথাসম্ভব সংযত থেকেছে। অপর পক্ষও মোটের উপর দমননীতির সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। রাশ টেনে ধরেছে তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ন্যায়বুদ্ধির ঐতিহ্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাস স্বৈরতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্রে ও খোশমেজাজী বিচারের থেকে আইনসম্মত বিচারে উত্তরণের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস তা নয়। গণতন্ত্র তথা আইনসম্মত বিচার যদি কাম্য হয় তবে ভারতের ইতিহাসে তার বিবর্তন অথবা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক ছিল। সে কাজটাও করণীয় কাজ। তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নেতারা। শাসকশক্তির দিক থেকেও আনুকূল্য ছিল। কিন্তু আরো জোরালো আন্দোলন না হলে ইংলণ্ডের জনমত মনঃস্থির করতে গড়িমসি করত। বীরত্বের পরীক্ষা না করে তারা চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতছাড়া করত না। তা বলে ভারতীয়দের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেও তাদের রুচি ছিল না। গান্ধীজী এটা জানতেন বলেই হিংসার প্রশ্রয় দেননি। নিলে প্রতিহিংসার পাল্লাও সমান ভারী হতো।

সহিংস যুদ্ধের মতো অহিংস যুদ্ধও দ্বিপাক্ষিক। একপক্ষ যেমনটি করবে অপর পক্ষও তেমনটি করবে। কিন্তু অহিংস যুদ্ধে ইনিশিয়েটিভ সব সময় অহিংস সেনাপতির হাতে। সেইজন্যে অহিংস সেনাপতি যেমনটি করবেন অপর পক্ষের সেনাপতিও তেমনটি করবেন। গান্ধীজীর পরিচালনায় দেশ যে

পরিমাণ সংযত অথচ সংগ্রামরত হয়েছে দেশের শাসনশক্তিও সেই পরিমাণে সাড়া দিয়েছে। সত্যাগ্রহ যদি সৌম্যতর হতো অপরপক্ষের আচরণও ভদ্রতর হতো।

তবে গান্ধীজী তো দুর্ভোগের কমতি চাননি। বরং আরো বেশী দুর্ভোগের জন্যে প্রস্তুত হয়েই তিনি সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল শুধু এই যে দমননীতির পেষণে অহিংসা যেন হিংসায় রূপান্তরিত না হয়ে যায়। অহিংস সৈনিকরা যেন হিংসায় উন্মত্ত না হয়। তাহলে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে উভয়েই মন্দ। উভয়পক্ষই অন্যায়কারী। অবশ্য যে কোনো দেশের স্বাধীনতা সমরে তার নজীর মেলে। স্বাধীনতার সৈনিকদের হিংসাকে ঐতিহাসিকরা কড়া নজরে দেখেন না। নীতিশাস্ত্রেও তেমন হিংসা নিন্দিত নয়। গান্ধীজী কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেয়ে উপায়-শুদ্ধিকেই মূল্য দিতেন বেশী। ইতিহাসে তিনি একটা নতুন নজীর রেখে যেতে চেয়েছিলেন। নীতিশাস্ত্রেও একটি নতুন ধারা যোগ করতে যত্নবান হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যেন তেন প্রকারেণ নয়। শুদ্ধতমপ্রকারেণ। এই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট।

১৯৬৮

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ

গান্ধীবাদ যাকে বলা হয় তার প্রকৃত নাম দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ। যেমন মার্কস-বাদ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে। সেটি হলো এদের বিশেষণ পদ। উভয়েই দ্বান্দ্বিক।

হাঁ, উভয়েই দ্বান্দ্বিক। কিন্তু দ্বন্দ্বের পদ্ধতি এক নয়। দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ অসত্যকে পরিহার করে, হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োজন হলে হিংসারও আশ্রয় নেয়, অসত্যেরও সুযোগ নেয়। তবে তেমন কোনো প্রয়োজন না হলে নেয় না।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যে মনে প্রাণে অসত্যাচারী বা হাড়ে হাড়ে হিংসাপরায়ণ এ ধারণা ভুল। তারও প্রস্থাপনা মানবিকবাদের উপরে। তারও অন্বিষ্ট মানবহিত। অধিকাংশ মানুষকে শোষণের হাত থেকে উদ্ধার করে এমন এক সমাজের পরিকল্পনা যাতে সকলেরই প্রতি ন্যায়। ভাষান্তরে সোশ্যাল জাস্টিস।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদও মানবিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরকাল বা পরলোক নিয়ে এর তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই, কে কোন দেবতাকে হবি দিয়ে তুষ্ট করে তা নিয়ে এর কিছু আসে যায় না। একজন গান্ধীবাদী আস্তিক না হয়ে নাস্তিকও হতে পারেন, অজ্ঞেয়বাদীও হতে পারেন। মহাত্মার শিষ্যদের মধ্যে আস্তিক নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী সবরকম লোক ছিলেন। কিন্তু সকলেই তাঁরা মানবিকবাদী।

তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের মধ্যে আরো এক জায়গায় মিল। উভয়েরই প্রস্তাবনা মানবিকবাদের উপরে। ইতিহাসের আধুনিক যুগটাই মানবিকবাদী দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ-নীতির যুগ। গান্ধীজী এর বাইরে ছিলেন না। তবে প্রাচীন যুগের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। সেখান থেকেও তিনি বল সংগ্রহ করতেন। সেখানে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যা শুধু প্রাচীন নয়, যা সনাতন, যা নিত্য নূতন। তা বলে তিনি কারো চেয়ে কম আধুনিক বা কম মানবিকবাদী ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারাও ছিল বৈজ্ঞানিক। কথায় কথায় পদে পদে এক্সপেরিমেণ্ট করাই ছিল তাঁর পদ্ধতি। তার সঙ্গে বিরোধ ছিল না অহিংসার। বিরোধ ছিল না সত্যের। বরঞ্চ সেই ছিল সত্যের পরীক্ষা।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদও অধিকাংশ মানুষকে মুক্তি দিয়ে সব মানুষের মঙ্গল বিধান করতে চায় ও সেইজন্যে বার বার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। দ্বন্দ্বে ভীত অথবা শ্রান্ত যারা হয় তারা দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদী নয়। গান্ধীবাদী নয়। হতে পারে গান্ধীমার্কা।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের সঙ্গে অহিংস পদ্ধতি যোগ দিলে তার নাম হয় সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ একজন ব্যক্তিরও হতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরও হতে পারে। সংখ্যার চেয়ে সত্যের দাম বেশী। ব্যক্তিসত্যাগ্রহও তার সত্যের জোরে জয়ী হতে পারে। প্রতিপক্ষের চিত্তপরিবর্তন ঘটাতে পারে। সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে পারে। তবে বিপ্লব যদি লক্ষ্য হয় সংখ্যার মূল্য অপরিসীম।

কোটি কোটি মানুষের জনতা দ্বন্দ্বে নামতে পারে, কিন্তু তার কাছে আদর্শবাদ আশা করা যায় না। অহিংসা আশা করাও উচ্চাশা। গণসত্যাগ্রহ কথাটা শুনতে যেমন জাঁকালো তেমনি ফাঁকা। জনতাকে জাগিয়ে তুললে জনতা আদর্শের বা সত্যের অনুরোধ শোনে না, হিংসার আকর্ষণে ভুলে যায়। তখন সত্যাগ্রহ হয় হত্যাগ্রহ।

তাহলে কি সংঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের আহ্বান ভুল? না, তেমন কোনো কথা নেই। সত্যাগ্রহে সকলের অধিকার আছে। কেবল দু-চারজন উত্তরসাধকের নয়। নতুন কোনো অধিকারীভেদ প্রবর্তন করা গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। যেখান সকলেই সমান অধিকারী সেখানে সবাইকে ডাক দিতে হয়। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা রাখতে হয়।

সত্যাগ্রহের যে ইতিহাস আমরা পড়েছি তার দক্ষিণ আফ্রিকান অংশটিতে সমষ্টির যোগদান মোটের উপর সুশৃঙ্খল ও সংযত। কারণ সংখ্যা সেখানে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। কয়েক হাজার না হয়ে কয়েক লাখ হলে কী হতো তা বলা যায় না। হয়তো হিংসা এসে পড়ত।

যাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা বেশী, যাদের দ্বারা সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা কম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাই জনতাকে সামলানো শক্ত হয়নি।

এদেশে শাসকদের সংখ্যা কম, শাসিতদের সংখ্যা বেশী। একবার ভয় ভেঙে গেলে হিংসার প্ররোচনা দুর্বার। জনতাকে অহিংস রাখা যাদের কাজ তাঁরা হয়তো লাখে একজন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন হাজারে একজন। ভারতের মাটিতে গণসত্যাগ্রহ রোপণ করতে সেইজন্যে এত বেগ পেতে হয়েছে।

এখনো জোর করে বলা চলে না যে গণসত্যাগ্রহের চারা ভারতের মাটিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে। গান্ধীজীর মতো তেমন নেতাও কি আছেন যিনি, মালীর মতো প্রতিদিন লক্ষ রেখেছেন ও চর্যা করছেন? জনগণের মন পাবার জন্যে হিংসা যেমন সক্রিয় অহিংসা কি তেমনি সক্রিয়? তাই যদি হতো তবে যত্র তত্র যখন তখন জনতা উচ্ছৃঙ্খল হতো না, পুলিশ ডাকতে হতো না, পুলিশে না কুলোলে মিলিটারি।

গণসত্যাগ্রহ এখন একটি ঐতিহাসিক পর্ব। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে চুকে গেছে। আর ব্যক্তিসত্যাগ্রহ এখনো খোলা আছে।

১৯৬৯

মহাকাব্যের নায়ক

পনেরোই অগাস্ট তাঁকে যার থেকে বঞ্চিত করেছিল তিরিশে ও একত্রিশে জানুয়ারি তাই তাঁকে দিল। গ্লোরিয়াস এণ্ডিং। গৌরবময় সমাপ্তি।

গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল এপিক সংগ্রাম। তা নিয়ে একদিন এপিক লেখা হবে। কিন্তু যেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলো তাকে গ্লোরিয়াস এণ্ডিং বলা শক্ত। মহাত্মার নিজের কথায় সেটা একটা গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইন্‌গ্লোরিয়াস এণ্ডিং।

এপিক যাঁরা লিখবেন তাঁদেরও মনে হবে পনেরোই অগাস্টের পরিসমাপ্তি অমন একটি মহাকাব্যের বা মহানাটকের উপযুক্ত পরিসমাপ্তি নয়। তা নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে কিন্তু আর্টের চাহিদা মিটবে না। সেইজন্যেই কি জীবনদেবতা তিরিশে জানুয়ারির ঘটনা ঘটালেন? তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একত্রিশে জানুয়ারির শেষ সৈনিক অপসরণ?

হাঁ, সেইজন্যেই। এপিক যাঁরা লিখবেন তাঁরা পনেরোই অগাস্টের অর্ধসমাপ্তিকে সমাপ্তি ভেবে 'ইন্‌গ্লোরিয়াস এণ্ডিং' বলবেন না। আরো কিছুদূর এগিয়ে যাবেন। অবশেষে পাবেন 'গ্লোরিয়াস এণ্ডিং'। গৌরবময় পরিসমাপ্তি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে একটি মহাকাব্যের বিষয় একথা সে সংগ্রাম সারা হবার আগেই আমার মনে হয়েছে। একদিন না একদিন কেউ না কেউ নতুন এক মহাভারত লিখবেন। তার নায়ক হবেন গান্ধী। একাধারে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ। তখন কিন্তু খেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রের জয়ই শেষ কথা নয়, তার পরে আছে যুধিষ্ঠিরের নৈরাশ্যময় মহাপ্রস্থান ও কৃষ্ণের শোচনীয় বিনাশ। নতুন মহাভারতেও তার অনুরূপ অ্যাণ্টিক্লাইম্যাক্স থাকবে।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গপ্রবেশ নতুন মহাভারতে দেখানো যাবে না। মহাত্মা গান্ধী স্বর্গ কামনা করেননি। সেখানে তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নন, বুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি চেয়েছেন দীনদুঃখীর সঙ্গে এক হয়ে যেতে। দেখাতে হবে কেমন করে তাঁর আত্মা সকলের আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেল। নির্বাণের ভিতর দিয়ে এক।

তাঁর ছবি যখন আঁকা হবে তখন তাঁর আকার হবে প্রমাণ সাইজের চেয়ে বড়ো। যেমন বুদ্ধের। আশেপাশের মানুষের চেয়ে মাথা উঁচু। বুদ্ধমূর্তির মতো বিরাট।

কিন্তু তাঁর বাণীর কী হবে? যে বাণী তাঁর জীবনের থেকে অভিন্ন। কেউ যদি তাঁর মতবাদ গ্রহণ না করে, সেই অনুসারে কাজ না করে, সবাই যদি তার মতবাদে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তবে বুদ্ধের বেলা যা হয়েছে তাঁর বেলাও তাই হবে। নিজ বাসভূমে পরবাসী। বরঞ্চ অন্য কোনো দেশে তাঁর বাণীর সমাদর হবে। ইতিমধ্যেই হতে আরম্ভ করেছে। যেমন আমেরিকায়। প্রতিরোধকারীদের মধ্যে।

১৯৬৯

অগ্নিপরীক্ষা

সেদিন আমরা ট্র্যাজেডী ভিন্ন আর কিছু দেখিনি। কিন্তু বীরের অহিংসা তো আর কোনোরূপে প্রতিভাত হতো না। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।'

ভারত ইতিহাসের গান্ধী সেদিন মানব ইতিহাসের সপ্তর্ষি মণ্ডলে উত্তীর্ণ হলেন। কেউ তাঁকে সেই উচ্চতা থেকে নামাতে পারবে না।

সাফল্য মহান্ আত্মার জন্যে নয়। অনেকবার মনে হয়েছে, গান্ধী এমন সফলকাম কেন? তিনি কি তবে মহাত্মা নন? আবার মনে হয়েছে, আশ্চর্য! যীশুর মতো এতোদিন তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয়নি! এ নিয়তি এড়ালেন কী করে?

এ নিয়তি এড়ানো গেল না। যেমন ব্যক্তিত্ব তেমনি তো নিয়তি। তাঁর মতো চরিত্রের সেইটেই পরিণতি। হ্যাপি এণ্ডিং তাঁর মতো কাহিনীর জন্যে নয়। নাটক বা উপন্যাস বা মহাকাব্য লিখতে বসলে আমরা তাঁর মতো নায়কের জন্যে হ্যাপি এণ্ডিং খুঁজে পেতুম না।

অনেক সময় মনে হয়েছে আমি ধন্য। যে বাতাসে তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন সে বাতাসে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি। যদিও তাঁর সঙ্গে সব মেলে না।

বরাবর মনে হয়েছে তিনি আমাদের সবাইকে ভালোবাসেন। যদিও আমাদের চেনেন না। যখন তাঁর সঙ্গে আলাপই হয়নি তখনো তাঁর ভালোবাসার প্রবাহ আমি অনুভব করেছি। তাঁর সেই ভালোবাসা যেন এক অদৃশ্য ফল্গুধারা।

স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছেন এই তাঁর সম্বন্ধে একমাত্র কথা বা চরম কথা নয়। তিনি তাঁর দেশবাসীদের ভালোবাসেন, ভালোবেসে সেবা করছেন, ভালোবাসার খাতিরে জীবন উৎসর্গ করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দেবেন, এই সব চেয়ে বড়ো কথা।

ব্রিটিশ রাজত্ব না থাকলে তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ থাকে না, সত্যাগ্রহ না থাকলে গান্ধীনেতৃত্ব থাকে না। সব সত্য। তবু তার চেয়ে সত্য এমন করে এ দেশের মানুষকে আর কেউ তাঁর মতো ভালোবাসেনি। অন্তত আমাদের যুগে।

জীবনের শেষদিনটিতেও সমানে চরকা কাটা চলেছে। সেই তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ। দীন দুঃখী দেশবাসী সাধারণের প্রতি। সেইভাবেই তাদের সঙ্গে তিনি সাযুজ্য অনুভব করতেন। তারাও করত তাঁর সঙ্গে।

ভালোবাসার ডোর ছিন্ন করতে পারে এমন শক্তি কি তিনটে বুলেটের আছে? গান্ধী তাঁর দেশবাসীর তথা বিশ্ববাসীর যেমন পরমাত্মীয় ছিলেন তেমনি রয়ে গেলেন।

তা সত্ত্বেও ভুলতে পারিনে যে এর নাম ট্র্যাজেডী। চেষ্টা করলে নিবারণ করতে পারা যেত। সেইভাবে প্রমাণ করতে পারা যেত আমাদের ভালোবাসা। এ কলঙ্ক মুছবে না।

ক্রুশিফিকশন যদি ঘটল তবে রেসারেকেশনও কি ঘটবে না?

গান্ধীকে ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু গান্ধীর জীবনে জীবন লাভ করে সারা দেশ নতুন করে জাগবে। সারা বিশ্বেও নব জাগরণ আসবে।

১৯৬৯

টলস্টয়

ভূমিকা

টলস্টয়ের জন্মের পর দেড়শো বছর অতীত হয় ১৯৭৮ সালে। সেই উপলক্ষে যে জয়ন্তী উৎসব হয় আমিও তাতে যোগ দিই। অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। সেসব একত্র করে একখানি বই প্রকাশ করা হচ্ছে। বইখানিতে টলস্টয় সম্পর্কে কিছু পুরানো লেখাও যাচ্ছে। পরিশিষ্টে থাকছে আমার ষোল বছর বয়সে লেখা টলস্টয়ের একটি উপকথার অনুবাদ। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত। অমনি করে আমার সাহিত্যিক শিক্ষানবীশী শুরু হয়। টলস্টয়ের কাছেই।

আর একটু বড় হয়ে টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' পড়ি। সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার রস। তখন থেকেই আমার মনে টলস্টয়ের কীর্তি ও তত্ত্ব নিয়ে একটা বিতর্ক চলে। তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট' আমাকে দোলা দেয়। কিন্তু আমি তাঁর তত্ত্ব নির্বিবাদে মেনে নিতে পারিনি। প্রশ্নটি অন্য আকারে তুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে, রম্যা রলাঁর কাছে। নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষার আলোয় নিজের পথ দেখতে পাই।

সম্প্রতি মস্কো থেকে প্রকাশিত Victor Shklovsky প্রণীত টলস্টয়-জীবনী পড়েছি। তার ফলে অনেক রহস্যের মর্মভেদ করতে পেরেছি। প্রচুর পরিমাণে আত্মনিন্দা করে টলস্টয় আর্ট সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন সেটা তিনি নিজেই প্রচার করেন পরবর্তী কালে 'রেজারেকশন' ইত্যাদি উপন্যাস লিখতে বসে। তাঁর কৈফিয়ৎ তুলে দিচ্ছি।

"These stories are written in my old style, which I don't approve of now. If I start changing things until I'm quite satisfied I'll never finish."

বেশ বোঝা গেল যে পুরানো অভ্যাস ছাড়া সহজ নয়, ওটা পালন করাই সহজ। বড়ো গল্প বা বড়ো উপন্যাস লিখতে হলে 'তেইশটি উপকথা'র আদর্শ কার্যকর নয়। কেবল উপকথা লিখেই সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরিয়ে দেওয়া যায় না।

'সমর ও শান্তি' তথা 'আনা কারেনিনা' টলস্টয় নিজেই নস্যাৎ করেন এই কারণে যে ওই বইগুলি টাকার জন্যে লেখা। কিন্তু 'রেজারেকশন'ও কি টাকার জন্যে লেখা নয়? দরাদরি করে টলস্টয় এর জন্যে এন্‌তার টাকা পান। তফাৎ শুধু এই যে টাকার সমস্তটা দুখোবরদের দেশত্যাগের তহবিলে খয়রাত করেন। খয়রাতের জন্যে টাকা তুলতে যদি উপন্যাস লিখতে হয় তো সেটাও টাকার জন্যে লেখা। সেটাকেও নস্যাৎ করতে হয়। তা কিন্তু টলস্টয় করেননি। ভাগ্যিস্‌ এসব খুঁতখুঁতানি যৌবনকালে ছিল না। থাকলে কি আমরা বিশ্বসাহিত্যের দু'খানি সেরা ক্লাসিক পেতুম? রসের বিচার আর নীতির বিচার এক নয়। টাকার জন্যে গান করা হয়তো সুনীতি নয়, কিন্তু তাহলে ওস্তাদদের কী দশা হবে? টাকার জন্যে ছবি আঁকা হয়তো সুনীতি

নয়, কিন্তু তাহলে চিত্রশিল্পীদের কী দশা হবে? টাকার জন্যে শেকসপীয়ারের নাটকও লেখা হয়েছিল। সেটা হয়তো সুনীতি নয়। কিন্তু টাকার জন্যে না লিখলে সেসব নাটক কোনোকালেই লেখা হতো না। শেকসপীয়ারও আর কিছু করতেন। তাঁর প্রতিভার দান থেকে মানবজাতি বঞ্চিত হতো। টাকা না বলে ওটাকে পারিশ্রমিক বললেই নীতির দিক থেকে নিন্দনীয় হয় না। ডাক্তারের যেমন ফী।

এই জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারা গেল যে 'আনা কারেনিনা' রচনার পূর্বে টলস্টয় তার একটি খসড়া তৈরি করেছিলেন। তাতে নায়িকার বয়স ছিল ত্রিশ, নায়কের ছিল পঁচিশ। আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল যে আনার বয়স বেশী, ভ্রনস্কির বয়স কম। কিন্তু উপন্যাসটির কোথাও বয়সের উল্লেখ নেই। শুধু একটি সংকেত রয়েছে আনার কথায় যে ভ্রনস্কি হচ্ছে একটি 'অফিসার ল্যাড'। এরূপ ক্ষেত্রে নায়িকার পক্ষে একটা হারাই হারাই ভাব থাকবেই। সেই ভীতি থেকে সন্দিগ্ধতা আর ঈর্ষা। অবশেষে ট্র্যাজেডী।

আরো জানা গেল এ উপন্যাসের আরম্ভটা কী ধরনের হবে তা নিয়ে টলস্টয় বহু ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই দিশা পাচ্ছিলেন না। কে যেন ফেলে গেছলেন পুশকিনের একখানা উপন্যাস। সেটার পাতা ওলটাতে গিয়ে টলস্টয় আবিষ্কার করেন তার ধানাইপানাইবর্জিত গৌর-চন্দ্রিকাহীন আরম্ভ। ব্যস্! টলস্টয়ও সেই ছাঁদে আরম্ভ করেন 'আনা কারেনিনা'। হাজার মাথা খুঁড়েও যেটা পাচ্ছিলেন না সেটা পেয়ে গেলেন দৈবক্রমে। অমনি শুরু হয়ে গেল রচনা।

'আনা কারেনিনা'র শতবর্ষপূর্তিও তার স্রষ্টার জন্মের সার্ধশতবর্ষ-পূর্তির সমসাময়িক। তাই আমি 'আনা কারেনিনা'কেই আমার এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যমণি করেছি। নরনারীর প্রেম ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, ভালোই হোক আর মন্দই হোক, মিলনান্তই হোক আর বিয়োগান্তই হোক সাহিত্যজগতের একটি চিরন্তন বিষয়বস্তু। তথা মানবহৃদয়ের এক চিরন্তন রহস্য। টলস্টয়ের এই উপন্যাস দেশকালের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর আবেদন নৈতিক নাই বা হলো।

অন্নদাশঙ্কর রায়

৫ই ভাদ্র ১৩৮৭

টলস্টয়

টলস্টয়ের কাছে সাহিত্যসৃষ্টি ছিল গৌণ। মুখ্য ছিল সত্য কথা বলা ও সত্যভাবে বাঁচা। মিথ্যাকে তিনি বিষম ঘৃণা করতেন। যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে। শেষবয়সে এটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। শুচি-বাতিকের মতো সত্যবাতিক।

এর সূচনা প্রথম বয়সে। উনিশ বছর বয়সে যখন তিনি ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেন তখন তিনি মনে মনে সংকল্প করেন যে লেখনীর মুখে সত্য বলবেন। পূর্ণ সত্য। সত্য ব্যতীত আর কিছু নয়। সাক্ষীরা যেমন ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও এত কঠোর ছিল না। সত্য বলা একরকম চলে, কিন্তু পূর্ণ সত্য বলা আদৌ নিরাপদ নয়। সত্য ভিন্ন আর কিছু না বললে বড় বড় ব্যাপারে মৌন থেকে যেতে হয়।

ডায়েরিতে তিনি প্রাণ খুলে যা লিখেছিলেন তা প্রকাশের জন্যে নয়। এমন কি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির চোখে পড়বার জন্যেও নয়। তখনো তিনি জানতেন না যে পরে একদিন তিনি সাহিত্যিক হবেন বা বিয়ে করবেন বা তাঁর ডায়েরি স্ত্রীকে পড়তে দেবেন বা জগৎকে দেখতে দেবেন। জানলে হয়তো তাঁর হাত বেঁকে যেত। সত্য লিখলেও পূর্ণ সত্য লিখতেন না। সত্য ভিন্ন আর কিছু না লিখলে লেখা বন্ধ হয়ে যেত। একেই বলে অজ্ঞতা হচ্ছে আশীর্বাদ।

লিখতে লিখতে ক্রমে হাত খুলে যায়। বুঝতে পারেন যে তাঁর লেখার হাত আছে। তাঁর পিসিমা তাতিয়ানাও তাঁকে উৎসাহ দেন এই বলে যে, তাঁর যেমন কল্পনার দৌড়, কেন যে তিনি উপন্যাস লেখেন না এটা আশ্চর্য। কিন্তু হাজার লিপিকুশলতা ও কল্পনাশক্তি থাকলেও তিনি মহান লেখক হতেন না। তেমন প্রতিভাও তাঁর ছিল না। হলেন তাহলে কোন্ মন্ত্রবলে? সত্যভাষণের সাধনাবলে। সত্যভাষণ হল এমন এক ডিসিপ্লিন যার কল্যাণে ক্ষুদ্রও মহান হতে পারে। তবে মহান্ শিল্পী হবে কি না নির্ভর করছে আরো একটা উপাদানের উপরে। কেউ যদি অসার জীবন যাপন করে তবে তার সেই অসার উপলব্ধি দিয়ে মহান সৃষ্টি হবে কী করে, লিখলেই বা সে প্রাণ খুলে সত্য কথা, পুরো সত্য কথা, সত্য ভিন্ন আর কোনো কথা নয়।

সার অভিজ্ঞতার উপরে টলস্টয়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল। পাঁকে ডুবে থাকলেও পঙ্কজকে তিনি ভোলেন নি। সত্যকে তিনি কোথায় না অন্বেষণ করেছেন! অস্থানে কুস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আরণ্যকদের মধ্যে, অভিজাত মহলে, কৃষকসংসর্গে, বন্যপ্রাণীমৃগয়ায়, বেদে-বেদেনীর সান্নিধ্যে। লিখতে বসে সব অভিজ্ঞতাই তাঁর কাজে লেগে গেল। কিন্তু যার জন্যে তিনি টলস্টয় তা হচ্ছে যুদ্ধের ভিতরকার সার সত্যকে মোহমুক্ত ভাবে দেখা ও দেখানো। তাকে রোমাণ্টিক করতে গিয়ে অসত্য করে না তোলা। যুদ্ধবিষয়ক রিপোর্টে

বা রচনায় কেউ সত্য কথা লেখে না। ঘটনা ঘটে যাবার পর রটনায় পল্লবিত হয়। ঐতিহাসিকরাও সেই রটনার নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করতে জানেন না। সত্য এমন লজ্জাকর বা জঘন্য যে তাকে ইচ্ছা করে বিকৃত করা হয়। পরম কাপুরুষও পরম বীর বলে পরিচিত হয়। ঘোড়া হয়তো প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, বীর ভাবছেন তিনিই তাকে রাশ ধরে চালাচ্ছেন। ঘটনা হয়তো আপনি ঘটে যাচ্ছে। সেনাপতি ভাবছেন তাঁর আদেশে ঘটছে। গৌরবের জন্যে বানানো গল্পও সত্য বলে প্রচলিত হয়। টলস্টয় এই চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

'সমর ও শান্তি' লিখে টলস্টয় বহু লোকের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বছর পাঁচেক লাগল ও-বই লিখে শেষ করতে ও আরো বছর দশেক স্বদেশের স্বীকৃতি পেতে। এর পরে তিনি যা নিয়ে লেখেন সেও এক বিপজ্জনক বিষয়। নরনারীর সাজানো সংসারে স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্যাশন। যতক্ষণ নীতির সীমার মধ্যে থাকে। যখন সীমার বাইরে চলে যায়। 'আনা কারেনিনা' তখনকার দিনে এক দুঃসাহসিক কীর্তি। টলস্টয় যাকে নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ মনে করেছিলেন একালের বিদগ্ধ পাঠক তাকে বলবেন সংস্কার, সংসার ও সমাজবিধির সঙ্গে সংঘাত। আনা এমন কোনো চিরন্তন মহাপাতক করেনি যার জন্যে অত বড় একটা শাস্তিই ছিল তার নিয়তি। তা সত্ত্বেও তার কাহিনীতে চিরকালের ট্র্যাজেডির উপাদান ছিল। প্রেমিকের একনিষ্ঠতায় সন্দেহ। তাই ও-বই শিল্পলক্ষ্যভ্রষ্ট নীতিগ্রন্থ হয় নি। অপর পক্ষে নীতিনিরপেক্ষ বাস্তববাদী চিত্রকর্মও নয়। সত্যের অন্বেষক অত সহজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এইখানে সমসাময়িক ফরাসী কথাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা। পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্যকদের সঙ্গেও।

তাঁর ওই দুখানি মহা-উপন্যাস মহাকাব্যজাতীয়। বলা যেতে পারে একালের মহাভারত ও রামায়ণ। অবশ্য অন্যপ্রকার। মানুষের জীবনে নিয়তির হাতই তিনি লক্ষ করেছেন। তাই মানুষকে ক্ষমাযোগ্য করেছেন। এক নেপোলিয়ন বাদে অমার্জনীয় কেউ নয়। যারা নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, অথচ নিয়তির দ্বারা চালিত হয় তাদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। কিন্তু মন্দ মানুষকে বা মন্দকারীকে ভালোবাসেন বলে তিনি মন্দকে ভালো বলেন না। মন্দত্বের প্রতি তাঁর লেশমাত্র সহানুভূতি নেই। এইখানেও তাঁর সঙ্গে তাঁর বাস্তববাদী সহযোগী ও পরবর্তীদের প্রতিতুলনা। ভালো আর মন্দকে তিনি যেমন শাদা আর কালোর মতো স্বতোবিরুদ্ধ মনে করতেন একালের বিদগ্ধ সাহিত্যিকরা তেমন মনে করেন না। বহুক্ষেত্রে ভালোমন্দ একাকার বা অনুপস্থিত। সত্য অনেক সময় ভালোমন্দের অতীত। সত্য শুধুমাত্র সত্য। ভালোও নয়, মন্দও নয়। সর্ববিশেষণবর্জিত।

গোড়াতেই বলেছি যে সাহিত্যসৃষ্টি টলস্টয়ের কাছে গৌণ ছিল। ইংরেজরা যেমন বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য লাভ করে তিনিও তেমনি ডায়েরি লিখতে গিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। বছর পঞ্চাশ বয়সে কীর্তির ও যশের বিত্তের

শিখরে উঠে কোথায় তিনি আনন্দ করবেন তা নয়। চাইলেন সত্যভাবে বাঁচতে। জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করতে। প্রথমে তাঁর আপনার। পরে তাঁর স্বদেশের ও স্বকালের। জীবনজিজ্ঞাসা বরাবর তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। অল্প বয়স থেকেই তিনি জীবন মৃত্যু, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর ও অমরত্ব নিয়ে চিন্তাকুল। বাণপ্রস্থের বয়স যখন হল তখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টি ছেড়ে পরমার্থে মন দিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এটা মস্ত বড় একটা লোকসান। কি রাশিয়ায় কি অন্য দেশের কথাশিল্পে 'আনা কারেনিনা'-র পরে আর ক্লাসিক লেখা হল না। হতে পারত যদি টলস্টয় মন খোলা রাখতেন। কিন্তু মনটা হল তাঁর দায়বদ্ধ। আত্মোদ্ধারের দায়। মানব উদ্ধারের দায়। সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে হিংসার হাত থেকে, অসত্যের হাত থেকে। তার জন্যে সত্যভাবে বাঁচতে হবে।

বিশেষ করে রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে বিপ্লবের হাত থেকে, যুদ্ধের হাত থেকে। এমনি গভীর ছিল তাঁর ইতিহাসদৃষ্টি যে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিপ্লব আসছে, যুদ্ধ আসছে। বাইবেলে আছে পয়গম্বর নূ (Noah) আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন যে মহাপ্লাবন আসছে, সৃষ্টি লুপ্ত হবে। তাঁর স্ত্রীকে সে কথা বলায় ভদ্রমহিলা বিশ্বাসই করলেন না। টলস্টয়ের পরিবারেও সেই পুরাণবর্ণিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হল। টলস্টয় উঠে-পড়ে লেগে গেলেন জীবনযাত্রার ধরনধারন বদলাতে ও শোধরাতে। যাদের পিঠে চড়ে বসেছেন তাঁদের পিঠ থেকে নামতে। চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাদের একজন বনে যেতে। দক্ষিণ আফ্রিকার কে একজন গান্ধী পর্যন্ত তাঁর কথা শুনে তাঁর অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের গৃহিণীর কানে একটি কথাও গেল না। যুদ্ধ আর বিপ্লব দুই দেখতে বেঁচে রইলেন কাউন্টেস। টলস্টয় বেঁচে গেলেন তার আগে মরে।

যুদ্ধ আর বিপ্লবের মতো মৃত্যু ছিল তাঁর আর-এক ধ্যান। সত্যভাবে বাঁচলে যুদ্ধ ও বিপ্লব এড়ানো যায়, মৃত্যু অনিবার্য। তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর এই নিয়েও মেঘলা ছিল। জীবনের অর্থের জন্যে তিনি খ্রীস্টমার্গে বিশ্বাসী হন। কিন্তু প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে তাঁর ঘোর অনাস্থা। পেছিয়ে যেতে যেতে তিনি চলে গেলেন যীশুখ্রীস্টের জীবনকালে। আদি খ্রীস্টবচনই হল তাঁর ধর্ম। শোষণ ও হিংসার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে বেধেছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত। এবার বাধল খ্রীস্টমার্গচ্যুত চার্চের সঙ্গে। একা টলস্টয় লড়তে লাগলেন দুই মহাশক্তির সঙ্গে। রাষ্ট্রের সঙ্গে। চার্চের সঙ্গে। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা বড় কম। বলা বাহুল্য মিলটনের মতো টলস্টয়ও লেখনীকে তরবারি করেছিলেন। খরধার তরবারি। কিন্তু মিলটনের পিছনে সম্প্রদায় ছিল। টলস্টয় সম্পূর্ণ একলা। দানবের বল নিয়ে তিনি জন্মে-ছিলেন। দানবও ছিলেন প্রথম যৌবনে। সেই বলের যেই সদ্ব্যবহার হল অমনি তাঁরও রূপান্তর ঘটল। তিনি হলেন মহামানব। যে হাতে কলম সেই হাতে বন্দুক ছিল একদা। বন্দুকও গেল। তার বদলে এক চাষী ও মুচির

হাতিয়ার। মদ্য মাংস ইত্যাদি পঞ্চ ম-কার গেল। রাজসিক হলেন সাত্ত্বিক। কিন্তু সব পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি যোদ্ধা। বার্ধক্যে তাঁর যুদ্ধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, চার্চের বিরুদ্ধে।

সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হল ঠিক। কিন্তু লাভবানও হল। কারণ তাঁর শেষ-বয়সে লেখা গল্পগুলি নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক বলে বিস্মরণীয় নয়। শিল্পীসুলভ চাতুরী তিনি ষষ্ঠ ম-কারের মতো বর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও—বোধহয় সেইজন্যেই—'আইভান ইলিচের মৃত্যু', 'প্রভু ও ভৃত্য' প্রভৃতি কাহিনীগুলি অন্তরকে উদ্বেল করে, সারা জীবন মনে থাকে, অলক্ষিতে জীবনকে বদলে দেয়। কী করে বলি যে এসব আর্ট নয়? হাঁ, এগুলিও আর্ট। তবে এই একমাত্র আর্ট নয়। টলস্টয় বললেও না। অপরপক্ষে 'সমর ও শান্তি'ও আর্ট। 'আনা কারেনিনা'ও আর্ট। টলস্টয় না বললেও আর্ট। শেষের দিকে তিনি "দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন" হয়েছিলেন। তাই নিজের কীর্তিকে ভস্ম করতে না চান, ছাইভস্ম মনে করেছিলেন। এটাও একপ্রকার শুচিবাতিক। কিন্তু এর আরো একটা কারণ আছে। সেটা আরো গভীর।

নিজের পূর্বজীবনকে কাটিয়ে ওঠা এক কথা। তাকে খারিজ করা অন্য জিনিস। তিনি কাটিয়ে উঠে ক্ষান্ত হবেন না। সরাসরি খারিজ করবেন। যেহেতু রিপুর তাড়নায় অনেকগুলো পাপ করে ফেলেছিলেন। না জেনে কারো কারো সর্বনাশও। অনুতাপ তাঁর মতো আর কে অত করেছে! দুনিয়াকে নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটির কথা কে এমন নির্মম ভাবে শুনিয়েছে। ডায়েরিও প্রকাশ হল তাঁর ইচ্ছায়। তবে পরিবারের মুখ চেয়ে কতক বাদসাদ দিয়ে। লোকে তাঁকে জুতো মারুক, এই তিনি চেয়েছিলেন। ভাবীকাল তাঁকে মাথায় করে রেখেছে। তিনি সত্যকুলজাত।

(১৯৬০)

অন্যতম গুরু টলস্টয়

টলস্টয় আমার অন্যতম গুরু। কী জীবনে কি শিল্পে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। দু'জনে এঁরা বন্ধনীভুক্ত। কেউ কারো চেয়ে বড়ো বা ছোট নন। ষোল বছর বয়সে আমি টলস্টয়ের 'তেইশটি কাহিনী' পুরস্কার পাই। তার একটি বাংলায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' পড়ি তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কিছুদিন পরে। যখন আমার বয়স দশ কি এগারো। "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" বুঝতে কষ্ট হয়, মুগ্ধ হয়ে পড়ি "একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়।" বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' হাতে পাই। 'ঘরে-বাইরে' বুঝতে পারিনে, 'সবুজের অভিযান' মুখস্থ করি। 'প্রবাসী'তে পড়া হয়ে যায় 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র বহু কবিতা।

টলস্টয়ের কাহিনীগুলির ভিতর দিয়ে তিনি যা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তা জীবনের মূলনীতি ও জীবনদর্শন। কিন্তু আমি চাই রস ও আনন্দ। বছর কয়েক পরে আমার নজরে আসে 'আনা কারেনিনা'। তন্ময় হয়ে পড়ি। সব কথা যে বুঝি তা নয়, কতই বা বয়স। আঠারো কি উনিশ। আরো কিছুদিন পরে পড়ি 'হোয়াট ইজ আর্ট'। সব কথা বোঝা আরো কঠিন। মোটামুটি হৃদয়ঙ্গম হয় যে আর্ট হবে সত্য ও শিব। সুন্দর না হলেও চলে। ওদিকে আমি রাশি রাশি কণ্টিনেণ্টাল নাটক নভেল পড়েছি। জীবনের সত্য মিথ্যা ভালো মন্দ পাপ পুণ্য সুন্দর মিছিল করে চলেছে। কী তার বৈচিত্র্য। কী তার আকর্ষণ। জীবনকে আমি আর্টের দর্পণে নিরীক্ষণ করব, না ধর্ম ও নীতির নিকষ দিয়ে কেবল শুভটুকুই আর্টের বিচারে সোনা বলে যাচাই করব।

পঞ্চাশোর্ধ্বে টলস্টয় বনে না গেলেও বাণপ্রস্থ নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের যৌবনের ভরা গঙ্গা তাঁর অমনোনীত হয়েছিল। সেই ভরা যৌবনের সৃষ্টিকেও তিনি নীতির বিচারে খাটো মনে করতেন। এতে কিন্তু আমার মন সায় দেয়নি। ভালো মন্দের বিবেক তাঁর মতে সমাজের বেলায় যেমন শিল্পের বেলায়ও তেমনি। ভালো কবিতা, ভালো গান, ভালো ছবি, একথা যখন বলব তখন কি এই কারণে বলব যে কবিতাটা বা ছবিটা লোকহিতকর, শিক্ষাপ্রদ, নীতিসম্মত? মানুষের সহজাত রসবোধ ও রূপবোধকে দমন না করে এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। আর্টের সংজ্ঞাকে সঙ্কুচিত করে তাকে ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের সীমানার ভিতরে আনতে গেলে যা হয় তা যেন চীনদেশের মহিলাদের লোহার জুতো পরানো। সুন্দরীকে সতী বানানোর এই সাধু অভিপ্রায় আর্টকে এত উচ্চে তুলে নিয়ে যাবে যে তাকে আর আর্ট বলে চেনা যাবে না। তার চেয়ে হতে দাও না কেন তাকে অসতী। হোক না সে আনা কারেনিনা।

আমি 'আনা কারেনিনা'কেই আর্টের আদর্শ ভাবি। 'সমর ও শান্তি' তো অনেকের মতে এ যুগের মহাকাব্যে 'ইলিয়াড'। আমার মতে ওর সঙ্গে সমান বলে গণ্য হতে পারে একমাত্র ডস্টয়েভস্কি রচিত 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'। 'ইলিয়াডে'র পর 'অডিসি' লেখাই ছিল প্রত্যাশিত, কিন্তু 'আনা কারেনিনা' আর একখানি 'অডিসি' নয়। তা সত্ত্বেও সে উপন্যাস একালের পাঁচ সাতখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম। তাকে কোনো কারণেই খাটো করা যায় না। যে দুটি সোপানের উপর দাঁড়িয়ে টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যের উচ্চতম স্তরে উঠেছিলেন সে দুটি যদি তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে যায় তবে তাঁর উচ্চতাই বা থাকে কোথায়! কেনই বা লোকে তাঁর বাণী শুনবে, তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে ঋষি হয়েছেন বলে!

ঋষি টলস্টয় এর পরে শিল্পের সাধনা ছেড়ে জীবনমরণের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করেন। বেদ উপনিষদ্ গীতা বাইবেল কোরান বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে অধ্যয়ন করেন। চার্চের ভাষ্য ত্যাগ করে

সরাসরি যীশু কথামৃত আস্বাদন করেন। যীশুর বাণী আদি খ্রীস্টানদের মতো অনুসরণ করেন। কোনো কারণেই নরহত্যা করা চলবে না, মানুষমাত্রেই তোমার ভাই ও তোমার পিতার সন্তান। হিংসার প্রতিশোধ হিংসা দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত অন্ন গ্রহণ করবে, অপরের পরিশ্রমের ফল থেকে তাকে বঞ্চিত করবে না। চাষীর মতো পোশাক পরে মুচির মতো জুতো তৈরি করা হলো টলস্টয়ের নিত্য কর্ম। তবে ওর থেকে তাঁর কোনো আয় ছিল না, চলত অন্য আয়ে। জমিদারির স্বত্ব তিনি স্ত্রীকে লিখে দেন। কিন্তু গ্রন্থস্বত্ব সর্বসাধারণকে দিতে চাইলে পারিবারের কাছ থেকে দুস্তর বাধা পান। শেষে এইভাবে রফা হয় যে, ঋষি হবার পূর্বে তিনি যেসব গ্রন্থ লিখেছিলেন সেসব গ্রন্থের স্বত্ব স্ত্রীকে লিখে দেন, সেইগুলিই তাঁর সোনার খনি। বাস একান্নে। তিনি খেতেন নিরামিষ।

কপিরাইট না থাকায় ঋষির বাণী দেশে বিদেশে ছড়িয়ে যায়। ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা তাঁতে বোনা কাপড়ের চাষীর পোশাক পরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। দেখলে চেনা যায় কে কে টলস্টয়পন্থী। কে কে উচ্চস্তর থেকে নেমে এসেছেন। দেক্লাসে বা ডিক্লাসড। টলস্টয় মাঝে মাঝে মস্কো যেতেন। একবার সেখানকার থিয়েটারে ঢুকতে গিয়ে বাধা পান। দারোয়ান বলে, "এই চাষী। তুই এর বুঝবি কী। এসব তোদের জন্যে নয়।" কে একজন ব্যাপারটা দূর থেকে লক্ষ করে ছুটে আসেন। বলেন, "সর্বনাশ। মানুষ চিনতে পারো না! ইনি যে কাউণ্ট লেও টলস্টয়।" দারোয়ান লজ্জায় ভয়ে জড়সড়। টলস্টয় তাকে সাধুবাদ দেন। "তুমি ঠিকই চিনেছ যে আমি একজন মুজিক। তুমিই ঠিক চিনেছ, আর কেউ নয়।" চাষী বলে তাঁকে ভুল করাতে তিনি মহা খুশি।

রুশদেশে যেটা ছিল একটা কাল্ট সেটা দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ভারতীয় ব্যারিস্টারের কাছে হয়ে দাঁড়ায় জীবনযাপনের এক শ্রেয়স্কর পন্থা। তাঁর সহচরদের নিয়ে তিনি স্থাপন করেন টলস্টয় ফার্ম। এঁরা সবাই সত্যাগ্রহী। তিনি এই পন্থা অবলম্বন না করলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেও পরে কেউ মহাত্মা গান্ধী বলত না। তিনিও ভারতে ফিরে এসে দক্ষিণ আফ্রিকার জের টেনে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতেন না, টলস্টয় ফার্মের জের টেনে সাবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতেন না, হাতে কাটা সুতো দিয়ে তাঁতে বোনা খদ্দর প্রচলন করতেন না। ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন গান্ধীজী বলেন, "আমার হাতে যদি শাসনক্ষমতা পড়ত তাহলে আমি টলস্টয়ের বোকা আইভানের মতো রাজত্ব চালাতুম।" টলস্টয়ের প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর মনের অতলে কাজ করছিল।

টলস্টয়ের আপন দেশে যাঁর আবির্ভাব ঘটে তিনি গান্ধী নন, লেনিন। তাঁর গুরু টলস্টয় নন, মার্কস। তাঁর পন্থা টলস্টয়পন্থা নয়, মার্কসপন্থা। রুশদেশের বিপ্লবীরা টলস্টয়কে বিদেশে রফতানি করে মার্কসকে স্বদেশে আমদানি করেন। সেইভাবেই তাঁরা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আর

অন্যভাবে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন গান্ধীজী, টলস্টয় যাঁর পথপ্রদর্শক। রাশিয়ায় যা পরিত্যক্ত হয় ভারতে তা গৃহীত হয়। অবশ্য তাঁর সমস্তটা নয়, সব সময়ের জন্যে নয়।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজীও টলস্টয়ের মতো বলতেন আর্মি মন্দ, পুলিশ মন্দ, কোর্ট মন্দ, জেল মন্দ, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে পীড়নের যন্ত্র, এই চারটি স্তম্ভের উপর যে দাঁড়িয়ে আছে সেই রাষ্ট্রও মন্দ। এমন এক সমাজ চাই যেখানে আর্মি নেই, পুলিশ নেই, কোর্ট নেই, জেল নেই, সুতরাং রাষ্ট্রও নেই। অথচ শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, ন্যায়বিচার আছে, বিচারে সাজাও আছে, কিন্তু তা কায়িক নয়। আর তার উদ্দেশ্য সংশোধন। গান্ধীজী টলস্টয়ের মতো এই আদর্শ সমাজকেই বলতেন, কিংডম অব গড, ভগবানের রাজ্য, সাধারণ পরিভাষায় রামরাজ্য। পরে এই কথাটির কদর্থ হয়। রাম এখানে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র নন, ভগবানের অন্যতম নাম।

ইংরেজ চলে গেলে স্বরাজ হবে, কিন্তু স্বরাজ হলে কি আর্মিও তুলে দেওয়া হবে, পুলিশও তুলে দেওয়া হবে, কোর্টও উঠিয়ে দেওয়া হবে, জেলও উঠিয়ে দেওয়া হবে? গোড়ায় গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল তাই, কিন্তু একটু একটু করে উপলব্ধি করেন যে ছোটখাটো একটা সৈন্যদল রাখতে হবে, আর রাখতে হবে তেমনি ছোটখাটো একটা পুলিশ। বিচার যদিও প্রধানত গ্রাম্য পঞ্চায়তেই হবে তবু হাইকোর্ট থাকাও দরকার, আর জেল না বলে তাকে শোধনাগার বলাই ভালো, সেও থাকবে ছোটখাটো আকারে। মার্কসবাদের যেমন রিভিসন হয়েছে বলে শোনা যায়, করেছেন যাঁরা তাঁরা রিভিসনিস্ট, টলস্টয়বাদেরও তেমনি রিভিসন করেছেন স্বয়ং গান্ধীজী। এ ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। তাঁর একটা অপোজিশন ছিল, সেই অপোজিশন হিংসায় বিশ্বাস করত, তাকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে না দিলে সে শান্তি দিত না, শৃঙ্খলা রাখত না, আদালতের হুকুম না হলে তাকে জেলে আটক করা যেত না। তাহলে কি কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পদত্যাগ করতে হতো? এ সমস্যা দেখা দেয় কংগ্রেস যখন প্রথমবার প্রাদেশিক সরকারে সমাসীন হয়। গান্ধীজী তার আগে ভাগেই কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেস ছাড়লেও কংগ্রেস তাঁকে ছাড়বে না। তিনি সেবাগ্রামে বসে পলিসি বাতলে দেন। অপোজিশন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন তাকে ক্ষমতার আসনের ভাগ না দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে অপোজিশনেরই সরকার গঠনের পালা, কিন্তু সংখ্যালঘু দল তো সরকার গঠন করতে পারে না। তাই ইংরেজ সরকারের কর্মচারীরাই রাজত্ব চালান। পরীক্ষা করে দেখা গেল এটা একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। মতবাদের রিভিসন চাই।

মুসলিম লীগকে ক্ষমতার একাংশ ছেড়ে না দিয়ে দেশের একখণ্ড ছেড়ে দেয় কংগ্রেস। তারপর বাকী খণ্ডের জন্যে যে সংবিধান রচনা করে তা গান্ধীবাদী বা টলস্টয়বাদী সংবিধান নয়। গান্ধী ততদিনে নিহত। তাঁর

শিষ্যরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর টলস্টয়ের শিক্ষা তো তাঁর নিজের দেশেই অচল, ভারতে তার প্রয়োগ করতে যাবে কে? লোকে সফলকেই পূজা করে, বিফলকে নয়। স্বাধীন ভারতে লেনিনেরই কদর বেড়ে যায়, গান্ধীভক্তদের অনেকেই মার্কস লেনিন উপাসনা আরম্ভ করেন। আমার এক প্রিয় বন্ধু একাধারে গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদী। আরেক বন্ধু গান্ধীবাদ থেকে সরে যেতে যেতে মার্কসবাদী বনে গেছেন। আবার এটাও লক্ষণীয় যে পাকা কমিউনিস্টরা কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করছেন, এই তো সেদিন একজন মরণপণ অনশন ঘোষণা করলেন।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে গান্ধীজী টলস্টয়পন্থা থেকে বেশ কিছুদূর অপসরণ করলেও অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিচ্যুত হননি। কায়িক শ্রম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্ন উপার্জন, চরকার সুতো তাঁতে বুনে বস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি তাঁর জীবনের শেষদিনটি অবধি রক্ষা করেছিলেন। এখনো তিনি বেঁচে আছেন সেই কার্যক্রমের ভিতর দিয়ে তাঁর অনুগত শিষ্যদের মধ্যে। টলস্টয়ের প্রভাবও এইভাবে বেঁচে আছে। মুজিকের পোশাক পরে এঁরা এখনও ঘুরে বেড়ান। এর নাম পদযাত্রা। আদি খ্রীস্টানদের মতো এঁদেরও বিশ্বাস স্বর্গরাজ্য একদিন আসবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এঁদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে। যদি কারো পুত্রকন্যা থাকে। তারা আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত সন্তানের মতো জীবনযাপন করতে চায়। কেউ হবে এঞ্জিনীয়ার, কেউ হবে ডাক্তার। এসব কাজ তো মন্দ নয়। শ্রেণীচ্যুত হতে একজনেরও ইচ্ছা নেই। শ্রমিকদের মধ্যে কৃষকদের মধ্যেই বরং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মধ্যবিত্ত হতে আগ্রহ। ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলগুলোর সংখ্যা যে বেড়ে যাচ্ছে তার একটা কারণ শ্রমিককৃষকরাও তাদের সন্তানদের সেখানে পড়তে পাঠাচ্ছে। তারাও প্রথমে হাফপ্যাণ্ট ও পরে ফুল প্যাণ্ট পরছে। স্কুলে যারা যাচ্ছে না তারাও।

টলস্টয়ের নিজের ঘরেই বিদ্রোহ মাথা তুলছিল। তাঁর এক ছেলে তো সোজা গিয়ে আর্মিতে যোগ দেয়। যেটা সব চেয়ে নৃশংস রেজিমেণ্ট সেই ব্ল্যাক ওয়াচে। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। টলস্টয় অসহায়। আরেক ছেলে তো কঠিন অসুখের সময় তাঁকে দেখতে আসবে না। সে বলে তার বাবা আগে ভাগেই বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে তার বিখ্যাত সাহিত্যিক হবার পথরোধ করে বসে আছেন। বিপ্লবের পরে আরেক ছেলের মন্তব্য, "এর জন্যে দায়ী হচ্ছেন বাবা। তিনিই তো বিপ্লবের নাটের গুরু।"

এদেশেও যদি কোনোদিন বিপ্লব ঘটে তবে যাদের সর্বস্ব যাবে তারাও হয়তো বলবে, "এর জন্যে দায়ী হচ্ছেন বাপু। তিনিই তো বীজ বুনে গেছেন।" সেটা যে নেহাৎ একটা ভ্রান্ত ধারণা তা নয়। এস্টাব্লিশমেণ্ট বলতে যা বোঝায় তা কেবল একমুঠো ইংরেজ নয়। ইংরেজরা চলে গেলেও ভারতীয়রা থাকে ও তারাই রাষ্ট্র চালায়। রাষ্ট্রকেই উৎখাত করতে হবে এটা গান্ধীপূর্ব কংগ্রেসের পলিসি ছিল না। এটা আমরা মডারেটদের মুখে বা এক্স্ট্রিমিস্টদের মুখেও শুনিনি। শুনিনি যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয়

তাঁদের মুখেও। এটা গান্ধীজীর মুখেই শোনা। তাঁর মৌল আপত্তি বিদেশী কর্তৃত্বে নয়, যে সীস্টেম তারা গড়ে তুলেছে তারই অন্তিত্বে। সেটা নির্জলা মন্দ। স্বদেশী কর্তৃত্ব হয়তো অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। কিন্তু মন্দত্বের জড় তাতে মরে না। যেমন মিলের কাপড়ে মরে না। তাদের গড়া সীস্টেমটাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। যাতে তার সাহায্যে মানুষ মানুষকে উৎপীড়ন না করে, শোষণ না করে। এক্ষেত্রে লেনিনের উদ্দেশ্য আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। উদ্দেশ্য একই, কিন্তু উপায় বিভিন্ন। আর উপায় বিভিন্ন বলেই একজনের ধ্যানের রাষ্ট্র প্রোলিটারিয়ান রাষ্ট্র, আরেকজনের ধ্যানের রাষ্ট্র ননভায়োলেণ্ট রাষ্ট্র। গান্ধীজী কোনোদিন শাসনকার্য করেননি, আমি করেছি। করার আগেও আমার ধারণা ছিল যে ননভায়োলেণ্ট রাষ্ট্র সম্ভব, কিন্তু করার পরে আমার ধারণা বদলায়। কম ভায়োলেণ্ট রাষ্ট্র হতে পারে, ননভায়োলেণ্ট রাষ্ট্র হবার নয়। তার জন্যে চাই সত্যি সত্যি স্বর্গরাজ্য। মানবপ্রকৃতির গভীরতম রূপান্তর। আমি বিবর্তনবাদী। বিবর্তনসূত্রে মানব হয়তো হিংসাপ্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে উঠবে। কতক লোককে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে, দুঃখবরণ করতে হবে। অধিকাংশ লোককে শিক্ষিত হতে হবে। চলতি অর্থে নয়। হঠাৎ একটা গণসত্যাগ্রহ বা একটা বিপ্লব এসে পথ-সংক্ষেপ করতে পারে, তবু রাষ্ট্র ওইটুকুতেই শুকিয়ে যাবে না। তার সেবা করবে সেই আর্মি, সেই পুলিশ, সেই কোর্ট, সেই জেল।

শিল্পী টলস্টয় ব্যর্থ হননি। ঋষি হবার পরেও লিখেছেন 'রেজারেকশন', তৃতীয় মহত্তম উপন্যাস। অন্তত গোটা দুই অবিস্মরণীয় গল্প, 'প্রভু ও ভৃত্য' আর 'আইভান ইলিচের মৃত্যু'। কিন্তু ঋষি টলস্টয় না পারলেন মহাযুদ্ধ ঠেকাতে, না পারলেন মহাবিপ্লব এড়াতে। একটার লজিকাল পরিণতি অপরটা। বিরাশি বছরে দেহত্যাগ না করে আরো সাত বছর বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন তাঁর ব্যর্থতার দৃশ্য। কিন্তু আরো তিন বছর টিকে থাকলে দেখতেন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের অহিংস অভিযান। তাঁরও পরোক্ষ সার্থকতা।

শিল্পী টলস্টয় ও ঋষি টলস্টয়, একজন মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় না। 'সমর ও শান্তি' লেখার বয়সেও তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও বিবেকের তাড়না যথেষ্ট প্রবল ছিল। 'আনা কারেনিনা' লেখার বয়সে আরো তীব্র হয়। তাঁর সাংসারিক সাফল্যের চূড়ায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে মানব জীবনের অন্বিষ্ট যশ নয়, বিভব নয়, মানসম্মান নয়, রাজ-ক্ষমতা নয়, ভোগবিলাস নয়। মৃত্যু অপেক্ষা করছে তার আত্মাকে এক অজানা লোকে নিয়ে যেতে, যেখানে সে নিঃসম্বল। কিংবা সে একেবারেই অস্তিত্বহীন। পরপারে অন্তহীন শূন্যতা। করণীয় তাহলে কী? যীশু যা বলে গেছেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা। ভালোবাসা যদি সত্য হয় তবে হত্যা করা কখনো সত্য নয়, কোনো কারণেই শ্রেয় নয়, শোষণ করা কখনো সত্য নয়, কোনো কারণেই শ্রেয় নয়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা দিচ্ছে এর

বিপরীত শিক্ষা, খ্রীস্টীয় শিক্ষার সঙ্গে সে সভ্যতার মূলেই বিরোধ। খ্রীস্ট-ধর্মে যারা বিশ্বাস করে তারা সে সভ্যতায় বিশ্বাস করতে পারে না! সে সভ্যতায় যারা বিশ্বাস করে তারা খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস করতে পারে না। খোসাটা আসল নয়, শাঁসটাই আসল। খাঁটি খ্রীস্টান হতে হবে। খাঁটি খ্রীস্টানের সঙ্গে খাঁটি বৌদ্ধের বা খাঁটি মুসলমানের বা খাঁটি হিন্দুর মূলত কোনো ভেদ নেই। গান্ধীজীকে তিনি তাঁর সমর্থন জানিয়ে, উৎসাহ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চিঠি লেখেন সে চিঠি পৌঁছয় তাঁর মৃত্যুর পরে। বলতে গেলে সেই তাঁর শেষ উইল ও টেস্টামেণ্ট। পার্থিব বিষয়-সম্পত্তির নয়, জীবনের বাণীর ও ব্রতের। গান্ধীজীকে লেখা সে চিঠি দেশ ও ধর্মনির্বিশেষে সব মানুষকেই লেখা। যারা বর্তমান সভ্যতার মিথ্যা মূল্যগুলোর মোহে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট।

শিল্প কি কেবল শিল্পকেই সার করবে, মানবজাতির জীবনমরণের সমস্যা নিয়ে ভাববে না, সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাবে না? এ বিষয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে আমার মতভেদ আজীবন। তাজমহল গড়ার কাজও কতক মানুষকে করতে হবে। চারদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্মে তৎপর থাকতে হবে, তন্ময় থাকতে হবে! শিল্পের দেবী ঈর্ষাপরায়ণা। সব মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে কতক মানুষের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এরা যা সৃষ্টি করছে তা সব মানুষের পক্ষে ও সব মানুষের জন্যে। এরা যদি না করে তো আর কেউ করবে না। শিল্পীরা তাদের স্বধর্ম নিয়েই থাকবে, সেটাও ধর্ম।

টলস্টয় গ্রামে বাস করতেন, চাষী ও কারিগরদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সেই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করত, সন্ন্যাসী ফকির জিপসীদেরও আসা-যাওয়া ছিল। এই যে চিরন্তন স্বদেশ একে ছেড়ে তিনি বিদেশেও যেতেন না, দু'বার গিয়ে অস্বস্তি বোধ করে অল্পদিনের মধ্যে ফিরে আসেন। তাঁর এই বিদেশবিমুখতার সঙ্গে যোগ দেয় নগরবিমুখতা। নগরগুলো তো বিদেশেরই অনুকরণ। সেখানে গেলেও তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে তাঁকে মস্কোতেও বাসা নিতে হয়েছিল। বছরের কয়েক মাস সেখানে কাটাতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় পড়ে থাকত ইয়সনাইয়া পলিয়ানায়। রবীন্দ্রনাথের যেমন শান্তিনিকেতনে। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই মস্কোতে বা সেণ্ট পিটার্সবার্গে। অনেকে প্যারিসে বা দক্ষিণ ফ্রান্সে বা ইটালীতে বা জার্মানীতে। টলস্টয় এঁদের দেখতে পারতেন না, তাঁর ধারণা দেশের লোকের নাড়ীর সঙ্গে এঁদের যোগ নেই, এঁরা লিবারল হলে শৌখীন লিবারল, বিপ্লবী হলে পুঁথি পোড়ো বিপ্লবী। লিবারলদের মুখে যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার বা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের খৈ ফুটত তখন তিনি বলতেন, যুদ্ধকালে কনসক্রিপশন কী করে তার সঙ্গে খাপ খায়? যারা রাষ্ট্রের হুকুমে নরহত্যা করে তারা তো তাদের বিবেক হারিয়ে বসেছে। রাষ্ট্রের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। পশ্চিম থেকে যন্ত্র আমদানি করে তার পায়ে আত্মা বলি

দিলে সেটাও তেমনি মারাত্মক। চাষী আর কারিগরকে কলমজুর বানিয়ে প্রগতি হবে, এটা মায়া।

তাঁর সমাধান ছিল চাষীকে আপনার বলতে একটুকরো জমি দিতে হবে, যেখানে চাষীরই মালিকানা। জমিদারেরও নয় রাষ্ট্রেরও নয়। দেশের বুদ্ধিজীবী মহল তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাই বুদ্ধিজীবীদের উপরে ছিল তাঁর অবজ্ঞা। তা ছাড়া কেই বা তাঁর মতো জমিতে গিয়ে চাষবাস করতে রাজী? তাহলে তো আর বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হবেন না। বুদ্ধিজীবীকে তিনি বানাতে চান চাষী। ওঁরা কিন্তু চাষীকে বানাতে চান বুদ্ধিজীবী। রাষ্ট্রের সঙ্গে, চার্চের সঙ্গে, শিল্পীদের সঙ্গে, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিরোধেই কেটে যায় তাঁর শেষজীবন।

পরিবারের সঙ্গেও তেমনি। গৃহত্যাগ করে তিনি কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পথের ধারে এক রেলস্টেশনে ঘটে দেহত্যাগ। সব দেশের মানুষ তাঁর জন্যে কাঁদে, সব শ্রেণীর মানুষও। একমাত্র তুলনা গান্ধীজীর নিধন।

(১৯৭৮)

টলস্টয় ঃ সার্ধশতবার্ষিকী

টলস্টয়ের জন্মের দেড়শো বছর অতীত হয়েছে। তাঁর জীবনকালেই তিনি দেশের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় দেখা গেল, স্বদেশে পূজ্যতে 'জার', টলস্টয় সর্বত্র পূজ্যতে। তাঁর জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে সারা দুনিয়ার লোক উৎকণ্ঠিত। কেন এত শ্রদ্ধা, এত প্রীতি, এর মমতা? 'সমর ও শান্তি', 'আনা কারেনিনা' ও 'রেসারেকশন' এই তিনটি মহান উপন্যাসের জন্যেই কি? না তাঁর মানবদরদী জীবনদর্শনের জন্যে, জনদরদী জীবন-যাপনের জন্যে? যুদ্ধবিরতি ও শোষণবিরতির জন্যে তাঁর অবিশ্রান্ত লেখনী-চালনার জন্যে?

টলস্টয়ের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ষোল বছর বয়সে, যখন আমি স্কুলের ছাত্র। তাঁর কাহিনীগুচ্ছ পুরস্কার পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করি গোটা দুই। একটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে। সেই যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো সে সম্পর্ক সারা জীবনেও ছিন্ন হলো না। জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে আমি তাঁর অনুচরদের সঙ্গেই রয়েছি। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি। আর্টকে তিনি পঞ্চাশোত্তর বয়সে ধর্মপ্রচার বা নীতিপ্রচারের বাহন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার মৌল মতভেদ। আমার মতে এতে আর্টের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অমিতাচারী আর্টকে সংযত হতে বলা এক জিনিস, শৃঙ্খলার খাতিরে শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া আরেক। শিবের জন্যে সৌন্দর্যকে লাঘব করা যায় না। সত্যের জন্যেও না, তবে

দ্বন্দ্বের দিন আমি দ্বিধান্বিত। ঠিক এই কারণেই আমি রবীন্দ্রনাথের আরো কাছাকাছি। পরবর্তী বয়সে আমি কবির প্রভাবও কাটিয়ে উঠেছি।

এ সংসারে ধনহীনরা ধনবান হতে চায়, বলহীনরা বলবান হতে চায়, অশিক্ষিতরা শিক্ষিত হতে চায়, নিম্নস্থানীয়রা উচ্চস্থানীয় হতে চায়। কিন্তু এর বিপরীত অভিলাষ কেউ কোথাও পোষণ করে কি? যদি কেউ করে সে সরাসরি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, মাঠে যোগ দেয় কিংবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। টলস্টয় দীনহীনদের একজন হয়ে তাদেরি মতো শ্রমলব্ধ অন্নে প্রাণধারণ করতে চেয়েছিলেন, পশুবলে তাঁর আস্থা ছিল না, বুদ্ধিজীবীদের উপর তাঁর অবজ্ঞা জন্মেছিল, সভ্যতার উপরে তিনি বীতরাগ। অথচ সন্ন্যাসীও হননি, মঠেও যোগ দেননি, আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেননি। গান্ধীজী তবু তাঁর সহধর্মিণীকে আশ্রমিকা করতে পেরেছিলেন, টলস্টয়ের সহধর্মিণী শেষপর্যন্ত অভিজাত ঘরণী। ঘর ছাড়তে যাওয়া মানেই ঘরণীকে ছাড়তে যাওয়া। সেই কাজটি যেদিন করতে সমর্থ হন সেদিন তিনি হন অভিজাত জীবনধারা থেকে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু ততদিনে তাঁর বয়স হয়েছে বিরাশি, শরীর ভেঙে গেছে, দিনকয়েকের মধ্যেই তিখি পথের ধারে এক রেলস্টেশনে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেঁচে থাকলে আবার তাঁকে তাঁর ঘরসংসারেই ফিরে যেতে হতো। সেটা হতো তাঁর পক্ষে পরাজয়। যদি না তাঁর সহধর্মিণীর ঘটত একপ্রকার অন্তঃপরিবর্তন। যদি না সমস্ত গৃহস্থালীটাই বনে যেত ঋষি ও ঋষিপত্নী তথা ঋষিসন্ততিদের আশ্রম। একটি কি দুটি কন্যা ভিন্ন আর কোনো পুত্রকন্যার উপরে তাঁর জীবনদর্শনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি। তাঁরা তাঁদের দেশের ও তাঁদের যুগের আর দশজন উচ্চবংশীয়ের মতো। তাঁদের তিনি মানাতে পারেননি যে স্বেচ্ছায় ধনসম্পদ ও অলস জীবনধারা ত্যাগ না করলে বিপ্লবের দিন বাধ্য হয়েই সর্বস্ব হারাতে হবে। তখন বিদেশে গিয়ে পিতার গ্রন্থস্বত্বের দৌলতে ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে।

ঋষি যেখানে নিজের ঘরের লোককেই সঙ্গে নিতে পারলেন না সেখানে সারা দেশের লোককেই বা সঙ্গে নিতে পারবেন কেমন করে? সে কাজের ভার পড়ল লেনিনের উপরে, ভার দিল ইতিহাস। লেনিনেরও নিঃস্বার্থ জীবন, সাধারণের মতো জীবনযাত্রা। কিন্তু জনগণকে সঙ্গে নেবার জন্যে কী পরিমাণ রক্তপাত করতে হলো তাঁকে! পরে তাঁর পটশিষ্য স্টালিনকে। রক্তের স্রোতে ভেসে গেল 'সমর ও শান্তি' তথা 'আনা কারেনিনা' তথা 'রেজারেকশনে'র বুদ্ধিদীপ্ত বলদৃপ্ত ধনসম্পদশালী অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু তাতে তাদেরই বা লাভ কী হলো যাদের মধ্যে টলস্টয় ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন ছোট ছোট জোত? যেখানে যারা শোষণও করবে না, শোষিতও হবে না। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চাষ করবে, যা ফলাবে তা খাবে, যা খাবে তা ফলাবে। শিল্পের মতো কৃষিও চলে গেছে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। খেত খামার কারো নিজের নয়। রাষ্ট্রের কিংবা সমষ্টির। টলস্টয় দেখলে কষ্ট পেতেন। কিছুতেই তাঁকে বোঝানো যেত না যে এরই নাম সামাজিক ন্যায়।

পশ্চিমের লোক যাকে গণতন্ত্র বলে তাতে তো তিনি বিশ্বাসই করতেন না, সুতরাং সে জিনিস গড়ে ওঠেনি দেখে তিনি কাকেই বা দোষ দিতেন? এক ডিকটেটরশিপের বদলে আরেক ডিকটেটরশিপ। অভিজাতদের না হয়ে শ্রমিকদের। সমাজের এক মেরুর না হয়ে অপর মেরুর। টলস্টয়প্রচারিত অহিংসার নামগন্ধ নেই। সত্যেরও আছে কি না সন্দেহ। কাউকে তো কিছু প্রাণ খুলে লিখতেই বা বলতেই দেওয়া হয় না। কড়া সেনসরশিপ।

টলস্টয়ের অহিংস মতবাদ কেবল যে যুদ্ধবিরোধী ছিল তাই নয়, বিপ্লব-বিরোধীও ছিল। বিপ্লব যে অহিংস হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর কিংবা কারো ছিল না। রাশিয়াতে কেবল যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছিল তা নয় বিপ্লবের প্রস্তুতিও চলেছিল। যেন একটা অন্যটার উল্টো পিঠ। যুদ্ধবাজরা টলস্টয়কে মনে করতেন দেশের শত্রু। আর বিপ্লববাদীরা মনে করতেন শ্রেণীর শত্রু। খ্রীস্টীয় ধর্মসঙ্ঘও তাঁর বাইবেলের ভাষ্যকে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ মনে করে তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল। জনগণ যদি তাঁরই ভাষ্য মেনে নেয় তবে প্রচলিত ধর্মের সংশোধন করতে হয়। কেবল ধর্মের বেলা নয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের বেলা টলস্টয়ের চিন্তা ছিল আমূল সংশোধন বা সংস্কারের পক্ষে। কিন্তু ন্যূনতম পরিবর্তনকেও রাষ্ট্রের বা চার্চের বা ধনতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের কর্তারা বিপ্লব বলে পরিহার করতেন। বিপ্লব যখন এল তখন রাষ্ট্রকেও নিঃক্ষত্রিয় করল। চার্চকেও নির্ব্রাহ্মণ বা নিঃসন্ন্যাসী করল। সমাজকেও নির্বৈশ্য করল। শূদ্র হলো নিষ্কণ্টক। কিন্তু অস্ত্র হাতে সেও গড়ে তুলল রেড আর্মি। তার জয়লাভ মানে হিংসার জয়লাভ।

অথচ রাজাপ্রজা সকলেই স্বীকার করতেন যে টলস্টয় তাঁর দেশের এক নম্বর নাগরিক। ইউরোপবাসীরা বলতেন তিনি ইউরোপের বিবেক। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত গান্ধীও তাঁকে কর্মগুরু পদে বরণ করেছিলেন। একলব্যের যেমন দ্রোণ। টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কে না ব্যথিত হয়েছিলেন? প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন টমাস মান বলেছিলেন টলস্টয় বেঁচে থাকলে কি তিনি এ যুদ্ধ বাধতে দিতেন? সমস্ত শক্তি দিয়ে রোধ করতেন। টলস্টয়ের সম্মান কেবল সাহিত্যিক হিসাবে নয়। মানবহিতৈষী হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর সাহিত্যিক কীর্তি এখনো অদ্বিতীয়। তবে পরবর্তীকালের বিচারে ডস্টয়েভস্কির উচ্চতা বাড়তে বাড়তে তাঁর সমান হয়েছে। আর মানব-নিয়তি সম্বন্ধে তাঁর যে ভাবনা তার কর্মময় অভিব্যক্তি প্রধানত গান্ধীজীর জীবনেই। তিনিও স্বাধীন ভারতে কার্যত পরিত্যক্ত।

টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কারো চেয়ে কম অভিভূত হন না ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন মার্গের সাহিত্যিক ম্যাকসিম গর্কি। গর্কির টলস্টয়স্মৃতি আরো অনেকের মতো আমাকেও অভিভূত করে। আমার তো মনে হয় না যে গর্কি টলস্টয়ের প্রতি সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে কোনোরূপ অবিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সেই প্রবন্ধ পড়ে ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, "ম্যাক্‌সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা

বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলস্টয় দোষেগুণে যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণরেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন কি, অনেক বিষয়ে হেয়। ···টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না এ কথা বলাই চলে না, খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের ও বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী? ···ক্ষণকালের মাথার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, একথা মানতে পারিনে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট চিত্ত বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়, তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে সত্য তা কেমন করে বলব? গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত, আর, তবেই না যা না ভোলবার তা বড়ো হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা হত।"

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি।)

রবীন্দ্রনাথের লেখায় টলস্টয় প্রসঙ্গ ওর বেশী যা আছে তা কোথাও এক লাইন, কোথাও দু'লাইন। একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি টলস্টয়কে ইউরোপের বিবেক বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একখানি চিঠিতে লিখেছেন, "Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারিনে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর উদার লেখা—কুটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।"

গর্কি নিশ্চয়ই এর চেয়ে কঠোর কিছু বলেননি। আমার মনে হয় গোর্কির জীবনস্মৃতিকে টলস্টয়ের জীবনচরিত বলে ভ্রম থেকেই রবীন্দ্রনাথের ওই ধারণা। সাক্ষাৎকারের সময় গর্কি যা শুনেছেন ও যা দেখেছেন তাই লিখেছেন, কিছুই বানাননি। সত্যকামের মতো টলস্টয়ও 'সত্যকুলজাত'।

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এবার গর্কির লেখা থেকে দিই। ইংরেজীতে।

"Leo Tolstoy is dead···The news hit my heart. I groaned from anguish and resentment and now, in a kind of half-madness, I imagine him the way I knew him and the way he used to look, and am racked by the desire to talk about him

···I recall his piercing eyes—they saw through everything—and his fingers, which seemed perpetually to be modelling something in the air, his talk, his jokes, his favourite muzhik words and his indefinable voice. I see how much life he had embraced and how superhumanly clever he was, and awesome. ···Words are powerless to convey what I felt then, felt both delighted and fearsome and it all merged in one happy thought. 'I'm not an orphan on this earth as long as this man is alive'.··· And now I feel an orphan, and I cry as I am writing. I have never wept so disconsolately and so bitterly. I don't know whether I loved him—and what does it matter whether I loved him or hated him? The sensations and emotions he aroused in me were always immense and fantastic; even the things around him that I found unpleasant and inimical somehow did not oppress me but exploded my soul, as it were, to enlarge it and make it more sensitive."

এ লেখা একজন ভক্তের লেখা, কিন্তু অন্ধ ভক্তের নয়। ভক্তির সঙ্গে ছিল সূক্ষ্ম যুক্তি। যা দিয়ে তিনি টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন। সোনার সঙ্গে খাদ থাকলে যা হয় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বেও ছিল তাই। নয়তো তিনি একজন সাধুসন্ত হতেন, একজন মুনিঋষি বা প্রোফেট। তেমন মানুষের হাতে 'সমর ও শান্তি' বা 'আনা কারেনিনা' হতো না। রবীন্দ্রনাথ যাই মনে করুন। কোন্ ধাতুতে তিনি তৈরি জানতে হলে গর্কির সাক্ষ্য আমাদের সাহায্য করে। আবার তুলে দিচ্ছি। ইংরেজী থেকে। পথের ধারে হঠাৎ দেখা দুই তীর্থযাত্রী ও যাত্রিণীর বীভৎস মিলনের বর্ণনা দিয়ে টলস্টয় বলেছেন,

"You see what sometimes happens. Nature—which the Bogomils believe to have been created by the devil—torments man in a particularly cruel and mocking way: it takes away the strength but leaves the desire. This is the lot of all living souls. Only man is exposed to the shame and horror of the torment which is part of his flesh. We carry it within ourselves as an inevitable punishment, but for what sin of ours? As he spoke his eyes were changing strangely—they were now plaintive like a child's, and now shining dryly and severely. His lips twitched and his moustache bristled. When he finished his story he took a handkerchief out of his blouse pocket and wiped his face hard, although it was dry. Then he spread his

bread with the hooked fingers of his strong peasant hand and repeated quietly, 'For what sin ?"

গর্কি যে ছবিখানি এঁকেছেন সে ছবি যে জীবন্ত হয়েছে এই দুটি উদ্ধৃতিই তার যথেষ্ট প্রমাণ। অসাধারণ পুরুষের সাধারণ দোষও থাকে। কথায় বার্তায় তা ফুটে বেরোয়। কিন্তু যেটা আরো পরিস্ফুট সেটা টলস্টয়ের আপসহীন সত্যনিষ্ঠা। সত্যকে জানবার জন্যে, জানাবার জন্যে তাঁর অপরিসীম প্রয়াস। শুধু শিল্পীদের বিরুদ্ধে নয়, শিল্পের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযোগ সে সত্য কথা বলে না।

"We're all given to telling tales. Me too. I write, and suddenly feel sorry for someone and add a good trait to a character, and take away from another, so as not to make the other characters too black by comparison···That's why I say that artistry is lying, deceitful and arbitrary, and is harmful for people. You write not about life as it is but what you think of life. Who can profit from knowing how I see this tower or the sea, or a Tatar—what is the point of it and who needs it ?"

একথা যিনি বলতে পারেন তাঁর হয় নতুন কিছু সৃষ্টি করবার নেই, নয় নতুন কিছু সৃষ্টি করবার থাকলেও তিনি তাতে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। তিনি চান এমন কিছু লিখতে যা যীশু খ্রীস্টের কথামৃতের মতো সর্বজনহিতকর হবে, কিংবা নিম্নতম অধিকারীর কাছে সরল, সহজ ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁর লেখা আর্ট হলো কি না তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই, তিনি চান দীন দুঃখী শোষিত পীড়িতদের সেবা করতে। সংসারে মন্দ আছে, অশুভ আছে। কিন্তু খ্রীস্টের বাণীই তাঁর বাণী। অশুভের প্রতিরোধ কোরো না। হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিরোধ অশুভ।

গর্কি তাঁকে যা বলেন ও তার উত্তরে তিনি যা বলেন তা ইংরেজীতে এইরকম। "I said that all writers probably made up things a little, portraying people they would like to see them ; I also said that I liked active people who opposed evil by all means, including violence. 'But violence is the main evil, he exclaimed taking me by the arm."

সত্য চিরদিনই তাঁর স্বভাবে ছিল, অহিংসা এল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর এই অহিংস মতবাদ ইউরোপ গ্রহণ করেন না। কিন্তু গান্ধীজী গ্রহণ করেন ও তাঁর কর্মপদ্ধতির সূত্রে ভারতের জনগণ গ্রহণ করে। এখানে বলে রাখা দরকার যে অপ্রতিরোধ বলতে যীশু যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা নিষ্ক্রিয়তা নয়, কাপুরুষতা নয়। সেটাও একপ্রকার প্রতিরোধ, কিন্তু নৈতিক প্রতিরোধ। প্যাসিভ বলে চিহ্নিত হলেও তা হৃদয়ের উপর অ্যাকটিভ। নয়তো যীশুর

বিচারই বা হতো কেন, প্রাণদণ্ডই বা হতো কেন ? টলস্টয় যে শিক্ষা যীশুর কথামৃত থেকে পান সেই শিক্ষাই দিয়ে যান তাঁর শেষবয়সের বাণীতে। সে শিক্ষা গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করে। কর্মপদ্ধতি গান্ধীজীর।

টলস্টয়ের উত্তরাধিকার একদিকে যেমন গান্ধীজীতে বর্তায় তেমনি আরেকদিকে রম্যা রলাঁয়। টলস্টয়ের পরে রলাঁকেই বলা হয় ইউরোপের বিবেক। প্রথম মহাযুদ্ধে রলাঁ ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। ফলে স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। কিন্তু মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুদয়ের পর তাঁদের হিংসাত্মক মতবাদ ও কার্যকলাপ রলাঁকে এক পা এক পা করে টলস্টয়পন্থা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। রলাঁ যে কেবল টলস্টয়েরই উত্তরাধিকারী ছিলেন তাই নয়। ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নায়কদেরও উত্তরাধিকারী। তাই রুশবিপ্লবের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মার সাযুজ্য। রুশবিপ্লব ফরাসীবিপ্লবের সন্তান। তাকে নাৎসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে সশস্ত্র প্রতিরোধই ফলপ্রদ। অহিংস প্রতিরোধ নিষ্ফল। ইউরোপের বিবেক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে দেশরক্ষার তথা বিপ্লবরক্ষার যুগ্ম প্রয়োজনে অসিধারণ ব্যতীত অন্য পন্থা দেখতে পায় না। নীতিগতভাবে টলস্টয়পন্থা পরিত্যক্ত হয়। টলস্টয়ের শিক্ষা ছিল, কোনো অবস্থাতেই হিংসা নয়। চার্চের শিক্ষা, রাষ্ট্রের শিক্ষা আক্রমণের মুখে হিংসা। রলাঁর শিক্ষাও শেষপর্যন্ত তাই।

মৃত্যুর পূর্বে রলাঁ সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে ফিরে যান ও নাৎসীদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে স্বগ্রামে ও স্বগৃহে বাস করেন। তখন তিনি মগ্ন হন সঙ্গীতসাধনায়। বিশেষত বেঠোভেনের সঙ্গীতে। বেঠোভেন, গোটে ও টলস্টয় এই তিনজনই ছিলেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। এঁদের মধ্যে বেঠোভেনই তাঁর কাছে অগ্রগণ্য। টলস্টয়ের প্রভাব যদিও তাঁর শিল্পকর্মের উপর পড়েছিল তবু তার সামনে ছিল বেঠোভেনের আদর্শ আদি থেকে অন্তকাল অবধি। বেঠোভেনেও আপসহীন। কী জীবনে কি শিল্পে। রলাঁর জাঁ-ক্রিস্তফ বেঠোভেনের আদলে আঁকা। রলাঁ টলস্টয়ের দিকে তাকাতেন চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। 'জাঁ-ক্রিস্তফ' লিখতে লিখতে সাহিত্যে টলস্টয়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন।

কোন্‌টা রাশিয়ার পক্ষে ভালো, কোন্‌টা জনগণের পক্ষে ভালো, কোন্‌টা নীতির দিক থেকে ভালো, কোন্‌টা শিল্পের দিক থেকে ভালো, এ নিয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে মতভেদের অবকাশ টলস্টয়ের জীবদ্দশাতেও ছিল, পরে তো রয়েছেই। তাঁর নিজের দেশেই তিনি এখন কুলুঙ্গীতে তোলা এক ঠাকুর। সকলেই তাঁর বন্দনা করে, কিন্তু কেউ তাঁর অনুসরণ করে না। রবিঠাকুর তাঁরই মতো একজন ঠাকুর হলেও এখনো আমরা কয়েকজন আছি যাঁরা তাঁর উত্তরপুরুষ বলে পরিচিত হই। ওদিকে কিন্তু রলাঁর অনুসরণ আর কেউ করেন না। তাঁর স্বদেশে তিনি কুলুঙ্গীতে তোলা ঠাকুরও নন। কেবল তাঁর একার নয়, তাঁর সমসাময়িক প্রায় সব আদর্শবাদী সাহিত্যিকদের একই দশা। আদর্শবাদের উপরেই পাঠক-সাধারণের বিরাগ। কিসে তাদের ভালো

সাহিত্যিকরা সেটা নির্দেশ করতে যাবেন কেন? তারা কি শিশু? না সাহিত্যিকরা গুরুমশায়? আর ভালোরই কি কোনো সংজ্ঞা বা মাপকাঠি আছে? পাঠকের রুচি অরুচিকে উপেক্ষা করে লেখক যদি তাঁর রুচি অরুচিকেই ভালো বলে পরিবেশন করেন তবে পাঠকও সে উপাদেয় ব্যঞ্জন উপেক্ষা করতে পারে।

ভালো নয় বলে টলস্টয় তাঁর নিজের যেসব কীর্তিকে খারিজ করেছিলেন এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর সেইসব কাহিনীই তাঁকে অমর করে রেখেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকরাও পরম সমাদরে পাঠ করে 'আনা কারেনিনা'। টলস্টয়ের মতে খারাপ বই। রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্রী। কিন্তু সাহিত্যরসিকদের অধিকাংশের মতে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারো কারো মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের বিচার টলস্টয় বা রলাঁ বা রবীন্দ্রনাথের উপর ছেড়ে দেওয়া ভুল। তাঁরা স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্মনিপুণ। বিচার করবেন সাহিত্যের যাঁরা জহুরী। আর সাহিত্যের যাঁরা তন্নিষ্ঠ পাঠক। সাহিত্যকে সাহিত্য বলেই ভালোবাসে। যে বই বার বার শতবার পড়েও তৃপ্তি হয় না, আবার পড়তে ইচ্ছে করে, সেই বইই ভালো বই। তেমন ভালো বইয়ের তালিকায় টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি' শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে স্বদেশে বিদেশে সব দেশ। অবশ্য কথাসাহিত্যে। নাটকে নয়। সেখানে শেকসপীয়ারের স্থান টলস্টয় পূরণ করতে পারেননি। তেমনি কাব্যেও গ্যেটের স্থান। আধুনিক সাহিত্যের কথাই বলছি। সাহিত্যে বিচারে দেশ বা জনগণ বা নীতির চেয়ে রসের ও রূপের গণনাই প্রধান। রসস্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা টলস্টয় দেশে দেশে যুগে যুগে আদরণীয় ও বরণীয়।

(১৯৭৮)

টলস্টয় ঃ তাঁর ট্র্যাজেডি

বিরাশি বছর বয়সেও টলস্টয় নিয়মিত ব্যায়াম করে শুতে যেতেন। সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে তিনি একখানি বই পড়ছিলেন। ডস্টয়েভস্কির মহান উপন্যাস 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'। এ যুগের যে ক'খানি বই টলস্টয়ের বিচারে আর্ট হিসাবে উত্তীর্ণ তারই একখানি। পড়তে পড়তে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় রাত তিনটে নাগাদ। তাঁর স্ত্রী শুতেন অন্য ঘরে। সে ঘর থেকে স্বামীর ঘরে এসে তিনি করছেন কী, না স্বামীর কাগজপত্র খানাতল্লাসি। টলস্টয় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকেন, জানতে দেন না যে তিনি জেগে আছেন। কাউণ্টেস নিরাশ হয়ে চলে গেলে টলস্টয় শয্যাত্যাগ করেন। কন্যা আলেকজান্দ্রা ছিলেন তাঁর পরম অনুগত ও একমাত্র বিশ্বাসভাজন। তাঁকে ডেকে বলেন, "আমি আজ এই রাত্রেই বেরিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাব স্থির নেই। কোচম্যানকে বল গাড়ি জুততে। কেউ যেন টের

না পায়।"

আলেকজান্দ্রা স্তম্ভিত হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনঃস্থির করেন যে তিনিও তাঁর অথর্ব পিতার পথের সাথী হবেন। ওই অসহায় মানুষটিকে একলা ছেড়ে দেবেন না। পিতামাতার মনোমালিন্য একদিনের নয়। প্রায় ত্রিশ বছরের। যেদিন থেকে টলস্টয় ভোগ ছেড়ে ত্যাগ আরম্ভ করেছেন। তাঁর সেই ত্যাগের সাধনায় পরিবারের আর কারো সহানুভূতি বা সমর্থন ছিল না। ছিল শুধু দুটি কি তিনটি কন্যার। তাদের মধ্যে আলেকজান্দ্রা তখনো অবিবাহিতা। ইতিমধ্যে টলস্টয় তাঁর সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছেন। গ্রন্থস্বত্ব তিনি সর্বসাধারণকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, স্ত্রী তাতে বাধা দেওয়ায় ত্রিশ বছর পূর্বের বইগুলির গ্রন্থস্বত্ব স্ত্রীর জন্যে সংরক্ষিত করে পরবর্তী বয়সের রচনা জনসাধারণের হাতে তুলে দেন। কিন্তু মুশকিল বাধে তাঁর ডায়েরি নিয়ে। শেষ ত্রিশ বছরের ডায়েরির উপর এক্তিয়ার কার? প্রকাশের ব্যবস্থা কে করবেন? ডায়েরিতে যদি এমন কিছু থাকে যা প্রকাশ করলে পরিবারের মুখে কালি পড়বে তাহলে সেটা বর্জন করার অধিকার নিশ্চয়ই পরিবারের। বিশেষত সহধর্মিণীর। কাউণ্টেসের বিশ্বাস তাঁর স্বামীর ডায়েরিতে তাঁকে সক্রেটিসপত্নী জান্তিপের মতো বদমেজাজী ও ঝগড়াটেরূপে আঁকা হয়েছে। ভাবীকালে তাঁকে নিন্দা করবে।

টলস্টয় তাঁর ডায়েরি বিয়ের আগেই তাঁর বাগ্‌দত্তাকে দেখিয়েছিলেন। তাঁর রাহুগ্রস্ত অতীতকে তিনি ঢাকা দিতে চাননি। সোনিয়া ইচ্ছা করলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারতেন। সোনিয়ার বয়স তখন আঠারো। টলস্টয়ের চৌত্রিশ। টলস্টয় যদিও তখনো 'সমর ও শান্তি' লেখেননি তবু সেই বয়সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তা বলে সোনিয়াও কম যান না। সাহিত্যচর্চা তাঁদের বংশেও ছিল। তিনিও একটু আধটু লিখতে পারতেন। টলস্টয়ের ডায়েরি পড়ে তিনি দারুণ আঘাত পেলেন ঠিকই, কিন্তু অমন সুপাত্রকে কি হাতছাড়া করা যায়? সেই বয়সের কেই বা অপাপবিদ্ধ জিতেন্দ্রিয়? সোনিয়া ডায়েরির উত্তরে পাঠিয়ে দেন এক উপন্যাস, রাতারাতি লেখা। তাতে টলস্টয়কে চিত্রিত করেন এক কুৎসিত কিমাকার প্রৌঢ় রূপে। যার চরিত্রও রূপের মতো বিকট। টলস্টয় তো মাথায় হাত দিয়ে বসেন। ভাবেন, আমি খারাপ বলে কি এত খারাপ!

যাক, বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়। সুখেরও হয়। কিন্তু ডায়েরি লেখার অভ্যাস টলস্টয়ের সারাজীবনের অভ্যাস। ডায়েরি থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাস একে একে জন্মায়। ডায়েরি তিনি দেখতেও দিতেন স্ত্রীকে। আপত্তিকর বিশেষ কিছু থাকতও না তাতে। কুকর্ম তো আর করতেন না। কিন্তু যা লিখতেন তা খোলাখুলিই লিখতেন। স্ত্রীর মুখ চেয়ে রেখে ঢেকে লিখতেন না। সেকালের এক সঙ্গীতশিল্পীর প্রতি কাউণ্টেসের আকর্ষণ তিনি সুনজরে দেখেননি। যদিও স্ত্রীর তখন বানপ্রস্থের বয়স। কাউণ্টেস এর জন্যে তাঁকে ক্ষমা করেননি। তিনিও ডায়েরি লিখতেন। দেখতে দিতেন।

কী জানি কেমন করে সম্পর্কটা ভিতরে ভিতরে চিড় খায়। শেষে এমন হলো যে পাশাপাশি ঘরে থেকেও তাঁরাও পরস্পরকে চিঠি লিখতেন। টলস্টয় সম্বোধন করতেন, "বন্ধু"। কাউন্টেস মাঝে মাঝে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর ও তাঁর স্বামীর মাঝখানে অন্য কোনো নারী ছিল না। কিন্তু ছিলেন বিশেষ এক শিষ্য। টলস্টয় যাঁকে তাঁর তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারী মনে করতেন। চার্টকভ তাঁর নাম। কাউন্টেসের মতে লোকটা সুবিধাবাদী ও ভণ্ড। টলস্টয়ের মতে আদর্শবাদী ও সুযোগ্য বাণীবাহক। টলস্টয়ের অবর্তমানে যিনি তাঁর তত্ত্ব বা মতবাদ জগতের কাছে প্রচার করতে পারবেন। শেষবয়সের ডায়েরিখানা তিনি তাঁরই হাতে দিয়ে যেতে চান। তিনিও সে দায়িত্ব নিতে রাজী। কিন্তু কাউন্টেস জেদ ধরেন যে ডায়েরিতে কী আছে না আছে তিনি দেখবেন ও দেখে শুনে অনুমতি দেবেন বা চেপে রাখবেন। তা ছাড়া তাঁর কানে এসেছিল যে টলস্টয় একখানা গুপ্ত উইল করেছেন ও সেটা নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন। সে রাত্রে বোধহয় গুপ্ত উইলের সন্ধানেই কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা হচ্ছিল। গুপ্ত উইলটা সম্ভবত চার্টকভের অনুকূলে। সম্পত্তিঘটিত নয়, পুঁথিপত্রঘটিত। জমিদারি অনেক-দিন আগে থেকেই স্ত্রীর নামে লিখে রাখা হয়েছিল। যেসব গ্রন্থ ১৮৮০ সালের আগে লেখা সেসব গ্রন্থের গ্রন্থস্বত্ব স্ত্রীর অনুকূলে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

সম্পত্তি নিয়েও অশান্তির শেষ ছিল না। জমিদারিটা তখন টলস্টয়ের নয়, তাঁর স্ত্রীর। তিনিই দেখাশুনা করতেন। দায় দায়িত্ব তাঁরই। চাষীরা যদি তাঁর অনুমতি না নিয়ে গাছ কেটে নিয়ে যায় তবে পুলিশ সাহেবকে চিঠি লিখে সেটা বন্ধ করতে চাওয়া কি তাঁর কর্তব্য নয়? তাঁর মতে তিনি ঠিকই করেছিলেন। পুলিশ এসে চাষীদের ধরপাকড় করে। তারা ধরে নেয় এসব টলস্টয়ের ইচ্ছায় ও জ্ঞাতসারে ঘটেছে। মুখে বলা হচ্ছে, আমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস করিনে, আমি সম্পত্তি ত্যাগ করেছি, কিন্তু আচরণ তো পুরোপুরি বিষয়ী লোকেরই মতো। স্ত্রীর বেনামীতে সম্পত্তিরক্ষা। রাস্তার মাঝখানে টলস্টয়ের ঘোড়া থামিয়ে জনাকয়েক চাষী তাঁকে যা তা বলে শাসায়। "এই বুড়ো! তুই এখনো বেঁচে আছিস। মর, মর, তুই জলদি মর। নয়তো আমরাই তোকে খতম করব।" টলস্টয় বিষম আঘাত পান। দেহে নয়, মনে। জমিদারির চাষীদের জন্যে তিনি আজীবন যা কিছু করেছিলেন তার পরিণাম কি এই! আর তাঁর সেই যে মতবাদ, সব অবস্থায় অপ্রতিরোধ, কোনো অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের দ্বারা নয়, সেই মতবাদ কি তাঁর নিজের সহধর্মিণীই লঙ্ঘন করলেন না পুলিশকে ডেকে এনে, ধরপাকড় করিয়ে? চাষীরা তো তাঁকে ভণ্ড সাধু বলে অশ্রদ্ধা করবেই। অমান্যও করবে। পুলিশের সাহায্যে তিনি মান্য হতে চান না। তিনি রাষ্ট্র জিনিসটারই বিরোধী। তিনি পুলিশ বা আদালত বা জেল বা সৈন্যসামন্ত কোনোটাই রাখতে চান না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে ভয়ের নয়, প্রেমের।

ভয়ের শাসনের স্থান নেবে প্রেমের শাসন। কিন্তু তাঁর শিক্ষার সঙ্গে তাঁর আচরণের মিল কোথায়? তাঁর নিজের পরিবারেই তিনি বেখাপ। দেশ বিদেশের লোক তাঁর দর্শন পেতে আসে, তাঁদের চোখে তিনি একজন যুগ-প্রবর্তক। কিন্তু তাঁর আপন জনকেই তিনি বোঝাতে পারেন না যে শোষিত শ্রেণীর শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত অভিজাত জীবন প্রেয় হলেও শ্রেয় নয়। শ্রেয় হচ্ছে শ্রমিকদের শ্রমের অংশ নেওয়া, শ্রমিক হওয়া, কৃষকদের শ্রমের অংশ নেওয়া, কৃষক হওয়া। শ্রেয় হচ্ছে শস্ত্রের দ্বারা অপরকে দাবিয়ে না রাখা, প্রেমের দ্বারা অপরকে বশ করা। শ্রেয় হচ্ছে দেশের শত্রুকেও মিত্রে পরিণত করা, তার মার ফিরিয়ে না দেওয়া, স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করা। এসব টলস্টয়ের মৌলিক বাণী নয়, যীশুর বাণীরই প্রতিধ্বনি। চার্চ এ পথের থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তিনি চান বিচ্যুতির সংশোধন করতে।

স্কুলে পরীক্ষায় সফল হয়ে আমি যেমন টলস্টয়ের 'টোয়েন্টি-থ্রী টেলস' পুরস্কার পেয়েছিলুম তেমনি পেয়েছিলুম বানিয়ানের আরো বিখ্যাত বই 'প্রিলগ্রিমস প্রোগ্রেস'। তার এক জায়গায় ছিল নায়কের উক্তি—

"O ! My dear wife and you, the children of my bowels, I, your dear friend, am in myself undone, by reason of a burden that lieth hard upon me. Moreover, I am for certain informed that this our city will be burned with fire from heaven ; in which fearful overthrow both myself, with these my wife, and you my sweet babes, shall miserably come to ruin, except (the which yet I see not) some way of escape can be found whereby we may be delivered."

পরিবারের প্রতি টলস্টয়ের বক্তব্য তারই অনুরূপ। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে যুদ্ধ আসছে, বিপ্লবও আসছে, ধ্বংস হয়ে যাবে তাঁর পরিবার, তাঁর আত্মীয়স্বজন, তাঁর শ্রেণী, তাঁর সমাজ, তাঁর চার্চ, তাঁর রাজবংশ। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় সময় থাকতে আমূল পরিবর্তন। যে পরিবর্তন স্বতঃপ্রণোদিত। যার সূচনা নিজের জীবনযাত্রায়, স্ত্রীপুত্রকন্যার জীবনযাত্রায়।

ইচ্ছা করলেই তিনি তাঁর আপনার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন, কিন্তু পরিবারের আর সকলের আমূল পরিবর্তন কি এতই সহজ? তা ছাড়া মদ্য মাংস তামাক বর্জন করা এক জিনিস, পত্নীসঙ্গ পরিহার করা আরেক। বাহান্ন বছর বয়সী। পুরুষের নিবৃত্তিমার্গ ছত্রিশ বছর বয়সী যুবতীয় প্রবৃত্তিমার্গের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীতের উপর বিপরীত কি একতরফা চাপানো যায়? তেমন সিদ্ধান্ত কি এককভাবে নেওয়া যায়? চাই দু'পক্ষের সম্মতি। যতদিন সেটা সম্ভব না হয়েছে ততদিন আমূল পরিবর্তন অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে যা হয় তার নাম সেক্স ওয়ার। ক্লাস ওয়ারের চেয়ে কম তীব্র নয়। একপক্ষ ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে অপর-

পক্ষকেও দণ্ধায়। সংসারে সেটা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। অশান্ত সংসার থেকে মুক্তি পেতে হলে সংসারত্যাগই প্রশস্ত।

কিন্তু সেরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে টলস্টয়ের বিবেকের আপত্তি। পতিব্রতা পত্নীকে কোনো কারণেই ত্যাগ করা যায় না। ত্যাগ করলে পরে স্ত্রী যদি পাপ করে তবে স্বামীও হবে তার পাপের জন্যে দায়ী। এই হলো খ্রীস্টীয় শিক্ষা। সত্য ও অহিংসার পথে একলা চলা যায়, কিন্তু ব্রহ্মচর্যের পথে যদি ডাক শুনে কেউ না আসে তবে 'একলা চল রে' বলে এগিয়ে গেলে মন ভেঙে যায়, ঘর ভেঙে যায়, পরে আর জোড়া লাগে না। টলস্টয় এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

গৃহত্যাগের চিন্তা কি কখনো কখনো উদয় হতো না তাঁর মনে? কিন্তু সে বয়সে গৃহত্যাগ মানেই তো দেহত্যাগ। কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজবেন, সেবা করবে কে, শুশ্রূষা করবে কে, এসব প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে উদয় হতো। অথচ পরিবারের আর দশজনের মতো ঐশ্বর্যের মধ্যে অভিজাত মানের জীবন যাপন করে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা আভ্যন্তরিক বিপ্লবের হাত থেকে পরিত্রাণ মেলে না। আর চার বছর বেঁচে থাকলে তিনি যুদ্ধের সাক্ষী হতেন। আরো তিন বছর বেঁচে থাকলে বিপ্লবের সাক্ষী। অমন সুনিয়ন্ত্রিত যাঁর জীবন তিনি যথাস্থানে থেকে পরিবারের সেবাযত্নে ও নিজস্ব চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নব্বই বছর বাঁচলে আশ্চর্যের বিষয় হতো না। সম্ভবত তিনি যুদ্ধের বা বিপ্লবের জীবন্ত সাক্ষী হতে চাননি। তার আগেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করতে অধীর হয়েছিলেন। দৈবাৎ একটা উপলক্ষ জুটে গেল মধ্যরাত্রে তাঁর কাগজপত্রে অন্যায় হস্তক্ষেপে। উটের পিঠে শেষ কুটো। টলস্টয় স্ত্রীকে জাগালেন না, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন না। আর যারা ছিল তারাও রইল ঘুমিয়ে। গৌতমের মতো তাঁর এই গৃহত্যাগেও সহায় ছিল এক বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁর কোচম্যান। তফাতের মধ্যে সহযাত্রী ছিল তাঁর অনুগতা কন্যা আলেকজান্দ্রা।

রেলস্টেশনে পৌঁছে তিনি কোচম্যানকে বিদায় দেন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অপরিচিতদের সঙ্গে অপরিচিতের মতো ভ্রমণ করেন। নিরুদ্দেশ যাত্রা। বোধহয় অসুখ নিয়েই রওনা হয়েছিলেন। পথের মাঝখানে অসুখটা বেড়ে যায়। কেউ কেউ চিনতে পারে যে উনি মহামতি টলস্টয়। কাগজে ওঁর ফোটো কে না দেখেছে? ওঁকে পথের ধারে এক অখ্যাত স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। খবরটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ইয়াসনায়া পোলিয়ানাতেও পৌঁছয়। সেই প্রথম তাঁর স্ত্রী জানতে পান টলস্টয় কোথায়। স্বামী সন্দর্শনে যান। কিন্তু এমনি তাঁর দুর্ভাগ্য যে চিকিৎসকরা কেউ তাঁকে রোগীর ঘরে যেতে দেন না, পাছে রোগী তাঁকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনিও অপরাধী বোধ করে নিরস্ত হন। দিনমান বাইরে ঘোরাঘুরি করে কাটান, রাত্রে রেললাইনের সাইডিং-এ রাখা ট্রেনের একটি কামরায় ঘুমোন। শেষে যখন টলস্টয়ের অজ্ঞান অবস্থা তখন স্ত্রীকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হয়। তিনি হাতে চুমু খেয়ে কানে কানে বলেন,

"ক্ষমা করো"। টলস্টয় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। ঘণ্টা দুই পরে মহাপ্রয়াণ। তাঁর জ্ঞান ফেরে না।

গৃহত্যাগ না করলে টলস্টয় আরো কিছুদিন বাঁচতেন আমার এ অনুমান অযথা নয়। কিন্তু যুদ্ধ দেখবার জন্যে আরো চার বছর ও বিপ্লব দেখবার জন্যে আরো তিন বছর বেঁচে থাকতেন এটা আমার বাসনা মেশানো চিন্তা। তিনি গৃহত্যাগ করেন ১৯১০ সালের ২৪শে অক্টোবর, দেহত্যাগ করেন ৭ই নভেম্বর। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত গান্ধীজী তাঁর যে পত্র পান সেটি তাঁর গৃহত্যাগের পূর্বে লেখা। তাতেই তিনি তাঁর মৃত্যুর সান্নিধ্যের কথা বলেছিলেন।

"The longer I live, and especially now, when I feel the nearness of death, I want to tell others what I feel so particularly clearly and what to my mind is of great importance··· namely that which is called 'Passive Resistance' but which is in reality nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretation···Therefore, your activity in the Transvaal, as it seems to us, at this end of the world, is the most essential work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

একহিসাবে এই চিঠিখানিই তাঁর শেষ উইল। যাঁর অনুকূলে সম্পাদিত তিনি প্রকৃতই উত্তরাধিকারী। তিনি চার্চ কভ নন, তিনি গান্ধী। কাউণ্টেস তাঁর নাম পর্যন্ত জানতেন না। টলস্টয়ের শেষজীবনের ব্রত গান্ধীর দ্বারাই উদ্‌যাপিত হয়। গান্ধীজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্যাসিভ রেজিস্টান্স হয় সত্যাগ্রহ। সেক্ষেত্রেও তার মূল প্রেরণা প্রেম। সত্যাগ্রহী তার প্রতিপক্ষকে ভালোবাসা দিয়ে আপনার করতে চায়। তবে সে ভালোবাসা দ্বান্দ্বিক ভালোবাসা। নির্দ্বন্দ্ব নয়। তাই তাতে দুঃখ আছে। মৃত্যুও যে নেই তা নয়। অশুভ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাঝখানেই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়।

টলস্টয়ের গৃহত্যাগকে তাঁর দেহত্যাগের হেতু ধরে নিয়ে দোষটা গিয়ে পড়ে তাঁর দুঃখিনী সহধর্মিণীর উপরে। সেটা কিন্তু কাউণ্টেসের প্রতি অবিচার। সোনিয়া ছিলেন সকল প্রকারেই পতিব্রতা, কিন্তু কেবল একটি অর্থে নয়। পতির ব্রত তাঁর নিজের ব্রত ছিল না। তিনি বুঝতেই পারতেন না অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে সম্পত্তি বিসর্জন কেন একান্ত জরুরি। গাছ লাগাবেন জমিদার, গাছ কেটে নিয়ে যাবে প্রজা, এটা কি ন্যায় না অন্যায়? বই লিখবেন গ্রন্থকার, মুনাফা লুটবে যে-কোনো প্রকাশক, এটা কি ন্যায় না অন্যায়? জমিদার তাহলে বাঁচবেন কি খেয়ে? গ্রন্থকারই বা খাবেন কী?

ভদ্রমহিলাকে বোঝানো শক্ত যে জমিদারি চাল বজায় রাখতে হলে শোষণের আশ্রয় নিতে হয় আর শোষণ অব্যাহত রাখতে হলে ভায়োলেন্স অপরিহার্য।

তার মানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব। শ্রেণীদ্বন্দ্বে জমিদারের জয় তখনি সুনিশ্চিত যখন রাষ্ট্র তার মুঠোর মধ্যে। তার মানে রাষ্ট্র যখন স্বৈরাচারী সম্রাটের শাসনাধীন। এ ব্যবস্থা দিকে দিকে যুদ্ধ ডেকে এনেছে ও আনতে যাচ্ছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিপ্লব। একথা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সত্য প্রকাশ করাই সাহিত্যিকদের কর্তব্য! আর তিনি যদি মনে করেন যে এটা তাঁর জীবনব্রত তবে এটাকে জীবিকার পর্যায়ে নামিয়ে আনলে ব্রতসিদ্ধি হয় না, হয় কিঞ্চিৎ অর্থলাভ। শেষবয়সে টলস্টয়ের জীবনব্রত বা মিশন ছিল সত্য প্রকাশ তথা সত্য প্রচার। তিনি একপ্রকার মিশনারি। মিশনারিরা কি যীশুর কথামৃত বিক্রী করে বেড়ান? করলে ক'জন কিনবে ও পড়বে? তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে খুব সাদাসিধেভাবে থাকতে হবে। অভিজাতদের মতো নয়।

এককালে লেখার জন্যে সব চেয়ে চড়া দাম হাঁকতেন টলস্টয় ও টুর্গেনিভ। দুই জমিদার। এ নিয়ে ক্ষোভ ছিল তাঁদের সমকক্ষ ডস্টয়েভস্কির। তিনি লিখেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে 'আনা কারেনিনা' প্রসঙ্গে—"কাল পড়লুম (তুমি বোধহয় আগেই শুনেছ) যে, লিও টলস্টয় তাঁর উপন্যাস, চল্লিশ কিস্তি, বিক্রী করেছেন 'রাশিয়ান মেসেনজারকে'। প্রকাশ শুরু হবে আগামী জানুয়ারি থেকে। দাম কিস্তি পিছু পাঁচশো রুবল। অর্থাৎ মোট বিশ হাজার রুবল। আমাকে তো ওরা আড়াইশো রুবল দিতেও ইতস্তত করেছিল। হুঁ, ওরা আমাকে হীনমূল্য মনে করে, লেখাই আমার জীবনোপায় কিনা।" এ অভিযোগ যুক্তিযুক্ত। জমিদার হলে তাঁরও দরাদরি করার জোর বাড়ত। তবে অমন লেখা জমিদারের হাত দিয়ে হতো কি না সন্দেহ।

'আনা কারেনিনা'র পর আর্ট সম্বন্ধে টলস্টয়ের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। নিজের উপরেই তিনি বীতশ্রদ্ধ হন এই বলে যে তিনি টাকার জন্যে লিখছেন। ডস্টয়েভস্কির উপরেও তাঁর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু পরে তিনি হিসাব করে দেখেন যে প্রকৃত আর্টপদবাচ্য রচনা যে কয়টি উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ডস্টয়েভস্কির কোনো কোনো লেখা। যেমন, 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'। গৃহত্যাগের প্রাক্‌কালে সেই বইখানিই হাতে নিয়ে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। পাঠ বোধহয় অসমাপ্ত থেকে যায়। কিন্তু সেই তাঁর জীবনের শেষ অধ্যয়ন।

কাউণ্টেস অনেকদিন আগেই লক্ষ করেছিলেন যে টলস্টয় আর এ জগতের লোক নন। তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে ও তাঁর চেহারায় একটা অতিমর্ত্য আভা ফুটে উঠছে। তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলির সুর কী করুণ! কোথাও অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। দেশ বিদেশের বড়ো বড়ো মাথা যাঁর কাছে নত হয়, যাঁর কীর্তি মানবজাতিরও কীর্তি, যাঁর উচ্চতা মানবাত্মার উচ্চতা সেই টলস্টয় ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা ও আত্মনিগ্রহ করতে করতে তাঁর সহজাত অহঙ্কারকে জয় করেছেন। জীবনে যেসব পাপকর্ম করেছেন তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর তপস্যা প্রায় সমাপ্ত। সে তপস্যা রেজারেক-

শনের। ঐ নামের উপন্যাসে যার তাৎপর্য নিহিত।

সহজভাবেই তাঁর প্রয়াণ ঘটত, আরো মাসখানেক বা বছরখানেক বাদে, যদি না তাঁর স্ত্রীর অনধিকার হস্তক্ষেপ তাঁকে গৃহত্যাগের প্রবর্তনা দিত। কাউণ্টেসকে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনার একটা সুযোগও দিলেন না। বিদায় তো নিলেনই না। গোপন রাখলেন তাঁর গতিবিধি। কাজটা কি নীতিসম্মত হলো? তাঁর মতো সত্যসন্ধ পুরুষের পক্ষে সেটাও কি তাঁর স্ত্রীর গোপন প্রবেশের চেয়ে কম গর্হিত? কিন্তু এর থেকে প্রমাণ হয় যে টলস্টয়ও মানুষ। তাঁর আচরণও মানুষেরই মতো। তাঁর ট্র্যাজেডি হিউমান। নাটকীয়ভাবে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগও নাটকীয়।

টলস্টয়ের বিয়োগে যে বিশ্বব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস ওঠে তার কোনো নজীর নেই। পরবর্তীকালে তার একমাত্র তুলনা মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবে বিশ্বময় শোকাবেগ। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" টলস্টয় রুশভাষায় লিখলেও সব দেশের জন্যে লিখেছেন। স্বকালের কথা লিখলেও সব কালের জন্যে লিখেছেন। কতক মানুষের কাহিনী লিখলেও সব মানুষের জন্যে লিখেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের কাছে পর নয়, বিদেশী হলেও আমাদের কাছে আপন। তাদের সুখদুঃখ আমাদেরও সুখদুঃখ। পুরাতন হলেও তারা কালজয়ী।

তবে যুদ্ধ আর বিপ্লব দুটোই ঘটে যাবার পরে টলস্টয়ের মতবাদের আর সে প্রাসঙ্গিকতা নেই, যেটা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের ও প্রথম সমাজবিপ্লবের পূর্বে। সে মতবাদের অনুসরণ যদি কেউ জীবনে করতে চান করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তার অনুসরণ তেমন সৃষ্টিশীল হবে না। তাঁর নিজের সার্থক সৃষ্টিও তাঁর আর্ট বিষয়ক তত্ত্ব অনুসরণ করেছে বলেই সার্থক হয়েছে তা নয়। হয়েছে তাঁর সত্য দৃষ্টি বা রসানুভূতির জন্যেই। সাংসারিক অর্থে সফল হয়েছে কি না অবান্তর।

(১৯৭৮)

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা

দু'বছর আগে কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে পাই ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শীর্ষে 'রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা'। 'স্টেটসম্যান' সেটি উদ্ধার করে লণ্ডন 'টাইমস' থেকে। লেখাটি 'টাইমস' পত্রিকার সাতটি কলম জুড়ে ছিল। আর বিশ্বময় প্রচারিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পুরোটা পুনঃপ্রকাশিত হয়নি। যেটুকু বেরিয়েছে সেটুকু ভগ্নাংশ।

বুদ্ধিজীবী বলতে টলস্টয় যাঁদের বোঝেন তাঁরা হলেন অভিজাত, বণিক,

রাজকর্মচারী, ডাক্তার, এন্‌জিনীয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিল্পী, ছাত্র, উকীল। এঁদের তিনি তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, মতবাদের দিক থেকে যাঁরা লিবারল। দ্বিতীয়ত, যাঁরা সোশিয়াল ডেমোক্রাট। তৃতীয়ত, যাঁরা বিপ্লববাদী। লিবারলদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য দেশের অধিকাংশ লোক চাষী, অথচ সেই চাষীদের সঙ্গেই তাঁদের সম্পর্ক কেটে গেছে। তাঁদের দৃষ্টি কেবল সরকারের অত্যাচার অনাচারের উপরেই নিবদ্ধ। সরকার হাজার হাজার লোককে জেলে কিংবা নির্বাসনে পাঠাচ্ছেন, বিনা বিচারে আটক করছেন, বই কাগজ ছাপতে দিচ্ছেন না, ছাপলে বাজেয়াপ্ত করছেন, সভাসমিতি করতে দিচ্ছেন না, ইউনিয়ন গড়তে দিচ্ছেন না, এইসব নিয়ে লিবারলরা সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন, কিন্তু চাষীদের তাতে কী এল গেল ?

আর সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা চান নির্বাচন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠন ও আইন প্রণয়ন, যাতে লোকের মুক্তি তথা কল্যাণ হয়। কিন্তু চাষীদের তাতে লাভটা কী হবে ? ওরাই তো জনগণের অধিকাংশ।

আর বিপ্লববাদীরা চান সরাসরি ক্ষমতা দখল করতে। ক্ষমতা দখল করে লোকের কল্যাণ করতে, তাদের মুক্তি দিতে। কিন্তু চাষীদের তাতে কতটুকু লাভ ? তারা কি জমির মালিক হবে ?

টলস্টয়ের নিজের সূত্র হচ্ছে প্রত্যেক চাষীরই আপনার বলতে একখণ্ড জমি থাকা চাই। যার উপর তার নিজের স্বত্ব। আর কারো নয়। সরকারেরও নয়। যতক্ষণ না এই মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই কিছু হবে না।

টলস্টয়ের এই সূত্র কেবল রাশিয়ার জন্যে প্রচারিত হয়নি, হয়েছিল পৃথিবীর সব দেশের জন্যে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মনে দাগ রেখে যায়নি কোনোখানেই। একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে গান্ধীজীকে। কিন্তু তিনিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কারুশিল্প নিয়ে যে পরিমাণ ভাবিত ছিলেন সে পরিমাণ জমির উপর চাষীদের স্বত্ব নিয়ে নয়। তাঁর পরে বিনোবাজী ভূদানের কর্মোদ্যোগ আরম্ভ করে বহুদূর অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে সব জমি গোপালের, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নয়। না ভূস্বামীর, না কৃষিজীবীর। এর মানে জমির উপর চাষীর স্বত্ব নেই। গ্রাম সভাই স্থির করবে কে কোন্ জমি চাষ করবে, কার শ্রমের কী পারিশ্রমিক বা কার সার বীজ ইত্যাদি নিয়োগের দরুন কী উপস্বত্ব। এককথায় বিনোবাজীও জমির বেলা প্রাইভেট প্রপার্টি মানেন না। অথচ রাষ্ট্রকর্তৃত্বও মানেন না।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় মার্কসবাদীদের হাতে ক্ষমতা এসেছে। তাঁরা সব জমি রাষ্ট্রের দখলে এনেছেন। রাষ্ট্রই একচ্ছত্র ও একমাত্র মালিক। চাষী যে জমিতে চাষ করে সে জমি তার নিজস্ব নয়। দয়া করে তাকে তার বাস্তুভিটা ও সংলগ্ন একটুকরো জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সে তরিতরকারি লাগায়। এ ছাড়া সমষ্টিগতভাবে গণ খামারে কাজ করতে পারে। কিংবা রাষ্ট্রের খাস খামারে।

কাজ অনুসারে মজুরি বা অংশীদারি স্থির করা হয়। "জমিটা আমার, এখানে আমি ইচ্ছামতো ফসল উৎপাদন করব ও ফসল বিক্রী করে ভোগ্যপণ্য কিনব", একথা বলার অধিকার সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষিজীবীদের নেই। চীনের খবর আমি আরো কম রাখি। যতদূর বুঝি চীনের মার্কসবাদীরা চাষীদের গ্রামে আটক রাখতেই চান, শহরে টেনে আনতে নারাজ। সুতরাং তাঁদের নীতি চাষীদের মন বুঝে কাজ করা। সোভিয়েট রাশিয়া যেমন শ্রমিকদের রাষ্ট্র গণচীন তেমনি কৃষকদের রাষ্ট্র। তবে ইদানীং সোভিয়েটের নতুন সংবিধানে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের সূত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। বোধহয় এই কারণে যে সোভিয়েট এতকাল পরেও খাদ্যে স্বয়ংভর হতে পারেনি, যদিও তার জমির পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী বই কম নয়। চাষীকে তার প্রাপ্য না দিলে যা হয় তাই হয়েছে ! জমিদার ও কুলাকদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে ক্ষুদে চাষীদেরও স্বত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। যার স্বত্ব নেই সে কেন ঝড় বৃষ্টি বরফ অগ্রাহ্য করে ক্ষেতে নামবে ? সেও দশটা পাঁচটা আপিস করবে বা কারখানায় খাটবে।

সব দেশের ও সব মতবাদের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি বড়ো বড়ো ইণ্ডাস্ট্রি বা ফার্মের উপরেই। ইউনিটগুলি যতো বড়ো তত ভালো। বড়ো ইউনিট নাকি বেশী ইকনমিক। বৃহত্তমসংখ্যকের মহত্তম কল্যাণ এঁদের কাছে ধর্তব্য নয়। এঁদের চিন্তা ক্যাপিটালিস্ট দেশে ধনিক শ্রেণীর তথা শ্রমিক শ্রেণীর কিসে লাভ হয়। আর কমিউনিস্ট দেশে শ্রমিক শ্রেণীর কিসে লাভ হয়। এককভাবে ধনিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখনো কৃষিজীবীদের। ব্যতিক্রম কেবল গুটি দশেক পাশ্চাত্ত্য দেশ ও জাপান। এসব দেশে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ হয়, তাই চাষীর সংখ্যা কম হলেও চলে। খাদ্যের অভাব হলে এরা গরিব দেশগুলির কাছ থেকে সস্তায় কিনে আনে বা সেসব দেশ যদি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে এটা নামমাত্র দামে ফাঁকি দিয়েও পাওয়া যায়।

টলস্টয় এই দুই বিকল্পের কোনোটাই পছন্দ করতেন না। তাঁর জীবন কেটেছিল চাষীদের সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলে। শোষকশ্রেণীর একজন বলে তাঁর অন্তরে যে গ্লানি ছিল সেটা তিনি একমুহূর্তের জন্যেও ভোলেননি। তাই তাঁর বাণী ছিল, চাষীকে তার জমির অধিকার দাও। মেহনৎ যার মালিকানা তার। রাষ্ট্র এখানে মালিক হয়ে বসতে চায় কেন ? জমিদারদের চেয়ে রাষ্ট্র এমন কী নিঃস্বার্থ ? অধিকাংশ নাগরিকদের স্বার্থই যদি রাষ্ট্রের স্বার্থ হয় তবে কৃষকদের ভোটেই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে। তা কি কোথাও হয় ? যতদিন না তা হয়েছে ততদিন কৃষিজীবীরা বঞ্চিত থাকবেই। খাদ্য উৎপাদনেও ঘাটতি পড়বে। আজ দুনিয়া জুড়ে খাদ্যের ঘাটতি। এর যদি কোনো স্থায়ী প্রতিকার থাকে তবে তা ভূমির সদ্ব্যবহারে। ভূমিই আসল। আর তার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হচ্ছে সেই যে বারোমাস সেখানে বাস করে ও চাষ করে। সামাজিক ন্যায় হচ্ছে এই মূল সত্যের স্বীকৃতি ও এরই আলোকে নীতি নির্ণয়।

কিন্তু একজন মানুষ তো কেবল কৃষক নয়, সে নাগরিকও। একজন নাগরিক হিসাবে সেও চায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, যারা তার উপরে কর ধার্য করে তাদের কাছে জবাবদিহি দাবী করার স্বাধীনতা, যারা তাকে ধরে নিয়ে যুদ্ধে পাঠায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্বাধীনতা। এখন এই নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা তাঁরা কি লিবারল বলে সকরুণ অবজ্ঞার পাত্র? নাগরিকহিসাবে কৃষকরাও কি তাঁদের কাছে ঋণী নয়? লিবারলরা সচেষ্ট না হলে আরো বেশী লোকের ফাঁসী হতো, নির্বাসন হতো, ভ্রান্ত বিচারে দণ্ড হতো, কারাবাস হতো। দেশে লিবারলরা সক্রিয় না হলে কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস পেতো না। স্বাধীন চিন্তার নামগন্ধ থাকত না। স্বয়ং টলস্টয়কেই লিখতে দেওয়া হতো না। রুশ সাহিত্য কোথায় ছিল আর কোথায় গিয়ে পৌঁছল এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় লিবারলদের শতবর্ষব্যাপী প্রয়াসকে। বিপ্লবের পর লিবারলরাও নেই, তাদের সে প্রয়াসও নেই। রুশ সাহিত্য কি উঠেছে না পড়েছে?

সোশিয়াল ডেমোক্রাট তাঁদের বলা হতো যাঁরা ডেমোক্রাসীর সমাজতন্ত্রকে ঢালতে চেয়েছিলেন। পার্লামেণ্টারি উপায়ে সামাজিক আধারে অন্যায় দূর করতে পণ করেছিলেন। হয়তো এটা তৎকালীন অবস্থায় অবাস্তব। কিন্তু যেটা অবাস্তব সেটা কি অবজ্ঞেয়? এই আদর্শ মেনে নিয়ে সুইডেন কিছুটা সাফল্য দেখিয়েছে। ইংলণ্ডও কতকটা সফল হয়েছে। আরো অনেক দেশ এদের অনুসরণ করছে বা করতে চায়। এতেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব সব চেয়ে কম। মানুষ মানুষকে খুন করবার জন্যে হাতিয়ার শানায় না। একটা শ্রেণী আর একটা শ্রেণীকে অক্ষরে অক্ষরে নির্বংশ করতে চায় না। পরিবর্তন যা হয় তা বিলম্বিত, কিন্তু বিলম্বিত বলে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কত লোক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচে, কত লোক কারাগারের কবল থেকে রক্ষা পায়, কত লোক নির্বাসনের দুঃখ থেকে রেহাই পায়, কত লোক কেঁচোর মতো ভয়ে ভয়ে বাঁচার দুর্গতি থেকে নিস্তার পায়। সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের অবজ্ঞা না করে অভিনন্দন করা উচিত। ইতিহাস তো এই শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। বাহাত্তর বছর তার কাছে এমন কিছু বেশী সময় নয়।

তারপর বিপ্লববাদীদের কথা। তাঁদের প্রাইভেট প্রপার্টিতে বা পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে বিশ্বাস নেই। কোটি কোটি মানুষের বিনাশ তাঁদের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো পূর্ব হতে অবধারিত। ওটা ছিল বিধাতার দ্বারা অবধারিত, আর এটা নাকি ইতিহাসের দ্বারা অবধারিত। ধর্মবিশ্বাসের মতো প্রবল ও গভীর এই মতবাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এঁরা এঁদের বিশ্বাসের জোরে ও তরবারির জোরে পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ অধিকার করেছেন। কাজও দেখিয়েছেন এত বেশী যে অবজ্ঞা না করে অভিনন্দনই করতে হয়। অন্যেরা যদি সময় থাকতে আরো বেশী বা সমান কাজ না দেখাতে পারেন তাহলে ভারতও রুশ চীনের পন্থা অনুসরণ করতে পারে। তখন আর নালিশ করা

চলবে না কয় কোটি মারা গেল বা গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে বেগার খাটল। কেঁচো হলো আরো কয় কোটি। সাহিত্য বা শিল্প কোনখানে থেমে গেল। নষ্ট করবার মতো সময় অন্যদের হাতে নেই। জনগণ অধীর।

(১৯৭৭)

আনা কারেনিনা

'আনা কারেনিনা' প্রকাশের পর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। শতবর্ষের আলোয় ওর নতুন একটা সমীক্ষার প্রয়োজন। শেষজীবনে টলস্টয় তাঁর নিজের সৃষ্টির উপর বিরূপ হয়েছিলেন। আর্টের যে সীমানা তিনি বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন তা মহৎ ভিন্ন আর কাউকে স্বীকৃতি দেবে না। 'আনা কারেনিনা'র বিষয়বস্তু তাঁর মতে মহৎ নয়। শুধু তাঁর মতে কেন, অনেকেরই মতে মহৎ নয়। কিন্তু ইলিয়াডের বিষয়বস্তু যদি হয় হেলেন ও প্যারিসের নিষিদ্ধ প্রেম তাহলে সেই মহাকাব্যকেই বা মহৎ কাব্য বলব কেন? তাতে যুদ্ধের বর্ণনা আছে বলে? টলস্টয় তো শেষজীবনে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'আনা কারেনিনা'র শেষখণ্ডে তাঁর যুদ্ধবিরোধী জীবনদর্শনের প্রভাব পড়েছে।

টলস্টয় স্বয়ং খাটো করতে চাইলেও আমি তাঁর 'আনা কারেনিনা'কে কখনো খাটো করতে রাজী হইনি। প্রথম বয়স থেকেই আমি 'আনা কারেনিনা'র অনুরাগী। নভেল যদি লিখতেই হয় তো ওরই মতো নভেল। তাতে জীবনের সব দিক আছে। নীতিনিপুণের মতো তার কোনো অংশ বাদ দেওয়া উচিত নয়। শিল্পবস্তু হিসাবেও আমি ওর মূল্যবত্তায় বিশ্বাস করি। গ্রেট নভেল বলতে যা বোঝায় 'আনা কারেনিনা' নিঃসন্দেহে তার পর্যায়ভুক্ত। আর্টের রাজ্যে যা গ্রেট তা হয়তো মরালিটির রাজ্যে গ্রেট নয়। মরালিটির রাজ্যে যা গ্রেট তা হয়তো আর্টের রাজ্যে গ্রেট নয়। যে চিত্র মরাল টেস্টে উত্তীর্ণ হবে না সে এস্থেটিক টেস্টে হতেও পারে। সেইরকমই হয়ে এসেছে এতকাল। চিত্রের মতো কাব্য বা নাটক বা উপন্যাসও আর্ট। তাকেও এস্থেটিক টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হয়। তা যদি সে হয় তবে মরাল টেস্ট তার পরের কথা। এইটেই ছিল আমার প্রথম বয়সের মত। পরে আমিও লিখতে লিখতে উপলব্ধি করেছি যে আর্টের সঙ্গে মরালিটির সম্বন্ধ অবান্তর নয়। প্রচ্ছন্নভাবে নৈতিক ভালোমন্দের নিষ্কর্ষও থাকে। তবে নির্জলা ভালো বা নির্জলা মন্দ বলে কিছুই নেই। শাদা ও কালোর মাঝামাঝি আরো অনেকগুলো রং আছে। ঈশ্বর ও শয়তানের বৈপরীত্য মানুষের বেলায় খাটে না। সত্যিকার মানুষ এত জটিল যে তাকে সরল করে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যেমন জীবনে তেমনি আর্টে। 'আনা কারেনিনা' যে ব্যর্থ হয়নি তার কারণ সত্যিকার সরল মানুষকে টলস্টয় সরল করতে যাননি। তত্ত্ব এখানে সত্যকে লোহার ছাঁচে ঢালাই করেনি।

'আনা কারেনিনা' যখন প্রথম পড়ি তখন আমার বয়স কত ? আঠারো উনিশ কুড়ি। বইখানা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বলেই আগ্রহ এত। আদ্যোপান্ত পড়ার মতো ধৈর্য নেই, অর্ধেকের উপর তো লেভিনের অর্থাৎ টলস্টয়ের জমিদারি দর্পণ ও জীবনজিজ্ঞাসা। ওসব আমি লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যাই। আমার একমাত্র আকর্ষণ নিষিদ্ধ প্রেমে ও প্রেমিক প্রেমিকার মিলনে বিরহ। পরিণাম যে লেভিন ও কিটির সমাজসম্মত প্রেমের বেলা হবে সুখের এটা তো ভালোই, কিন্তু আনা ও ভ্রনস্কির অসামাজিক প্রেমের বেলা হবে পাপের ও পাপের ফলে পতনের ও পতনের ফলে মৃত্যুর এতে আমার অন্তরের আপত্তি ছিল। এটা তো হোমারের মতো হলো না, হলো না খ্রীস্টপূর্ব গ্রীক জীবনবোধের বা মূল্যবোধের মতো। পাপ থেকে পতন, পতন থেকে মৃত্যু হেলেনের বেলা ব্যবস্থা নয়। প্রেমিকের সঙ্গে কুলত্যাগিনী হেলেন পারিসের সঙ্গে পতিপত্নীরূপে আনন্দেই দশ বছর বাস করেছিল। পরে হেলেনই মেনেলাউসের ঘরে সম্মানের সঙ্গে ফিরে আসে ও পতিপত্নীরূপে বাস করে। সমাজবিধানে বা নীতিবোধে বাধে না। খ্রীস্টীয় ক্ষমাধর্মেরও প্রয়োজন হয় না। হেলেন হরণের জন্যে ট্রয় অভিযানেরই প্রয়োজন ছিল। যেহেতু গ্রীকদের সম্মান নষ্ট হয়েছিল। নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার করতে হলে যুদ্ধ করে হেলেনকে পুনরুদ্ধার করতে হয়। এর মধ্যে পাপ কোথায়, পতনই বা কার ? পতন যদি কারো হয়ে থাকে তবে তা ট্রোজানদের। মৃত্যুও তাদেরই। কিন্তু হেলেনকে তা বলে কেউ বলবে না 'ফলন উওম্যান' বা 'পতিতা নারী'। বস্তুত 'পতিতা' কথাটিও ইংরেজী 'ফলন নারী'র অনুবাদ। এখন ওটি গণিকার সমার্থক হয়েছে। গ্রীকরা বা প্রাচীন ভারতীয়রা অমন কথা ভাবতেই পারতেন না। ওটা ইহুদী-খ্রীস্টান ধারণা। টলস্টয় ওটা গ্রীক রোমান ক্লাসিক ঐতিহ্য সূত্রে পাননি, পেয়েছেন ইহুদী খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যসূত্রে। ব্যভিচার সেখানে হত্যার মতো অপরাধ। দশবিধ অনুজ্ঞার অন্যতম 'ব্যভিচার করিয়ো না'। নারীপক্ষে অতি কঠোর শাস্তি। সকলের দ্বারা লোষ্ট্রাঘাতে নিধন। পুরুষের পক্ষে অতটা কঠোর নয়। কারো কারো বেলা আদৌ কঠোর নয়। রাজা ডেভিড তো অপরের ক্ষেত্রে পুত্রলাভ করেন। ইতিহাসে রাজা সলোমনের স্থান কত উচ্চে ! সেই উত্থানের পেছনে ছিল পতন, কিন্তু তার জন্যে শাস্তির কথা কেউ কখনো বলেনি। সাধারণের বেলায়ই শাস্তি। বিশেষত নারীর বেলায়। টলস্টয় এই প্রাচীন ধারণার উত্তরসূরী।

খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তনের পরও তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল অভিজাত সমাজের পূর্বতন নরনারীর প্রেমনীতি। নাইট ও লেডীদের হৃদয় বিবাহের দ্বারা শাসিত ছিল না। রাজা আর্থারের রানী গুইনেভেয়ার ছিলেন নাইট ল্যান্সলটের প্রেমাসক্ত। সে প্রেম নিতান্ত অশরীরী ছিল না। 'কোর্টলি লাভ' বা রাজসভাসম্মত প্রেম যাকে বলা হতো সেটা ছিল উত্তমের প্রতি অধমের পূজা নিবেদন। অন্তত প্রকাশ্যে কামগন্ধহীন। তার থেকে এসেছে অসংখ্য রোমান্স ও ত্রুবাদুর গীতি। এদেশে যেমন কানু বিনে গীত নেই

ইউরোপে তেমনি 'কোর্টলি লাভ' বিনে মধ্যযুগীয় কাব্য ও রোমান্স নেই। সাধুরা পছন্দ করতেন না, কিন্তু জনসাধারণ ভালোবাসত। সাধুরা নিয়ে এলেন এর মধ্যে পাপবোধ। পাপের পরিণাম মৃত্যু। যেখানে মৃত্যু নয় সেখানে সমাজের বাইরে পতিত হয়ে থাকা। সেটা মৃত্যুর চেয়েও অসহনীয়। আত্মঘাতিনী না হলে টলস্টয়ের আনা কারেনিনাকেও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকতে হতো। বড়লোকের রক্ষিতার যে পরিমাণ মর্যাদা তার বেশী সে পেত না। ভ্রনস্কির দ্বারা পরিত্যক্ত হলে সে যা হতো তাকে বলে ফরাসীভাষায় 'দেমি মঁদ'। আমরা বলি "হাফ গেরস্ত"। অপেরা বা থিয়েটারের অভিনেত্রীদের মর্যাদা আগে যেরকম ছিল। দিনকাল বদলেছে। তাঁরাও জাতে উঠেছেন। একশো বছর পরে লেখা হলে 'আনা কারেনিনা'র পরিণাম অবশ্যম্ভাবীরূপে ট্র্যাজিক হতো না। এমন কি সমসাময়িক ফ্রান্সে বা ইংলণ্ডে লেখা হলেও কাহিনীর শেষটা অতখানি মর্মান্তিক না হতেও পারত। গলসওয়ার্দি যে ওটা মেনে নিতে পারলেন না তার কারণ তাঁর অভিজ্ঞতা ভিকটোরিয় ভণ্ডামির হলেও পশ্চিম ইউরোপীয় উদারতার। টলস্টয় দুটোর কোনোটার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে প্রাণে খ্রীস্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী। তার থেকে করুণা। আবার তারই থেকে মরণান্ত সমাধান। মাঝখানে অবশ্য আরো একটা বিকল্প ছিল। আনা অনুতাপ করে স্বামীর সংসারে ফিরে যেত। সেই ভরসায় স্বামীস্ত্রীর ডিভোর্স ঘটানো হয়নি। কিন্তু তাতে রসভঙ্গ হতো। টলস্টয় নীতিনিপুণ হলেও আর্টিস্ট। আর্টের দিক থেকে স্বামীর সঙ্গে মিলন অসম্ভব। আবার নীতির দিক থেকে প্রেমিকের সঙ্গে বিবাহ অবাঞ্ছনীয়। তাহলে তো নারীর পদস্খলনকে পুরস্কৃত করা হলো। সেইসঙ্গে পুরুষের পদস্খলনকেও।

'সমর ও শান্তি' সারা হয় ১৮৬৯ সালে। পরের বছর টলস্টয়ের পত্নী তাঁর দিদিকে লেখেন এবার তাঁর স্বামী লিখতে চান একটি অভিজাতশ্রেণীর বিবাহিতা মহিলার পদস্খলনের কাহিনী। তাঁর সমস্যা হবে তাঁর কাহিনীর নায়িকাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা, যাতে তাকে গিলটি মনে না করে প্যাথেটিক মনে করা হয়। দোষী মনে না করে করুণ মনে করা হয়। বই লেখা শুরু হয় ১৮৭৩ সালে। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৭২ সালে ঘটে যায় এক সত্যিকার দুর্ঘটনা। রেল লাইনে কাটা পড়ে মারা যান এক ভদ্রমহিলা, তাঁর নামও আনা। প্রতিবেশী এক বিপত্নীক জমিদারের উপপত্নী। জমিদার তাঁর সন্তানদের গভর্নেসকে বিবাহ করতে চান শুনে আনা আত্মহত্যা করেন। টলস্টয়কে এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সম্ভবত এর থেকেই তিনি পেয়ে যান তাঁর নায়িকার নাম ও পরিণাম। যা শুধুমাত্র করুণ হতে পারত তাই হলো ট্র্যাজিক। ট্র্যাজেডীকে অবশ্যম্ভাবী করতে হলে তার কারণ দর্শাতে হয়। কারণ থেকে কার্য ঘটে এটা যেমন সত্য তেমনি সত্য কার্যও কারণকে চুম্বকের মতো নিয়তির অভিমুখে টানে। আমার অনুমান টলস্টয়ের আনার ভবিতব্যই তার অতীতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কাহিনীকে

সত্যঘটনামূলক করতে গিয়ে মূল কল্পনাকে তদানুযায়ী করতে হয়েছে। ওরকম একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে কার্ষ হয়তো কারণ থেকে নিম্নমুখে বইত, কার্ষ থেকে কারণ উজান বইত না। টলস্টয় আনাকে নিয়ে কী করবেন তা জেনে নিয়ে বই লিখতে আরম্ভ করেন। কিছুদূর এগোতে না এগোতেই এক রেল দুর্ঘটনা। একটি লোক চাকার তলায় পড়ে মারা যায়। স্বেচ্ছায় কিংবা নেশার ঘোরে কিংবা কুয়াশায়। ভ্রনস্কির সঙ্গে আনার প্রথম সাক্ষাতের পরক্ষণে ওটা কি শুভদৃষ্টি না অশুভদৃষ্টি ?

আনার বিয়ে হয়েছিল যাঁর সঙ্গে তিনি তার থেকে বয়সে বিশ বছরের বড়ো, সুদক্ষ ও প্রবীণ রাজকর্মচারী। দেশের সবাই তাঁকে একডাকে চেনে। বিদেশেও তাঁর নামডাক। এমন মানুষের সময় কোথায় যে স্ত্রীকে সঙ্গ দেবেন ? বিয়ের আগে ভালোবাসা হয়নি, বিয়ের পরেও না। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ নিতান্তই কর্তব্যের সম্বন্ধ। দু'জনেই দু'জনের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। ভালোবাসা আনার জীবনে যখন এল তখন সে শুধু একজন বিবাহিতা মহিলা নয়, একটি পুত্রের জননী। তার ছেলের বয়স আট বছর। তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা তার ছেলের উপরেই কেন্দ্রীভূত। তার ছেলেই তার জীবনের কেন্দ্র। একটা দিনের জন্যেও সে ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এমন যে পুত্রগত প্রাণ জননী তার জীবনে কোন্ এক অশুভক্ষণে অবিবাহিত ভ্রনস্কির আবির্ভাব। কাউণ্ট ভ্রনস্কি ধনীর সন্তান, স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে সৈনিকের জীবন, সেটা তার কেরিয়ার হলেও জীবিকা নয়, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি নিয়েই সে আপনাকে ব্যস্ত রাখে। প্রেমে পড়ার মতো অবসরও নেই, অভিপ্রায়ও নেই। বিবাহ তো দূরের কথা। তাকে স্বামীরূপে কামনা করেছিল আনার ননদ কিটি, তার প্রেমেও পড়েছিল ওই অষ্টাদশী তরুণী। আনার আরেক ননদ ডলি একদিন তার স্বামী স্টিভার অবিশ্বস্ততার প্রমাণ পেয়ে স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়। তখন তাকে শান্ত করার জন্যে পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো ছুটে আসে আনা। রেলপথে সহযাত্রিণী হন বর্ষীয়সী কাউণ্টেস ভ্রনস্কি। মস্কো স্টেশনে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে বাড়ি আনার জন্যে যায় তাঁর পুত্র। সেইসূত্রে ভ্রনস্কির সঙ্গে আনার প্রথম দর্শনে প্রেম।

এই নিষিদ্ধ প্রেম তাদের দু'জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক অপ্রতিরোধ্য বন্যায়। সে যেন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার উপরে মানুষের হাত নেই। প্রকৃতিই স্থির করে দেয় তাদের নিয়তি। আনার বিবেক একটুও সায় দেয় না, কিন্তু সারা দেহ সারা মন সারা হৃদয় সারা সত্তা সাড়া দেয়। এই বন্যায় সে তার পায়ের তলার মাটি থেকে ছিটকে পড়ে। সেটার নামই কি পদস্খলন ? পতন ? ভ্রষ্টতা ? ভ্রনস্কিরও একই দশা। কিন্তু তার তো স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, তাদের প্রতি কর্তব্যের টান নেই। সে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীন সেও নয়। নিষিদ্ধ প্রেমে জড়িয়ে পড়ে মিলিটারি ডিউটিতে অবহেলা করলে তারও চাকরি নিয়ে টানাটানি। অবিবাহিত পুরুষের জীবনে বিবাহিতা নারীর সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' নতুন কিছু নয়। অমন তো কত হয়।

তেমনি বিবাহিতা নারীর জীবনেও অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' অজ্ঞাত বা অশ্রুত নয়। উভয় পক্ষই ওটাকে ক্ষণস্থায়ী বলে জানে, তাই অনিত্যের জন্যে নিত্যকে বিসর্জন দেয় না। ওটা ক্ষণিকের মতিভ্রম। ব্যাপারটাকে ওইভাবে নিলে আনাকেও কুলত্যাগ করতে হতো না, তার স্বামীকেও হতমান হতে হতো না, ভ্রনস্কিরও মিলিটারি সার্ভিস থেকে পদত্যাগ ঘটত না, কিটিরও হতাশ প্রেম থেকে অসুখ বাধত না, ভ্রনস্কির সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত তার বিয়ে দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করতে পারা যেত। 'আনা কারেনিনা' হতো একখানি কমেডী। তা না হয়ে যা হলো তা একখানি ট্র্যাজেডী। মূল কারণ, আনা ও ভ্রনস্কির প্রেম অভিজাত সমাজে প্রচলিত সাধারণ একটা 'অ্যাফেয়ার' নয়, যাকে দু'দিন বাদে বা দু'বছর বাদে ঝেড়ে ফেলতে পারা যায়। অবৈধ সহবাস সত্ত্বেও। অবৈধ সন্তানলাভসত্ত্বেও। কারেনিনা যথেষ্ট ক্ষমাশীল ছিলেন, আত্মীয়স্বজনও যথেষ্ট দরদী। কিন্তু যে-নারী পরপুরুষকে ও যে-পুরুষ পরনারীকে বরাবরের জন্যে আপনার করতে চায় তাদের একপক্ষের যদি একটি সন্তান থাকে ও সে সন্তানের মায়া কাটানো পরমদুঃখকর হয় তবে তার পরম দুঃখের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। সেই দুঃখিনী দয়িতাকে সুখী করা ধন দিয়ে নয়, মান দিয়ে নয়, সঙ্গ দিয়ে নয়, এমন কি ডিভোর্সের পর বিবাহ দিয়েও কারো সাধ্য নয়।

এক্ষেত্রে ধনের কোনো অভাব ছিল না। মানের অভাব ছিল, পিটার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে আনা অপমানিত হয়েছিল। মস্কোর অভিজাত মহলেও সে অপাঙ্‌ক্তেয়। গ্রামে গিয়ে বসবাস করাই ছিল প্রকৃষ্ট পন্থা। যেদিন ওরা গ্রামে ফিরে যাবে তার আগের দিন ঘটে আনার স্বেচ্ছাবৃত অপঘাত। আনা নিশ্চয়ই আশঙ্কা করেছিল যে গ্রামেও সে সমানভাবে মিশতে পারবে না। সেখানেও তার আসন হবে জমিদারের রক্ষিতার। সেখানেও তার মনে সন্দেহ থাকবে যে আনার ডিভোর্স যখন হয়নি তখন ভ্রনস্কি তাকে বিয়ে না করে অন্য একজনকে বিয়ে করতে পারে। অথচ আনার ডিভোর্সের জন্যে ভ্রনস্কির যত মাথাব্যথা আনার ততখানি নয়। আনার পক্ষে ডিভোর্স পাওয়া না পাওয়া ছিল সেকালের আইন অনুসারে তার স্বামীর করুণানির্ভর। যে নারী ব্যভিচার দোষে দোষী সে কখনো তার স্বামীকে দোষ দিয়ে ডিভোর্সের জন্যে আদালতে যেতে পারে না। আদালতে যেতে হলে যেতে হবে তার স্বামীকেই। স্বামীই স্ত্রীকে দোষ দিয়ে ডিভোর্স আদায় করতে পারে। কিন্তু সেরূপ স্থলে স্ত্রীর কলঙ্ক হবে, ছেলের কলঙ্ক হবে, স্বামীরও যে কলঙ্ক হবে না তা নয়। কারেনিন সেটা এড়াতে চেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও উকিলের পরামর্শ নেন। পরে দেখা গেল কারেনিন একজন বিশ্বাসী খ্রীস্টান। খ্রীস্ট নিষেধ করে গেছেন স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে। দোষী হলেও তাকে ক্ষমা করতে হবে। চার্চেরও সেই বিধান। কারেনিন প্রথমটা উপরোধে পড়ে নিজের ঘাড়ে দোষটা টেনে নিয়ে আনাকে ডিভোর্স দিতে রাজী হয়েছিলেন। তার মানে তাঁকেই মিথ্যা কথা বলতে হতো যে তিনিই অন্যনারীগামী। আনার খাতিরে তিনি

এতদূর যেতে রাজী হলেও ছেলেকে ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না। পরে তাঁর কথা থেকে মনে হলো তিনি তাতেও রাজী, কিন্তু কন্যার জন্মের পর কন্যাকে নিয়ে যখন আনা ভ্রনস্কির সঙ্গে ইটালী চলে যায় তখন কারেনিনের সঙ্গে কথাবার্তার খেই ছিঁড়ে যায়। ইতিমধ্যে কারেনিন পড়েন কাউন্টেস লীডিয়ার প্রভাবে। এই ধার্মিক মহিলা তাঁকে বোঝান যে ডিভোর্স পেলে আনা ঘরে ফিরে আসতে চাইলেও ফিরে আসতে পারবে না, তার ভালো হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আনার মঙ্গলের জন্যেই ওর প্রত্যাবর্তনের পথ খোলা রাখাই শ্রেয়।

কারেনিন নিজে আবার বিয়ে করতেন না। তিনি আদর্শ খ্রীস্টান হতে চেয়েছিলেন। কেউ যদি তোমার একগালে চড় মারে তুমি তার দিকে আরেক গাল বাড়িয়ে দেবে, এই নীতির অনুসরণে তিনি অপরাধিনী স্ত্রীকে তার দ্বিতীয় বিবাহে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু আনা তাঁর কাছে করুণা প্রার্থনা করেনি, তার হয়ে করেছিল তার দাদা। সে অনুতপ্ত হয়নি। প্রেমের জন্যে তার দেহমনহৃদয় ক্ষুধার্ত। তার ক্ষুধার নিবৃত্তি তার ভরা যৌবনে না হলে সে সারাজীবন জ্বলত। তার জীবন জুড়িয়েছে বলে কি সে অনুতাপ করবে? তবে এটাও জানে যে সে বিবাহের শপথভঙ্গ করে অপরাধী হয়েছে। তার অপরাধবোধ সত্য। অথচ অপরাধের দরুণ করণীয় যে অনুশোচনা সেটা অসত্য। ভগবান তাকে যেমন করে গড়েছেন সে তেমনি। সে সত্যকথা বলে, সত্যাচরণ করে, না পারলে বিবেকের দংশনে পীড়া পায়। ছলনা তার স্বভাবে নেই। স্বামীর অঙ্গীকৃত ডিভোর্স প্রত্যাখ্যান করে আনা দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ হারায়। পরে যখন ভ্রনস্কির পীড়াপীড়িতে স্বামীর করুণাপ্রার্থী হয় ততক্ষণে খুব বেশী দেরি হয়ে গেছে। তিনি অঙ্গীকারভঙ্গ করেন।

ভ্রনস্কির মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানকে যে দুঃখ পোহাতে হয় সে দুঃখ অন্যপ্রকার। আনার গর্ভে তার যে কন্যা হয়েছে তাকে সে নিজের বলে দাবী করতে পারে না। আইনত সে কারেনিনের। তার পদবী ভ্রনস্কি নয়, কারেনিন। পরে যেসব সন্তান জন্মাবে তারাও কেউ ভ্রনস্কি বলে পরিচিত হবে না, হবে কারেনিন বলে। তাহলে বংশরক্ষা হবে কী করে? সে ধরে নিয়েছে যে আনার সঙ্গে তার আইন অনুসারে বিয়ে হবে, যদি তার আগে ডিভোর্সটা হয়। চার্চ তেমন বিবাহ স্বীকার করবে না, কিন্তু রাষ্ট্রে তার নজীর আছে। তখন তো তার সন্তানদের ভ্রনস্কি বলে পরিচিত হতে বাধা থাকবে না। আনার মতিগতি কিন্তু বিপরীত। সে আর মা হতে চায় না। তা বলে সে ব্রহ্মচারিণী নয়। জন্মশাসনের উপায় জেনে নিয়েছে। এ নিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাতে মনোমালিন্য। ভ্রনস্কি চায় স্বামী-স্ত্রীর সহজ স্বাভাবিক জীবন। তার কি ধনের অভাব যে একটি সন্তানেই সে সন্তুষ্ট হবে? তাও পরের নামাঙ্কিত। সে চায় আরো সন্তান। পুত্রসন্তান। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আনার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কাছে তার স্বামীর দিকের

পুত্রই যথেষ্ট। এক মুহূর্তের জন্যেও সে তার পুত্রকে ভুলতে পারে না। তার জীবনকে সে ভাগ করে দিয়েছে পুত্র আর প্রেমিক দু'জনের মধ্যে। সে একই কালে পুত্রগত প্রাণ ও প্রেমিকগত প্রাণ। কী করে তাদের একবৃন্তে মেলাবে এই তার সমস্যা। ডিভোর্স এ সমস্যার সমাধান নয়, যদি না পুত্রকেও তার পিতা তার মাতার সঙ্গে থাকতে দেন। না, কিছুতেই তিনি এতে রাজী হবেন না। এটা দুরাশা।

আনা ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছিল পুত্রের সঙ্গে প্রেমিকের জোড় মেলাতে না পেরে। সে মেনে নিতে পারছিল না যে তাকে পুত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনধারণ করতে হবে। তার মনে হচ্ছিল তার মরণই ভালো। এ রকম একটা সমাধান তার মাথায় আসে যখন তার কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে সূতিকারোগে তার প্রাণ সংশয় হয়। ঘটনাটি ঘটে তার স্বামীর গৃহেই। আনাকে বাঁচাতে তিনিও যৎপরোনাস্তি করেন। কন্যাটি যদিও তাঁর নয় তা সত্ত্বেও তিনি তাকে ভালোবাসেন। সেই সন্ধিক্ষণে আনার মৃত্যু হলে আশ্চর্যের বিষয় হতো না, কারণ ডাক্তাররাও সেই আশঙ্কা করেছিলেন। ভ্রনস্কির বেদনা তখন দেখবার মতো। মৃত্যু আসন্ন জেনে আনা নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর সঙ্গে প্রেমিকের শান্তি স্থাপন করে। এমন একটি স্বর্গীয় দৃশ্য বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। গ্রন্থ যদি এইখানেই সমাপ্ত হতো স্বামী স্ত্রী ও প্রেমিকের মহিমাময় মিলনের মধ্যে কাহিনীর পরিণতি কী মহৎ হতো! তবে সূতিকারোগে মরণ ঘটত আনার।

কিন্তু গ্রন্থকারের অভীষ্ট ছিল সে রকম মৃত্যু নয় অন্যরকম মৃত্যু সংঘটন। তার ইঙ্গিত তিনি দিয়ে রেখেছিলেন ভ্রনস্কির সঙ্গে আনার প্রথম দর্শনের সময়। দুর্ঘটনার বার্তা শুনে আনা মন্তব্য করেছিল, "এটা একটা অশুভ লক্ষণ।" তাদের মিলনের পরেও দেখা দেয় আর একটা অশুভ সঙ্কেত। ঘোড়দৌড়ে জয় হতে যাচ্ছে ভ্রনস্কির। এমন সময় সে লম্ফমান ঘোড়ার পিঠে লম্বমান না হয়ে ধপ করে বসে পড়ে। ঘোড়ার পিঠ ভেঙে যায়। যন্ত্রণার থেকে মুক্তিদানের অন্য উপায় না থাকায় ঘোড়াটিকে গুলী করে মারতে হয়। ওটি অশ্ব নয়, অশ্বিনী। সুন্দরী ও সুগঠিত। যেন আনা কারেনিনার প্রতিরূপ। ভ্রনস্কি তাকে ভালোবেসে মনোনয়ন করেছিল। অথচ তারই অপঘাত মৃত্যুর নিমিত্ত হলো।

শেষের দিকে আনা মৃত্যুর জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল। ডিভোর্স পেলেও কি সে বাঁচতে চাইত? দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও কি সে বাঁচত? তার জীবন কি সার্থক হতো পুত্রকে বরাবরের মতো হারিয়ে প্রত্যাবর্তনের পথ বরাবরের মতো রুদ্ধ করে? এ বই তিনরকম ভাবে লিখতে পারা যেত। এ ব্যাপার পঞ্চাশ বছর আগে ঘটলে কারেনিন পুশকিনের মতো ডুয়েল লড়ে মারা যেতেন। ভ্রনস্কিও তো আনার মৃত্যু আসন্ন দেখে আত্মঘাতী হতে যাচ্ছিল। গুলীটা বুকে লাগলে সে-ই মারা যেত। ত্রিভুজকে দ্বিভুজে পরিণত করতে হলে একজন না একজনকে মরতে হতোই। সেই একজন হলো

টলস্টয়ের বিচারে আনা। লেখকের বিচারই চূড়ান্ত। আনা যোগ দিল বিশ্বসাহিত্যের ট্র্যাজিক হীরোইনদের সঙ্গে। হেলেন তাদের একজন নয়। তার সঙ্গে তুলনা বৃথা। ট্র্যাজিক হিরোইন হওয়া কি সম্ভব হতো আনা যদি পতিহারা বা সাথীহারা হয়ে বেঁচে থাকত? পতিহারা হলে পুনর্বিবাহ সুগম হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় স্বামীর সামঞ্জস্য হতো কী করে? সাথীহারা হলে পুত্রসুখে সুখী হতো, কিন্তু প্রিয়সঙ্গ পেত কোথায়?

মরণ ঝাঁপ দেবার আগে আনার স্বগতচিন্তার বিক্ষিপ্ত টুকরোর মধ্যে এটাও ছিল যে তার প্রেমিক তাকে প্রেম দিয়ে তৃপ্ত করতে পারেনি। কামনার তৃপ্তির জন্যে সে পিপাসার্ত। তার শঙ্কাও ছিল যে ভ্রনস্কি তাকে একদিন সঙ্গ না দিয়ে পরিত্যাগ করবে। পতিপরিত্যাগিনী হবে প্রেমিকপরিত্যক্তা। ভ্রনস্কি আগের মতো সমাজে মেশে, আনা তো তা পারে না। এটাও তার সহ্য হয় না। তা বলে কি পুরুষ মানুষ তার সব কাজ ফেলে প্রিয়ার সঙ্গে সমস্তক্ষণ কাটাবে? একটি দিনের জন্যেও বাইরে যাবে না? গেলে তার প্রিয়া তাকে ভুল বুঝবে? বস্তুত বিবাহ একজন পুরুষকে বা নারীকে যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেয় বিবাহব্যতিরিক্ত একত্রবাস সে পরিমাণ স্বাধীনতা দেয় না। বিবাহেই নিরাপত্তা বেশী। সোয়াস্তি বেশী। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো। কারেনিনের সঙ্গে আনার সুখ ছিল না, সোয়াস্তি ছিল। আর ছিল সামাজিক মর্যাদা ও মেলামেশার পরিসর। ভ্রনস্কির সঙ্গে সুখ ছিল, সোয়াস্তি ছিল না। আর ছিল না সামাজিক স্বীকৃতি ও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ। কোলের মেয়েটিকে নিয়ে কী জানি কেন তার আনন্দ ছিল না। ভ্রনস্কিরও না। সে-ই হতে পারত তাদের মিলনের সেতু। কিন্তু আনা তাকে ভালোবাসত না, ভ্রনস্কিও যে আদর করত তা তো মনে হয় না। বরং কারেনিনেরই তার প্রতি একটা অহেতুক মমতা।

টলস্টয় তাঁর পরিকল্পিত নায়িকাকে 'গিল্‌টি' বলে বিশেষিত করতে চাননি। করতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র 'প্যাথেটিক'। কিন্তু তাঁর পূর্ব কল্পনা ঘটনাচক্রে পরিবর্তিত হয়। তাই আনা কারেনিনা শুধুমাত্র প্যাথেটিক নয়। মূলত গিল্‌টি। সে নিজেও মানে ওকথা। এক শতাব্দী পরে জন্মালে মানত না। গিল্‌ট সম্বন্ধে নরনারীর বদ্ধমূল ধারণা ছিন্নমূল হয়েছে। প্রেমহীন বিবাহে দেহদান একালের দৃষ্টিতে ক্রীতদাসের নীতি। স্বাধীন মানুষের নীতি নয়। বিবাহহীন প্রেম তার চেয়ে নীতিসম্মত। একালের বিদগ্ধ পাঠক আনাকে গিল্‌টি বলে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হবেন। যতদিন সে তার স্বামীর ঘরে ছিল ততদিন তার দ্বৈতজীবন নীতিবিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু গৃহত্যাগের পর সে কেবল প্রেমিকের সঙ্গেই থাকে। নীতির নিকষে আমি তো এতে অপরাধের বা গিল্‌টের দাগ দেখতে পাইনে। সমাজের নিকষও ঠিক আগের মতো নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর একালের আনারা অনায়াসেই কারেনিনদের ফেলে ভ্রনস্কিদের সঙ্গে বাস করছে। ডিভোর্স

হয়তো হয়নি, পুনর্বিবাহ হয়তো ঘটেনি, সন্তান হলে বার্থ রেজিস্টারে ভ্রনস্কিদের নাম লেখা হচ্ছে। আইন এখন এতদূর উদার হয়েছে যে ডিভোর্সের মামলায় কোনো পক্ষের অপরাধ প্রমাণ করতে হয় না। কে অপরাধী কে নয় তাতে কিছু আসে যায় না। একালের পাঠক বুঝতেই পারবে না আনা কারেনিনা কী এমন অপরাধ করেছিল, কেন তার অমন নিষ্ঠুর পরিণাম হলো।

টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি'র একটা শাশ্বত আবেদন আছে। এক শতাব্দী পরেও তার ইতরবিশেষ হয়নি। 'আনা কারেনিনা' সম্বন্ধেও সেকথা বলা চলে কি? তারও কি একটা শাশ্বত আবেদন আছে? এক শতাব্দী পরেও কি ও বই তেমনি সজীব, তেমনি সুন্দর, তেমনি সার্থক, তেমনি প্যাসন ও তেমনি কম্প্যাশন ভরা? টলস্টয় যেসব প্রতিমায় জীবন্যাস করেছিলেন তারা কি তেমনি রক্তমাংসের মানুষ, তেমনি ভালোয় মন্দে মেশা? এটি একটি আশ্চর্য চরিত্রচিত্রশালা। যে যেমন সে তেমন। প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। শিল্পকর্ম-হিসাবে 'আনা কারেনিনা' এখনো অতুলনীয়। যে টলস্টয় আর্টিস্ট তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এতে। আর্টের দিক থেকে স্বয়ং ডস্টয়েভস্কির মতে এ নভেল নিখুঁত। বিতর্ক কেবল মনস্তত্ত্ব নিয়ে। মনস্তত্ত্ব ইতিমধ্যে আরো বেশী সূক্ষ্ম হয়েছে। ফ্রয়েড এসে চিরকালের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন। অবচেতনে অবগাহন করলে চিন্তার ও আচরণের অন্যরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার পর সেকালের সেই শাদা-কালো দোরঙা নীতি ও নরনারীর দোরোখা নীতি একালে মেনে নেওয়া যায় না। মরালিস্ট টলস্টয়ের সঙ্গে একালের বিদগ্ধ জনের মতভেদ অন্যায্য নয়। আনা যদি বাঁচত তাহলে ভ্রনস্কির প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেমই তাকে সাধারণ পতিব্রতার চেয়ে মহত্তর আসন দিত। যেমন দিয়েছে রাধাকে। পরিত্যক্তা বলে রাধাকে তো মরতে হয়নি। তবে রাধা তো শ্যামের জন্যে কুলত্যাগ করেন নি। যার জন্যে কুলত্যাগ সে-ই যদি পরিত্যাগ করে তবে তার শাস্তি প্রাণত্যাগ। তার মর্ম নিজের মৃত্যু। ভ্রনস্কিকে আনা ভুল বুঝে গুরু দণ্ড দিয়ে গেল। ধ্বংস করে গেল তার জীবন। যাকে ভালোবাসে তার সর্বনাশ করাই কি প্রেমিকার সাজে? এটাই হয়তো বাস্তব সত্য। যেমন তীব্র প্যাশন তেমনি তীব্র সন্দেহ ও ঈর্ষা। দুঃখীরা দুঃখ দিতে ভালোবাসে। আনার মতো দুঃখিনী কে? ওটাও তো প্রেমের পরীক্ষা। ভ্রনস্কির প্রেম যদি সর্বংসহ হতো তবে হয়তো বা তাদের মিলিত জীবন স্থায়ী হতো।

এদের দু'জনের প্রেমকে আমরা সামাজিক তথা নৈতিক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তাই মনে করি এদের ট্র্যাজেডীর মূলে সামাজিক তথা নৈতিক বিধি লঙ্ঘন। এ ধারণা ভুল নয়, কিন্তু পুরোপুরি ঠিকও নয়। মূলের নিচেও মূল আছে। তলিয়ে না দেখলে নজরে পড়ে না। এই রহস্যের তল মনস্তত্ত্বের অতলে। আনা ভ্রনস্কিকে ভালোবাসে, বহুভাগ্যে পরস্পরকে কাছে পেয়েছে। কিন্তু ওই যে কাছে পাওয়া ওটাই ওদের কাল হলো। কাছে এলেই ঠোকাঠুকি

বাধে। কেন বাধে তার নানা বিচিত্র কারণ। কিন্তু আধুনিক মনোবিদরা ক্রমেই উপলব্ধি করছেন যে, অনুরাগের উল্টো পিঠে বিরাগও থাকে। যাতে সব চেয়ে আনন্দ তাতে সব চেয়ে বেদনা বা বিকার। তা ছাড়া ওটা একপ্রকার রণ। রণ থাকলে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নও থাকে। আনা চায় ভ্রনস্কির উপর বিজয়িনী হতে। ভ্রনস্কি কি বার বার পরাজয় মেনে নেবে? কখনো কি বিদ্রোহী হবে না? আনা চায় বিজিতকে বন্দী করে রাখতে। বন্দী কি মুক্তির জন্যে ছটফট করবে না? আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় একটা কথা। সেকস ওয়ার। ওর তর্জমা করলে কটু লাগবে। উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ নেই। আনা কারেনিনার স্রষ্টা শুধু যে মনোবিদ্ ছিলেন তাই নয়, বহু নারীর সংসর্গে এসে হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছিলেন। তাঁর নারীচরিত্রগুলি সেইজন্যে এমন জীবন্ত। তিনি যেন তাদেরই একজন হয়ে ভিতর থেকে তাদের দেখেছিলেন ও বুঝেছিলেন।

নারীজাতি সম্বন্ধে বিষম তিক্ত ছিলেন টলস্টয়। গর্কীকে যা বলেছিলেন তার মর্ম নারী সম্বন্ধে সত্য কথা বলা বিপজ্জনক। যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে সেদিন তিনি একটি পা কবরের মধ্যে রেখে নারী সম্বন্ধে সত্য কথাটি নির্ভয়ে বলবেন। তাড়াতাড়ি আর-একটি পা কবরের ভিতর টেনে নিয়ে ধপ করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন। দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই তিনি সংজ্ঞা হারান। মনের কথাটা মনেই থেকে যায়।

'আনা কারেনিনা' বিশ্লেষণধর্মী রচনা। তখনকার দিনের পক্ষে ব্যতিক্রম। তা হলেও নরনারী সম্পর্কের উপর নির্ভয়ে আলোকপাতের অনুকূল ছিল না সে যুগ। না বলা কথাটা আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। টলস্টয় মেনটালের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এলিমেণ্টাল স্তরে পৌঁছেছিলেন। যেকথা বলি বলি করে বলতে সাহস হলো না সেকথা বোধহয় এলিমেণ্টাল।

উপন্যাসটির চাবী নিহিত রয়েছে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত সেই উক্তিটিতে যেটি মুদ্রিত হয়েছে 'আনা কারেনিনা' নামটির নিচে। তার মর্ম "প্রতিশোধ আমারই। আমিই অন্যায়ের শোধ নেব।" অর্থাৎ দণ্ডদানের কর্তা ভগবান স্বয়ং। দণ্ড দিতে হয় তিনিই দেবেন। দেবেন যথাকালে যথানিয়মে। মানুষ মানুষকে দণ্ড দিতে পারে না। কারেনিন আনাকেও না। আনা ভ্রনস্কিকেও না। বাইবেলে আছে—

"Dearly beloved, avenge not yourselves; but rather give place unto wrath; for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord. Therefore if thine enemy hunger, feed him: if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good." (**New Testament**, Romans, Chapter 12, verses 19-21)

এই বই লেখার সময় টলস্টয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাংসারিক সাফল্যে তাঁর বৈরাগ্য এসেছিল। তিনি খুঁজছিলেন জীবনের অর্থ। যা না পেলে জীবন বৃথা। একটু একটু করে তিনি ঝুঁকছিলেন খ্রীস্ট ধর্মের দিকে। কিন্তু গির্জার দিকে নয়। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল। ধীরে ধীরে তিনি এই প্রত্যয়ে পৌঁছন যে, হিংসার উত্তর প্রতিহিংসা নয়, অহিংসা। আঘাতের উত্তর প্রত্যাঘাত নয়, ক্ষমা। অনিষ্টের উত্তর পাল্টা অনিষ্ট নয়, উপকার। ভ্রষ্টতার উত্তর বর্জন নয়, করুণা। পাপের উত্তর সাজা নয়, অন্যায়ের উত্তর প্রতিশোধ নয়, শত্রুকে তার ক্ষুধার অন্ন তৃষার জল যোগানো। মন্দের উত্তর প্রতিরোধ নয়, অপ্রতিরোধ।

এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র লেভিন। সে যেন বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়সের টলস্টয়। জীবিকার চেয়ে জীবনকে নিয়েই সে ভাবিত। তার জীবন পরিশেষে অর্থবান হয়, তার অন্তর হয় নতুন অনুভূতির দ্বারা আপ্লুত। তাকে ভালো হতে হবে, ভালো কাজ করতে হবে, তার জীবনকে ভালো দিয়ে ভরে দিতে হবে। লেভিনের মতো টলস্টয়ের জীবনও ভালোর দিকে মোড় নয়। সেই বয়সে নয়, আরো পরিণত বয়সে। 'আনা কারেনিনা' লিখতে গিয়ে তিনি লেভিনের কলমে নিজের ধর্মীয় অনুভূতির কথাও লিপিবদ্ধ করেন। আনা ও ভ্রনস্কির কাহিনী ফুরিয়ে যাবার পরেও লেভিনের কাহিনীর রেশ থাকে। আর্ট নয়, মরালিটি নয়, মনস্তত্ত্ব নয়, ধর্মীয় উপলব্ধির উপরেই যবনিকা পড়ে। লেভিনের তথা টলস্টয়ের অন্তঃপরিবর্তন এ গ্রন্থের উপসংহার। এখন থেকে তিনি ঋষি টলস্টয়।

(১৯৭৯)

রেজারেকশন

বছর পঞ্চাশ বয়সে টলস্টয়ের জীবনদর্শন এমন গভীরভাবে বদলে যায় যে সেই পরিবর্তন যেন একপ্রকার ধর্মপরিবর্তন বা কনভারসন। ভিতরে ভিতরে তিনি ফিরে যান যীশু খ্রীস্টের আদি শিষ্যদের যুগে। যাঁদের জীবনযাত্রা ছিল সরল, নিরলঙ্কার, সকলের প্রতি সপ্রেম, হিংসাপ্রতিহিংসাবর্জিত, ক্ষমাপরায়ণ, শাসনমুক্ত, শোষণমুক্ত, আত্মশ্রমনির্ভর, নারীসম্পর্কহীন বা পরনারীসম্পর্ক-হীন, বেশ্যাবৃত্তিবিরোধী। আদি খ্রীস্টানদের ছোট ছোট কমিউন পরবর্তীকালে অতিকায় চার্চে পরিণত হয়, চার্চের উচ্চাভিলাষ রাষ্ট্রের উচ্চাভিলাষকেও ছাড়িয়ে যায়, খ্রীস্টানরা খ্রীস্টানদের আগুনে পুড়িয়ে মারে, ক্রীতদাস বানিয়ে কেনাবেচা করে, বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়, সৈনিকবৃত্তির সমর্থন করে, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়, শ্রমিকদের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে, কৃষকদের জমি কেড়ে নেয়। টলস্টয় যেমন রাষ্ট্রের উপরে তেমনি চার্চের উপরে সমান বীতশ্রদ্ধ হন, অথচ ভলতেয়ারের মতো উভয়কে ধ্বংস করার প্রবর্তনা

দেন না। যে প্রবর্তনা থেকে উদ্‌ভূত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব। যে বিপ্লবের জের চলছিল রুশদেশের শিক্ষিত মানসে। টলস্টয়ের বাণী হলো, ফিরে চল মাটির টানে, ফিরে চল যীশুর আদর্শে, ফিরে চল নীতির জগতে।

'আনা কারেনিনা' লিখতে লিখতেই তিনি এই প্রত্যয়ে উপনীত হন যে যীশুর প্রদর্শিত পথই শ্রেষ্ঠ পথ, যদি তাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা হয়। তিনি প্রথমে নিজের জীবনে, পরে পরিবারের জীবনে ও আরো পরে দেশের তথা মানবজাতির জীবনে প্রেম, ক্ষমা, অপ্রতিরোধ, অপ্রতিশোধ, কায়িক শ্রম প্রভৃতি মূলনীতিগুলি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর লেখার কাজ হয়ে ওঠে তাঁর জীবনসাধনার অঙ্গ। আর্টের জন্যে আর্ট নয়, আদর্শের জন্যে আর্ট, নীতির জন্যে আর্ট, মানবহিতের জন্যে আর্ট। আর্টের জন্যে আর্ট যারা বলে তারা অর্থকরী পণ্যের পসারী, পণ্য তাদের বিলাসী ও বিলাসিনীদের উপভোগের জন্যে, এরা ধনিক শ্রেণীর লোক, এদের পঙ্কিল জীবনই তাতে প্রতিফলিত হয়, জনগণের আর্ট অন্য জিনিস। সেই অন্য জিনিসের চর্চা করতে করতে টলস্টয় তাঁর ছোটগল্পগুলিকে যীশুর উপদেশাত্মক উপকথার মতো সরল, সহজ, সর্বপ্রকার বাহুল্য ও কৌশল মুক্ত করেন। উপন্যাস নামক প্রকরণটার উপরেই তাঁর অনীহা জন্মায়। দুটি একটি উপন্যাসিকা লিখেই তিনি পাঠকদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চান। কিন্তু পাঠকরা তাতে তৃপ্ত হবে কেন? কী একটা কারণে টলস্টয়পত্নী একবার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সম্রাট স্বয়ং নালিশ করেন, "টলস্টয় আর উপন্যাস লেখেন না কেন?" কাউণ্টেস এর কী কৈফিয়ৎ দেবেন? অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ঔপন্যাসিক স্বেচ্ছায় সে পথ থেকে সরে গিয়ে চাষী মজুরের জন্যে ধর্মীয় উপকথা লিখছেন। সেসব উপকথা চিরন্তন হতে পারে, কিন্তু সমসাময়িক সমস্যার প্রতিফলন কোথায়? আধুনিক জীবনটাই যদি জটিল হয়ে থাকে তবে সেই জটিলতাও কি আর্টের বিষয় নয়? বিষয় যদি দাবী করে উপন্যাসের আকার ও আধার তাহলে উপন্যাসই লিখতে হয়। লিখলে তা প্রকাশ করতেও হবে। প্রকাশ করলে তার থেকে অর্থও আসতে পারে। তা বলে কি সেটা অর্থকরী পণ্য! কেবল বড়লোকেরাই কিনবে! লিখবে যারা তারা সকলেই বড়লোক হবে?

এসব প্রশ্ন এড়ানোর জন্যে টলস্টয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁর গ্রন্থের উপর কপিরাইট থাকবে না। যার ইচ্ছা সে বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করতে পারে। পাঠকদের ঘরে ঘরে পৌঁছয় এটাই তাঁর কাম্য, অর্থ তিনি চান না। কিন্তু সংসার চলবে কী করে, যদি বই থেকে টাকা না আসে? যদি জমিদারিও চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়? যদি অন্য কোনো আয়ের পন্থা না থাকে? পরিবারটিও তো ক্ষুদ্র নয়। টলস্টয় পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাস করতেন না। ব্রহ্মচর্যের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কপিরাইট না থাকলে প্রকাশকরাই লাভের সমস্তটা পান, স্ত্রীপুত্রকন্যা ভেসে যায়। শেষে একটা রফা হয় গৃহিণীর সঙ্গে। জীবনের মোড় পরিবর্তনের আগেকার লেখার

উপর কপিরাইট থাকবে টলস্টয় পরিবারের। পরবর্তী রচনার উপর কপিরাইট কারো নয়। সেগুলি সৃজনধর্মী নয় প্রচারধর্মী। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক এই হলো লেখকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যখন গান্ধীর মতো মানুষের হাতে টলস্টয়ের প্রচারধর্মী রচনাগুলি পড়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি 'টলস্টয় ফার্মে' বাস করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা বদলে যায়।

'আনা কারেনিনা' লিখে টলস্টয় মনে করেছিলেন আর উপন্যাস লিখতে হবে না। কিন্তু অমন একজন জাতশিল্পী কি তাঁর প্রতিভাকে বন্ধ্যা রাখতে পারেন? বিশ বছর বাদে উপন্যাসের জগতে ফিরে যেতেই হলো। উদ্দেশ্যটা বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টি নয়। তার আবরণে নীতিনির্দেশ। 'রেজারেকশনে'র টলস্টয় স্বদেশের ও সব দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতিনির্দেশক বা মরাল লীডার। তাঁর এই উপন্যাসের নায়িকা সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ নয়, ছোটলোকের ঘরের পিতৃপরিচয়হীন বারবধূ। যীশু-খ্রীস্টের শিষ্যা মেরী ম্যাগডালেনের মতো আর কোনো গণিকার পতনের পর পুনরুত্থান আমার জানা নেই। টলস্টয়ের সৃষ্ট কাতুশা মাসলোভার পতনের পর পুনরুত্থান আমার মনে হয় মেরী ম্যাগডালেনের পদাঙ্ক অনুসরণ। তার পতনের মূলে ছিল তার দোষ নয়, আরেকজনের। সে এই উপন্যাসের নায়ক নেখলুডভ। নায়িকাকে কলঙ্কিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে সে তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। দশ বছর বাদে যখন তাকে পুনরাবিষ্কার করে তখন সে বাধ্য হয়ে বেশ্যা। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে দস্যুতা ও নরহত্যার অভিযোগ। আদালতে জুরির বিচার চলছিল। নেখলুডভের ডাক পড়েছিল একজন জুরর হিসাবে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই 'বিচারক'।

কাতুশার এই দুর্গতির জন্যে দায়ী কে? নেখলুডভের বিবেক জাগ্রত হয়। সে দায়ী করে নিজেকেই। মামলার বিবরণ শুনে তার বিশ্বাস হয় না যে কাতুশা টাকার জন্যে মানুষ খুন করেছে। কিন্তু জুরির বিচার তো। জুরির রায়, সে দস্যুতার অপরাধে অপরাধী নয়, কিন্তু খুনের অপরাধে অপরাধী। এতে নেখলুডভের অমত ছিল। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে সে সকলের সঙ্গে একমত হয় ও পরে সচেতন হয়ে শিউরে ওঠে যে কাতুশা বিনা অপরাধেই চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত। এই ঘোর অবিচারের বিরুদ্ধে সে কাতুশার হয়ে আপীল করে। আপীল নিষ্ফল হয়। তখন মহামান্য সম্রাটের কাছে আবেদন করে। শেষে কারাদণ্ড মকুব হয়, কিন্তু নির্বাসন বহাল থাকে।

নেখলুডভ পণ করেছিল সে কাতুশাকে রাজদ্বার থেকে উদ্ধার করবেই, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। মেয়েটি যাতে আবার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন না করে, যাতে সমাজে সম্মানের স্থান পায় সেইজন্যে তাকে বিবাহ করবে। এটা তার নিজের প্রায়শ্চিত্ত। কাতুশাকে পাঁকে নামিয়েছে যে, সে-ই তাকে পাঁক থেকে টেনে নির্মল করবে। তাহলে তো তাকেই নির্মল হতে হয় তার আগে! তার নিজের জীবনকেও উন্নত করতে হয়। সে কি আর পাঁচজন জমিদারের মতো

কৃষকের রক্ত শোষণ করে না ? সে কি তাদেরই মতো বিলাসব্যসনে নিমগ্ন নয় ? সে কি তাদেরই মতো একজন পরকীয়ার সঙ্গে প্রেম করে না ? একই কালে একটি কুমারীকে বিয়ে করে স্বকীয়া রূপে পেতে চায় না ? নেখলুডভ হাত ধুয়ে নিজেকে সাফ করে। প্রেম করা ছেড়ে দেয়। বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। জমিদারি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে না দিলেও খুব কম খাজনায় বিলি করে। ঘরবাড়ি ছেড়ে সাইবেরিয়ায় গিয়ে কাতুশার সহচর হবার জন্যে প্রস্তুত হয়। কাতুশা যতদিন চাইবে ততদিন সে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করবে। কায়িক সম্ভোগ বর্জন করবে।

কিন্তু একরাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতায় একটি নিরীহ নিষ্পাপ মেয়েকে পাপের পথে ঠেলে দেওয়া যেমন সহজ তাকে সেই পথের মাঝখান থেকে ফিরিয়ে আনা তেমন সহজ নয়। বেশ্যালয়ে শত শত—শত শত কেন, সহস্রাধিক পুরুষ তাকে পাপের সাথী করেছে, তার শরীর নিয়ে কেনাবেচা করেছে। সে কি আর মানুষ ! সে কি আর নারী। সে এখন নারকী। নেখলুডভ যদি কামের প্রস্তাব করত তাহলে সে অনায়াসে বুঝত। তা তো নয়, এ প্রস্তাব প্রেমের প্রস্তাব, বিবাহের প্রস্তাব। এ প্রেম স্বর্গীয়, এ বিবাহ সামাজিক। এর মধ্যে কামগন্ধ নেই। নেখলুডভ এখন অন্য মানুষ। মানুষ হয়ে সে মানুষকে শোষণ করে না, শাস্তি দেয় না, যুদ্ধবিগ্রহ ও দণ্ডদান থেকে তার বিশ্বাস উঠে গেছে। সে সকলের মঙ্গল করতে চায়। নিজে ভালো হবে, পরের ভালো করবে। কাতুশা যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে তা হলেও সে ওকে পরিত্যাগ করবে না। ওর সঙ্গে সাইবেরিয়া যাবে ও সেখানে চার বছর থেকে ওর সেবা করবে। সেইভাবে প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবেই। সে একদম নাছোড়বান্দা। এটা তার নিজের বিবেকের তাড়না থেকে উদ্‌গত কর্তব্য।

কাতুশা তাকে ভুল বোঝে। এসব কথা মনে থাকা উচিত ছিল দশ বছর আগে। তাহলে তো জীবন অন্যরকম হতো দু'জনের। সে যা বলে তার মর্ম, সেদিন যাকে তুমি কায়িক সুখের জন্যে ব্যবহার করেছিলে আজ তাকে ব্যবহার করতে চাও আত্মার কল্যাণের জন্যে। ঈশ্বরের রোষ থেকে রক্ষা পেতে। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি আত্মহত্যা করব। আমার জীবন-টাকেই নষ্ট করে দিলে তুমি। তোমার জন্যে আমার গর্ভে সন্তান এল। সেও মারা গেল। আবার তুমি এসেছ কী করতে ? আমাকে কারামুক্ত করতে ? উত্তম। পারো তো করো। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি থেকে উদ্ধার করবে কী করে ? ও ছাড়া আর কী গতি আছে আমার ? বিবাহ ? তা কি কখনো হয় ? তুমি কত বড়ো আর আমি কত ছোট ! তুমি একজন প্রিন্স। তুমি বিয়ে করবে একজন প্রিন্সেসকে। আমাকে বিয়ে করে তুমি কোনোদিন সুখী হবে না। একটানা ত্যাগস্বীকার করে তুমি অসুখী হবে। আমি তোমার অমন আত্ম-ত্যাগ গ্রহণ করতে নারাজ।

আসলে নেখলুডভের অন্তরে যে প্রেম ছিল সে প্রেম করুণাঘন খ্রীস্টীয় প্রেম। তাকে প্লেটোনিক প্রেম বলা চলে না। রোমান্টিক প্রেম তো নয়ই।

কাতুশা কামগন্ধ আর চায় না, চায় সেই ভালোবাসা যা কাতুশাকে কাতুশা বলে ভালোবাসা। দুঃখিনী বলে দয়া করা নয়, পতিত বলে উদ্ধার করা নয়, ছোটলোক বলে অনুগ্রহ করা নয়।

কারাগারে ও সাইবেরিয়ার পথে কাতুশার সঙ্গে নেখলুডভের অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। একপক্ষের ক্ষমাহীন মনোভাব অপরপক্ষের একনিষ্ঠতার ফলে একটু একটু করে বদলায়। অভিজাত শ্রেণীর লোক হওয়ার মস্ত বড়ো সুবিধা এই যে তার সামনে সব দরজা খুলে যায়। যেটা খোলে না সেটা টাকার ফুস্‌ মন্তরে খোলে। চারদিকে ঘুষের রাজত্ব। বিশেষ করে সাইবেরিয়ায়। এক দিন কাতুশা কারাগার থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু নির্বাসন থেকে নয়। তাকে সাইবেরিয়াতেই চার বছর কাটাতে হবে। তখন তারই উপর স্থির করার ভার ছেড়ে দেয় নেখলুডভ, সে কাকে বিয়ে করতে চায়, কার সঙ্গে বা কার কাছে থাকতে চায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাতুশা স্থির করে, সে চায় একজন বিপ্লবী বন্দীর সাথী হতে। তার নাম সাইমনসন। সে সত্যবাদী, অহিংসক, জিতেন্দ্রিয়। তার সঙ্গে সম্পর্কটা কামগন্ধহীন। সেও বিবাহের প্রস্তাব করেছে। বিপ্লববাদিনী মারিয়া পাভলোভনা কিন্তু কটাক্ষ করে যে বিবাহটা কামগন্ধহীন থাকবে না। যা হয়ে থাকে তাই হবে।

কাতুশা যখন সাইমনসনকেই বরণ করেছে তখন নেখলুডভের আর করণীয় কী আছে ? সেও মুক্তি পায়। ততদিনে সেও হৃদয়ঙ্গম করেছে যে তারও ঘর চাই, ঘরণী চাই, সন্তান চাই, নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক চাই। সমাজ শ্রেণীশূন্য হোক আর নাই হোক, পুরুষ নারীশূন্য হতে পারে না, পরিবার সন্তানশূন্য হতে পারে না। কাতুশা তাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, সে স্বাধীন-ভাবে মনোনয়ন করবে। কাকে, কবে, এসব কথা পরে। আপাতত সে কাতুশার প্রতি কর্তব্যের দায় থেকে মুক্ত। তার অতীতের প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত। সে এখন নতুন মানুষ। এখন থেকে তার নতুন কর্তব্য যীশু যাকে ভগবানের রাজ্য ও ভগবানের ন্যায়ধর্ম বলেছেন তারই অন্বেষণ। সর্বপ্রকার অন্যায়ের প্রতিকার। খ্রীস্টীয় চার্চকে উপেক্ষা করে সে সরাসরি খ্রীস্টের কাছে যায়। তাঁর বাণী মান্য করে।

শ্রেণীচ্যুত হওয়াও তার লক্ষ্য। তবে হিংসার ভিতর দিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন কাম্য নয়। তা বলে হিংসাচালিত বিপ্লবীদের সবাইকে সে মন্দ মনে করে না। ভালো, মন্দ, মাঝারি তাদের মধ্যেও আছে। যারা একটি সামান্য প্রাণীকেও আঘাত করতে চায় না তারাও তাদের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অকাতরে নরহত্যা করতে পেছপাও নয়। মারিয়া পাভলোভনা তো অভিজাতকন্যা। সে থাকে গরিবদের সঙ্গে গরিবদের মতো, তাদেরই মতো খেটে খায়। পুলিশ হানা দিলে পুলিশকে গুলী করে একজন কমরেড। মারিয়া তার খুনের দায় নিজের ঘাড়ে টেনে নেয়। বলে, আমিই গুলী করেছি। যদিও সে রিভলভার ধরতে জানে না। সাইবেরিয়াযাত্রী বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে কাতুশার নৈতিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। কিছুটা হলেও এতটা

নেখলুডভের সাহচর্যে হতো না। চরিত্রের দিক থেকে বিপ্লবীরা অনেক উন্নত। ওদের সঙ্গে মিশে নেখলুডভের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। সেটা ভালোর দিকে। কিসের জন্য এরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, দুঃখ বরণ করেছে, বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত? আত্মসুখের জন্যে? ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে? না। তাদের সামনে এক মহান লক্ষ্য।

'রেজারেকশন' ছিল যীশু খ্রীস্টের কবর থেকে পুনরুত্থান। খ্রীস্টধর্মের এটি একটি মূলতত্ত্ব। টলস্টয় এটিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, এটি একটি বেশ্যালয়ে কবরস্থ নারীর পুনরুত্থান। সাইবেরিয়ায় তার সাজা হয়নি, হয়েছে শাপে বর। কমরেডকে বিয়ে করে সেও কমরেড হবে। বিপ্লবের দিনে তাকে দেখা যাবে বারাঙ্গনা বেশে নয়, বীরাঙ্গনা বেশে। প্রিন্সকে বিয়ে করে তার এমন কী সৌভাগ্য হতো! অভিজাত সমাজ কি তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিত? ঘৃণা করত না? তার স্বামীকেও একঘরে করত না? তার সন্তানকেও অপাঙ্‌ক্তেয় করত না? রাশিয়ার উচ্চতর শ্রেণীর যে চিত্র এঁকেছেন টলস্টয় তা যেন বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত দুর্নীতিজর্জরিত পম্পিয়াই নগরী। বিপ্লব যে কত সন্নিকট তা কি টলস্টয় স্বয়ং জানতেন? এ বই সমাপ্ত হয় ১৮৯৯ সালে। সম্রাটের পতন হয় ১৯১৭ সালে। বিপ্লবীরা বেশ্যাবৃত্তি উচ্ছেদ করে। সেটা কি 'রেজারেকশনে'র প্রভাবে? তাই যদি হয়ে থাকে তবে টলস্টয়ের নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলতে হবে। তিনি তো আর্টের জন্যে আর্ট সৃষ্টি করেননি। তাঁর ছিল সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। বেশ্যাবৃত্তির মতো হাজার হাজার বছরের ইভিল কি আর কোনো উপায়ে দূর হতে পারত? বিপ্লব ভিন্ন?

'রেজারেকশন' এই অর্থে মেরী ম্যাগডালেনেরও পুনরুত্থান। কাতুশা মাসলোভা তারই প্রতিরূপ। মেয়েটির সর্বনাশ হয়েছিল ঠিকই, তবু তার মধ্যে কয়েকটি সদ্‌গুণ ছিল। সে কিছুতেই মিথ্যা কথা বলবে না। আত্মরক্ষার জন্যেও না। যে সত্যে স্থির সেও তো সতী। কায়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থে। সে পরদুঃখকাতর। পরের জন্যে সাহায্য চায়, নিজের জন্যে নয়। সাজা পেলেও সে বিচলিত নয়। সাজাও একদিক থেকে ভালো। সাজা না পেলে সে কি বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে আসতে পারত? সৎপ্রকৃতির মানুষের সাক্ষাৎ পেত? বেশ্যালয়ে পচে মরত না? সাইবেরিয়াও তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়। আর যাই হোক সে নরক নয়। দূর থেকে ভয়ঙ্কর দেখায়। কাছে গেলে ভয় ভেঙে যায়।

দ্বিতীয়ত, 'রেজারেকশন' হচ্ছে নেখলুডভেরও পুনরুত্থান। নীতিহীন জীবনে সে সুখের অন্বেষণ করছিল। তার মতো আরো অনেকে। তারা তারই মতো সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোক। তাদের কেউ বা জমিদার, কেউ বা বণিক, কেউ বা সামরিক কর্মচারী, কেউ বা অসামরিক কর্মচারী। আবার কেউ বা চার্চের ধর্মাধিকারী। এদের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার বোঝা জগদ্দল পাথরের মতো চেপেছিল যাদের পিঠে তারা দেশের পরিশ্রমী জনগণ।

নেখলুডভ মর্মে মর্মে অনুভব করে যে তার ও তার শ্রেণীর জীবনযাপনের ধারা ঠিক নয়। যা ঠিক নয় তাকে শোধরাতে হবে। তা যদি সময়ে শোধরানো না হয় তবে মহতী বিনষ্টি। সে নিজের জীবন যাপনের ধারা শোধরানোর সংকল্প নেয়। ফলে তার যে পরিবর্তন হয় সেটাও টলস্টয়ের মতো একপ্রকার কনভারসান। ভিতরে ভিতরে সে মরে যাচ্ছিল, মরণ থেকে তার পুনরুত্থান হলো। তারই মতো যদি তার শ্রেণীর সকলের হতো তাহলে রুশদেশেরও বিনা দ্বন্দ্বে পুনরুত্থান হতো। কার্যত তা হলো না, হবার নয়। সুবিধাভোগী শ্রেণী কখনো বিনা দ্বন্দ্বে আত্মসমর্পণ করে না। এ বই বেরোনোর বিশ বছরের মধ্যে ওইসব প্রিন্স, কাউণ্ট, জেনারেলের দল হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল! তাসের কেল্লার মতো ভেঙে পড়ল পুরাতন শৃঙ্খলা। সবচেয়ে ক্ষতি হলো চার্চের। বিপ্লবীরা নিরীশ্বরবাদী। যারা ঈশ্বরই মানে না তারা খ্রীস্টকে মানবে কেন? যারা খ্রীস্টকে মানে না তারা গির্জাকে পুষবে কেন? গির্জার সম্পত্তিকে রেহাই দেবে কেন? রাষ্ট্র নতুন কর্তাদের হস্তগত হয়ে রক্ষা পেল। কিন্তু চার্চ গেল সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে সহমরণে বা সহপলায়নে।

চার্চ গেল বলে কি খ্রীস্টধর্ম গেল? রাশিয়ার জনগণ মনে প্রাণে খ্রীস্টান। তাদের কাছ থেকেই টলস্টয় খ্রীস্টধর্মের কর্মগত প্রেরণা পেয়েছিলেন। বাইবেল থেকে যা পেয়েছিলেন তা পুঁথিগত শিক্ষা। বেঁচে থাকলে তিনি দেখে মর্মাহত হতেন যে স্নানের ঘরের ময়লা জলের সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকেও ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর 'রেজারেকশন' লেখা ব্যর্থ। তাঁর নিজের পরিবারের লোকই পলাতক। কপিরাইট লুপ্ত। সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত। আয়ের পন্থা কোথায় যে মানসম্ভ্রম নিয়ে ওঁরা বাঁচবেন! সত্যি সত্যি কায়িক পরিশ্রম করতে হবে নাকি। আমার তো প্রত্যয় হয় না যে উপন্যাসের নায়ক কায়িক পরিশ্রম দিয়ে পরিবার পোষণ করত। ততদূর পরিবর্তন টলস্টয় তার চরিত্রে দেখাননি। দেখিয়েছেন কাতুশার চরিত্রে। সে কায়িক শ্রমে কাতর তো নয়ই বরং উৎসাহী। সে জনগণের কন্যা। কায়িক শ্রমের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বেশ্যালয়ে। তাতেই তার চরিত্রহানি ঘটেছিল। চরিত্র ফিরে পায় কঠোর কায়িক শ্রমে। অনুতপ্ত বিবেকী জমিদার নয়, গুণমুগ্ধ তেজস্বী বিপ্লবীই তার মনের মতো পুরুষ।

নেখলুডভও উচ্চমনা পুরুষ। কিন্তু সে বরাবর একটা ভুল ধারণা নিয়ে কাজ করেছে। তার ধারণা যে-সর্বনাশটা সে করেছে তার প্রকৃষ্ট প্রতিকার হচ্ছে বিবাহ। কিন্তু বিবাহও কুলটাকে কুল দিতে পারে না, গণিকাকে গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদা দিতে পারে না। যদি না বিশ্বময় একটা ভাববিপ্লব ঘটে যায়। বেশ্যাবৃত্তি রহিত করা সেদিকে একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ। কিন্তু সেই যথেষ্ট নয়। বেশ্যাকে বিয়ে করতে আদর্শবাদী পুরুষ এগিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজনরা তার বধূকে স্বীকৃতি দিতে ও স্বাগত করতে এগিয়ে আসবে না। পাড়াপড়শী পাড়ায় টিকতে দেবে না। কিংবা পাড়ার বখাটে ছেলেরা এসে উত্যক্ত করবে। যে অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে সীতাকে

যেতে হয়েছিল তার চেয়েও অসহনীয় অগ্নিপরীক্ষা একজন আনা বা কাতুশার সম্মুখে। তেমন এক অগ্নিপরীক্ষার দিন সে কি ভ্রনস্কির উপর বা নেখলুডভের উপর নির্ভর করতে পারবে? সীতাও কি পারলেন রামের উপর নির্ভর করতে? লোকভয়, সমাজভয়, রামের মতো মহামানবকেও সীতার মতো সতীনারীর মানরক্ষা করতে দেয়নি। আর এরা তো সতী নারীও নয়। হতে পারে অন্তরের দিক থেকে খাঁটি সোনা।

এক্ষেত্রে নেখলুডভ বা সাইমনসনের মতো পুরুষের কাছ থেকে কাতুশার মতো নারী যা প্রত্যাশা করে তার নাম বিবাহ নয়, প্রেম। সাইমনসন বিবাহের নাম উচ্চারণ করেছে। না করলেও পারত। কাতুশাকে সে ভালোবাসে। ভালোবাসাই কাতুশার মৃতসঞ্জীবনী। তাই দিয়েই তার রেজারেকশন বা পুনরুত্থান। নেখলুডভ যদি তাকে ভালোবাসত তবে তার সেই ভালোবাসার উপর নির্ভর করেই কাতুশা তার হাত ধরত। প্রেমের জন্যে নারী সর্বস্ব হারাতে পারে। সতীত্বও তার মধ্যে পড়ে। প্রেমই সেই সোনার কাঠি যার ছোঁওয়া লেগে অসতী সতী হয়। প্রথম বয়সে কাতুশা ও নেখলুডভ দু'জনেই দু'জনের প্রেমে পড়েছিল। সেটা কামগন্ধহীন মিষ্টি প্রেম। তিন বছর বাদে যেটা এল সেটা কাতুশাকে আচমকা নষ্ট করে গেল। নষ্টের গোড়া নেখলুডভের প্রেমহীন কাম। দশ বছর বাদে তার মধ্যে জাগ্রত হলো বিবেক। কিন্তু প্রেমের স্থান কি বিবেক নিতে পারে? প্রেমের জন্যে পিপাসিত হৃদয়কে তৃষ্ণার জল দিতে পারল না বিবেকবান প্রাক্তন প্রেমিক ও কামী। সে বিবেকের দায়ে বিবাহ করতে চায়, প্রেমের দায়ে নয়। সে প্রাণভরে ভালোবাসে না। ভালোবাসলে দেহকেও ভালোবাসতে হয়। তার বেলা সে কুণ্ঠিত। মনে মনে যা চেয়েছিল তা প্রেম নয়, বিবাহও নয়, তা ক্ষমা, তা মুক্তি। কাতুশা তাই তাকে দেয়।

নেখলুডভের বিশ্বাস কাতুশা তাকে ভালোবাসে বলেই বিবাহের দায় থেকে অব্যাহতি দিল। সে যাতে সমান ঘরে বিয়ে করে সুখী হতে পারে! আত্মত্যাগে নায়ক নায়িকাকে নয়, নায়িকাই নায়ককে ছাড়িয়ে গেল। মিলনান্ত না হলেও এ কাহিনী ট্র্যাজিক নয়। না কাতুশার পক্ষে, না নেখলুডভের পক্ষে। বিপ্লবী সাইমনসনকে দেবতার মতো আকাশ থেকে নামিয়ে এনে টলস্টয় শেষরক্ষা করেছেন। সেটা একটা মামুলী কৌশল। সেই কারণে এ কাহিনী দুর্বলও হয়েছে। সাইমনসন আবির্ভূত হয়ে কাতুশার ভার না নিলে নেখলুডভকে চারটি বছর সাইবেরিয়ায় একঘরে হয়ে কাটাতে হতো। ও যে শ্রমিক বা কৃষাণের জীবনের শরিক হতো তা তো মনে হয় না। জমিদারি থেকেই মাসোহারা পাঠানো হতো। কাতুশা ওকে বিয়ে করতে রাজী হলেও সমাজে মেলামেশা সুগম হতো না। অসিধারব্রতও ভঙ্গ হতো।

এটা টলস্টয়েরও ব্যক্তিগত সমস্যা! এই জমিদারঘটিত ব্যাপারটা স্ত্রীর নামে লিখে দিলেও উপস্বত্ব তিনি নিজেও ভোগ করতেন। জীবনযাত্রার স্টাইলের বিশেষ হেরফের হয়নি। এর জন্যে তাঁর মনে অস্বস্তি ছিল।

অপরাধবোধ ছিল। নেখলুডভ এদিক থেকে আর একটি লেভিন। অর্থাৎ টলস্টয়।

তা ছাড়া আমার মনে হয় যে-কাঁটা নেখলুডভের বিবেকে বিঁধে রয়েছিল সে কাঁটা টলস্টয়ের নিজের বিবেকেও। সেটা সম্পত্তিঘটিত নয়। কুমারীর কৌমার্যঘটিত। ক্ষমা! ক্ষমা! ক্ষমার জন্যে তাঁর অন্তরাত্মা আকুল। এ বই লিখে তিনি শাপমুক্ত হলেন। তার মানে এ নয় যে কাহিনীর সমস্তটা সত্য। গোড়ার দিকটা সত্য হওয়াই সম্ভবপর। ঋষি বাল্মীকিও তো যৌবনে দস্যু রত্নাকর ছিলেন।

আর্ট সম্বন্ধে টলস্টয় যেসব নতুন সূত্র নির্দেশ করেছিলেন সেসব তিনি ছোটগল্পের বেলাও পালন করেছিলেন। বড়গল্পের বেলাও বহু পরিমাণে। কিন্তু 'রেজারেকশন' লিখতে গিয়ে তিনি নিজেই নিজের নির্দেশ থেকে সরে যান। ফিরে যান সাবেক সূত্রে। 'সমর ও শান্তি' আর 'আনা কারেনিনা'র সঙ্গে 'রেজারেকশনে'র কলাবিধি সংক্রান্ত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। থাকলেও প্রকট নয়। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় অপরাধের বিচার কী ভাবে হতো, শাস্তি কী প্রকার হতো, কারাবাস ও নির্বাসন কেমনতর হতো, এসব যদি বিশদ করতে হয় তবে উপন্যাস বৃহদায়তন হবেই। আর উপন্যাস যদি বিশ্বকোষ হয় আর্টের সূত্র পুরোপুরি মেনে চলা সম্ভব নয়। কী নতুন কী পুরানো। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি বাক্য ঠিক ঠিক লিখতে গেলে উপন্যাস লেখা চলে না।

'আনা কারেনিনা' প্রেমের উপন্যাস। যদিও সে প্রেম নিষ্কাম নয়। প্যাশনপূর্ণ। 'রেজারেকশন' প্রেমের উপন্যাস নয়। এর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে অবলার উপর প্রবলের কাম থেকে, সমাধান হয়েছে প্রবলের প্রায়শ্চিত্তে ও অবলার পূর্ণ মর্যাদালাভে। অবলাই নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে। টলস্টয় সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন ক্ষমা-গুণকে। বলবানই ক্ষমা করতে পারে। দুর্বল পারে না। কাতুশা অবশেষে আশ্বাস দেয় যে সব শোধবোধ হয়ে গেছে। তখন নেখলুডভ তার বন্দনা করে। "কী যে ভালো মেয়ে তুমি!" বিবেকের তাড়নায় বিবাহ কি কাতুশাকে কৃতার্থ করত! না। সেভাবে একটা ঘোর অন্যায়ের প্রতিকার হতো, কিন্তু অন্যায় আর প্রতিকার নিয়েই কি নরনারীর আনন্দ? অমন এক নিরানন্দ ঘরসংসার নিয়ে কাতুশাই বা কী করত আর নেখলুডভই বা কী করত!

টলস্টয়ের 'রেজারেকশন' হচ্ছে অর্ধ-খ্রীস্টীয় আর অর্ধ-বৈপ্লবিক। তার এক জায়গায় কার্ল মার্কস লিখিত সুসমাচারেরও উল্লেখ আছে। তবে বিপ্লবীদের বেশীর ভাগই মার্কসবাদী নয়, নারদনিক বা পপুলিস্ট। তাদের অভিষ্ট প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ নয়, পীপলস ডেমোক্রাসী। কাতুশাকে উন্নত করতে নেখলুডভ একক তপস্যায় অক্ষম হতো। তার সমস্যার সমাধান খ্রীস্টেরও অসাধ্য হতো, যদি না মারিয়া পাভলোভনা, সাইমনসন প্রমুখ বিপ্লবীরা এসে অসাধ্যসাধন করত। তাদের যে নীতি তাতে কাতুশা পতিতা

নয়, পাপীয়সী নয়, শোষিতা। সাইমনসন তাকে সাদরে গ্রহণ করে। নেখলুডভরা নয়, সাইমনসনরাই নারী ও শূদ্রের ভরসা। তা হলেও টলস্টয়ের এই টেস্টামেণ্ট মথি-লিখিত সুসমাচারেই শেষ।

ইচ্ছা করলে ও চেষ্টা করলে বেশ্যাও শুচি হতে পরে, সাধ্বী হতে পারে, পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথ নিতে পারে, পরকালে স্বর্গে যেতে পারে, কিন্তু ইহকালে কোনো মহাপুরুষ তাকে সমাজে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। খ্রীস্টও যে পেরেছিলেন তারও কোনো নজীর নেই। মেরী ম্যাগডালেনও সমাজে স্থান ফিরে পাননি। সব দেশেই সব যুগেই বেশ্যারা সমাজের বাইরে। নারীজাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যারা সমাজের ভিতরে ও যারা সমাজের বাইরে। পুরুষ বাইরে গেলে ভিতরে ফিরে আসে, কিন্তু নারী যদি একবার বাইরে গেল তো বাইরেই থেকে গেল। 'রেজারেকশনে'র সমস্যাটা তো হলো এইখানে। বিশ্বের প্রাচীনতম সমস্যা এই প্রাচীনতম পোশাকে ঘিরে। টলস্টয়ও কি এর মুখোমুখি হলেন? না পাশ কাটিয়ে গেলেন? আনাকে নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল সে সমস্যা মেটেনি, আনা সমাজ ফিরে পায়নি! কাতুশাকে নিয়ে যে সমস্যা সেটাও কি মিটল? সেও কি সমাজ ফিরে পেল?

(১৯৭৯)

টলস্টয়ের উপকথা

টলস্টয়ের যে-বইখানি প্রথমে আমার হাতে আসে সেখানির নাম 'টোয়েণ্টি-থ্রী টেলস'। স্কুল থেকে পাই প্রাইজ হিসাবে। শেষের উপকথাটির বাংলায় তর্জমা করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। নাম 'তিনটি প্রশ্ন'। সঙ্গে সঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তর আসে। লেখা মনজুর। ছাপা হবে। মাস দুয়েকের মধ্যে সত্যি সত্যি প্রকাশিত হলো। তা দেখে আমার সে কী আনন্দ! সালটা ১৯২০। বয়স ষোল। তখনো স্কুলের চৌকাঠ পেরোইনি। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা নয় তো কী! লেখাটা আমার নয়, টলস্টয়ের। নইলে ছাপা হতো না। তাঁরই দৌলতে আমার ছাপার অক্ষরে নাম ওঠে। সেই আমার প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। যদিও অনুবাদের কাজ।

সাহিত্যে আমার শিক্ষানবীশী সেইদিন থেকে শুরু। যাঁর কাছে শিক্ষানবীশী তিনি সব দেশের ও সব কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টলস্টয়। এক্ষেত্রে আমি জাতীয়তাবাদী নই। বিশ্বনাগরিক। আমার নিয়তি আমাকে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করে। কিন্তু সে-সময় আমি সচেতন ছিলুম না যে আমিও একজন সাহিত্যিক হব ও আমার হাত দিয়েও গল্প উপন্যাস হবে। আমার নিজের ধারণা ছিল না, চেতনাই ছিল না যে, পরবর্তী বয়সে আমার সম্বন্ধে বলা হবে, "তোমার 'সত্যাসত্য' হচ্ছে তোমার 'সমর ও শান্তি' আর তোমার 'রক্ত ও শ্রীমতী' তোমার 'আনা কারেনিনা'। শুনে তো আমি অবাক।

কখনো তো ভেবে দেখিনি যে টলস্টয়ের অনুসরণে আমিও লিখব দু'খানা বৃহৎ উপন্যাস। লেখা হয়ে যাবার পরেই কথাটা ওঠে। আমি বহুদিন থেকে তৃতীয় একখানা বৃহৎ উপন্যাস নিয়ে চিন্তান্বিত, সেটা যদি এ জীবনে লিখে উঠতে পারি তাহলে আবার হয়তো কথা উঠবে যে, "এই বইখানা তোমার 'রেজারেকশন'।" আমার এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইংরেজীতে যাকে বলে রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। টলস্টয়ের ধ্যানের রেজারেকশন আর আমার ধ্যানের রিনিউয়াল অবশ্য একই জিনিস নয়। তবু পুনরুত্থান ও পুনর্নবীকরণ দুটোই পুনঃ। আমার অজ্ঞাতসারে আমি টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। একথা আগে কখনো মনে হয়নি। বলা বাহুল্য তিনি ও আমি দুই স্বতন্ত্র ঐতিহ্যে মানুষ। আমি রবীন্দ্রনাথের আরো কাছাকাছি। আমার একটা কাব্যসাধনার দিকও আছে। অবহেলিত যদিও। টলস্টয় ছিলেন কাব্যরসবর্জিত।

টলস্টয়ের সেই তেইশটি গল্পের সবক'টি সে বয়সে আমি পড়িনি। পরে যখন কলেজ জীবনে টলস্টয়ের অন্যান্য বই পড়ি তখন আমি আরেকজন টলস্টয়কে আবিষ্কার করি, যাঁর সৃষ্টি 'আনা কারেনিনা'। আমার শিক্ষাগুরু তাহলে কোন্ টলস্টয়? যিনি আর্টের উপরে নীতিকে স্থান দেন, না যিনি নীতির আগে আর্টকে আসন দেন? যিনি এত সরল সহজ করে লেখেন যে একটি বারো বছরের ছেলেও বুঝতে পারে, যদি তর্জমাও মূলের অনুরূপ হয়। না যিনি পাঠকের বোধশক্তির উপর দৃষ্টি না রেখে বিষয়ের অন্তঃসারের উপরে ও প্রকাশের অন্তঃসৌন্দর্যের উপরে দৃষ্টি রাখেন? দুই টলস্টয়ের একজনকে যদি বেছে নিতে হয় তবে আমি 'আনা কারেনিনা'র রচয়িতাকেই মনোনয়ন করব। তেইশটি উপকথার বই তুলে রাখি। পড়া শেষ হয় না। কোথায় হারিয়ে যায়।

বইখানা হারিয়ে গেলেও মনের মধ্যে একটা খটকা থেকে যায়। টলস্টয়ের মতো বাক্‌সিদ্ধ সাহিত্যিক সরল সহজ করে চাষীমজুর ও অল্পবয়সীদের জন্যে লিখতে গেলেন কেন? ইচ্ছা করে যাবতীয় অলঙ্কার ত্যাগ করলেন কেন? বাহুল্য বর্জন করলেন কেন? খুঁটিনাটি পরিহার করলেন কেন? তবে কি তিনি আর আর্টিস্ট নন? লোকহিতের জন্যে আর্টকেও বিসর্জন দিয়েছেন? না এটাই আর্টের চরম সিদ্ধি? আর্ট যখন সর্বপ্রকার ছলাকলার ঊর্ধ্বে ওঠে তখনি তার আবেদন সর্বব্যাপী হয়। সকলের কাছে তার মর্মবাণী পৌঁছয়। ক'জন চাষী মজুর 'আনা কারেনিনা' পড়ে তৃপ্তি পায়? ক'জন বালকবালিকার হাতে সে বই দেওয়া যায়? দিলেও তারা রস পায়? অপর পক্ষে টলস্টয়ের তেইশটি উপকথা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে, বিভিন্ন ভাষায় তাদের তর্জমা হয়েছে। ষোল বছর বয়সী আমিই একজন তর্জমাকার। আরো কম বয়সীরাও সমজদার।

বড় হয়ে আমিও একজন লেখক হয়ে উঠি। কিন্তু টলস্টয়ের আদর্শে নয়। কতকটা রবীন্দ্রনাথের, কতকটা প্রমথ চৌধুরীর, কতকটা রম্যা রঁলার, কতকটা

পশ্চিম ইউরোপীয় সাহিত্যরথীদের। রম্যা রঁলারও লক্ষ্য ছিল পীপল পর্যন্ত পৌঁছনো। তাঁর দৌড় এলিৎ পর্যন্ত নয়। টলস্টয়ের কাছে তিনিও দীক্ষা নিয়েছিলেন। পরে মত পরিবর্তন করেন। শেষে দেখা গেল তিনি যে-পরিমাণে সমাজবিপ্লবী সেই পরিমাণে সাহিত্যশিল্পী নন। তাঁর রচনা বক্তব্য-প্রধান। আর সে-বক্তব্য ইতিমধ্যে বাসি হয়ে গেছে। অথচ টলস্টয়ের উপকথা-গুলি একশো বছর আগে যেমন তাজা ছিল এখনো তেমনি। সমাজের যে কোনো স্তরে, মানুষের যে কোনো বয়সে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এদের আবেদন সমান। এ কি কখনো সম্ভব হতো যদি না থাকত প্রচ্ছন্ন একপ্রকার আর্ট? যে আর্ট কলাকৌশলের ধার ধারে না। অথচ রসোত্তীর্ণ।

'সত্যাসত্য' শেষ করে আমি আবার টলস্টয়ের এইসব উপকথার দিকে ফিরি। আমারও সাধ যায় এমনি কয়েকটি উপকথা লিখতে, যেসব উপকথা জনগণের কাছে আদর পাবে। শুধুমাত্র বিদগ্ধ পাঠকের কাছে নয়। আমি আবার নিজেকে প্রশ্ন করি, "তুমি কি শুধুমাত্র এলিৎকুলের লেখক হবে, না জনগণের লেখক হবে?" উত্তর পাই, "না, শুধুমাত্র এলিৎকুলের নয়। আমার লক্ষ্য জনগণ। তবে ওদের জন্যে আমি আমার লেখার মান বা আমার আর্টের স্ট্যাণ্ডার্ড খাটো করতে পারব না। সব রকম চাতুরী, সব রকম ছলাকলা ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে শিবের বিরোধ বাধলে আমি শিবের চেয়ে সৌন্দর্যকেই পছন্দ করব। জনগণ যদি তাতে সন্তুষ্ট না হয় তবে আমি একলা চলব। যারা আমার সঙ্গে চলবে তাদের যদি এলিৎ বলো তো আমি নাচার।"

এ উত্তর টলস্টয়ের মনঃপূত হতো না। সৌন্দর্যের সঙ্গে শিবের বিরোধ বাধলে তিনি শিবের পক্ষে। মানুষ কী করে ভালো হবে, কী করে মানুষের ভালো করবে, সারা জীবনটা কী করে ভালোর সাধনায় কাটবে পরলোকে নয় ইহলোকেই কেমন করে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যার সবটাই ভালো, সমস্তটাই শ্রেয়—এই হলো তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা তথা সাহিত্যজিজ্ঞাসা। যত না তিনি আর্টিস্ট তার বেশী মরালিস্ট। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস লেখবার সময়ও তাঁর শ্রেয়োবোধ বা নীতিবোধ একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু 'আনা কারেনিনা' লেখার পরে এটা জাজ্বল্যমান হয়। তিনি কথায় ও কাজে ঋষি হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ উপকথাই 'আনা কারেনিনা'র পরে লেখা। তবে কয়েকটির আরম্ভ 'আনা'র পূর্বেকার। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই নৈতিক শ্রেয়োবোধ প্রবল। বিশেষত খ্রীস্টীয় করুণা ও ক্ষমা। ব্যতিক্রম 'ভালুক-শিকার'। সেটি একটি শিকারকাহিনী। যখনকার ঘটনা তখন তিনি মৃগয়ায় আমোদে যেতেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হন, মাছ মাংস পরিত্যাগ করেন। শেষ বয়সের টলস্টয় অহিংসাবাদী। কিন্তু তাঁর শিকারকাহিনী শিবের না হোক সত্যের অনুরোধে লেখা। রচনাশৈলীর দিক থেকে এটি অন্যান্য উপকথার মতোই। একটি কথাও পল্লবিত বা অতিরিক্ত নয়। তীরের মতো একলক্ষ্যে ধাবিত। কলাকৌশল বাদ দিয়ে এরকম একটি কাহিনী বলা যেন মশলা বাদ

দিয়ে তরকারি রাঁধা। এটি তো তবু আমিষ। আর সব নিরামিষ।

ইংরেজীতে যেমন 'টেল' আর 'স্টোরি' বাংলায় তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সেইজন্যেই আমি 'টেল'কে বলতে চাই উপকথা। আর 'স্টোরি'কে গল্প। 'টেল' এর মধ্যে পড়ে 'ফেয়ারি টেল'। তার মানে রূপকথা। আর 'ফোকটেল'। তার মানে লোককথা। টলস্টয়ের এই তেইশটি উপকথার মধ্যে গুটি দুয়েক বিদেশী গল্পও আছে। ফরাসী কথাসাহিত্যিক স্যাঁ পিয়ের ও মোপাসাঁর। টলস্টয় এ দুটিকে নিজের মতো করে লিখেছেন। সাতটি হলো রুশদেশের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত উপকথা। টলস্টয় এগুলির স্রষ্টা নন। তিনি এগুলিকে নিজের করে নিয়েছেন। একটি হচ্ছে রূপকথা। এটা তাঁরই বানানো। এছাড়া আছে ছেলেদের জন্যে লেখা গুটি দুই উপকথা ও বড়োদের জন্যে লেখা গুটি দশেক গল্প। বাকী রইল যেটি সেটি সেই শিকারকাহিনী। সত্যঘটনার বিবরণকে কি উপকথা বা গল্প বলা চলে? না বলি তো কী বলব?

কোন্‌টাকে বলব গল্প আর কোন্‌টাকে উপকথা এর বিচার করবে কে? একজনের মতে যেটা উপকথা আরেকজনের মতে সেটা গল্প। একজনের মতে যেটা গল্প আরেকজনের মতে সেটা উপকথা। যাই হোক, এই সংগ্রহের অধিকাংশই হচ্ছে উপকথা। যা মুখে মুখে বলা যায়। যা মৌখিক আকারে প্রচলিত। কালি কলমের অপেক্ষা রাখে না। লোকমুখে প্রচারিত হলে লোকশ্রুতি। যা শোনা যায়। টলস্টয় আপনাকে এর মধ্যে প্রক্ষেপ করেননি। তবে তাঁর প্রবণতাটা কোন্‌দিকে তা অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি রসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পরিবেশনও করতে চান। শিক্ষা এখানে নীতিশিক্ষা বা ধর্মের যেটা সার অংশ তারই শিক্ষা। তিনি যেন কথকতার ভার নিয়েছেন। তিনি যেন একজন গুরুমশায়। আমার উনিশ কুড়ি বছর বয়সে এতেই আমাকে বিরূপ করেছিল। আমি কি একজন রসজ্ঞ পাঠক নই? আমি কি একটি শিশু বা গ্রাম্য শ্রোতা? শিক্ষকদের কাছে পড়তে পড়তে আমি বিমুখ হয়ে উঠেছিলুম।

পরবর্তীকালে আমিও এসব উপকথার সমজদার হই। অনেক সময় ভেবেছি আমিও এ রকম কিছু দিয়ে যাব, যা সাধারণ লোক স্মরণ রাখবে, যেমন স্মরণ রেখেছে হাজারো লোকগাথা, লোককথা, প্রবাদ, ছড়া, গীতিকা। 'আর্ট কী' বলে টলস্টয়ের যে বিখ্যাত গ্রন্থ আছে তার থেকে একটি অংশ তুলে দিলে কথাটা আরো স্পষ্ট হবে। এর বাংলা অনুবাদ মোটামুটি এই রকম। "ভাবীকালের শিল্পীরা বুঝতে পারবে যে, জনাকতক ধনিকশ্রেণীর লোকের সাময়িক বিনোদনের জন্যে ক্ষণজীবী উপন্যাস বা সিমফনী বা চিত্র রচনার চেয়ে অতুল গুরুত্বপূর্ণ ও ফলবান হচ্ছে একটি রূপকথা বা একটি প্রাণস্পর্শী গীতিকা বা একটি ঘুমপাড়ানী ছড়া বা একটি সরস ধাঁধা বা একটি রঙ্গকৌতুক বা একটি নক্‌শা রচনা, যা চোদ্দ পুরুষ ধরে লক্ষ লক্ষ শিশুকে ও সাবালককে আনন্দ জোগাবে। মানুষের সরলতম অনুভূতিময় এই

যে শিল্পের খনি এতে সকল মানুষের প্রবেশ আছে। অথচ এর প্রায় সবটাই এখনো অনাবাদী পড়ে রয়েছে।"

ওই আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলেই তিনি এই জাতীয় রচনায় হাত দেন। তিনি যে মহান উপন্যাস লিখতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু তাঁর মতে মহান উপন্যাসের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ও বলবান হচ্ছে রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি মানুষের সরলতম অনুভূতির চিরায়ত প্রকাশ, যা লক্ষ লক্ষ শিশু ও সাবালকের আনন্দ বিধান করবে। কিন্তু, কই, তিনিও তো এ জাতীয় রচনা শত শত দিয়ে যেতে পারলেন না? যে ক'টি দিলেন তার থেকে পরের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস বাদ দিলে নিজের তৈরি জিনিস গুটি পনেরো। অবশ্য এই সংগ্রহের বাইরেও কিছু আছে। যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন 'ইভান ইলিচের মৃত্যু', যেমন 'প্রভু ও ভৃত্য'। সেগুলি কিন্তু আকারে বড়ো, প্রকারে জটিল। শিশুরা তার সমজদার হতে পারে না। সাবালকরা যদি অশিক্ষিত হয়ে থাকে তবে তারাও না। তা বলে কি সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম বলবান? আমি তো মনে করি টলস্টয় তাঁর শিল্পসাধনার উচ্চতম সোপানে পৌঁছেছেন ওই দুটি গল্প লিখে। কে ধনী, কে নির্ধন এ গণনা অবান্তর। সাময়িক বিনোদন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারাজীবনের রসাস্বাদনও হতে পারে। স্মরণীয়তাও একপুরুষে ফুরিয়ে যায় না, উপকথা না হয়ে যদি উপন্যাস হয়। আর আর্টের বিচার ভোট দিয়ে হয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ যাত্রা পছন্দ করে বলে যাত্রাই নাট্যকলার শেষকথা নয়। তার বেলা কালিদাসের শকুন্তলা বা শেকসপীয়ারের হ্যামলেট বা ম্যাকবেথ বা ওথেলো মহাকালের মনোনীত। সর্বজনগ্রাহ্য সরল অনুভূতি নিয়ে কালোত্তীর্ণ রচনার নিদর্শন গ্রীক নাট্যকারগণ রেখে গেছেন। কিন্তু তার সংখ্যাও শত শত নয়। সর্বসাধারণের চিরস্মরণীয় শিল্পসৃষ্টি কোন্ দেশে কোন্ কালে ক'টি বা হয়েছে? যে ক'টি হয়েছে সে ক'টি যদি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তো সর্বজনগ্রাহ্য নয় বিদগ্ধজনগ্রাহ্য। ব্যতিক্রম হচ্ছে হোমারের ইলিয়াড, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত। সেইরকম কয়েকটি কাব্য, নাটক, উপন্যাস তো আর্টের জগতে নতুন একটি বিভাগ।

টলস্টয় যা বলতে চান তার মানে বৃহৎমাত্রেই মহৎ নয়, ক্ষুদ্রও মহৎ হতে পারে, বৃহৎ হলেই স্থায়ী হয় না, ক্ষুদ্রও স্থায়ী হতে পারে, সাধারণের আনন্দ বরং ক্ষুদ্রতেই বেশী। আমি এ যুক্তি মানি। তা বলে বৃহতের গুরুত্ব কি অস্বীকার করতে পারি? সরলতম অনুভূতিই কি একমাত্র অনুভূতি? মানুষের জীবনে যতরকম অনুভূতি আছে সবরকম অনুভূতিই কাব্যের বা নাটকের বা উপন্যাসের বিষয়। জটিলতম ও কুটিলতমও অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। আধুনিক মানুষ আর্টের সীমানাকে সম্প্রসারিত করতে চায়। কেবল জনগণের দিকে নয়, বহু নিষিদ্ধ বা গোপনীয় অভিজ্ঞতার দিকেও। এতদিন যা প্রকাশ করতে বাধা ছিল তাও অবাধে প্রকাশ করা হচ্ছে। অথচ টলস্টয় মনে মনে একটা সীমানা বেঁধে দিয়েছেন। রসের থেকে আদিরস একেবারে বাদ গেছে।

তাঁর একটিও উপকথা আদিরসাত্মক নয়। নরনারীর প্রেম একেবারে অনুপস্থিত। বোধহয় এই কারণে যে শিশুরা তার সমজদার হবে না। যেন শিশুরা যার সমজদার নয় তার মূল্য যৎসামান্য।

এদেশে তো কানু বিনে গীত নেই। জনগণও সেই রসেরই রসিক। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি বেঁচে আছেন তাই নিয়ে। তাঁদের পদাবলী যে অমর হয়েছে তা নরনারীর প্রেমের মাধুর্যে। প্রেমিক প্রেমিকার একজনের কাছে অপরজন হচ্ছে দেবতা। আবার দেবতাই হচ্ছে প্রিয়জন। "দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" কিন্তু টলস্টয় বোধহয় এটা অনুমোদন করতেন না। নইলে তাঁর উপকথাসংগ্রহের মধ্যে একটিও প্রেমের উপকথা ঠাঁই পায়নি কেন? রুশদেশের জনগণের কি রসবোধ নেই? তাদের জীবনে কি মধুর রস নেই? প্রচলিত উপকথাগুলির ভিতরে ঈশ্বরপ্রেম আছে, মানবপ্রেম আছে, নেই শুধু মানবমানবী প্রেম। ভাবীকালের শিল্পীরা কি প্রেম বলতে রাধাকৃষ্ণ প্রেম বুঝবে না? তেমন প্রেমের পদাবলী লিখবে না? টলস্টয়ের শিল্পতত্ত্ব মেনে না নেবার এটাও ছিল আমার একটা কারণ। শিশুরা পড়বে না, বেশ তো, বড়ো হোক আগে, তারপর পড়বে। জনগণ পড়বে না, বেশ তো, লেখাপড়া শিখে প্রস্তুত হোক আগে। তার পরে পড়বে। ওরা প্রস্তুত নয় বলে আমি লিখতে পারব না এটা একপ্রকার মানা। সব দুয়ার মানুষের জন্যে খুলে দিতে হবে, এখানে আমি টলস্টয়ের সঙ্গে ষোল আনা একমত। কিন্তু লেখকরাও মানুষ। তাদের কাছে খোলা রাখতে হবে সব দুয়ার। ক্ষুদ্র কবিতা তথা বৃহৎ উপন্যাস। সরলতম অনুভূতি তথা জটিলতম অনুভূতি। ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম, নরনারীপ্রেম। যার জীবনের যেটা সত্য সেটাই তাকে লিখতে দিতে হবে। নেওয়া না নেওয়া পাঠকের রুচি।

এই উপকথাগুলির মধ্যে টলস্টয়ের নিজের সব চেয়ে প্রিয় ছিল 'ভগবান সত্যকে দেখেন, কিন্তু অপেক্ষা করেন' আর 'ককেশাসের বন্দী'। প্রথমটি তাঁর মতে ধর্মীয় আর্ট, দ্বিতীয়টি বিশ্বজনীন আর্ট। প্রথম উপকথার নায়ক আকসিওনভ নামে এক যুবক বণিক নিঝনির মেলায় মালপত্র বেচবার জন্যে বাড়ি থেকে রওনা হয়। পথে রাত কাটায় এক সরাইখানায়। সেখানে তার পাশের ঘরে শুয়েছিল তারই পরিচিত আরেকজন বণিক। পরের দিন ভোরবেলা সরাই থেকে বিদায় নেবার পর আকসিওনভ ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। তার মালপত্রের সঙ্গে তার ব্যাগে একখানা রক্তমাখা ছুরি পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে পাশের ঘরের বণিককে খুন করে বিশ হাজার টাকা চুরি করেছে। আকসিওনভ বলে সে এর কিছুই জানে না, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাকে বেত মারা হয়, খনিতে খাটানো হয়, সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়। সেখানে ছাব্বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পর সে অকালে বুড়িয়ে যায়। তার ধার্মিক স্বভাবের জন্যে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। এমন সময় এক নতুন কয়েদীকে সেই কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। আকসিওনভের শহরেই মাকার সেমেনিচের বাড়ি। কথাবার্তা

থেকে আকসিওনভ টের পায় যে এই সেই আসল খুনী। ক্রোধে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়, কিন্তু ভগবানের কাছে সারা রাত প্রার্থনা করে। রাতের পর রাত এইভাবে কাটে। একদিন আবিষ্কার করে মাকার কারাগার থেকে পালাবার জন্যে গর্ত খুঁড়ছে। পরে যখন তদন্ত হয় তখন আকসিওনভ মাকারের নাম করে তাকে ধরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে তাকে বাঁচিয়ে দেয়। মাকারের পাষাণ হৃদয় গলে যায়।

"Makar Semenich did not rise, but beat his head on the floor. 'Ivan Dmitrich, forgive me ! he cried. 'When they flogged me with the knout it was not so hard to bear as it is to see you now.....yet you had pity on me and did not tell. For Christ's sake forgive me, wretch that I am ! And he began to sob."

"ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন। আমি হয়তো তোমার চেয়ে শতগুণ খারাপ।" আকসিওনভ বলে। তার হৃদয়ের বোঝা নেমে যায়। তার বাড়ি ফিরে যাবার বাসনা থাকে না। মাকার সেমেনিচ কর্তাদের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু আকসিওনভের খালাসের হুকুম যখন এসে পৌঁছয় ততদিনে সে মৃত।

দুর্ধর্ষ তাতারদের রুশ বন্দী ঝিলিনকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে সাহায্য করে তাদেরই ছোট একটি মেয়ে। তার নাম দিনা। মানুষের অন্তরে মানুষের প্রতি কী অপার করুণা ! কার কী দেশ, কার কী জাতি, কার কী ভাষা এ প্রশ্ন মানুষের আপদে বিপদে মানুষের দয়ামায়ার পথে প্রতিবন্ধক হয় না। তার অন্তঃকরণের স্বাভাবিক মহত্ত্ব বাইরের ব্যবধান অতিক্রম করে। ঝিলিনের মতো দিনাও পাঠকের ভালোবাসা আকর্ষণ করে। তাতারদের সকলের চরিত্র মনুষ্যত্বের তুলিতে আঁকা হয়েছে। মানুষ হিসাবে তারা কেউ হীন নয়। শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ইসলামের উপরেও।

"মানুষ কিসে বাঁচে" এই নামের উপকথাটি বহুভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। এটি একটি অলৌকিক কাহিনী। এক গরিব কাঠুরের প্রাণ যায় গাছ কাটতে গিয়ে। দিন কয়েক পরে তার স্ত্রীরও মরণ আসন্ন হয় যমজ কন্যা প্রসব করতে গিয়ে। ভগবান তাঁর একজন এন্‌জেলকে পাঠান বিধবা জননীর আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। এন্‌জেলের নাম মাইকেল। বিধবা জননী তার অসহায় শিশুদুটির প্রাণরক্ষার জন্যে আরো কিছু দিন সবুর করতে অনুনয় করে। মা বাপ ছাড়া কি শিশু বাঁচতে পারে ? মাইকেল ভগবানের আদেশ অমান্য করে স্বর্গে ফিরে যায়। তখন ভগবান তাঁকে আবার আদেশ দেন বিধবা জননীর আত্মাকে নিয়ে আসতে। তার পরে তাঁকে মর্ত্যে নির্বাসন দেন। তাঁকে মানুষের সঙ্গে মানুষ হয়ে ততদিন দেহধারণ করতে হবে যতদিন না তিনি তিনটি প্রশ্নের উত্তর পান। তিনটি উত্তর হচ্ছে তিনটি সত্য। মানুষের ভিতরে কী নিবাস করে ? মানুষকে কী দেওয়া হয়নি ? মানুষ কিসে বাঁচে ?

মাইকেল একদিন আসমান থেকে মাটিতে পড়ে দেখেন তাঁর ডানা নেই। তাঁর গায়ে কাপড় নেই। তিনি শীতে কাঁপছেন। একজন মুচি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে নিজে দুঃস্থ হলেও অচেনা অজানা আর্ত মানুষকে দয়া করে বাড়ি নিয়ে যায়। তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনে ওঁকে অশন বসন আশ্রয় দেয়। কিন্তু কিছুতেই ওঁর পরিচয় পান না। মাইকেল সাইমনের কাছে শিখে মুচির কাজ করেন। ওঁর কাজের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়ায়। এক ধনী লোক একদিন গাড়ি করে এসে তাঁকে একজোড়া বুটজুতোর ফরমাস দেন। জুতোজোড়া যেন এক বছর মজবুত থাকে, ফেটে না যায়। মাইকেল কিন্তু বুট না বানিয়ে চটি বানান। সেইদিনই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয় ও তাঁর স্ত্রী বলে পাঠান বুটের দরকার হবে না, চটির দরকার হবে। শবযাত্রার সময় চটি পায়ে দেওয়াই প্রথা।

একদিন এক মহিলা আসেন। সঙ্গে যমজ কন্যা। তাদের জুতো বানাতে হবে। কিন্তু একটির একটি পা খোঁড়া। মাইকেল চিনতে পারেন যে এই সেই যমজ মেয়েদের একজন যার পায়ের উপর তার মা গড়িয়ে পড়েছিল মৃত্যুর সময়। মহিলাটির মুখে শোনা গেল শিশুদুটিকে তিনি নিজের সন্তানের সঙ্গে পালন করেন, নিজের সন্তান বেঁচে নেই, এরাই তাঁর সন্তানের মতো প্রিয়। দেখা গেল মা বাপ ছাড়াও মানুষ বাঁচে। যা পেয়ে বাঁচে তা প্রতিবেশীর স্নেহমমতা। যা পরকে আপন করে। ভগবানই শিশুদুটিকে মহিলাটির হৃদয়ের বাৎসল্যরস দিয়ে বাঁচান।

এক এক করে তিনটি প্রশ্নের উত্তর পান মাইকেল। মানুষের অন্তরে দয়ামায়ার নিবাস। মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি কী তার প্রকৃত প্রয়োজন, নিত্যপরিধেয় বর্ষাকালস্থায়ী বুটজুতো না অদ্যপরিধেয় শবযাত্রার চটিজুতো। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আর-সকলের প্রেম প্রীতি স্নেহমমতা। এই তিনটি সত্যের জ্ঞান লাভ করে মাইকেল মর্ত্য থেকে স্বর্গে ফিরে যান। যাবার সময় আবার তাঁর ডানা গজায়।

এইরকম আরেকটি উপকথা "যেখানে প্রেম আছে সেখানে ভগবান আছেন।" মার্টিন বলে একটি গরিব মুচির স্ত্রী মারা যায়, পরে একমাত্র ছেলে মারা যায়। সেও আর বাঁচতে চায় না। কিন্তু একজন বৃদ্ধ তীর্থপথিক তাকে নিজের জন্যে না বেঁচে ঈশ্বরের জন্যে বাঁচতে উপদেশ দেন। যিনি তাকে প্রাণ দিয়েছেন তিনি তাঁর কাজের জন্যেই দিয়েছেন। এর পর মার্টিন জীবিকা অর্জনের পর অবসরকালে বাইবেল পাঠ করে। তাতেই তার শান্তি। খ্রীস্টের বাণী থেকে সে জানতে পায় যে তিনি অতিথি হয়ে আসেন, তখন কেউ বা তাঁকে সমাদর করে, কেউ বা নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকে। তাঁকে ফিরিয়ে দেয়।

একদিন ঘুমের ঘোরে সে শোনে, "রাস্তার উপরে নজর রেখো। কাল আমি আসব।" পরের দিন সে প্রভু খ্রীস্টের পথ চেয়ে থাকে। তিনি আসেন না। কিন্তু আসে স্টেপানিচ নামে এক বুড়ো শ্রমিক। তার কাজ বরফ পরিষ্কার করা। শ্রান্ত ক্লান্ত শীতার্ত লোকটিকে ঘরে ডেকে এনে তাকে চাঙ্গা করবার

জন্যে চা তৈরি করে খাওয়ায় মার্টিন। তার পর আসে একটি শিশু কোলে করে একজন স্ত্রীলোক। শীতের কাপড় নেই। যা পরে আছে তা দিয়ে শীত নিবারণ হয় না তার নিজেরই। তাই জড়ায় শিশুর গায়ে। ওদের ভিতরে ডেকে আনে মার্টিন। জানতে পারে ওদের খাওয়া হয়নি। ওদের খেতে দেয় মার্টিন। অভাবে পড়ে পরণের শাল পর্যন্ত বাঁধা দিতে হয়েছে। মার্টিন একটি পুরোনো আচ্ছাদন নেয়। আনা ছয়েক পয়সাও দেয় শালটা ছাড়িয়ে আনতে।

এর পরে মার্টিন লক্ষ করে এক ফলওয়ালী বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেছে একটি ছেলের। বুড়ীর ঝুড়ি থেকে একটা আপেল সরাবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে বাবাজী। মার্টিন গিয়ে ওদের ঝগড়া মেটায়। ছেলেটিকে বলে ক্ষমা চাইতে। বুড়ীটিকে বলে ক্ষমা করতে। দু'জনাতে ভাব হয়ে যায়।

দিনটা তো এমনি করে কেটে গেল। কই, প্রভু তো দেখা দিলেন না। মার্টিন রাতেরবেলা বাইবেল খুলে পড়তে বসে। তার মনে হয় সে শুনতে পাচ্ছে কাদের যেন পদধ্বনি। কে যেন কানে কানে বলছে, "মার্টিন, মার্টিন, আমাকে চিনতে পারছ না?" মার্টিন বলে, "কে?" কণ্ঠস্বর বলে, "আমি।" অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে স্টেপানিচ। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। আবার মার্টিন বলে "কে?" আবার কণ্ঠস্বর বলে, "আমি।" অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই স্ত্রীলোক আর তার শিশু। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। আবার মার্টিন বলে, "কে?" আবার কণ্ঠস্বর বলে, "আমি।" অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই বুড়ী আর সেই ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

বাইবেল খুলতেই চোখে পড়ে "আমি ছিলুম ক্ষুধার্ত, তুমি আমাকে খাদ্য দিলে। আমি ছিলুম অচেনা অজানা। তুমি আমাকে ঘরে নিয়ে গেলে।" পাতার নিচের দিকে নজরে পড়ে, "যেহেতু তুমি এসব কাজ করলে আমার একজন ভাইয়ের বেলা, এমন কি যেজন সকলের ছোট তার বেলা, সেহেতু তুমি করলে আমারই বেলা।"

মার্টিন এবার বুঝতে পারে যে তিনিই এসেছিলেন বিভিন্ন রূপ ধরে। সে তাঁর সমাদর করেছে। অতিথির মতো।

মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ছিল 'বোকা ইভানের কাহিনী'। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বোকা ইভানের মতো সৈন্যসামন্ত ও ধনসম্পদ অগ্রাহ্য করে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা রাজ্য চালানো যায়, রাজ্য রক্ষা করা যায়। টলস্টয় এটিকে বলেছেন রূপকথা। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর আদর্শ সমাজের রূপরেখা। এই রাজ্যও একপ্রকার ইউটোপিয়া। এখানে কেউ অভুক্ত থাকবে না। কিন্তু আগে খেতে দেওয়া হবে তাদেরই যাদের হাতে কড়া পড়ে গেছে হাত দিয়ে কাজ করতে করতে। তাদের খাওয়াদাওয়ার পর যা বাঁচবে তা দেওয়া হবে আমাদের মতো বুদ্ধিজীবীদের যারা লাঙল বা শাবল ধরে না, যাদের হাতে কড়া পড়ে না। ওদের আসন হবে খানা টেবিলে, আমাদের আসন হবে মেজেতে। আমরাই ইতর জন। ওরা ভদ্র। টলস্টয়ের লেখায় সাধারণত

হাস্যরস থাকে না, কিন্তু বোকা ইভানের কাহিনী হাস্যরসে ভরপুর। মিলিটারিস্ট আর ক্যাপিটালিস্টদের তিনি হাস্যকর করে তুলেছেন, সব চেয়ে হাস্যাস্পদ করেছেন যারা মস্তিষ্কের জাঁক করে তাদের।

(১৯৭৯)

সমর ও শান্তি

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনিতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু ইউরোপীয়রা বলতে পারেন জীবনের প্রতি অবস্থায় তো দুঃখ সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য কোথায়? পরম্পরা যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দুঃখ তা নয়, আর বিশ্রাম যে অবিমিশ্র সুখের তাও নয়। সুখ দুঃখ নিরপেক্ষভাবে সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম। এবং দুই মিলিয়ে জীবন যদি হয় পদ্য তবে সংগ্রাম ও বিশ্রাম বোধহয় 'দুঃখ' ও 'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল।

ইউরোপের ইতিহাস—ইউরোপ-নির্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস—মাত্র দুটি শব্দের উলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে, কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো নেশনে নেশনে সমর যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের ভেঙে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। এ খেলা ফুরোয় না, ফুরোবার নয়।

টলস্টয় প্রণীত 'সমর ও শান্তি' নেপোলিয়নীয় যুগের ইতিহাস। ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়কনায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক বল নায়িকা বল সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণ মন সম্মান। অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের ভগ্নাংশ। এর বিষয় এর দেশকালরহিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানব-করতলরেখা।

রুশ সৈন্যরা অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউস্টারলিৎসের রণক্ষেত্রে। হেরে যায়, "হেরে গেছি" এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। পরে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎকার ঘটে, বন্ধুতা হয়। আবার ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে সেই মৈত্রী পর্যবসিত হলো শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজভ দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কো প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কো জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল শহরে

আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট করে ফরাসীরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচার ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগ মাংসে তারই মত দশা হলো তাদের। যতটা পথ এসেছিল ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহুগুণ মনে হলো। কুটুজভ ইচ্ছা করলেই রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের নির্বংশ করতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হলো না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁরা কোনো কোনো সৈনিক কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আর্মে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হলো পথি বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন মস্ত এক লম্ফ।

এই হল কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড়ো বড়ো কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড়ো বড়ো কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্রপাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙ্ সমস্তটা হতো অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের ঝড়ের মতো চলা, অধিক কৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠোনের দোষ—নেপোলিয়নের সর্দিকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজভ মস্কো রক্ষা না-করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন, তাঁর পরামর্শ-পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে সেখানে ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলস্টয় বলতেন, এ কি আমরা না-ভেবেচিন্তে করেছি? আমরা অনেকদিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছিলুম যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আনব ও মস্কো খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলস্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা কেমন করে ঘটল, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে তারা জানে কার কত দূর দৌড়। কিন্তু যুদ্ধে অপর পক্ষের সামর্থ্য পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ঐটেই একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের ছোট ছোট ঈর্ষা দ্বেষ। তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘরসংসার, কেউ গণনা করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের এক-একজনের এক-এক মত, তাদের সবাইকে এক মনে কাজ করানো প্রধান সেনাপতির নিত্য সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা জয়গৌরব ততটা নয় যতটা লুটতরাজ। মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে। যুদ্ধ জিনিসটা একজনের হুকুমে হয় এর মত ভ্রান্তি আর নেই। যুদ্ধ হয়, একবার কোনো মতে শুরু করে দিলে আপনা-আপনি। থামে হয়তো একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা হেরে

গেছি।" অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কী যে তার অন্তিম ফল টলস্টয় তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম করলেন, "যুদ্ধ হোক", আর অমনি যুদ্ধ হলো এই সুলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান। নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবা নন, প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কোতে তিনি আগাগোড়া নির্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কোর ধনসম্ভার তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূরদেশে এনেছিল। সেই লোভের তাণ্ডব নাচ চলল। নেপোলিয়ন মোরগের মতো নিশ্চিত জানতেন যে, নাগরিকরা তাঁর লম্বা চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকানপাট বসাবে। গ্রামিকরা আসবে মাছ, তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন যে, যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও তেমনি তিনি প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলস্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোস্টোপশিনের অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে তা কিন্তু বলা যায় না। হয়তো রাশিয়ানরা, হয়তো ফরাসীরা। যে-ই দিক সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কিসের ফল কী দাঁড়াবে।

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কোতে এই যে তাদের অপ্রতিরোধের সংকল্প এ-ও কারুর নির্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এ-ও তারা একজোট হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ। এমন যদি না হতো তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাধাত, প্রলয়ঙ্করের করতালি তো এক হাতে বাজে না।

শেষ জীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাববিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্বাভাষ তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়। নামহীন পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা। পারেননি, এমনি উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল অভিজাত্য উন্মূল হলো না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে। গান্ধীজীর জীবনাদর্শে। টলস্টয়কে দ্বিখণ্ডিত করে কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা এই তাঁর উভয় বয়সের, উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের সংকেত। শিল্পী-ঋষি ও সাধু-ঋষি মূলত ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্রপাত্রী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ

ব্যক্তিরা নন। নাম পরিচয়হীন নির্বিশেষ জনতা যা করে তাই হয়। এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালী নয়, তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের বোধের অতীত বলে আমরা একদা তাকে স্থাণু মনে করেছিলুম, তেমনি নিয়তির ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আমরা ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির। বিচিত্র সংসারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেশনে নেশনে। কিন্তু অলক্ষিতে বালিকা হয়ে উঠেছে বালা, বালা হয়ে উঠেছে নব-যুবতী। অন্তরীক্ষে শীতের সূর্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নীল। কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণী একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ধূমে ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হয়ে? টলস্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরলতার ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অভাব অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব। কারুর অতি বড় সর্বনাশ ঘটে না, জীবন-দেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সদ্ব্যবস্থা করেন। কাউকে দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে। কাউকে রাখেন চিরকুমারী করে, নিজের নিষ্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভাবনা ভেবে। মরতে মরতে বেঁচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে এটুকু পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায় নেই যে প্রত্যেকটি কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের মতো উৎরেছে। তার মানে ওরা আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছেন যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসে থাকলে বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মতো শান্তিকালেও টলস্টয় পড়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বিকাশ, বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। দ্বন্দ্বের স্থান রণাঙ্গনে। গৃহে বড়ো জোর একটু মান অভিমান, সহজ কলহ। একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে, বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে, একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তি যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর বলে গণ্য হবে তা তো ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষত রাশিয়ায়, এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গণ্ডী কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি। তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে জিজ্ঞাসা ছিল।

(২)

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলস্টয়কে ঢের বেশী আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে? এর এক-একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক-এক জনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে নাম করা যায় নাটাশার, মারিয়ার, সোনিয়ার, হেলেনের। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় অ্যাণ্ড্রুকে, পিটারকে, নিকোলাসকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এত রকম এত ব্যক্তি অন্য কোন গ্রন্থে আছে? ডস্টয়েভ্স্কিও টলস্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। সে দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনো তার পুতুল খেলার অভ্যাস ভাঙেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী। সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোনো অপ্সরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অখলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল অ্যাণ্ড্রুকে। অ্যাণ্ড্রু উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা। বয়সেও বড়ো। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর ধ্যান। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খুচরো খরচ হয়েছিল, বাজে খরচ। বিরক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শস্থানীয় বলে বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হলেন। প্রশান্ত নীল আকাশের নীচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হলো তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ঐ অসীম বিশ্বরহস্য। এমন যে অ্যাণ্ড্রু, তাঁরও নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করল নাটাশার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরনা। এক বছরের জন্যে অ্যাণ্ড্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে বিয়ে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠল। এল তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের কবলে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল। বাধা পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। বেঁচে গেল কিন্তু বদলে গেল। অ্যাণ্ড্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে তাঁর জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনো রূপ মহত্ত্ব প্রত্যাশা করলেন না, এত দুর্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, এইবার মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন। ঘটনাচক্রে নাটাশাদের আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হলো দিব্য ভাবে। তিনি ক্ষমা করলেন, তিনি ভালোবাসলেন,

প্রাণীমাত্রকে, সংসারকে। তাঁর মনে ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে আশীর্বাদ করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালোবাসত পিটার। লোকটা কেবল যে লাজুক, ভালোমানুষ, কিম্ভূতকিমাকার, মাথাপাগলা তাই নয়, নামগোত্রহীন সত্যকাম। তাই কাউকে কোনদিন জানায়নি ভালোবাসার কথা। হঠাৎ মারা গেলেন কাউণ্ট বেসুকো, উত্তরাধিকারী হলো পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির তথা পদবীর। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগসম্পন্ন প্রতিপত্তিমান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হলো যার সঙ্গে সে অসামান্য রূপবতী, সোসাইটির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, হেলেন। কোনো পক্ষে প্রেম নেই। বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হলো। হেলেন খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রানীমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হলো ফ্রীমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণব্রতরত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালোবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মতো বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেল যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়। সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুকও ছুঁড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের শেষ ফল হলো এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল। তার চোখের সুমুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও উপর গুলি চলবে এমন সময় তার প্রাণদণ্ড মকুব হলো, সে চলল বন্দী হয়ে ফিরন্ত ফরাসীদের সঙ্গে। কৃষকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দীদের সহিত তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসোভ ডোলোগোভ প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকেও কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছিল। শৌখীন মানবহিত আর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে—ততদিনে হেলেন মরেছিল—সে দস্তুরমতো সংসারী হলো। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি নিজে তাকে সহজ আনন্দ জোগায়, উদ্ভিদকে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণবিকশিত পাদপের মতো প্রসারিত, সমৃদ্ধ হল। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোকলতা! তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হতো সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলস্টয়ের মানসী নারী। সে ভালো। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়। শিক্ষার দ্বারা নয়। নীতির চুল চেরা তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তা-ই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে চায় না।

অ্যাণ্ড্রুর বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপহীনতার প্রতিক্রিয়ায় কতক তার কঠোরস্বভাব জনকের তাড়নায় তপস্বিনী। তার সমবয়সিনীরা যখন খেলা করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতির পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে লুকিয়ে অধ্যাত্মচর্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারীমাত্রেই করে থাকে। আপনাকে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সহিত, বিবাহের তো প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে! কতবার নিরাশ হলো। অবশেষে নাটাশার ভাই নিকোলাস তার পৈত্রিক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিনে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হলো। মারিয়ার দীর্ঘাচরিত সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মতো প্রাণময়, তবে সহাস্য নয় সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগানো চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তার মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এই সব তার বহির্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালোবাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাসও তাকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা তার অন্যান্য কাজের মতো ছেলেমানুষী। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে, কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা যে জুয়ায় সব হারিয়ে বসে রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জন দিল। নিকোলাস বর্তে গেল, সে তো কিছুতেই তার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মতো বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগোভ নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একটা বড়ো দুঃখ সে গরিব। তাতে তাকে নির্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ সে একটিও নারী দেখল না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পূজা করতে পারে। তার ধারণা রাণী থেকে দাসী পর্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে শুধু তার মানসীকে হয়তো একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে শয়তানী করবে। করবে গুণ্ডামী। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলস্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলস্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন। এসব জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণাসভায়, দরবারে, অভিজাত মহলে, ফ্রীমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়িতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিসে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দীদের সঙ্গে, গেরিলাদলে—সর্ব-

ঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়তো শেষ বয়সে তাদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালোবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশত শেষের দিকে একেবারে ও জিনিস বর্জন করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চললেন। টলস্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্র্যাজেডি এই। আলোচ্যগ্রন্থে তিনি যাকে জয়যুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েড মরণের পূর্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে বাজতে থাকে: জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।

(১৯৩৪)

টলস্টয় ও বিনু

টলস্টয়ের কাছে বিনুর শিক্ষানবিশী স্টাইলের জন্য নয়, স্টাইলকে অতিক্রম করার জন্য। শিক্ষানবিশীর শুরু কবে, তা মনে নেই, সারা এখনো হয়নি। লেখকের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে পাঠকের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, মাঝখানে কোনো প্রাচীর রাখতে চায় না। অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানও তাকে পীড়া দেয়। সাধকের মতো লেখকেরও শেষ কথা, শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। তন্ময় হওয়ার আগে স্টাইল একটা সহায়, কিন্তু তন্ময় হওয়ার ক্ষণে স্টাইল এটা বাধা। কুঞ্জের দ্বার অবধি গিয়ে সখী বিদায় নেয়, নতুবা সে সখী নয়, সতীন।

টলস্টয়ের কিছুই গোপন নেই, তিনি কিছুই হাতে রাখেননি, যখনকার যা তখনকার তা পাঠকের হাতে সঁপে দিয়েছেন, জীবনযৌবন পাপ-পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। বোধহয় পেরেছেনও। এর জন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে। সাধকের মতো লেখকেরও শত্রু তার বিভূতি তার অলঙ্কারের ঝঙ্কার। তার অহঙ্কারের টঙ্কার। ঈশ্বরের কাছে যে ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়ায় সে কি তাঁর আলিঙ্গনের জন্যে জায়গা রেখেছে? সর্বাঙ্গে জড়োয়া ও কিংখাব। সেসব যে খুলে ফেলে দিয়েছে, তাদের আসক্তি কাটিয়েছে, সেই তো উত্তমা নায়িকা, উত্তম সাধক। তেমনি উত্তম লেখক। তার অন্তিম পাঠক সব মানুষের অন্তরাত্মা। "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" সেই মানুষের প্রেম পেতে হলে সব ছাড়তে হয়।

এ যে কেবল স্টাইলের বেলায়, তা নয়। টলস্টয় তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন

পূর্বে গৃহত্যাগ করেছিলেন। জীবনের কাছে সত্যরক্ষার জন্যে তেমন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। যার জীবন সত্য নয়, তার লিখন সত্য হবে কোন্ জাদুবলে? সমাজের চিন্তা থেকে কোন এক সময় জীবনের চিন্তা বিনুকে পেয়ে বসল। সেখানেও টলস্টয় হলেন তার দৃষ্টান্ত। কী যে সার, কী যে অসার, এ সম্বন্ধে টলস্টয়ের সঙ্গে তার নির্ণয়ের সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু যুবক টলস্টয়ের সঙ্গে। বর্ষীয়ানের সঙ্গে তার মতভেদই অধিক, কিন্তু সেও স্বীকার করে নিয়েছে যে সাযুজ্যেই মুক্তি। লেখকের মোক্ষ পাঠকের সঙ্গে সাযুজ্যে। পাঠক হচ্ছে দৃশ্যত 'পীপল' বা জনগণ। নেপথ্যে সব দেশের সব কালের পাঠকসত্তম। "সেই মানুষ।"

(১৯৪৪)

টলস্টয়, গান্ধী ও আমি

আমার যখন সতেরো কি আঠারো বছর বয়স তখন আমি আবিষ্কার করি যে আমি অন্তর থেকে নৈরাজ্যবাদী। আমার পছন্দ রাষ্ট্রহীন অস্তিত্ব। সৈন্য নেই, পুলিশ নেই, নেই ম্যাজিস্ট্রেট, নেই আদালত। পরিবার, বিবাহ, জাত, শ্রেণী: এগুলিতে আমার বিশ্বাস অল্পই। সম্পত্তি, মালিকী স্বত্ব, উত্তরাধিকার, টাকা খাটানো: এগুলোরও কোনো অর্থ হয় না আমার কাছে।

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে আমিই হয়ে দাঁড়াই রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ। ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে পুলিশ নিয়ে কাজ করি। জজ হয়ে আইন প্রয়োগ করি। আবার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফৌজ নিয়ে কাজ করি, স্বরাজের পরে অর্ধসামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করি। বেশ বুঝতে পারি যে আমার জীবিকা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার উপর। যে ব্যবস্থা বৈদেশিক শাসনের চেয়েও গভীর, ধনতন্ত্রের চেয়েও বনেদী, ফিউডালিজমের চেয়েও প্রাচীন।

তবে কি আমি আমার নৈরাজ্যবাদ বিসর্জন দিই বা অতিক্রম করি? না। বরঞ্চ উপলব্ধি করি যে নৈরাজ্যবাদের মধ্যে রয়েছে আরো উন্নত আরো তৃপ্তিকর ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি, যদি নৈরাজ্যবাদের পূর্বে একটি বিশেষণ বসানো হয়। বিশেষণটি 'অহিংস'। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে আগে আসবে অহিংসা, তার পরে আসবে নৈরাজ্যবাদ।

এমনি করে আমি অন্তরের প্রত্যয় থেকে হলুম অহিংস নৈরাজ্যবাদী। এ ক্ষেত্রে আমার গভীর সাযুজ্য ছিল টলস্টয়ের সঙ্গে, গান্ধীর সঙ্গে। একই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান আমরা। সে বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে স্কন্ধ অভিজ্ঞতার অচলের উপরে। রণজর্জর জগতে আমরা ধরে আছি সেই নিশ্চিত বিশ্বাসকে যে বিশ্বাস স্থির থাকবে সব বিপর্যয়ের পরেও, সব ভাঙাচোরার পরেও।

কিন্তু এর মানে কি এই যে আমি টলস্টয়বাদী বা গান্ধীবাদী? না। তার

কারণ তাঁদের সঙ্গে দু'তিনটি জায়গায় আমার গুরুতর মতভেদ আছে।

প্রথমত, আমার কাছে আর্ট হচ্ছে নিজেই নিজের লক্ষ্য মহত্তর লক্ষ্যের উপলক্ষ হতে গেলে আর্ট তার আত্মাকে হারায়। অহিংস নৈরাজ্যবাদী হিসাবে আমার আত্মাকে পেতে গিয়ে আর্টিস্ট হিসাবে আমি আমার আত্মাকে হারাতে রাজি নই। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় শিল্পীকে ছেড়ে দিতে হবে তার নিজের মতো করে বাঁচতে, তার নিজের মনের মতো করে সৌন্দর্য প্রতিমা গড়তে। তার জীবিকার জন্যে সে এমন লোকের অনুগ্রহনির্ভর হবে না যারা শিল্পকে শিল্প বলে মূল্য দেয় না। এ জায়গায় আমি টলস্টয় ও গান্ধীর মতো আপোসহীন, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত, প্রেম বলতে আমিও মানব প্রেম বুঝি, যেমন বুঝতেন টলস্টয় ও গান্ধী। কিন্তু আমি প্রেম বলতে আরো বুঝি পুরুষের প্রতি নারীর ও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম। টলস্টয়ের সারাজীবন গেল এর সঙ্গে যুঝতে। গান্ধীও বৃথা চেষ্টা করলেন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে। টলস্টয়ের অপূর্ব জ্ঞান সত্ত্বেও, গান্ধীর নিখুঁত শিভ্যালরি সত্ত্বেও নারীকে তাঁরা কেউ চিনতেই পারলেন না। অচেতনভাবে নারীকে তাঁরা দেন অধীনতার ভূমিকা, যেমন দিয়ে এসেছেন ধার্মিক পুরুষেরা এতকাল মাতৃত্বের নামে। গৌরবে দিশাহারা হয়ে। আসলে কিন্তু নারীকে তাঁরা নরকের মতো ডরাতেন। তাঁদের সহজাত সংস্কার তাঁদের বলত, নারী ও পাপ এক অপরের সঙ্গে যুক্ত। আমি এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। সমাজব্যবস্থায় মানবপ্রেম ও নরনারীর প্রেম সমান গুরুত্ব পাবে।

তৃতীয়ত, টলস্টয় বা গান্ধী কেউ বিশ্বাস করতেন না আধুনিক সভ্যতায়। আমি বিশ্বাস করি। এই সভ্যতার কতকগুলি মূল্য যে মন্দ তা আমিও মানি। কিন্তু কতকগুলি মূল্য আছে যা ভালো, যা উৎকৃষ্টতর, যা অনন্য। এই মার্গই বিবর্তনের মার্গ। এই মার্গে চলতে চলতে আমরা মন্দকে অতিক্রম করতে পারি। যন্ত্রপরায়ণ, নাগরিক, প্রকৃতির সঙ্গে যুধ্যমান, দুর্বলের যম, নির্মমভাবে হিংস্র এই সভ্যতা নিজের হাতেই মরবে, যদি না এর অন্তরের পরিবর্তন হয়। তা বলে এর কীর্তিগুলো কেবলমাত্র আধিভৌতিক নয়। আধ্যাত্মিকও বটে। এ সভ্যতা আমাদের বহু পরিমাণে দিয়েছে অভাব থেকে, উৎপীড়ন থেকে, অতীত-উপাসনা থেকে, পারলৌকিকতা থেকে, সামাজিক অবিচার থেকে মুক্তি। বহু পরিমাণে সাম্য, বহু পরিমাণে জ্ঞান। বহির্বিশ্বের জ্ঞান তো বটেই, অন্তর্জগতের জ্ঞানও। সত্যই যে ভগবান, এটি আধুনিক সভ্যতারই দান। এমন কি অহিংসার নতুন ব্যাখ্যাও আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে। টলস্টয় ও গান্ধী উভয়েই আধুনিক সভ্যতার সন্তান। আমিও। কিন্তু সজ্ঞানে।

(১৯৫৩)

টলস্টয়ের গৃহত্যাগ

টলস্টয়ের শেষজীবন বাইরে বিশ্বব্যাপী যশের ও শ্রদ্ধার, ঘরে অকল্পনীয় অশান্তির। একদা যা ছিল সুখের নীড় তাই হয়ে দাঁড়ায় কোঁদলের খোঁয়াড়। তিনি নিজেও এর জন্যে কম দায়ী ছিলেন না। তিনি বেঁচে থাকতে সম্পত্তির একটা বিলিব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা স্ত্রীর সম্পত্তিক্রমে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যে উইল সম্পাদন করেন তা স্ত্রীকে না জানিয়ে ও না দেখিয়ে। উইলটা বার বার তিনবার পালটানো হয়। উইলের এক্‌জিকিউট্রিক্স করা হয় কন্যা আলেবজান্ড্রাকে। আলেবজান্ড্রার মৃত্যু হলে কন্যা টাটিয়ানাকে। স্ত্রীকে এক্‌জিকিউট্রিক্স করা হয়নি। স্ত্রীর মনে সন্দেহ ছিল যে স্বামী উইল করেছেন। তিনি সেটা স্বামীর শোবার ঘরে ঢুকে তাঁর কাগজপত্র ঘেঁটে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন গভীর রাত্রে। স্বামী টের পেলে বলেন, "তুমি কেমন আছো দেখতে এসেছি।" স্বামী বোঝেন সবই, কিন্তু না বোঝার ভাণ করেন। দু'জনের মনেই দু'জনকে অবিশ্বাস। এর একমাত্র সত্যিকার প্রতিকার স্ত্রীকে উইলটা দেখানো। কিন্তু তাহলে হয়তো তিনি আত্মহত্যা করতেন। আত্মহত্যার হুমকি তিনি প্রায়ই দিতেন। প্রকাশ্যে। সত্য যাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো সেই টলস্টয় সত্যের কাছ থেকে পলায়ন করলেন। তার গৃহত্যাগ সেই পলায়ন।

ওদিক আরেক জট পাকিয়েছিলেন তিনি তাঁর অপ্রকাশিত যাবতীয় ডায়েরি ও পাণ্ডুলিপি তাঁর পট্টশিষ্য চার্টকভের জিম্মায় দিয়ে। চার্টকভ তা পরে প্রকাশ করতেন। ডায়েরির অনেক স্থানে স্ত্রীপুত্রকন্যার বিরুদ্ধে কটূক্তি ছিল। চার্টকভকে বলা হয়েছিল ওসব বাদ দিতে। তিনি নিজেও ডায়েরি চেয়ে নিয়ে আপত্তিকর পৃষ্ঠাগুলো খুলে নেন। কিন্তু নষ্ট করেন না। পরে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। স্ত্রীর দাবী মেনে নিয়ে টলস্টয় চার্টকভের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে নিজের হেফাজতে রাখেন। এ ছাড়া তিনি একটি গুপ্ত ডায়েরিও রাখতেন পোশাকের ভিতর লুকিয়ে। এই লুকোচুরি অমন একজন সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অশোভন। সমস্তক্ষণই কিনা স্ত্রীপুত্রকন্যার ভয়ে। যিনি জারকে ভয় করতেন না, চার্চকে ভয় করতেন না তিনি নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যাকে ভয় করতেন। দুটিকে বাদে। সে দুটি টলস্টয়ান বা টলস্টয়পন্থী। অন্যেরা টলস্টয়কে ভালোবাসলেও তাঁর মতবাদকে ভালো মনে করতেন না। পুত্র লেও তো রীতিমতো পিতৃদ্রোহী। তার ধারণা সেও একজন মহান লেখক হতে পারত যদি না তার পিতা পূর্বে মহান লেখক হয়ে তার পথ রোধ করতেন।

'রেজারেকশন' তাঁর স্ত্রী একেবারেই পছন্দ করতেন না। অথচ ও বই থেকে আয় যখন দুখোবরদের দেশত্যাগের তহবিলে দান করা হয়, তিনি এই বলে আক্ষেপ করেন যে তাঁর ছেলেমেয়েরা শাদা পাঁউরুটি খেতে পাচ্ছে না, আর তাদের বাপ কিনা কোথাকার হতভাগা বিদ্রোহী 'বিদেশী' দুখোবরদের জন্য

ঘরের টাকা খয়রাত করছেন। আর সেটাও কিনা নিজের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে।

ঘোষিত নীতিটা এই ছিল যে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থের কপি-রাইট টলস্টয় পরিবারের। তাঁরাই রয়ালটি পাবেন। তার পরে রচিত গ্রন্থের উপর কপিরাইট থাকবে না। যে কোনো প্রকাশক যে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারবেন। টলস্টয়কে বা পরিবারকে রয়ালটি দিতে হবে না। কিন্তু এ নিয়ে দারুণ গণ্ডগোল বেধে যায়। টলস্টয় ভেবেছিলেন ১৮৮১ সালের পর থেকে যা লিখবেন তা লাভের জন্য লেখা নয়, প্রচারের জন্যে লেখা। দেখা গেল তাঁর প্রবন্ধের বই বিক্রী করে লাভ হয় না। তাঁর প্রধান শিষ্য একটা প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করেন। সেখান থেকে তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। লাভের জন্যে নয়। তা বলে লোকসান দিয়ে তো প্রকাশন সংস্থা চালানো যায় না। প্রধান শিষ্য চার্টকভ (দুখোবর নন, টলস্টয়ের মতোই অভিজাত) টলস্টয়কে অনুরোধ করেন নতুন উপন্যাস লিখে তাঁর হাতে দিতে। উপন্যাস প্রকাশ করলে তার থেকে লাভ হবে, তা দিয়ে প্রবন্ধের লোকসান পুষিয়ে যাবে। গৃহিণীর তাতে আপত্তি ছিল। যদিও ১৮৮১ সালের পর লেখা তবু উপন্যাস তো। উপন্যাস লিখলে তাঁকেই দিতে হবে, দিলে সেটা টলস্টয় রচনাবলীর সামিল হবে। রচনাবলীর প্রকাশক স্বয়ং টলস্টয়গৃহিণী। এ নিয়ে মতান্তর ও মনান্তর গৃহিণীর সঙ্গে প্রধান শিষ্যের। টলস্টয় শিষ্যকে ছাড়েন না। শিষ্যই তাঁর মতবাদ প্রচারের অগ্রণী।

যাই হোক, 'রেজারেকশন' টলস্টয় চড়া দামে বিক্রী করেন। তখন কপি-রাইট যে তাঁর নিজের এটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আয় যা হয় তা পরার্থে ব্যয় হয়। দুখোবরদের অপরাধ ওরা সৈন্যদলে যোগ দেয় না। ওদের ধর্মমত আদি খ্রীস্টানদের অনুরূপ। যুদ্ধে মানুষ মারতে হয়। সেটা ওদের মতে খ্রীস্টীয় শিক্ষাবিরুদ্ধ। তাদের নির্বাসিত করা হয় না। কিন্তু তাদের উপর জোর জুলুম করা হয়। তারা সহ্য করতে না পেরে দেশত্যাগের সংকল্প নেয়। টলস্টয় সহায় হন। 'রেজারেকশন' লিখে অর্থসাহায্য করেন। ওরা দেশত্যাগ করে।

স্ত্রীর সঙ্গে মতভেদ কেবল গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে নয়। গৃহিণী নিজেই ১৮৮১ সাল পর্যন্ত লেখা গ্রন্থের প্রকাশিকা হয়েছিলেন। তাতে লাভ হতো বেশী। টলস্টয়ের পুত্রকন্যা ছাড়াও বিস্তর আশ্রিত আশ্রিতা ছিল। এত বড়ো সংসার ঘাড়ে নিয়ে সোনিয়া দেখেন প্রকাশকরা যা দেন তা যথেষ্ট নয়। নিজে প্রকাশ করলে আয় হয় বেশী। ডস্টয়েভস্কি-পত্নীও স্বামীর গ্রন্থ স্বয়ং প্রকাশ করে আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। টলস্টয়-পত্নী তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কিন্তু টলস্টয় প্রণীত গ্রন্থ থেকে সংসারের যে আয় তা তো ১৮৮১ সালের পর রচিত গ্রন্থ থেকে হয় না। কেমন করে তাহলে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করবেন? সোনিয়া তাই জমিদারির ভারও গ্রহণ করেন। টলস্টয় জমিদারি প্রথার উপর বিরূপ হয়েছিলেন। শাসন ও শোষণ না করে জমিদারি চালানো যায় না।

দুটোই তাঁর কাছে অন্যায়। তাঁর মতে সব জমি চাষীদেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু এত বড়ো ত্যাগের জন্যে পরিবার প্রস্তুত ছিল না। ওরা খরচ চালাবে কী করে? ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও বেড়েছে, বয়সও বেড়েছে। রোজগারে মন নেই। বাপকেই উপার্জন করতে হয়। শুধুমাত্র বইপত্রের আয়ে কুলায় না। শুধুমাত্র জমিদারির আয়েও কুলায় না। গৃহিণী শক্ত হাতে হাল ধরেন। কিন্তু তাঁর কড়াকড়ির জন্যে চাষীদের কাছে টলস্টয়ের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। গাছকাটার জন্যে জমিদারপত্নী কয়েকজনের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ওদের সাজা হয়! টলস্টয়ের মতে সেটা অধর্ম। স্ত্রীর মতে আইনসঙ্গত।

এ সমস্ত সহ্য হতো। কিন্তু স্বামী চান দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রজনের মতো থাকতে। ধনীদের সঙ্গে ধনীদের মতো নয়। গান্ধী ও কস্তুরবার বেলা যেটা সম্ভব হয় টলস্টয় ও সোনিয়ার বেলা সেটা সম্ভব হয় না। টলস্টয় চান শ্রেণীচ্যুত হতে। সোনিয়া তাঁর সন্তানদের শ্রেণীচ্যুত হতে দেবেন না। জন্ম-সূত্রে ওরাও কাউণ্ট ও কাউণ্টেস। ওরা ওদের আভিজাত্য বজায় রাখবে—বাপের খরচে অবশ্য। দুনিয়ার কত লোক টলস্টয়কে গুরু বলে মানে। কিন্তু একজন কি দু'জন বাদে তাঁর পুত্রকন্যারাই মানে না। তাঁকে পাগল বলে সার্টিফিকেট দেবার প্রসঙ্গও নাকি উঠেছিল। তাহলে আদালত থেকে এক-জনকে তাঁর গার্জেন নিয়োগ করা হতো। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সেই গার্জেনই করতেন। কিন্তু তাঁর কলমটা কেউ কেড়ে নিতে পারত না। দুনিয়া জানত তিনি পাগল নন। যাই হোক, তাঁকে পাগল বলে ঘোষণা করা হয়নি। এই রক্ষে।

ওদিকে চার্চ তো তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিলই, স্টেটও তাঁকে তাঁর বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করার অপরাধে জেলে পাঠাতে পারত, যদি সংবাদপত্র বিশেষের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথায় কাজ করত। তখনো ১৯০৫ সালের বিপ্লব ঘটেনি। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর নরম মনোভাব তার বহুবর্ষ পূর্বের। বিপ্লবের সমর্থন তিনি করতেন না। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর যাদের ফাঁসী দেওয়া হলো তাদের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি একটি সাংঘাতিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। "আমি নীরব থাকতে পারিনে।" ফলে সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়ে যায়। তাতে তিনি বলেছিলেন, তাঁকেও যেন ফাঁসী দেওয়া হয়। তাঁর জনপ্রিয়তা ফিরে আসে। রাষ্ট্র তাঁকে ঘাঁটায় না।

টলস্টয়ের পূর্বসূরী পুশকিন নাকি শতাধিক নারী সম্ভোগ করেছিলেন। টলস্টয়ের রেকর্ড অত লম্বা নয়। তাঁর মধ্যে এ নিয়ে বরাবরই একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। **Flesh** যা চাইছে **spirit** তাতে সায় দিচ্ছে না। বিবাহের পর স্বকীয়ার সঙ্গেও একই অন্তর্দ্বন্দ্ব। ব্রহ্মচর্যের সংকল্প বার বার নিয়েছেন। বার বার ভঙ্গ করেছেন। ফলে তেরোটি পুত্রকন্যা। তাঁর স্ত্রী গোড়া থেকেই অনিচ্ছুক। তাঁকে স্বাধীনতা দিলে তিনি দুটি কি তিনটির বেশী চাইতেন না। নারীর উপর এতগুলি সন্তান চাপানো পুরুষেরই দোষ। এমনি করে পুরুষ নারীকে বন্দিনী করে রাখে। অথচ এর জন্যে তো কই টলস্টয়কে

অনুতপ্ত হতে দেখা গেল না। 'ক্রয়টজার সোনাটা' আমি কলেজে পড়েছিলুম। ও বই আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। ওটা এই কারণেই মূল্যবান যে টলস্টয় নরহত্যার মতো নারীহত্যারও বিরোধী। কিন্তু ও কাহিনীর মরাল ইস্যুটা তো মার্ডার নয়, সেক্স। যেখানে নারীকেই দোষ দেওয়া হয়েছে। যেন নারীই একমাত্র পার্টনার।

টলস্টয়ের সেক্স সংক্রান্ত দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। বিবাহের পর স্বামীগৃহে এসেই আবিষ্কার করেন গ্রামবাসিনী আকসিনিয়াকে। যার পুত্রের প্রকৃত পিতা নাকি টলস্টয়। স্বামীকে চোখে চোখে রাখা সেই যে শুরু হয় তার পর আটচল্লিশ বছর ধরে চলে। নজরবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি বৃদ্ধ বয়সেও মেলে না। একদিন কি দু'দিন বাড়ির বাইরে কাটালেও সন্দেহ করা হতো যে উদ্দেশ্যটা নারীসঙ্গ। লেখার উপরেও কড়া নজর। সেক্স নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই সন্দেহ। অভিজ্ঞতার অনুপাতে সামান্যই তিনি লিখতেন। তাও রেখে ঢেকে। তবে বিবাহপূর্ব ডায়েরিতে সব কথা ছিল। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সে ডায়েরি যেন অবিকল ছাপা হয়। সেটা কিন্তু হয়নি। অনেক বাদসাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবারের বাইরেও তাঁর একটি পুত্র ছিল। তিনি তার নামটা পর্যন্ত ভুল করেন। তাকে স্বীকারও তিনি করেননি। তবে তাকে তাঁর বাড়িতে কোচম্যানের কাজ দেওয়া হয়েছিল। টলস্টয়ের জীবদ্দশায় **'The Devil'** প্রকাশিত হয়নি স্ত্রীর ভয়ে। তাতে ছিল আকসিনিয়ার সঙ্গে প্রণয়ের উত্তাপ। সে এক কৃষকবধূ। সোনিয়ার ঈর্ষা বিবাহের ছেচল্লিশ বছর পরেও সমান তীব্র ছিল। স্বামীকে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৮৮৯ সাল। পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রাখা হয় চার্টকভের কাছে। চার্টকভও নিজের কাছে রাখতে সাহস পান না। রাখেন তাঁর মায়ের কাছে। কী মনে করে টলস্টয় ওর একটা নকল লুকিয়ে লুকিয়ে তৈরি করিয়ে এনে তাঁর এক পুরানো আরাম কেদারার অয়েল ক্লথের ঢাকনার আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও ওটি ধরা পড়ে যায় সোনিয়ার কাছে ১৯০৯ সালে। তার মানে টলস্টয়ের মৃত্যুর এক বছর আগে। পুরাতন ঈর্ষার ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। আশির উপর বয়স। তবু নিস্তার নেই! পরকীয়া চাষানীর সঙ্গে তিনি যে উল্লাস বোধ করেছিলেন তারই বর্ণনা ছিল নায়কের বেনামীতে। বিবাহের পর নায়ক তাঁর স্বশ্রেণীর স্বকীয়ার সঙ্গে উল্লাসের পরিবর্তে যাতনা বোধ করেন। এ এক নির্মম সত্য। একে লিপিবদ্ধ না করে টলস্টয়ের সোয়াস্তি ছিল না। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় স্ত্রীর নজরে পড়লে কী বিষম কাণ্ড হবে সেটাও তিনি অনুমান করেছিলেন। যা ঘটবার তা ঘটে যাবার পর দু'জনেই কান্নাকাটি করে শান্ত হন। ছাপা কিন্তু বন্ধ থাকে।

আমার তো মনে হয় টলস্টয়ের গৃহত্যাগের অন্যতম কারণ টলস্টয়ের সত্যকথনে সোনিয়ার নিদারুণ অসহিষ্ণুতা। আকসিনিয়ার প্রতি যে প্যাশন তার মতো প্যাশন তিনি সোনিয়ার প্রতি অনুভব করেননি। কিন্তু সেটা তো

চুকে বুকে গেছে কতকাল আগে। তা হলেও সে আগুন যেমন লেখকের স্মরণে জীবন্ত ছিল, উপন্যাসের পাতায়ও তেমনি জ্বলন্ত। এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব। কিন্তু সোনিয়ার চোখে তিনি তো শিল্পী নন, তিনি স্বামী। যে স্বামী এতকাল পরেও সেই পারতেন প্যাশনের বর্ণনায় মুখর তিনি কি স্ত্রীকে সত্যি ভালোবেসেছেন? স্ত্রীর বেলায় এমন নিরুত্তাপ কেন? বিবাহের ছেচল্লিশ বছর বাদে এই আবিষ্কার সোনিয়াকে পাগল করে তোলে। উইল, ডায়েরি ইত্যাদির দরুন যে অশান্তি তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, এই আত্মজীবনীমূলক গুপ্ত পুঁথির দরুন।

টলস্টয়ের নিজের চরিত্রেও ঈর্ষা নিহিত ছিল। সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ তাঁর চুয়ান্ন বছর বয়সের স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন কেন তিনি তানেয়েভ নামক সঙ্গীতকারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বোনের বাড়ি যান। তিনি কি সঙ্গীতের প্রেমে অন্ধ, না সঙ্গীতকারের প্রেমে? সোনিয়া তো ক্রোধে উন্মাদ। স্বামীকে শাসিয়ে বলেন, "তুমি যদি তোমার 'রেজারেকশন' প্রকাশ কর তো আমিও আমার ছোটগল্পগুলো প্রকাশ করব।" শেষে সন্ধি হয়।

(শ্রী নারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত পত্রের রূপান্তর)

(১৯৮০)

পরিশিষ্ট

তিনটি প্রশ্ন

(টলস্টয়ের লেখা থেকে অনুবাদ)

এক সময় এক রাজার এই ধারণা হল যে যদি তিনি জানতে পারতেন কখন কোন্ কাজ করা উচিত, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে, আর কোন্‌টাই বা সবচেয়ে দরকারী কাজ, তবে কোনো বিষয়েই তিনি অকৃতকার্য হতেন না।

এই ভেবে তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করলেন, যে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে সে প্রচুর পুরস্কার পাবে।

রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত সকলেই এলেন, কিন্তু সকলেই প্রশ্ন-তিনটির বিভিন্ন উত্তর দিলেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বললেন, উপযুক্ত সময়ে কাজ করতে হলে পাঁজি একখানা কাছে রেখে পাঁজির নির্দেশ মতো কাজ করা আবশ্যক। কেউ কেউ বললেন, আগে থেকে কখন কী করতে হবে ঠিক করা অসম্ভব। তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট না করে যখন যা দরকার হয় তাই করা উচিত। তবেই জানা যাবে কোন্ কাজ সবচেয়ে দরকারী। আর কেউ কেউ বললেন, কখন কোন্ কাজ করা উচিত একা তা স্থির করা অসম্ভব, সুতরাং রাজার একটি মন্ত্রণা সভা থাকা চাই। মন্ত্রণা সভাই সকল কাজের উপযুক্ত সময় স্থির করবেন।

আরও অনেকে ছিলেন। তাঁরা বললেন, এমন অনেক বিষয় আছে, যা তৎক্ষণাৎই স্থির করতে হলে ভবিষ্যতে কী হবে তা আগে জানা চাই। জ্যোতিষীরাই তা জানে—সুতরাং জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে জানতে হয় কখন কোন্ কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হল বিভিন্ন রকমের। কেউ বললেন, রাজার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মন্ত্রী। কেউ বললেন, পুরোহিত। কেউ কেউ বললেন, চিকিৎসক ; কেউ কেউ বা বললেন, সৈনিকই রাজার সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বললেন, বিজ্ঞানই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়। কেউ বললেন, রণকৌশল। কেউ বা বললেন, দেবপূজাই সবচেয়ে দরকারী কাজ।

প্রশ্ন তিনটির সমস্ত উত্তরই বিভিন্ন হওয়ায় রাজা কারও সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। পুরস্কারও দিলেন না। কিন্তু তবুও প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাওয়ার ইচ্ছা থাকায় জ্ঞানের জন্যে সর্বত্র বিখ্যাত একজন সাধুর সঙ্গে পরামর্শ করা স্থির করলেন।

এই সাধু যে বনে বাস করতেন সে বন ছেড়ে কখনো কোথাও যেতেন না। তিনি সাধারণ লোকদেরই অভ্যর্থনা করতেন ; সুতরাং রাজা সাধারণ লোকের বেশেই গেলেন। সাধুর কুটীরের কিছু দূরে ঘোড়া ও রক্ষী সৈন্যদের রেখে একাই সাধুর কাছে গেলেন।

গিয়েই দেখলেন সাধু কুটীরের সামনের জমিতে কেয়ারি করছেন। অভ্যর্থনা করেই আবার কাজ করতে লাগলেন। কাছে গিয়ে রাজা বললেন, "বিজ্ঞ, আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে আমি এসেছি। কখন কোন্ কাজ করা উচিত, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে আর সবচেয়ে দরকারী কাজ কোনটা।"

সাধু শুনলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না, কাজ করতে লাগলেন। রাজা বললেন, "আপনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ; কোদালটা আমাকে দিন, আপনার জন্যে কিছু কাজ করে দিই।"

"ধন্যবাদ", বলে সাধু কোদালখানা রাজার হাতে দিলেন।

দু'টি কেয়ারি করেই রাজা আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

এবারেও সাধু কোন উত্তর দিলেন না কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোদালের জন্যে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এখন একটু বিশ্রাম কর, আমি কিছুক্ষণ কাজ করি।"

রাজা কোদাল না দিয়ে আরও দু'ঘণ্টা কাজ করলেন।

সূর্য অস্তগামী হলেন। রাজা কোদাল রেখে বললেন, "বিজ্ঞবর, আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর পেতেই আপনার এখানে এসেছি। যদি আপনি উত্তর না দিতে পারেন তাও বলুন, আমি বাড়ি ফিরে যাই।"

"ঐ দেখ দেখ, কে একজন এদিকে দৌড়িয়ে আসছে। দেখা যাক সে কে।"

সাধু বললেন।

রাজা দেখলেন দাড়িওয়ালা কে একটি মানুষ বনের ভিতর দিয়ে দৌড়িয়ে আসছে। মানুষটি দু'হাত দিয়ে তার তলপেটটা চেপে ধরেছে। হাতের নীচে রক্তপ্রবাহ। রাজার কাছে এসেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। রাজা ও সাধু দু'জনে মিলে লোকটির পরিচ্ছদ খুলে ফেললেন। পেটের নীচেই একটা প্রকাণ্ড ক্ষত। রাজা নিজের রুমালখানি ও সাধুর তোয়ালেখানা নিয়ে ক্ষতটি ভালো করে বেঁধে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় লোকটির চেতনা হল—সে একটু জল চাইলে। রাজা জল এনে দিলেন।

এর মধ্যে সূর্যাস্ত হয়েছে। রাজা ও সাধু দু'জনে মিলে লোকটিকে কুটীরের মধ্যে নিয়ে গেলেন ও একখানি বিছানায় শুইয়ে দিলেন। লোকটি চোখ বুজে আরাম বোধ করলে। কিন্তু রাজা এত পথ এসে ও এত কাজ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শোওয়া মাত্রেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে জেগে উঠেই রাজা দেখলেন সেই লোকটি তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তিনি কোথায় সেই লোকটিকে দেখেছেন তা স্মরণ করতে তাঁর বিলম্ব হল। রাজাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে লোকটি ক্ষীণ স্বরে বললে, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

"আমি তো তোমাকে চিনি না—কিসের জন্যে তোমাকে ক্ষমা করতে হবে ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনি আমাকে চেনেন না—কিন্তু আমি তো আপনাকে জানি। আপনি আমার ভাইকে হত্যা করেছেন, আমার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন। এর প্রতিশোধ নেব বলে আমি শপথ করেছিলুম, আপনি সাধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনে আমি আপনার ফেরবার পথের ধারে লুকিয়ে ছিলুম আপনাকে হত্যা করবার ইচ্ছায়।

দিন গেল, তবুও আপনি ফিরলেন না। কাজেই, আমার লুকোবার জায়গা থেকে বার হলুম। কিন্তু হঠাৎ আপনার রক্ষীদের হাতে পড়ে যাওয়ায় তারা আমাকে চিনতে পেরে আহত করে। আমি ওদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে এলুম কিন্তু যদি আপনি আমার শুশ্রূষা না করতেন তবে আমি নিশ্চয়ই মারা যেতুম। আমি আপনাকে মারতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আপনি আমাকে রক্ষা করলেন। এখন, যদি আমি বাঁচি আর আপনি সম্মত হন, তবে আমি আপনার সবচেয়ে বিশ্বাসী ক্রীতদাসের মতো আপনার সেবা করব ও আমার ছেলেদেরও তাই করতে বলব। আমাকে রক্ষা করুন।"

রাজা তাঁর শত্রুর সঙ্গে এত সহজে সন্ধি করতে পারায় ও তাকে বন্ধুরূপে লাভ করায় বড় খুসি হলেন। শুধু যে তাকে রক্ষা করলেন তা নয়, নিজের চাকর ও চিকিৎসকদের তার সেবাশুশ্রূষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতেও প্রতিজ্ঞা করলেন।

আহত ব্যক্তিটির কাছে বিদায় নিয়ে রাজা সাধুর খোঁজে গেলেন। ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর প্রশ্ন তিনটির উত্তর জানতে আর একবার ইচ্ছে করলেন।

সাধু তার নতুন তৈরী কেয়ারিগুলিতে বীজবপন করছিলেন। রাজা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "সাধুশ্রেষ্ঠ, আমার প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিতে শেষবার প্রার্থনা করছি।"

রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করে সাধু বললেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর তো তুমি পেয়েইছ।"

"পেয়েছি ? বলেন কী আপনি ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

"বুঝতে পারছ না ?" সাধু বললেন, "কাল যদি আমার দৌর্বল্য দেখে তোমার দয়া না হত, এসব কেয়ারি যদি তুমি না করতে, যে পথে তুমি এসেছিলে সেই পথেই যদি চলে যেতে, তবে সেই লোকটা নিশ্চয়ই তোমাকে আক্রমণ করত—আর তুমিও আমার কাছে কেন থাকলে না এই ভেবে আক্ষেপ করতে। সুতরাং, যখন তুমি কেয়ারি করছিলে সেই সময়ই ছিল তোমার কাজ করার উপযুক্ত সময়, আমিই ছিলেম সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, আর আমার উপকার করাই ছিল তোমার সবচেয়ে দরকারী কাজ। পরে যখন সেই লোকটি দৌড়িয়ে এল আর তুমি তার শুশ্রূষা করলে, সেই সময়ই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। যদি তুমি তার শুশ্রূষা না করতে সে নিশ্চয়ই মারা যেত। তুমি তার সঙ্গে মিত্রতা করতে পারতে না। সুতরাং সেই হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। আর তুমি তার যা করলে তাই হল তোমার সবচেয়ে দরকারী কাজ। তবেই মনে রেখো, সবচেয়ে উপযুক্ত সময় মোটে একটি—'এখন' এইটিও সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, কারণ এই সময়েই আমাদের যা কিছু ক্ষমতা থাকে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি সেই, যার সঙ্গে তুমি এখন আছ। কেননা কেউ জানে না কখনো আর কারও সঙ্গে তার কোনো কাজ থাকবে কি না। সবচেয়ে দরকারী কাজ তার উপকার করা। কারণ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই এই।"

(১৯২০)

লালন ও তাঁর গান

ভূমিকা

চিঠিখানাতে তারিখ দেওয়া নেই। তবে ফাইলটা ১৯৭৪ সালের চিঠিপত্রের ফাইল। লিখেছিলেন মহম্মদ গোলাম রহমান। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি যে সময় নদীয়া জেলার কুস্টিয়া মহকুমার সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলুম সে সময় তিনি ছিলেন আমার আপিসের একজন করণিক। তাঁর বক্তব্য—

"আমি ছোটবেলা থেকেই মহাত্মা লালন শাহ ফকিরের গান শুনতে শুনতে কতকটা চিন্তাশীল হয়ে পড়ি। পরবর্তীকালে আপনি এখানকার এস. ডি. ও থাকাকালীন মাঝে মাঝে ফকিরি গান শুনতেন এবং জলসা করতেন। তাতে আমি খুব প্রেরণা পাই। পরবর্তী কালে আমিও ফকিরদের বাসায় এনে গান শুনতাম। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ১৯৪২ সালে এক বিরাট সাধুসেবা চলাকালীন স্থানীয় আলেমগণ ফকিরদের উপর অমানুষিক মারপিট করে। ১৯৪৩ সালে আমি ছেঁউড়িয়া গ্রামে যেয়ে ফকিরদের ও লালন শাহ ফকিরের মাজারের দুরবস্থা দেখতে পাই।—দরগার মাজার ঘরটি প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে এবং আমি বহু কষ্ট করে আর একটি ঘর ছাদ পর্যন্ত করার পর আমার অসুখ হয়ে পড়ায় আমি আর ছাদ দিতে পারলাম না। পরে বাবু দেবীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয় হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজারের অনুকরণে নূতন ঘর করবেন বলে আমার তৈরি ঘরটি খুলে ফেলেন। এই সময় গবর্নমেণ্ট পনের হাজার টাকা স্যাংসান করায় তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব আহাদ সাহেব চার পিলারের উপর একটি শেড দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা রাজি না হওয়ায় তিনি হজরত নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার মাজারের অনুকরণেই বর্তমান ঘরটি করেছিলেন। তাতে নাকি বাবু দেবীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয় বহু টাকা দান করেছিলেন।—এখন বাউলতন্ত্র দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সাঁইজীর ঘরটিও সুন্দরভাবে তৈরী হয়েছে। এখন বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই গানগুলি ভাল ভাবে প্রচার হলে দেশে এত অশান্তি, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা থাকত না। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান যে একদিন এক জাতিতে পরিণত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রোফেসার মনসুর-উদ্দীন সাহেবের প্রথম খণ্ড 'হারামণি'র ভূমিকা লিখেছেন। তাতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "এই ভারতের একজাতীয়তা রেখেছে শুধু ফকিরেরাই।" তাই দেখা যায় লালন শাহ ফকিরের ভক্তবৃন্দ হিন্দু ও মুসলমান জাতিভেদ মানেন না। তাই আমার মনে হয় আপনাদের মতো মনীষীগণ যদি লালন শাহ ফকিরের আধ্যাত্মিক গানগুলি ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করে প্রচার করতেন তাহলে প্রত্যেক লোকে আত্মতত্ত্ব ও মানুষতত্ত্ব ভাল ভাবে শিখতে পারত এবং নিজেকে চিনতে পারত। ফলে মানুষে মানুষে এত হিংসা থাকত না এবং দেশে স্বর্গশান্তি বিরাজ করত।……আমি আশা করি আপনি এমন কিছু

করে যাবেন যাতে অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমান নিজেদেরকে লালনপন্থী বলে গর্ব করতে পারে। তাহলে এদেশে একটি বিরাট কাজ হবে এবং আপনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং সাঁইজীরও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। পত্রসহ কয়েকখানা গান পাঠালাম। সাঁইজী আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

"সাঁইজী" এখানে লালন সাঁই দরবেশ। যাঁর গুরু সিরাজ সাঁই দরবেশ। সাঁই এক্ষেত্রে শাহ শব্দের প্রতিশব্দ। কিন্তু লালন প্রভৃতি বাউল ফকিরদের গানে সাঁই হচ্ছেন তিনিই যিনি অন্তরে বিরাজ করছেন অথচ ধরতে গেলে ধরা দিচ্ছেন না। অন্য কথায় মনের মানুষ।

গোলাম রহমানের চিঠিখানি আমি সরিয়ে রেখেছিলুম। লালনের জন্যে আমার যা করণীয় তা আমি প্রবন্ধ আকারেই করি। আর একটি কাজ করতে চেয়েছিলুম। দুই রাষ্ট্রের বাউলদের নিয়ে লালন-দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। আয়োজন অনেক দূর এগিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ায় আয়োজনে ছেদ পড়ে। আশা আছে একদিন এই অনুষ্ঠানটি সম্ভব হবে। শুনতে পাই লালনপন্থী বাউলদের মধ্যেও এখন দুই ভাগ। যাঁরা ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় বাস করেন তাঁরা এক সুরে গান। যাঁরা আখড়ার বাইরে বাস করেন তাঁদের গানের সুর আরেক। তা ছাড়া যাঁরা লালনপন্থী নন অথচ লালনের গানও গেয়ে শোনান তাঁরা যে সুরে গান তা আরো এরকম। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের কর্তব্য প্রচলিত সুরগুলিকে মিলিয়ে খাঁটি সুরটি উদ্ধার করা ও তার স্বরলিপি প্রস্তুত করা। এ কাজ আমার নয়। আমি প্রচারকও নই। আমি একজন সাহিত্যিক, সাহিত্যের বিচারে লালন ফকিরের যে গানগুলি উত্তীর্ণ তেমন গানের উপরেই আমার পক্ষপাত।

লালন দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমার প্রবন্ধগুলি বই করে বার করতে গিয়ে দেখা গেল অত ছোট বই প্রকাশ করা পোষায় না। তখন প্রকাশক শ্রীরবীন বল প্রস্তাব করেন যে প্রবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে লালনের নির্বাচিত গান। আমি রাজী হই। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া চল্লিশটি গান যোগ করে বইটিকে আর একটু বড়ো করা হলো। [প্রবন্ধ সমগ্রে অবশ্য ন্যায্য কারণেই লালনের গানগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে—সম্পাদক।] বিভিন্ন পাঠান্তর দেখে বিচার করে গ্রহণ করেছি যেটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা আমার নেই। সাধক ভিন্ন আর কেউ এর যোগ্য নন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন আমাকে বলেছিলেন বাউলের গান হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সাধনসঙ্গীত। তাঁদের গান তাঁরা সাধারণে প্রকাশ করতে বা প্রচার করতে চান না। লালনও কি কোনোদিন কল্পনা করেছিলেন যে লোকসঙ্গীত বলে তাঁর গান সংগৃহীত ও সংকলিত হবে? যাঁরা সাধক নন তাঁরাও পড়বেন ও বুঝতে চাইবেন?

লালনের গানের ভাষা যত সহজ তার মর্ম তত সহজ নয়। তাতে এমন সব দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা হয়েছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেসব তত্ত্বের মর্ম ভেদ করা অসম্ভব, যদি তত্ত্বদর্শীরা ব্যাখ্যা না করেন। আমি নিজেই

জিজ্ঞাসু। যাঁরা আরো জানতে চান তাঁদের পড়তে হবে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীনের, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ও ডক্টর মতিলাল দাসের বিভিন্ন গ্রন্থ। কিন্তু কেবল বই পড়েই তাঁদের দৃষ্টি খুলে যাবে না, গান শুনতে হবে। গায়কদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে। আখড়ায় যেতে হবে।

আমার এই বইখানি বর্ণপরিচয়। বর্ণপরিচয়ে কারো শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। যা হয় তা বিদ্যারম্ভ। চেষ্টা করেছি আগ্রহ জাগিয়ে দিতে। তার বেশী আমার সাধ্য নয়। গোলাম রহমান আমার কাছে যা প্রত্যাশা করেছেন তার যোগ্য হতে হলে আমাকে আরো পড়াশুনা করতে হবে, আরো গান শুনতে হবে, আরো মিশতে হবে, আরো ঘুরতে হবে। কিন্তু এ বয়সে আমি যদি এসব করতে যাই তবে আমার পরিকল্পিত উপন্যাস লিখবে কে? তবে হিন্দু মুসলমানের মিলন আমার চিরদিনের কাম্য। এ বই যদি মিলনের সহায় হয় তবে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আর সেইভাবেই পূর্ণ হবে সাঁইজীরও উদ্দেশ্য।

লালনের গানের সংখ্যা হাজার হাজার। তার থেকে চল্লিশটি নির্বাচন করা কি বৃথা চেষ্টা নয়? কিন্তু তার বেশী করতে গেলে সাধারণের পক্ষে গুরুপাক হতো। তা ছাড়া এমন বহু গান আছে যার কয়েক পঙ্‌ক্তি আমাকে মুগ্ধ করলেও বাকীটা ক্লান্তিকর। পুনরাবৃত্তিও প্রচুর। সাধারণ পাঠকের পক্ষে চল্লিশটিই যথেষ্ট। এখানে বলে রাখি যে এর একটি আমি কুমিল্লায় এক বৈষ্ণবীর কণ্ঠে শুনেছিলুম। তখন কিন্তু লালনের ভণিতা শুনিনি। গানটি একটু অন্য রকমও ছিল। 'এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।' অথচ এটি লালনের বলে অষ্টম খণ্ড 'হারামণি'র অন্তর্ভুক্ত। সেই সুবাদে এই বইয়েরও সামিল।

লালন তাঁর দশ হাজার শিষ্যকে কী উপদেশ দিতেন তা জানবার আর কোনো উপায় নেই, একমাত্র উপায় তাঁর গান। তাঁর গানের ভণিতায় মাঝে মাঝে তাঁর গুরু সিরাজ সাঁইয়ের নাম পাওয়া যায়। তা বলে সেসব গান সিরাজের নয়, লালনেরই রচনা। সিরাজের উপদেশ হয়তো সেইরূপে রক্ষিত, কিন্তু রূপ যিনি দিয়েছেন তিনি লালন। সিরাজও একজন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, কিন্তু লালন না থাকলে তার নাম কেউ জানত না। তাঁর স্বরচিত গানের কোনো অস্তিত্ব নেই। লালন বরাবরই সিরাজকে অগ্রস্থান দিয়েছেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে গুরুবাদী। লালনপন্থীরাও তাই। আমি গুরুবাদে বিশ্বাস করিনে। অতএব লালনপন্থী বলে পরিচয় দিতে পারিনে। অথচ লালনের সঙ্গে আমি একপ্রকার সহমর্মিতা বোধ করি। লালনের গানই তাঁর বাণী। বাউলদের গানই তাঁদের বাণী। যা বলবার তা গানের মাধ্যমেই তাঁরা শুনিয়ে যান। গানের সুর আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে, গানের ভাষা আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায়, গানের বাণী আমাদের জীবনের পাথেয় হয়।

লালনের শিষ্যসংখ্যার বেশীর ভাগই গৃহী শিষ্য। যাঁরা গৃহী তাঁরা চাষবাস করতেন, তাঁত চালাতেন, মাছ ধরতেন, নৌকা বাইতেন। যাঁরা গৃহী নন তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলেও তাঁদের জীবন সঙ্গিনীহীন ছিল না। তবে সন্ততিহীন ছিল। কী করে সেটা সম্ভব তা "বুঝ সাধু যে জান সন্ধান"। ঢাকার এক উকিল একদিন আমার চেম্বারে এসে আমাকে সন্ধান দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "পঞ্চাশ বছর তাঁর বয়স, কিন্তু দেখলে মনে হবে পঁচিশ বছরের যুবতী। যে সাধনে এটা সম্ভব হয় সে সাধন আপনাদেরও যুগল সাধন হতে পারে। এই নিন সাধন তত্ত্বের বই।" আমি তো হাঁ। গুরুরূপিণী মহিলাকে আমি দর্শন করতে যাইনি। কিন্তু উকিল ভদ্রলোকের দুই চোখ ছিল সত্যিই দ্যুতিময়। লালনের ভাষায় "গুরু কৃপা তনু যারা নয়ন তাদের দীপ্তকারা"। আমি তাঁর বইখানি পড়ে দেখি, কিন্তু পালন করতে ভয় পাই। পরে আরো কয়েকজন সাধককে আমি দেখেছি, কিন্তু অনুসরণ করিনি।

"দীপ্তকারা" ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। সম্ভবত "দীপ্তাকারা"। কিন্তু অন্য কিছুও হতে পারে। এমনি অনেক জায়গায় আছে। ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ, না শোনার দোষে ভুল, যথাসময়ে লিখে না রাখার ফলে বিকৃত, তা কে বলতে পারে? আমি পারতপক্ষে লেখনীক্ষেপ করিনি, করেছি শুধু সেইখানেই যেখানে পাঠান্তরে অর্থভেদ দুষ্কর। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অসংলগ্ন বা খণ্ডিত। পূরণ করতে পারতুম, কিন্তু করলে আমাকেই জবাবদিহি করতে হতো। পাঠকই মনে মনে পূরণ করুন।

আমি কুস্টিয়া ছেড়েছি ১৯৩৬ সালে। পূর্ববঙ্গ থেকে বিদায় নিয়েছি ১৯৪৭ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনবার সেদেশে গেছি, কিন্তু কুস্টিয়া যেতে পারিনি। তাই লালনপন্থী বাউলদের সঙ্গলাভ ঘটেনি। প্রধানত কুস্টিয়া, যশোর ও পাবনায় তাঁদের আখড়া। বাংলাদেশ থেকে এই ক'জন বিখ্যাত লালনপন্থী বাউলের নাম আমি পেয়েছি—

কুস্টিয়ার বেহাল শাহ্, খোদা বখ্‌স, গোলাম ইয়াসিন শাহ্, আবদুল গনি শাহ্, সরূপ শাহ্, নিজাম শাহ্, আইনউদ্দীন শাহ্, ঝুরু শাহ্।

যশোরের কানাই শাহ্ বা ক্ষ্যাপা বাউল, লায়লী বেগম, মহেন্দ্র গোসাঁই খোরশেদ শাহ্, করিম শাহ্।

পাবনার জামেলা খাতুন।

দুই সরকার অনুকূল হলে এঁদের কয়েকজনকে আমরা এপারের লালন দ্বিশতবার্ষিকী উৎসবে অতিথিরূপে পাবার আশা রাখি। কিন্তু কবে তা জানিনে। আমার তো অভিলাষ ওপারের বাউলদের সঙ্গে এপারের বাউলদের একসঙ্গে বসানো ও একই গান গাওয়ানো। তাহলে বোঝা যাবে সুরের ও কথার মিল কতদূর আর অমিল কোন্‌খানে। ওঁরাও পরস্পরের সঙ্গে সুর ও কথা মিলিয়ে নেবেন। ত্রিশ বছরের ব্যবধানে পার্থক্য নিশ্চয়ই বেড়েছে। আগেও ছিল।

লালন ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গের মানুষ। সুতরাং তিনি পূর্ব পশ্চিম নির্বিশেষে উভয় প্রান্তের বাউলদের পূর্বপুরুষ বা পূর্বসূরী। শুধু বাউলদের কেন, সকলেরই। দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে সকলেরই সহযোগিতা ও শুভকামনা প্রত্যাশা করি। কিন্তু দুই সরকার সদয় না হলে কোনো রকম আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানই সম্ভব নয়।

একক ভাবে আমরা যা করতে পারি তা লালন প্রসঙ্গ লেখা ও তাঁর গান নির্বাচন করে প্রকাশ করা। যাঁদের গ্রন্থ ও পত্র থেকে আমি গান মনোনয়ন করেছি তাঁরা হলেন সুপ্রসিদ্ধ লোকগীতিবিশারদ ও আমার পুরাতন বন্ধু অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দীন, কুস্টিয়ার লালন একাডেমীর পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম, 'লালন স্মারকগ্রন্থে'র সম্পাদক জনাব আবুল আহসান চৌধুরী ও আমার প্রাক্তন সহকারী জনাব মহম্মদ গোলাম রহমান। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আমি যে-সময় কুস্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলুম সে-সময় সেখানকার দ্বিতীয় মুন্সেফ ছিলেন স্বর্গীয় মতিলাল দাশ। তাঁর 'লালন-গীতিকা' একখানি মূল্যবান সংগ্রহ। তাঁর কাছেও আমি ঋণী। 'ষষ্টিমধু' সম্পাদক শ্রীকুমারেশ ঘোষকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁর মাতামহ স্বর্গীয় রাইচরণ দাসের রচনা-সংগ্রহ আমার সহায়।

পরিশেষে আমার কৃতজ্ঞতা শ্রীরবীন বল ও শ্রীদুলাল বলের কাছে। এঁরা উৎসাহের সঙ্গে এ বই অতি সত্বর প্রকাশ করছেন। লালন দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

৩রা বৈশাখ, ১৩৮৫ **অন্নদাশঙ্কর রায়**

প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল লালন ফকিরের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর শত-বার্ষিকীর প্রায় এক বৎসর ব্যবধানে। মৃত্যুর তারিখ ১৭ই অক্টোবর ১৮৯০ সাল। এটাই প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ।

জন্মসাল নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ ছিল। আর সরকারে সরকারে অসহযোগ। তাই সেবারকার দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান আশানুরূপভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। এপারে আমরা ওপারের কাউকে পাইনি। ওপারে ওঁরাও এপার থেকে কাউকে পাননি। এবারে তো পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ হতে পারে নি। মৃত্যুসালের লিখিত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সরকারে সরকারে সহযোগিতা না হলে দুই পারের অনুষ্ঠানে দুই পারের বাউলদের পাওয়া যাবে না। আমরা আশা করব এর পরের জন্মোৎসব ও স্মরণ অনুষ্ঠানগুলি দুই প্রান্তেই সুসম্পন্ন হবে।

এই সংস্করণে লালন স্মরণ যুক্ত হলো। দ্বিতীয় সংস্করণে পরিশিষ্ট হিসাবে 'মানবিকবাদ প্রসঙ্গে' সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। প্রকাশন ভার নিয়েছেন মিত্র ও ঘোষের শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৯ মার্চ ১৯৯২ — অন্নদাশঙ্কর রায়

লালন তিরোধান শতবার্ষিকী

আগামী অক্টোবর মাসে লালন শাহ ফকিরের মৃত্যু শতবার্ষিকী। জীবিত থাকতেই তিনি যথেষ্ট প্রখ্যাত ছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার অপ্রমাণিত, তবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত একটি প্রতিকৃতি যে লালনের, এটা সংশয়াতীত। মৃত্যুকালে লালনের বয়স হয়েছিল—তাঁর শিষ্যদের মতে—এক শো ষোল বছর। কিন্তু প্রামাণিক দলিল না থাকায় গবেষকরা একমত হন না। তাই দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে এপারে আমরা অপ্রত্যাশিত বাধা পাই। ওপারে লালনের আখড়ায় ও অন্যত্র যথাযোগ্য অনুষ্ঠান হয়। সেবার মতভেদ থাকলেও এবার তো মতভেদ নেই। এবার সবাইকে চেষ্টা করতে হবে শতবার্ষিকী যেন সুসম্পন্ন হয়।

দরবেশদের নামের পদবী "শাহ"। ফারসি ভাষায় এর অর্থ "মহারাজা"। লোকমুখে এঁদের পদবী "সাঁই"। অর্থাৎ স্বামী। স্বামীজীদেরও তো বলা হয় মহারাজ। সাঁইদের যিনি গুরু তিনিও সাঁইজী বলে অভিহিত। সাঁই শব্দের আরো একটি অর্থ ঈশ্বর।

লালনের গানে ঈশ্বরের বা আল্লার উল্লেখ সাধারণত মেলে না। কিন্তু একই অর্থে সাঁই-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সব দরবেশ বাউল নন। সব বাউল দরবেশ নন। লালন ছিলেন দীক্ষার দিক থেকে দরবেশ, কিন্তু সাধনার দিক থেকে বাউল। বাউল সাধনায় দেহ-তত্ত্বের একটি অত্যাবশ্যক স্থান আছে। যেমন আছে সহজিয়া, তান্ত্রিক, যোগী সাধনায়। এ সাধনায় নারী হচ্ছে অপরিহার্য সঙ্গিনী। নারীকে সমান ও স্বাধীন মর্যাদা দেওয়া হয়। বাউল শব্দটি এসেছে বাতুল থেকে। হিন্দীতে বাচুল থেকে বাউরা। যেমন বৈজু বাউরা। এরা সমাজে থাকে না, গৃহী নয়। এদের সম্পত্তি থাকে না, সন্তান জন্মায় না। দিনভর গান গেয়ে বেড়ায়, রাত্রে আখড়ায় মিলিত হয়। এরা ভিক্ষাজীবী। সব ফকির বাউল নয়, সব বাউলও ফকির নয়। তবে সাধারণত মুসলিম বাউলরা ফকির। কোনো কোনো হিন্দুকেও ফকির বলা হয়। তৃপ্তি ব্রহ্ম আপনার পরিচয় দেন তৃপ্তি ফকির বলে। অশোক ফকির বলে আরেকজনের পরিচয়।

হিন্দু বাউল, মুসলিম বাউল, এভাবে পরিচয় দিলে লালনের প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁর শিষ্যদের প্রতিও। তাঁদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন। সাধনাটা অভিন্ন। তার কতক অংশ সুফী, কতক বৈষ্ণব, কতক বৌদ্ধ সহজিয়া। দরবেশরা সুফী।

সুফীরা মুসলমান হলেও আনুষ্ঠানিক নন। অনেক হিন্দু সুফী সাধক হলেও মুসলমান নন। হিন্দু ও মুসলিম এই দুই বিভাগের ভিতরে ও বাইরে লালনের মতো বাউল ও ফকিরদের অবস্থান। এঁরা কোনো পীরের মুরিদ নন। কিংবা কোনো গোস্বামীর শিষ্য। এঁরা মসজিদেও যান না, মন্দিরেও যান না, নামাজও পড়েন না, পুজাও করেন না, শরিয়তও মানেন না, শাস্ত্রও

মানেন না, এঁরা ইংরেজীতে যাকে বলে Non-conformist। তা সত্ত্বেও বোঝা যায় এঁরা বৃহত্তর অর্থে মুসলমান অথবা হিন্দু। কিন্তু প্রচলিত অর্থে হিন্দুও নন, মুসলমানও নন।

"সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন ভাবে জাতের কী রূপ দেখলেম না এই নজরে।"

লালনের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় হাজার হাজার লোকের মনে কৌতূহল ছিল লালন হিন্দু না মুসলমান। চেহারা থেকে, পোশাক থেকে, কথাবার্তা থেকে জানবার উপায় ছিল না তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর প্রয়াণের পর "হিতকরী" পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির নাম "মহাত্মা লালন ফকীর"। মুসলমানের নামের পূর্বে "মহাত্মা" বিশেষণ প্রয়োগ করার রীতি নেই। যদি কেউ করেন তাহলে তিনি নিজে মুসলমান নন, তিনি একজন উদারমতি হিন্দু। নিবন্ধটির লেখক সম্ভবতঃ পত্রিকার সহ-সম্পাদক রাইচরণ দাস। কুষ্টিয়ার উকিল। নিবন্ধকার লিখেছিলেন, "নিজে লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই, কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত।

"মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে। কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলার উপায় নাই। ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন।"

ওই নিবন্ধে আরো স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছিল, "ইনি নেমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কী প্রকারে বলা যায়?"

মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁর অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁর অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগেনি। হরিনাম কীর্তন হয়েছিল। তাঁরই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের মধ্যে তাঁর সমাধি হয়েছিল। নিবন্ধকার শুনেছিলেন, শ্রাদ্ধাদি কিছুই হবে না, বাউল সম্প্রদায় নিয়ে মহোৎসব হবে। তার জন্যে শিষ্যরা অর্থসংগ্রহ করছেন। সাধু সন্তদের মৃত্যুকেও সমাধি বলা হয়। তাই মৃতদেহকে দাহ করা হয় না। মাটির নীচে তাঁরা জীবিত। এ রীতি পীরদের বেলাও লক্ষিত হয়। সাধারণ গোরস্থান তাঁদের জন্যে নয়। তাঁদের নিজস্ব মাজার।

'হিতকরী' পত্রিকার বিবরণ থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না যে

লালন জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন বা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে দীক্ষাসূত্রে মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর দীক্ষা দরবেশ দীক্ষা। দীক্ষা দান করেছিলেন সিরাজ সাঁই। একজন অখ্যাত সাধক। দরবেশরা সুফী আর সুফীরা মুসলমান। অতএব লালনও মুসলমান পর্যায়ভুক্ত। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁকে বিশেষভাবে চিনতেন। কাঙালের মতে মহম্মদের পরেও অনেক ভক্ত মুসলমানকুল "পবিত্র" করেছিলেন। লালন সাঁই নামে যে ফকির বাস করেন তিনিও "পরম ভক্ত যোগী"। তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই।

"সিদ্ধযোগী" কাঙালের এই রচনাটি লালনের জীবিত কালে লিখিত। এটি প্রামাণিক হলে লালনের জন্ম মুসলমানকুলে। তবে এক্ষেত্রে কুল বলতে বোধহয় "সম্প্রদায়" বোঝায়, "বংশ" নয়।

লালন জন্মসূত্রে মুসলমান না দীক্ষা সূত্রে মুসলমান এর ফয়সালা আজও হয়নি। এর প্রয়োজনই বা কিসের? মুসলমান হলেও তো তিনি সামাজিক মুসলমান ছিলেন না। বাউল ফকিররা সামাজিক মুসলমান নন। লালন যদি বিখ্যাত না হতেন কেউ তাঁকে মুসলমান বলে গর্ব বোধ করত না। বেশরা ফকিরদের প্রতি অবজ্ঞা আমি পূর্ববঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম। লালনও একজন বেশরা ফকির। শরিয়ত মেনে চলতেন না। লালন তাঁর গানের জন্য সর্বত্র জনপ্রিয় হলেও তাঁর জীবনযাত্রা তো সামাজিক মুসলমানদের মতো ছিল না। হিন্দুরাও যে তাঁকে সামাজিক হিন্দু বলে গণ্য করত তাও নয়।

বাউল, ফকির, সহজিয়া, যোগী, তান্ত্রিক, কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের এদেশে উৎপত্তি। এঁদের ঠিক হিন্দু বা মুসলমান বলে সারিবদ্ধ করা যায় না। তা ছাড়া এঁরা ঈশ্বরের চেয়ে মানুষকেই সত্য মনে করেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এটা বোধহয় এঁদের সকলের বাণী। "এই মানুষে সেই মানুষ আছে", লালনের গানে পেয়েছি। তেমনি অন্যান্যদের গানেও। এখানে "সেই মানুষ" হচ্ছেন ঈশ্বর বা আল্লাহ্। এঁরা মানবিকবাদী। ইংরেজিতে যাঁদের বলে হিউম্যানিস্ট। অথচ অবতারবাদী নন।

আমাদের আসল কাজ হচ্ছে লালনের অসংখ্য গানের শুদ্ধরূপ প্রকাশ করা। লিপিবদ্ধ নয় বলে প্রচুর মিশ্রণ ঘটেছে। চাহিদা আছে বলে বহু ব্যক্তি লালন গীতি তৈরি করছেন। ভণিতা লালনের নামে। যাঁর যেমন খুশি তিনি তেমনি সুরে গাইছেন। লালন গীতি প্রকৃতপক্ষে সাধনসঙ্গীত। একে লোক-গীতি বলে গণ্য করা ভুল। সাধনার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক নেই তাঁরা সুগায়ক হলেও মর্মজ্ঞ নন। লালন শাহী বাউল না হলে লালনের গান কেউ ঠিকমতো গাইতে পারবেন না। তাঁদের সমবেত করে লালন শতবার্ষিকী পালন করা উচিত। কিন্তু তাঁদের একত্র করা সহজ নয়।

বাংলাদেশের সহযোগিতা না পেলে এপারের অনুষ্ঠান কর্তারা অসহায়। তাঁদের সহযোগিতা পেলে এপারের শতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হবে।

লালন দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে যাঁদের আমরা ওপার থেকে আনাতে পারিনি তাঁদের কয়েকজন পরে এসে আমাদের গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন হিন্দুও ছিলেন। লালনের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যেও বহু সংখ্যক হিন্দু ছিলেন। তাঁর সাধনা ধর্মীয় নয়, মানবিক। সাধকরা পরমাত্মার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক চান, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে উদাসীন। স্বর্গে যাবার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা নেই, নরকে যাবার ভয়ে তাঁরা ভীত নন। এই দেহ আর এই জীবন আর এই মর্ত্যভূমি নিয়েই তাঁদের গানের জগৎ।

তাঁরা রাজারাজড়া বা নবাব বাদশাদের দরবারে যান না, আগেকার দিনে শহরে গঞ্জেও আসতেন না। গ্রামের এককোণে নিভৃতে বাস করতেন, দিনরাত গান করতেন, গোপনে সাধনা করতেন, সাধনাও ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু নারীকে নিয়ে। সমাজ হিন্দুই হোক আর মুসলিমই হোক কোনো দিন এঁদের নেক নজরে দেখেনি। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর জমির মতো বাউলোত্তর জমির নাম আমি সেটলমেণ্টের খতিয়ানে দেখিনি। এঁদের যাঁরা আখড়ার জন্যে জমি দিতেন বা অন্যভাবে সাহায্য করতেন তাঁরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর তন্তুবায় বা হিন্দুমুসলমান। বাউলরাও প্রধানত কৃষকশ্রেণীর লোক। একমাত্র লালন বোধহয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান। কায়স্থকুলে জন্ম বলে জনশ্রুতি।

আজকাল বাংলাদেশ থেকে যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁদের মুখে শুনতে পাই, বাউলদের উপর এমন নির্যাতন চলছে যে বাউল বলে পরে আর কেউ থাকবে না। একইরকম নির্যাতনের খবর পাচ্ছি মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। মধ্যযুগের এই সম্প্রদায় হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, অথচ অহিন্দুও নয়, অমুসলমানও নয়, সমাজের মার্জিনে এদের স্থিতি। সমাজ যদি দাবি করে যে এরা আর দশজন হিন্দু বা মুসলমানের মতো শাস্ত্র বা শরিয়ত মেনে মন্দিরে বা মসজিদে যাবে, পূজা-আর্চা করবে বা নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, তাহলে বাউল ধারা আর বহমান থাকবে না। যাঁদের আমরা দেখছি তাঁরাই শেষ বাউল। ভেক ধরলেই সাধু হয় না। নিয়মিত সাধনা করা চাই। সেই সাধনা যদি বাউল ঐতিহ্য অনুসারী না হয়ে শাস্ত্রীয় বা শরিয়তী হয় তবে তার বৈশিষ্ট্য কোথায়? সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে গিয়ে আমরা মুসলমান বা হিন্দু গড়তে পারি, কিন্তু বাউল বা দরবেশ গড়তে পারব না। গান তো ইসলামে নিষিদ্ধ। বাউল গান যদি নিষিদ্ধ হয় তবে আমাদের উত্তর পুরুষেরা একটি মহান উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। গানগুলির ইসলামীকরণ অথবা বৈষ্ণবীকরণ তো আরও অনিষ্টকর। তাতে বাউলের বস্তু থাকে না। ভান থাকে। বাউল ধারাকে, বাউল সাধনাকে বাঁচাতে হবে। এর জন্যে চাই সহনশীলতা, উদারতা। সেটা নিম্নস্তরে ছিল বলেই লালন শাহ্ ফকির সম্ভব হয়েছিলেন ও মহাত্মা বলে বন্দিত হয়েছিলেন।

(১৯৮৯)

লালন স্মরণ

লালন শাহ্ ফকির দেহরক্ষা করেন ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে। তাঁর শিষ্যদের মতে তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর। তার মানে তাঁর জন্ম ১৭৭৪ সালে। সেকালের কোনো লিখিত সাক্ষ্য না থাকায় জন্মসালটি বিতর্কিত। তবে জনশ্রুতিরও মূল্য আছে। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে লালন ফকিরের জন্মদ্বিশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তাব আমার কানে এসেছিল ১৯৭৪ সালে ঢাকা ভ্রমণকালে। বাংলাদেশের বন্ধুদের ইচ্ছা পশ্চিমবঙ্গেও লালন জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী যেন পালন করা হয়। আমাকেই অনুরোধ করা হয় সে ভার নিতে। আমিও কথা দিই। কিন্তু এই শর্তে যে ওপার থেকে এপারে খাঁটি লালনশাহী বাউল সংগ্রহ করে পাঠাতে হবে। বাউলদের গানই তো আসল। গান বিনা বাউলের অন্য পরিচয় নেই। আমরা লালনের গান শুনেই চিনি তিনি কে বা কী ছিলেন। কী বলতে এসেছিলেন। কী বলে গেলেন। সভাসমিতি করে বক্তৃতাসূত্রে লালনকে চেনা যায় না। চাই বাউলদের জমায়েত ও গানের আসর।

ওপারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে করতে হঠাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিধন সংবাদ আসে। ছেদ পড়ে যায়। তা সত্ত্বেও আমি হাল ছেড়ে দিইনে। কিছুকাল পরে ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র হন ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁকে অনুরোধ করি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে। ততদিনে যাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে লালনভক্ত কেউ ছিলেন কি-না জানিনে। গত পনেরো বছরের মধ্যে একবারও তাঁরা আমাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতে পরপর ১৯৭২, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে আমরা আমন্ত্রিত হয়েছিলুম। তারপর থেকে আর কখনো নয়। চন্দ্র মহাশয় হতাশ হন। আমিও হতাশ হই। ওপারে ওঁরা দ্বিশতবার্ষিকী পালন করলেন কি-না খবর পাইনি। সাচ্চা লালনশাহী ফকিরের অভাবে আমরা জন্মদ্বিশতবার্ষিকী পালন করতে পারিনি। এ খেদ আমি গত বারো তেরো বছর ধরে লালন ও বহন করেছি। দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৯০ সাল। লালন তিরোহিত হন গত ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে কুষ্টিয়ার সন্নিকটে ছেঁওড়িয়া বা সেঁওড়িয়া গ্রামে তাঁর নিজের আখড়ায় শিষ্যপরিবৃত হয়ে গান করতে করতে। কুমারখালির 'হিতকরী' পত্রিকায় ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় রচনা 'মহাত্মা লালন ফকীর'। একজন ফকিরকে 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করা সেই প্রথম ও সেই শেষ। 'মহাত্মা' শব্দটি হিন্দুর লেখনীমুখেই মানায়। অনুমান রচনা সম্পাদক মীর মশারফ্ হোসেনের নয়, সহকারী সম্পাদক রাইচরণ দাসের। সেই রচনা থেকে জানা যায় লালনের ভক্ত ছিল দশ হাজারের উপর। তাঁদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন নিশ্চয়। এখনো লালনশাহী ফকিরদের মধ্যে হিন্দুও আছেন। লালনের সাধনা সুফী দরবেশ সাধনা। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন সিরাজ

সাঁই ফকির। কিন্তু লালনের গান কেবল সুফী দরবেশ ধারায় নিবদ্ধ ছিল না। কতক গান দেহতত্ত্বমূলক। কতক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় সিক্ত। মানুষতত্ত্ব যে তিনি কোথায় পেলেন বলতে পারব না, সম্ভবত বৌদ্ধ সহজিয়া ধারা থেকে। মনে হয় সেটাই তাঁর সাধনার বিশেষত্ব।

সুখের বিষয় এবার বাংলাদেশ সরকার থেকেই লালনের মৃত্যুশত-বার্ষিকীতে ডাকটিকিট ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত লালনের স্কেচ। লালনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে কবি লালন শাহ্। বাউলও না, ফকিরও না। ইসলাম যে দেশে রাষ্ট্রধর্ম সেদেশ বাউলকে মুসলমান বলে স্বীকার করতে পারে না। সুতরাং বাউল পরিচয় খারিজ। কিন্তু ফকির তো ইসলামসম্মত। যথা, ইপির ফকির। অতদূর যাব কেন, রাজশাহী জেলার নওগাঁয় আমার নিত্য সহচর ছিল আসমত ফকির নামক চাপরাশি। আমার আপদে বিপদে সহায়। সেখানে এক মুসলিম ফকির ও তার ফকিরানীকে আমার বাংলোয় নিয়ে এসেছিলেন মহম্মদ মসুরউদ্দীন। বাকে সাহেব ফকিরানীর গান রেকর্ড করেন। ফকিরানীর মুখে শুনেছিলুম, "চণ্ডিদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দু'জন মলোরে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।" ফকিরানী এরপর গেয়ে শুনিয়েছিল যে, "প্রেমের ডোরে আছেন বাঁধা, মহম্মদ আর আপনে খোদা।" মনসুরউদ্দীন সাহেব নিজে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ গবেষক। ইসলামবিরুদ্ধ বলে গানের কথা শুধরে দিতেন না। তাই ফকিরানীর গান অবিকৃতভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের দীক্ষা বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারী, সুফীঐতিহ্য অনুসারী নয়। লালনের গানে 'সাঁই' কথাটির উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়, কখনো তিনি নিজেই লালন সাঁই, কখনো তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই, কখনো মানষের অন্তরে যে মানুষ আছেন সেই মনের মানুষ সাঁই। এই শব্দটি আমি কখনো এপারের বাউলদের গানে শুনিনি। সুতরাং বাউল বললে কেবল একই প্রকার বাউল বোঝায় না। ফকির বললেও একই প্রকার ফকির নয়। লালনশাহী ফকিররা কেউ বা জন্মসূত্রে মুসলমান, কেউ বা দীক্ষাসূত্রে মুসলমান। কিন্তু লালনের দীক্ষা বোধহয় গতানুগতিক ইসলামী দীক্ষা ছিল না, যতখানি ছিল সরাসরি সুফী দরবেশ দীক্ষা। যতদূর জানি হিন্দুদের মধ্যেও কেউ কেউ সুফী সাধনা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইসলামী দীক্ষায় দীক্ষিত হননি। ইসলাম একটি ধর্মমত, সুফী একটি সাধনমার্গ। যেমন হিন্দু একটি ধর্মমত, সহজিয়া একটি সাধনমার্গ। ধর্মমত আর সাধনমার্গ এ দুইয়ের পার্থক্য মনে রাখলে লালনের উক্তির মর্ম অনুধাবন সহজ হয়।

"সবলোকে কয় লালন ফকির হিন্দু না যবন
লালন বলে আমি আমার না জানি সন্ধান।"

তাঁকে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত না করে একজন মরমিয়া সাধক বলে গণ্য করাই শ্রেয়। তা হলেই তিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান বৌদ্ধ

নির্বিশেষে দেশ বিদেশের মরমিয়া সাধকদের একজন বলে মান্য হন। একজন মার্কিন মহিলা লালনের পদাবলী ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন। আমি "পদাবলী" বলছি বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তুলনা করে। বাংলা সাহিত্যে লালন পদাবলীও উচ্চাঙ্গের কবিতা। তাকে লোকগীতি বলে শ্রেণীভুক্ত করা ঠিক হবে না। ফোক সং বা লোকগীতি সাধনসঙ্গীত নয়। লালনের গান নিগূঢ় রহস্যময়।

হিন্দীতে 'বাউরা' বলে একটি কথা আছে। বৈজু বাউরা বলতে বোঝায় বৈজু নামক বাউরা অর্থাৎ বাতুল। বাংলা ভাষায় বাউল শব্দটিরও একই অর্থ। বাউরা বা বাউলরা লোকচক্ষে বাতুল, তাদের জীবন সাধারণ সংসারী মানুষের জীবন নয়, তারা গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো, অথচ নারী বর্জিত নয়। নারীও সাধকের সাধনসঙ্গিনী হতে পারে, বহু ক্ষেত্রে হয়ে থাকেও। নারীবর্জিত না হলেও বাউলদের জীবন সন্তানবর্জিত। তা না হলে তারা গৃহী বাউল। সুতরাং কতক পরিমাণে সংসারী।

দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের 'দাস' বাউলরা পূর্ববঙ্গের 'সাঁই' বাউলদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে আহার করেন না। তার মানে তাঁদের মধ্যেও হিন্দু মুসলিম ভেদ আছে। যদিও তাঁরা সামাজিক অর্থে হিন্দুও নন, মুসলিমও নন, দুই গণ্ডীর বাইরে। কবীরপন্থীরাও যখন মিলিত হন তখন তাঁদেরও মাঝখানে থাকে একটা শক্ত দেওয়াল, তার একধারে বসে আহার করেন হিন্দু শিষ্যরা, অন্যধারে মুসলিম শিষ্যরা। রাম আর রহিমকে কবীরও মেলাতে পারেননি। যবন হরিদাসকেও জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। চৈতন্যের শিষ্যরাও তাঁর সহভোজী হননি, যতদূর জানি। অথচ সাধনা একই। দেশ কি সাধে দু'ভাগ হয়েছে? প্রদেশও। জাতিও। একটা অদৃশ্য দেওয়াল বরাবরই ছিল। লালন এর বিরোধী ছিলেন। তার বেশ কয়েকটা গানে জাতপাতের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত তিনি জন্ম-সূত্রে হিন্দুই ছিলেন, হিন্দুরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন মুসলিম সংসর্গের দরুন। জন্মসূত্রে মুসলমান হলে বিদ্রোহের সুর শোনা যেত না। জন্ম সূত্র যাই হোক, তিনি ছিলেন জাতপাতের ঊর্ধ্বে।

যে সাধনা নারীবর্জিত নয়, অথচ সন্তান বর্জিত তার সম্বন্ধে সামাজিক মানুষের সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা স্বাভাবিক। 'হিতকরী'র সম্পাদকীয় রচনাতেও এর প্রমাণ মেলে। সাধকরা একপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা একান্ত গুহ্য। তাঁরা কাউকে জানতে দেন না, যদি বা কেউ জানতে পান তিনি তা প্রকাশ করেন না। তবে লালন প্রভৃতি সাধকের গান থেকে অনুমান করতে পারা যায় যে তাঁদের সাধনা দেহবর্জিত নয়। কায়েন মনসা বাচা তাঁরা সেই মানুষের সন্ধান করতেন যিনি এই মানুষেই বিদ্যমান। বংশরক্ষার দায় তাঁদের নেই। তাঁদের পরম্পরা বংশ পরম্পরা নয়, পিতাপুত্র পরম্পরা নয়, গুরুশিষ্য পরম্পরা। লালনের গুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই, তেমনি লালনের শিষ্য ছিলেন শীতল, মহরম শাহ, মানিক শাহ ও কুদু শাহ। শাহ আর সাঁই একই কথা।

শীতল যাঁর নাম তিনিও শাহ বা সাঁই ছিলেন কিনা সম্পাদকীয় থেকে মালুম হয় না। শিষ্যদেরও শিষ্য ছিলেন, কেউ কেউ এখনো আছেন। আমরা তাঁদের খোঁজ রাখিনে। মাঝখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত, পাশপোর্ট, ভিসা ও বৈদেশিক মুদ্রার বেড়াজাল। বাউলের পক্ষেও দুর্ভেদ্য।

কবি লালনের চেয়ে 'মহাত্মা' লালন অনেক, অনেক বড়ো। ডাকটিকিট বার করতে পারলে আমরা 'মহাত্মা' বলে তাঁর পরিচয় দিতুম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। ডাকটিকিট প্রকাশ করা তার সাধ্যতীত। ভারত সরকারকে এ নিয়ে অনুরোধ করতে আমরা ভরসা পাইনে, আবেদন নিবেদন আমাদের স্বভাব নয়। আমরা যেটুকু অনায়াসে করতে পারি, সেটা আমাদের এখানকার বাংলা আকাদেমির আনুকূল্যে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। সেটাই সম্প্রতি সম্পন্ন হয় ১১ই ডিসেম্বর। তার আগেই ঘটে যায় বাংলাদেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আমন্ত্রিত অতিথি অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী ও তাঁর মনোনীত বাউলরা যোগ দিতে অক্ষম হন। মুর্শিদাবাদ থেকে আসেন তিনজন লালনপন্থী বাউল, শাহ্ পদবী। অন্যান্য জেলা থেকে পাঁচজন ভিন্ন মার্গের বাউল, দাস পদবী। সকলেই লালনের গান আমাদের শোনান। আমার ভাষণটি রেকর্ড করেন তাঁর টেপ রেকর্ডারে শ্রীমান গৌতম রায়। তারই সারাংশ এই নিবন্ধ। তাঁকে আমার ধন্যবাদ। সম্ভব হলে বাংলাদেশ থেকে লালন শাহী বাউল আনিয়ে আবার আমরা অনুষ্ঠান করব অন্য কোন-খানে। তাঁরা না এলে শতবার্ষিকী পালন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

(১৯৯০)

লালন জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী

শতবার্ষিকী তো ফি বছর একজনের না একজনের অনুষ্ঠিত হতে দেখি। দ্বিশতবার্ষিকী বড়ো একটা নজরে পড়ে না। আমার জীবনে আমি দুটিমাত্র দ্বিশতবার্ষিকীতে যোগ দিয়েছি। একটি পঁচিশ বছর আগে কবিগুরু গ্যেটের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী। অপরটি দু'বছর আগে ভারতপথিক রামমোহন রায়ের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী। এ বছর আরো একটি জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীতে যোগ দেবার সৌভাগ্য সমাগত। এটি মহাত্মা লালন শাহ ফকিরের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী।

'মহাত্মা লালন ফকির' কথাটি আমার নয়। 'হিতকরী' পত্রিকার। লালনের মহাপ্রয়াণের দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তার শিরোনামা ছিল 'মহাত্মা লালন ফকীর'। ঘটনাটি ঘটে ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর। আর নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেই সালের ৩১শে অক্টোবর। লালন সম্বন্ধে মুদ্রিত রচনা সেইটিই প্রথম। তবে তার আগে লালনের উল্লেখ পাওয়া গেছে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের 'সংগীত লহরী'র একটি গানে। গানটি এইরকম—

"আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে
কিসে কার মন মজেছে।
ফিকিরচাঁদে, আজবচাঁদে
রসিকচাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগল কানাই,
লালন গোসাঁই, সব সাঁই এতে হার মেনেছে।"

লালনকে গোঁসাই বলে অভিহিত হতে আর কোথাও লক্ষ্য করিনি। সাঁই বলেই তিনি সাধারণে পরিচিত। তাঁর গুরু সিরাজ শাহ ফকিরও ছিলেন সাঁই। কুষ্টিয়া অঞ্চলের লোক এখনো লালনকে সাঁইজী বলে স্মরণ করে ও মানে। সিরাজ শাহ ছিলেন দরবেশ শ্রেণীর ফকির। সুতরাং লালনকেও সেই শ্রেণীর ফকির বলে গণ্য করা যেতে পারে। আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম তখন আমার কুঠিতে কয়েকজন যুবক ও একজন প্রৌঢ়া এসে বাউলের গান গেয়ে শোনায়। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা সকলেই বলে তাদের দরবেশ দীক্ষা। পুরুষদের একজনের নাম ইসব শাহ। অন্যান্যদের নাম ঠিক মনে পড়ছে না। তবে মুসলমানী নাম। পদবী শাহ। কিন্তু মেয়েটির নাম হরিদাসী। না, হিন্দুর মেয়ে নয়। সেও তাদেরই একজন। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে মুসলমানের হিন্দু নাম একটুও অস্বাভাবিক ছিল না। আমার চাপরাশি বাদল যে মুসলমান এটা জানতে আমার দেড় বছর লেগেছিল।

লালনের নাম আমি কুষ্টিয়ায় থাকতেই শুনেছিলুম। কিন্তু কোনোদিন তাঁর আখড়ায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যদিও মাইল দেড়েকের ব্যবধান। তবে লালনের শিষ্যদের অনুযোগ তখনি আমার কানে এসেছিল যে, লালনের গানের খাতাখানি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গেছেন ও প্রার্থনা সত্ত্বেও ফেরৎ দিচ্ছেন না। নাম করব না, তাঁদের কারো কারো ধারণা যে 'গীতাঞ্জলি' রচনার মূলে লালনের সেই খাতা। পরবর্তীকালে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সেই খাতাখানি দেখতে পান। সেটি কিন্তু আসলে খাতা নয়। উপেন্দ্রবাবুর মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের আখড়া থেকে সেখানে রক্ষিত একখানি কপি সংগ্রহ করে তাঁর এক কর্মচরীকে দিয়ে আর একপ্রস্থ নকল করিয়ে নেন। পরে ওর থেকে শুদ্ধ করে কতকগুলি গান 'প্রবাসী'-তে প্রকাশ করেন। আসল খাতা রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়নি। লোকের ধারণা অমূলক। রবীন্দ্রনাথ যে খাতা পেয়েছিলেন সেটিও নকল খাতা। তার থেকে কুড়িটি গান বেছে নিয়ে তিনি 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন ১৩২২ সালে। এটা তাঁর বিশ্ব খ্যাতির পূর্বে নয়, পরে। এতে লালনেরই খ্যাতি বাড়ে।

কেউ কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাকি তাঁর চিত্র-পুস্তকে লালনের একখানি প্রতিকৃতি এঁকে নেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সেটি ১৮৯৫ সালে দেখেন ও 'ভারতী' সম্পাদিকা স্বর্গীয়া সরলা দেবীকে জানান। সরলা দেবীর প্রবন্ধে এর উল্লেখ আছে। প্রবন্ধের নাম

'লালন ফকির ও গান'। 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। সেই প্রতিকৃতির সন্ধান এখনো মেলেনি। তবে সেটি ছিল অসম্পূর্ণ। বোধ হয় স্কেচ।

লালনের চেহারা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক লালনপন্থী ফকির খোদাবক্স শাহ (১৯৪০ সালে বয়স ৯৭ বছর) উপেন্দ্রবাবুকে বলেন যে, লালনের মাথায় বাবরী চুল ছিল, মুখে ছিল লম্বা দাড়ি, একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন, মুখে অল্প বসন্তের দাগ, আয়ত চক্ষে এক গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কুমারখালির ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়ও ঐরূপ বর্ণনা দেন। তিনি ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ীতে লালনকে কয়েকবার দেখেছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সরলা দেবীকে লিখেছিলেন, "লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্তভাব দেখিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যাইত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম-জীবনের প্রেমোন্মত্ততা মিলিত হইয়া তিনি যে নিরক্ষর তাহা যেন সহজে বুঝিতে পারা যাইত না।"

অক্ষয়বাবু লালনকে স্বচক্ষে দেখেননি। 'হিতকরী'র নিবন্ধকার তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য এইরূপ—"লালন ফকিরের নাম কাহারও জানিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রংপুর, দক্ষিণে যশোহর ও পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য শুনিতে পাই; ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি! কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। ...আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন, সম্প্রদায়ের ধর্মমতানুসারে ইঁহার কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে, বাউল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়।... লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে, কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই, ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি, ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা 'সাঞি' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নেমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়?"

'হিতকরী' নিবন্ধকার আরো বলেন, "ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন

উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে, না হয় অজ্ঞতা-বশতঃ, কিছু বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ, লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিকবংশীয়রা ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থভ্রমণকালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকির হয়েন। ইহার মুখে বসন্ত রোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। মরণের পূর্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন, 'আমি চলিলাম'। ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিম কার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার হয় নাই। হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্য শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।"

ঐ নিবন্ধ থেকে আরো জানা যায় যে, লালন বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা (মহোৎসব) দিতেন। তাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্র হয়ে সংগীত ও আলোচনা হতো। তাতে তাঁর পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয় হতো। "লালন ফকির নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন, বস্তুত তাহা নহে। ইনি সংসারী ছিলেন, সামান্য জোতজমা আছে, বাটীঘরও মন্দ নহে। জিনিসপত্রও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা দুই হাজার রাখিয়া মরিয়া যান। ইঁহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন।" এটাও নিবন্ধকারের সাক্ষ্য।

নিবন্ধকারের নাম জানবার উপায় নেই, কারণ পত্রিকাটিতে সম্পাদকের নাম থাকত না। প্রকাশক ছিলেন লাহিনীপাড়ার দেবনাথ বিশ্বাস ও মুদ্রাকর কুমারখালীর রজনীকান্ত ঘোষ। লাহিনীপাড়া ও ছেঁউড়িয়া দুটি গ্রামই কুমারখালী থানার তথা কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত। পত্রিকাটি ১২৯৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়। তার পরের বছর টাঙ্গাইল থেকে। লাহিনীপাড়া আর টাঙ্গাইল এই দুই স্থানের একমাত্র যোগসূত্র মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর জন্মস্থান লাহিনীপাড়া, কর্মস্থান টাঙ্গাইল। অনুমানের কারণ আছে যে, মীর মশাররফ হোসেনই ঐ পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। রচনাটি যদি তাঁর না হয়ে থাকে তবে তাঁর সহ-সম্পাদক রাইচরণ দাসের হওয়া সম্ভবপর। এই ভদ্রলোক ছিলেন কুষ্টিয়ার উকীল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এঁর উল্লেখ করেছেন রাইচরণ বিশ্বাস নামে। কুষ্টিয়ার উকীলবাবু রাইচরণ বিশ্বাস, কুমারখালীর খ্যাতনামা হরিনাথ

মজুমদার ও তাঁহার ফিকির চাঁদের দলস্থ লোকেরা লালনের অনেক গান ও জীবনের অনেক ঘটনা জানেন। তার মানে শেষ জীবনের। কারণ লালনের আয়ুষ্কাল ছিল একশো ষোল বছর দীর্ঘ। তাঁর প্রথম ছাব্বিশ বছর কেটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ফকিরী গ্রহণ করেন তিনি অল্প বয়সেই। অক্ষয়-কুমারের অনুসন্ধান অনুসারে দশ বারো বছর বয়সে তিনি বারুণী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে যান ও সেখানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পরিত্যক্ত হন। একজন মুসলমান ফকির সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য করে তাঁকে লালন-পালন করেন ও ধর্মশিক্ষা দেন। এই ফকিরের নাম সিরাজ শাহ।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ কী জানি কেমন করে জানতে পেরেছেন যে ১৮২৩ সালের দিকে লালন নানা তীর্থ পর্যটনের পর কুষ্টিয়ার সেঁউড়িয়া গাঁয়ের জোলা জাতীয় মুসলিম স্ত্রী গ্রহণ করে সেইখানেই বসবাস করতে থাকেন। তা যদি হয় তবে আস্তানা গেড়ে একস্থানে বসবাস ১৮২৩ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত সাতষট্টি বছর। তার আগে গৃহহীন অবস্থায় পথে পথে। প্রথম দশ-বারো বছর জন্মস্থান চাপড়ার সংলগ্ন ভাঁড়ারা গ্রামে। লালনের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর জীবনকাহিনী লোকমুখে পল্লবিত হতে হতে যে আকার নিয়েছে তা ইতিহাস নয়, তা উপন্যাস। আমরা তার উপর নির্ভর করতে পারিনে। এই পর্যন্ত জানা যায়, হিন্দু কায়স্থ করবংশীয় সহযাত্রী-পরিত্যক্ত বসন্ত রোগী। আরোগ্য লাভ করে সিরাজ শাহ ফকিরের শিষ্য। যাঁর অপর নাম সিরাজ সাঁই। সেই সুবাদে তিনিও লালন শাহ ফকির। তথা লালন সাঁই। ফকিরদের ফকিরানী থাকেন। এটা আমিও দেখেছি। কিন্তু ফকির বা ফকিরানী কেউ শরিয়তী মুসলমান পর্যায়ভুক্ত নন। তাঁরা বেশরা ফকির বা নাড়ার ফকির। মুসলিম সমাজ তাঁদের স্বীকার করে না।

লালন যে মুসলিম সমাজে ঠাঁই পাননি এ বিষয়ে জনাব আবুল আহসান চৌধুরী যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের নাম 'বাঙলার বাউল-বিরোধী আন্দোলন ঃ প্রেক্ষিত লালন শাহ।' তাতে আছে "বাউলধর্ম বাঙলার জনপ্রিয় লোকধর্ম। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না অথচ এই জনপ্রিয় লোকধর্মকে লোকমানসপট থেকে মুছে ফেলার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। এই কারণে বাউল সম্প্রদায়ের লোকদের সমাজে বিভিন্ন ভাবে অনাদৃত ও নিগৃহীত হতে হয়েছে। বাউলরা শরিয়ত-পন্থী মুসলমান ও হিন্দুধর্মচারীদের দ্বারা যুগপৎ উৎপীড়িত হয়েছেন। এই বিরোধিতা ও নিগ্রহের দুটি প্রধান কারণ হলো—বাউলদের প্রভাবে শাস্ত্র-শাসিত ধর্মানুশাসনকারীদের সংখ্যা হ্রাস এবং সেই হেতু মোল্লা মৌলবী পুরুতদের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ক্ষয়। প্রথম কারণটি ধর্মীয়; দ্বিতীয় কারণটি অর্থনৈতিক। বাউলবিরোধী আন্দোলনে এযাবৎ মুসলমান ধর্ম ও সমাজসংস্কারক এবং মোল্লা মৌলবীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। বাউলধর্মে দীক্ষিতদের মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য এবং বাঙলার প্রখ্যাত বাউলদের অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াই এর

কারণ। যদিও বাউলদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দেখা যায়।"

লেখক আরো বলেন, "বাউলরা ভাব বিদ্রোহী। তারা আচারিক ধর্মকে অস্বীকার ও বর্জন করে সহজ সাধনায় ব্রতী হয়েছে। শাস্ত্র তাদের পরিচালিত করেনি—হৃদয় তাদের পথ দেখিয়েছে। বাউল-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পশ্চাতে ধর্মীয় শোষণ ও সামাজিক অবিচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিহিত ছিল। জাতিভেদ, ছুৎমার্গ ও ধর্মীয় আভিজাত্য নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বিশেষভাবে পীড়িত ও ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই সহজেই তারা সহজিয়া সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কালিক বিবর্তনে এরাই বাউল নামে পরিচিত হয়। সনাতন শাস্ত্র আচার ও প্রচলিত সমাজধর্মের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সম্প্রদায় ধর্মের প্রাচীর ভেঙে তারা পেয়েছে এক উদার মিলন ময়দানের সন্ধান। সমাজ ও ধর্ম থেকে স্বেচ্ছাবিশ্লিষ্ট এই সাধক-সম্প্রদায়ের একতারায় ধ্বনিত হয়েছে শাস্ত্রমুক্তির সুর।"

জনাব আবুল আহসানের মতে লালনের জীবদ্দশাতেই লালনবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। "তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট থেকেই তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, নিন্দা ও শত্রুতা কুড়িয়েছেন। তাঁর প্রেম ও অধ্যাত্ম ধর্মশাস্ত্রবাদী ধর্মগুরু ও সমাজপতিদের দ্বারা বারবার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কিন্তু লালন ধীর স্থির লক্ষ্যগামী। কোনো অন্তরায়, প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে নিরুৎসাহিত বা স্তব্ধ করতে পারেনি। নদী যেমন সকল বাধা অতিক্রম করে সাগরের লক্ষ্যে বিরতিহীন ছুটে যায়, তেমনি লালন সব বিরোধিতাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছেন সত্যাভিমুখে—পরম প্রিয় মনের মানুষকে পাবার আশে। লালন তত্ত্বানুসন্ধানী। তাই এই সব দুঃখ আঘাত বেদনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়নি।"

মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহমদের বাউল ধ্বংস ফাৎওয়ার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে। ততদিনে লালনের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীবসন্তকুমার পাল ও ছেপেছেন 'প্রবাসী'। মওলানা সাহেব রায় দেন যে, লালন সাহার ধর্মের কোনই ঠিক ছিল না। বরঞ্চ তাঁহার ভাবের গান ও কবিতাবলীর ভিতর দিয়া পরিস্ফুটিত হয় যে, তিনি হিন্দু জাতির একজন উদাসীন ছিলেন। তিনি কেবল মুসলমানের হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুসমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। "তিনি মোছলমানের অন্ন ভোজন ব্যতীত এছলাম গ্রহণ করেন নাই বা মোছলমান বলিয়া নিজেকে স্বীকার করেন নাই বা এছলামের আবিদা, বিশ্বাস ও নামাজ-রোজা প্রভৃতির কোনো চিহ্নই কিম্বা আচার-ব্যবহার কিছুই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে মোছলমান বলা যাইতে পারে। তিনি মোছলমানের হোলিয়া অনুসারে মোছলমানের দরবেশ ফকির হওয়া দূরে থাক, একজন মোছলমান বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারেন না। তিনি যত বড়ই মুনি ঋষি উদাসীন হউন না কেন মোছলমানের তিনি কেহই নহেন।...সুতরাং

বাউল বা নাড়ার ফকিরগণ যে লালন সাহাকে মোছলমানের সেরা পীর দরবেশ বলিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ মোছলমানের দরবেশ ফকিরের দাবী করিয়া দুনিয়াটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন ইহা তাঁহাদের সর্বৈব পথ-ভ্রষ্টের পরিচয় মাত্র।"

লালন হিন্দু না মুসলমান লালনের জীবিতকালেও এ প্রশ্ন উঠেছিল। তাঁর উত্তর—

"সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।"

এই প্রসঙ্গে তাঁর আরো একটি গান আছে। সেটি আরো প্রসিদ্ধ। 'হিতকরী'র সেই নিবন্ধের শেষে সেটি উদ্ধৃত হয়েছিল।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালম ভাবে জাতের কি রূপ দেখলেম না এই নজরে।
কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে ?
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনি চিনি কিসে রে ?
জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন সে জাতের ফাতা
ঘুচিয়েছে সাধ বাজারে।"

ওটা বোধ হয় 'সাত বাজারে' হবে। অন্যত্র 'সাত বাজারে' দেখেছি।

লালন হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও সিরাজ সাঁইয়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে ফকির হয়েছিলেন। ফকিরদের মধ্যে বিবিধ মত প্রচলিত ছিল। সিরাজের মত দরবেশ বলেই অনুমান হয়। দরবেশরা সুফী ধারার সাধক। ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছু তাঁদের কাম্য নয়। বহিরঙ্গ আনুষ্ঠানিকতায় তাঁদের অনীহা। তবে সংসারে থাকতে হলে সেটাও মেনে নিতে হয়। যাঁরা মানতেন না তাঁরাই দরবেশ হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। নাচ গান বাজনাই তো তাঁদের প্রার্থনা, জাগর ও উপবাস।

দরবেশের মধ্যে যাঁরা বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁদের সাধনায় সুফী দরবেশ ভিন্ন আরো দুটি অঙ্গ ছিল। তাঁরা সুফী দরবেশের চেয়ে আরো কিছু বেশী। লালন ছিলেন এই অর্থে বাউল।

এই দুটি অঙ্গের একটি হলো বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা। আর-একটি হচ্ছে সহজিয়াদের 'এই মানুষে' 'সেই মানুষ'কে দেখা ও এই দেহের ভিতর

দিয়ে দেহাতীতের সন্ধান পাওয়া। অর্থাৎ নরনারীর যুগল সাধনা ও যুক্তভাবে যোগসাধনা। সুফীদের সাধনসঙ্গিনী না থাকলেও চলে, কিন্তু সহজিয়াদের চলে না, বৈষ্ণবদের একভাগের চলে না। বাংলার বাউলদেরও চলে না। অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন, "মোটামুটি ভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয়পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ। মুসলমান মাধববিবি ও আউলচাঁদই এ মতের প্রবর্তক বলে পণ্ডিতদের ধারণা। মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রই বাউলমতকে জনপ্রিয় করেন। আর উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ।" তাঁর সঙ্গে সকলে একমত হবেন কি না জানিনে।

সাধনা আর ধর্ম একার্থক নয়। ধর্ম বলতে বোঝায় হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম কিন্তু সাধনা বলতে বোঝায় সুফী সাধনা, সহজিয়া সাধনা, তান্ত্রিক সাধনা, যোগ সাধনা প্রভৃতি কত রকম সাধনা। ধর্মের জন্যে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়, সাধনার জন্যে সমাজ থেকে দূরে সরে যায়। তখন কেউ বা কেবল ঘুরে বেড়ায়, কোথাও তেরাত্রির বেশী কাটায় না। কেউ বা আশ্রয় নেয় নির্জন গুহায়। কেউ বা আশ্রম বা আস্তানা বা আখড়ায় মাথা গোঁজে। কিন্তু দিনের বেলা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে একতারা বা খঞ্জনী হাতে বেরিয়ে পড়ে। বাউল ও বৈষ্ণবদের বিশেষত্ব হলো ভিক্ষার বিনিময়ে গান বা গানের বিনিময়ে ভিক্ষা। সমাজের সঙ্গে ষোল আনা মিল সাধনার দিক থেকে ক্ষতিকর হতে পারে। তেমনি সাধনার দিকে ষোল আনা মন সমাজের দিক থেকে ক্ষতিকর হতে পারে। ধর্ম আর সমাজ যেক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্ব ছেড়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ হয়তো ধার্মিকদের মতে ধর্মদ্রোহ। ইউরোপের মরমী সাধকদের এর জন্যে দণ্ড পেতে হয়েছে। লালনও একজন মরমী সাধক। শতাব্দীটা উনবিংশ না হলে, রাজত্বটা ইংলণ্ডীয় লিবারল না হলে লালনকে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মধ্বজরা সমাজছাড়া তো করতেনই, দেশছাড়াও করতেন। খাঁচাছাড়া করলেও আশ্চর্যের বিষয় হতো না।

তবে তার সম্ভাবনা কম। বাংলার উর্বর মাটিতে এতরকম সাধক সম্প্রদায় গজিয়ে উঠেছিল আর তাদের মূল এত গভীরে নেমেছিল যে দণ্ড দিতে গেলে হাজার হাজার মেয়েপুরুষকে রাজদ্বারে হাজির করতে হতো। বিচার করতে করতে কাজীরাও হার মেনে যেতেন। কাজী-বংশের সন্তান বিখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ মওলানাদের বিপক্ষে বাউলদের পক্ষ সমর্থন করেন। ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সমিতির ১৯২৭ সালের অধিবেশনে অভিভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "ইসলাম কী ভাবে বাঙালীর জীবনে সার্থকতা লাভ করবে তার সন্ধান যতটুকু পাওয়া যাবে বাংলার এই মারফৎ-পন্থীর কাছে, ততটুকুও পাওয়া যাবে না বাংলার মওলানার কাছে। কেননা সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মারফৎ-পন্থীর ভিতরে রয়েছে কিছু জীবন্ত ধর্মসৃষ্টির বেদনা, পরিবেষ্টনের বুকে সে এক উদ্‌ভব। আর মওলানা শুধু অনুকারক, অনাস্বাদিত পুঁথির ভাণ্ডারী,—সম্পর্কশূন্য, ছন্দহীন তাঁর জীবন।"

এর জন্যে কাজী আবদুল ওদুদকেও গোঁড়া মুসলমানরা ক্ষমা করেননি। তিনি যদি ভারতের বদলে পাকিস্তান বরণ করতেন ও ঢাকায় থাকতেন ও ১৯৭১ সাল অবধি বাঁচতেন তাহলে আল বদরের হাতে তিনিও নিহত হতেন। তবে বাংলাদেশের জনমত পূর্ব পাকিস্তানী আমল থেকেই লালনের পক্ষপাতী। সরকার তাঁর আস্তানায় একটি স্মৃতিসৌধ ও একটি লোকসংস্কৃতিকেন্দ্র স্থাপন করেন। এটি ১৯৬২ সালের ঘটনা। ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া একটি জেলায় পরিণত হয়েছিল। অতঃপর তার নতুন নামকরণের প্রস্তাব ওঠে। তা শুনে মওলনা মেছবাহুর রহমান একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, "শোনা যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলার নাম পরিবর্তন করে 'লালন শাহী' এবং কুষ্টিয়া শহরের নাম পরিবর্তন করে 'লালন নগর' করার ষড়যন্ত্রে কেউ কেউ মেতে উঠেছেন এবং তা জেলা কাউন্সিলের সভায় পাশ করানোর চেষ্টা করছেন। সকলেই জানে লালন একজন বেদ্বীন, বেশরা, জাতধর্মহীন নাড়ার ফকির যাদেরকে কুষ্টিয়াবাসী ঘৃণাই করে থাকে। লালনের ধর্মমতের 'চারিচন্দ্রভেদ', 'ষড়চক্র', 'দ্বিদলপদ্ম', 'মূলাধারচক্র', 'সহস্রদলপদ্ম', 'অধর মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'ত্রিবেণী', 'আল', 'বিন্দু', 'সাধনসঙ্গিনী', 'প্রেমভজা' প্রভৃতি কাম আরাধনার ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দসমূহের তাৎপর্য কী তা জানলে বা তাঁর অবতারবাদের সংবাদ জানলে যে কোন রুচিসম্পন্ন মানুষ লালন এবং তাঁর অনুসারীদের নাম মুখে আনতেও ঘৃণা বোধ করবে।"

লালন কেবল বাউল সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মরমী কবি ও সংগীতকার। তাঁর গান রচনা প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলেছিল। একশো বছরে অন্তত দশ হাজার গান রচিত হয়েছিল। সে সব গান কেউ লিখে রাখেনি, তাঁর জীবিতকালে ছাপাও হয়নি। তাঁর দেহত্যাগের পর সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এখনো বহু গান সংকলিত হয়নি। বহু গান হারিয়ে গেছে। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লালনগীতির সংগ্রহ কার্যে পঞ্চাশ বছরকাল ব্যাপৃত। তাঁর 'হারামণি'র কয়েক খণ্ডে লালনের গান পাওয়া যায়। তিনি অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে লালনগীতির একটি সূচীপত্র প্রণয়ন করেছেন। জনাব আবুল আহসান চৌধুরীও একটি পুরাতন সূচীপত্র উদ্ধার করেছেন। কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ সূচীপত্র নয়। একাজ মনসুরউদ্দীন সাহেবকেই এ জীবনে শেষ করে যেতে হবে। তাঁর দীর্ঘ জীবন চাই।

উত্তর ভারতের সন্ত কবিদের সঙ্গে বাংলার বাউল কবিদের যথেষ্ট মিল আছে। বাউলরা বাংলা ভাষায় গান রচনা করলেও তাঁদের তত্ত্ব, তাঁদের উপমা ও রূপক, তাঁদের প্রকাশ্য ও গূঢ় অর্থ সন্ত কবিদের হিন্দী ভাষার বিভিন্ন উপভাষার গানের থেকে মূলতঃ ভিন্ন ছিল বললে ভুল হবে। সিরাজ শাহ ও লালন শাহ উভয়েই দীর্ঘকাল পরিব্রাজক ছিলেন। ছেঁউড়িয়াতে আস্তানা গেড়ে বসবাস শুরু করার আগে লালন নিশ্চয়ই উত্তর ভারত ভ্রমণ করে থাকবেন। সমসাময়িক বাউলদের জীবনেও উত্তর ভারত পরিক্রমা ঘটে থাকবে। সূফী মত, বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত, এর প্রত্যেকটিই সন্ত কবিদের রচনায়

ছায়াপাত করেছিল। সূফী মত এসেছিল আরব পারস্য থেকে। আর বৈষ্ণবমত দক্ষিণ ভারত থেকে। আর সহজিয়া মত বৌদ্ধ রাজাদের শাসনকালে গৌড় বঙ্গ থেকে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী যেমন তেমনি সহজিয়া বৈষ্ণব সূফীর ত্রিবেণী। এই যে সমন্বয় এর থেকে উদ্গত হয় বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় বা পন্থ। কবীরপন্থ যেমন উত্তর ভারতে বাউলপন্থ তেমনি বাংলায়। বাউলপন্থেরই একটি শাখা লালনপন্থ।

লালনপন্থের সাধকরা কেবল যে ছেঁউড়িয়ার ভাণ্ডারা উপলক্ষে জমায়েত হতো তা নয়। আশেপাশের যতগুলো জেলা—রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ—সর্বত্র তাদের আখড়া ছিল। সর্বত্র ভাণ্ডারা বা মহোৎসব হতো। সর্বত্র সাঁইজীকে দর্শন দিতে হতো, গান শোনাতে হতো। তাঁর একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়ায় চড়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন শেষ বয়স অবধি। এইভাবে লালনপন্থ জনপ্রিয় হয়। তবে তাঁর শিষ্যরা সাধারণত সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের হিন্দু মুসলমান। প্রধানত জোলা বা মোমিন। মুসলিম সমাজে জাতিভেদ না থাকলেও শ্রেণীভেদ আছে। কুষ্টিয়া মহকুমায় লক্ষ করেছি একই গ্রামে কাছাকাছি দুই মসজিদ। একটি গৃহস্থ অর্থাৎ চাষীদের। অপরটি মোমিন অর্থাৎ জোলাদের। খবর নিইনি ধাওয়া অর্থাৎ জেলেদের জন্য এই দুই মসজিদের কোনটির দুয়ার খোলা ছিল।

উপেন্দ্রবাবু দেখেছেন লালনের আখড়ার প্রধান পৃষ্ঠপোষকগণ কারিকর বা জোলা শ্রেণীর মুসলমান। এই মোমিন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মতে লালনের কিছু প্রভাব আছে। এঁদের অনেকেই এখন শিক্ষিত ও বিত্তশালী। যদিও শরীয়তবাদীদের নিন্দাভয়ে এঁরা একেবারে প্রকাশ্যভাবে কিছু করতে পারেন না, তবু তলে তলে এরা নানাভাবে লালনের স্মৃতিরক্ষার জন্য সচেষ্ট। এই উপেন্দ্রবাবুর ধারণা। আমার মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী শরীয়ত-বাদীদের নিন্দাসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে লোকসংগীতের তথা লোকসাহিত্যের চর্চা করছেন। রেডিওতে লোকসংগীত নিয়মিত শোনানো হয়। সেই নামে লালন-গীতিও সকলের কানে যায়।

বাউলের গান লোকসাহিত্য কি না এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। শ্রোতারা সাধারণ লোক, রচয়িতারাও সাধারণ ঘরের লোক। লালন নাকি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু বাউলদের সাধন তত্ত্ব বুঝতে পারে ক'জন? তাদের সাধনপ্রণালী আদৌ সহজ নয়। সাংকেতিক ভাষায় যেসব কথা বলা হয়েছে সে ভাষা বাংলা হলেও সুগম বাংলা নয়। সেই চর্যাপদের সময় থেকেই এই প্রকাশধারা প্রবহমান। পণ্ডিতেরা এর রহস্যভেদ করতে পারেন না, কারণ তাঁরা অভিধান পড়ে শব্দের অর্থ করেন। অভিধানে শব্দ থাকলেও তার গোপন অর্থ মেলে না। তার জন্যে যেতে হয় বাউলদের কাছে। তারাও লোকভয়ে খুলে বলে না। কেউ প্রকাশ করে দেয় এই ভয়ে তারা গানগুলো পর্যন্ত লিখে নিতে দেয় না। বলে, "লিখে নিলে ঝরনার জলকে বেঁধে রাখা হয়। ওকে বয়ে

যেতে দাও। হারিয়ে যায় যাবে। ভিতর থেকে নতুন ধারা ঝরবে।"

লালনের গানও একদিন হারিয়ে যাবে, যদি লিপিবদ্ধ না হয়। কিন্তু লিপিবদ্ধ করলে সে হবে বদ্ধ জল। গুরুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য। অনড় অচল। লালন সেটা চাননি। নিত্য নতুন গান সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর প্রকৃতি। তিনি স্বভাবকবি। মুখে মুখে গান বানিয়ে তখনি শোনাতেন। শোধনের অবকাশ পেতেন না। ছন্দ মিল নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তা সত্ত্বেও যা হতো তা সাধনার দিক থেকে উচ্চকোটির। কবিতা হিসাবেও উচ্চাঙ্গের। সংগীত হিসাবে তো অপূর্ব। সুফী বা সহজিয়া বা বৈষ্ণব যে ভাবেরই হোক না কেন তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে অসামান্য।

এই গানটি আমার মনে হয় সুফী ভাবাত্মক—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে।
মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।…
সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।"

আর একটি গান তো বৈষ্ণবভাবে ভরপুর—

"সে ভাব সবাই কি জানে!
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে।
গোপী বিনে জানে কেবা শুদ্ধরস অমৃতসেবা
গোপীরা পাপপুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণদরশনে।…
টলে জীব অটল ঈশ্বর তাইতে কি হয় রসিক নাগর
লালন কয় রসিক বিভোর রস ভিয়ানে।"

এবার দিই একটি সহজিয়া ভাবের গানের নমুনা—

"এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে,
কত মুনি ঋষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
সে চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়
ও যে, আলেক মানুষ তেমনি সদায়
আছে আলেকে বসে।…
আমার হলো কী ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরি ধন
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে।"

এর পরে দেহতত্ত্ব। এটিও সহজিয়া ভাবের। আত্মার লীলাধাম দেহ। তাই—

"ধর রে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে
ক্ষীরোদ মৈথুনের ধারা ধর রে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরাতে করে সচেতন হয়ে…
পঞ্চবাণের ছিলে কেটে প্রেম যাচো স্বরূপের পটে
সেরাজ সাঁই বলে রে লালন বৈদিক বাণে করিস্ নে রণ
বাণ হারায়ে পড়বি তখন রণ-খেলাতে হুমড়ি খেয়ে।"

এই কবি নিরক্ষর হতে পারেন, কিন্তু এঁর শিক্ষাদীক্ষা অসাধারণ। দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে ইনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। আর দীক্ষাও পেয়েছেন বিভিন্ন ভাবের। মূল স্রোতটি আমার বিশ্বাস বৌদ্ধ সহজিয়া। তার দুই দিকে মুসলিম সুফী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারা। লালনের সাধক জীবনে ও সৃষ্টিতে তিনটি প্রবাহ একসঙ্গে মিলেছে।

সুদীর্ঘকাল ধরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা। যার নিদর্শন চর্যাপদ। মানুষকে নিয়েই এ সাধনা। নরনারী উভয়েরই তাতে সমান অধিকার ও সমান স্বাধীনতা। কায়াসাধন সেখানে প্রবৃত্তিবাচকও নয়, নিবৃত্তিবাচকও নয়, সম্মতি ও সামঞ্জস্য বাচক। সেটাও একপ্রকার তপশ্চর্যা। তপশ্চর্যায় সিদ্ধি অসিদ্ধি দুই সম্ভবপর। হয়তো অসিদ্ধের সংখ্যাই ছিল বেশী। বৌদ্ধধর্ম দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা ফল্গুধারার মতো লোকজীবনে বহমান থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় দক্ষিণের তামিল আড়বারদের বৈষ্ণব গোপীকৃষ্ণলীলা। পরবর্তীকালে ব্রজের রাধাকৃষ্ণ লীলা। রাধার মর্যাদা কৃষ্ণের মর্যাদারও অধিক। মানুষের মর্যাদা ভগবানের মর্যাদারও অধিক। ভগবানও মানুষ। এই মানুষে আছে সেই মানুষ। মানুষকে চিনলেই ভগবানকেও চেনা যায়। মানুষকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা যায়। মানুষকে ছেড়ে ভগবানকে ধরা নিষ্ফল। নরনারী প্রেমই আত্মা ও পরমাত্মা প্রেমের প্রতীক। বৌদ্ধ সহজিয়ারা পরমাত্মা মানতেন না। যুগল প্রেম তাঁদের সাধনার বিষয় ছিল না। সুতরাং তাঁদের সাধনায় এটি হলো বৈষ্ণবদের সংযোজন। বৈষ্ণবদের সাধনাতেও তাঁদের সংযোজন ঘটল। দুই মিলে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা বিবর্তিত হয়।

ইতিমধ্যে দেশের মাটিতে ইসলামের প্রবর্তন হয়েছিল। সেই সূত্রে সুফী সাধনাও আসে। সাধকদের কেউ পীর, কেউ ফকির। ফকিরদের কেউ দরবেশ কেউ আউলিয়া। এঁদের মধ্যে ভগবানের জন্যে একটা তীব্র ব্যাকুলতা ছিল। এঁদের সাধনা অনুরাগের সাধনা। সুফীরা কেউ কেউ ভগবানকে নারীরূপেও কল্পনা করতেন। নৃত্য-গীত-বাদ্য এঁদের সাধনার সহায়। সুতরাং মারফতী গানও এঁদের দিনরাতের সাথী। নারীকে সাধনসঙ্গিনী করা এঁদের মতে

নিষিদ্ধ নয়। ভগবানকে নারী বলে কল্পনা করলে নারীকেও তো অধিকতর মর্যাদা দেওয়া হয়। স্ত্রীকে তুমি না বলে আপনি বলাও চলে। ভারতের মাটিতে এসে বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব থেকে রস সংগ্রহ করে সুফীবাদ সমৃদ্ধ হয়। অপর পক্ষে তারাও সুফী সংস্পর্শে এসে সমৃদ্ধ হয়। যোগা-যোগের পরিণতি বাউল সাধনা। পুরো একশো বছর ধরে এই সাধনায় তন্ময় থেকে লালন একে দিয়ে যান উচ্চতম ভাব।

রামমোহনের আয়ুষ্কালের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আয়ুষ্কাল যোগ করলে যত দীর্ঘ হয় একা লালনের আয়ুষ্কাল ছিল তত দীর্ঘ। দেশের শিক্ষিত নাগরিক মহলে যে সময় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ চলেছিল সেই সময়েই চলেছিল অশিক্ষিত গ্রামিক লোকচিত্তে অন্য এক আলোড়ন। এর সুসম্বন্ধ ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। সে রকম ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন লালনকে, তাঁর যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া যাবে। তিনিই একমাত্র নায়ক নন, তাঁর সঙ্গে থাকবে আরো অনেকের নাম। মদন বাউল, গগন হরকরা, বিশা ভুঁইমালী এঁরাও থাকবেন। গঙ্গারাম বলে একজনের কথা ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলতেন। যাঁর রচনা 'পরাণ আমার সোঁতের দীয়া, আমায় ভাসাইলে কোন ঘাটে!'

বাংলাদেশে লালন দ্বিশতবার্ষিকী ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। সেই উপলক্ষে ঢাকার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে একখানি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন জনাব আবুল আহসান চৌধুরী। যাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ও প্রেরণায় ইনি একাজে হাত দেন তিনি এঁর পিতা ও আমার প্রিয় বন্ধু মরহুম ফজলুল বারী চৌধুরী। একজন সত্যিকার উদারমনা মহাপ্রাণ ভদ্রলোক, যাঁর পরিচয় ধর্মে নয়, সহৃদয়তায়। আমার এই প্রবন্ধের তথ্য ও উদ্ধৃতিগুলি আমি স্মারকগ্রন্থ থেকে পেয়েছি।

চল্লিশ বছর আগে আমার ধারণা ছিল লালন স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর নামটিও মুসলিম নাম। এখন বুঝতে পারছি দুটি ধারণাই ভুল। লালন যে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেটি আনুষ্ঠানিক মুসলিম দীক্ষা নয়, সেটি গোপনীয় দরবেশ দীক্ষা বা ফকিরী দীক্ষা। কারো কারো মতে বাউল দীক্ষা। তাঁকে আরবী নাম গ্রহণ করতে হয়নি। তবে তিনি শাহ পদবী পেয়েছিলেন। যারা ফকিরী নেয় তারা কোনো সমাজেরই ধার ধারে না। লালন হিন্দু বা মুসলিম কোনো সমাজেরই সামিল ছিলেন না। তিনি এককালে হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী একশো বছর যা ছিলেন তাকে হিন্দু বলা যায় না। শ্রীবসন্তকুমার পাল অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে সাঁইজী সমাজচ্যুত হয়ে অবধি কখনো তাঁর আত্মীয় চাপড়ার ভৌমিকদের বাড়ী যাননি। ভৌমিকরা তাঁর আখড়ায় গেলে স্বহস্তে রান্না করে খেতেন। সযত্নে তার ব্যবস্থা করতেন সাঁইজী।

(১৯৭৪)

পুনশ্চ :

লালনকে নিরক্ষর বলা কি ঠিক? জনাব আবু তালিব 'লালন জীবনীর আরো তথ্য' নামক নিবন্ধে একখানি পাট্টার বিবরণ দিয়েছেন। সেটি ১২৮৭ সালের ৬ই মাঘ রেজিস্ট্রি করা হয়। লালান নাকি নিজের নাম স্বাক্ষর করেন। কিন্তু জনাব আবুল আহসান চৌধুরী 'লালন স্মারক গ্রন্থে' ঐ পাট্টার যে প্রতিলিপি দিয়েছেন তাতে 'শ্রীলালন সাঁই' স্বহস্তে সই করেননি, ব-কলমে সই করেছেন 'শ্রীশীতল সাহা'। লালনের বয়স তখন আন্দাজ একশো ছয় বছর। সে বয়সে লিখনক্ষম ব্যক্তিরও হাত কাঁপে। স্বহস্তে সই না করলেই সেটা নিরক্ষরতার প্রমাণ বলে ধরে নেওয়া যায় কি?

(১৯৭৮)

পুনঃ পুনশ্চ :

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত স্কেচ সংশয়াতীত। অক্ষয়কুমার মৈত্র লালনকে চাক্ষুষ বলেছিলেন বলে জানা গেছে।

(১৯৯২)

লালন স্মারক

লালনের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। তবে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এতে নৈষ্ঠিক মুসলমান মওলানা মৌলবীদের আত্মাভিমানে বাধবেই। লালনের জীবিতকালেও প্রশ্ন উঠেছিল তিনি হিন্দু না মুসলমান। তিনি এর উত্তর দিয়েছিলেন গান দিয়ে। 'হিতকরী'র নিবন্ধটিতে তাঁর সেই বিখ্যাত গানটি মহাপ্রয়াণের পর উদ্ধৃত হয়।

'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন ভাবে জাতের কী রূপ দেখলেম না এই নজরে।'

তিনি হিন্দুর ঘরে জন্মেছিলেন, কিন্তু সিরাজ শাহ ফকিরের কাছে দীক্ষা নেবার পর তিনি যা হলেন তা প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে মেলে না। অতএব তাঁকে হিন্দু বলে গণ্য করা যায় না। এটা শুধু মুসলমানের ঘরে অন্নগ্রহণের জন্যে নয়। অপরপক্ষে সিরাজ শাহ ফকিরের মতো যাঁরা নামাজ পড়েন না, রোজা রাখেন না, শরিয়ত মেনে চলেন না, তাঁদের সাধনমার্গ শাস্ত্রীয় ইসলামের সঙ্গেও মেলে না। অতএব তাঁদের মুসলমান বলেও স্বীকার করা যায় না। সেইসব দরবেশরা মারফতী বলেই পরিচিত। তাঁদের প্রেরণা সুফী মতবাদ থেকে উৎসারিত। ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছুই তাঁরা চান না। স্বর্গে গিয়ে হুরীদের সঙ্গে মিলিত হতেও তাঁদের বাসনা নেই। গান-বাজনা আর নাচ হচ্ছে তাঁদের প্রার্থনা উপাসনা উপবাস। তাঁদের মধ্যে

যাঁরা বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁদের সাধনায় সুফী-দরবেশ ভিন্ন আরো দুটি অঙ্গ আছে। বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব মরমিয়া। বৌদ্ধধর্মকে দেশান্তরী করলে কী হবে, দেশের মাটিতে রয়ে যায় বৌদ্ধ সহজযানের সাধনার মূল। বিশেষ করে বাংলাদেশের উর্বর মাটিতে সুফী ও বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে যুগপৎ যোগাযোগে বৌদ্ধ সহজিয়ার অলক্ষিতে বিবর্তন হয় লোকজীবনের উপেক্ষিত স্তরে। তারই অন্যতম ফল বাউলের সাধনা ও সাধন-সংগীত। সাহিত্য হিসাবেও এর একদিন আদর হবে সাধকরা কেউ এটা কল্পনা বা কামনা করেননি। তাঁরা কবিযশপ্রার্থী ছিলেন না। কবিযশ যদি তাঁদের কারো ভাগ্যে জুটে থাকে তবে সেটা প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জন্যে। শিক্ষিত মহলও তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন স্বদেশীর যুগে, স্বদেশের প্রাণ-প্রবাহের নিদর্শনরূপে। নিঃসন্দেহে লালন বাউল-কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শতবর্ষ ধরে নিবিড় ভাবে অন্তরের প্রেরণায় গান রচনা করে গেছেন, গান গেয়ে গেছেন, এমন মানুষ কি দ্বিতীয় কেউ আছেন আমাদের ইতিহাসে ?

লালনকে ঠিকমতো চিনতে ও বুঝতে হলে বহুদূর উজিয়ে যেতে হবে বাংলার অতীতে, ভারতের অতীতে, আরব ও ইরানের অতীতে। মনে রাখতে হবে যে, শ্রেষ্ঠ হলেও লালনই একমাত্র বাউল বা মারফতী কবি নন। মদন বাউল, গগন হরকরা, বিশা ভুঁইমালী, পাগলা কানাই, গঙ্গারাম প্রভৃতির থেকে আলাদা করে দেখাটা ঠিক দেখা নয়। এঁদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাটাই ঠিক দেখা। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শিক্ষিত মহলে যেমন একটা রোশনাই চলছিল, যাকে বলে বাংলার রেঁনেসাস, তেমনি অশিক্ষিত স্তরেও চলছিল অন্ধকার স্রোতের বুকে দীপের ভেলা ভাসানো। গঙ্গারামের গানের একটি কলি আমার মনে পড়ে—"পরাণ আমার সোঁতের দীয়া, আমায় ভাসাইলে কোন ঘাটে !"

বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোকমানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব। দুই যমজ সন্তানের মতো তাঁদের দু'জনের জন্ম। দু'বছর আগে পরে। ইতিহাস-জননীর পক্ষে দুই বছর যেন দুই মিনিট। তবে একসঙ্গে এলেও তাঁরা একসঙ্গে যাননি। লালনের পরমায়ু যেন রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়া পরমায়ু। লোকসংস্কৃতিতে একক ব্যক্তিত্বের এমন বিরাট উপস্থিতি আমাদের অভিভূত করে।

সম্প্রতি ঢাকার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে লালন শাহ ফকিরের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংকলিত 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। সম্পাদনা করেছেন জনাব আবুল আহসান চৌধুরী। এঁর পিতা ফজলুল বারী চৌধুরী ছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু। তাঁরই একান্ত আগ্রহে ও প্রেরণায় তাঁর পুত্র এ কাজে হাত দেন, কিন্তু প্রকাশনের কিছুদিন পূর্বেই তিনি প্রয়াণ করেন। শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। শ্রীমান আবুল আহসান বহু বিদগ্ধ জনের প্রবন্ধ একসূত্রে গেঁথেছেন। পশ্চিমবঙ্গকেও বাদ দেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের লেখা প্রবন্ধও বিশেষ মূল্যবান।

(১৯৭৪)

পুনশ্চ :

এই স্মারক গ্রন্থে যাঁদের রচনা সংকলিত হয়েছে তাঁদের নাম : সরলা দেবী, বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মতিলাল দাশ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ আবদুল হাই, আহমেদ শরীফ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন, বিশ্বনাথ মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দেব, আবুল আহসান চৌধুরী। প্রত্যেকটি নিবন্ধই সুচিন্তিত।

(১৯৭৮)

অবিস্মরণীয় লালন

॥ ১ ॥

বাউল একটি ধর্ম নয়, একপ্রকার সাধনা। সেই সাধনার সাধকরা লোকচক্ষে হিন্দু হতে পারেন, মুসলমানও হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মুখে যাঁর কথা শোনা যায় তিনি মানুষের অন্তরে স্থিত মানুষ। মনের মানুষ। এই দেহই তাঁর আধার। সাধনা করলে এই দেহেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়। বাউলদের এক এক মণ্ডলীর এক এক দীক্ষা। এমনি একটি মণ্ডলীকে বলা হয় সাঁই দরবেশ। এঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয় শাহ্ ফকির। সিরাজ শাহ্ ফকির বলে এক সাঁই দরবেশ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাউল সাধক। তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন তরুণ বয়সী হিন্দু কায়স্থ কর বংশীয় লালন। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে লালন নামে বহু ব্যক্তি আছেন। লালন বা লল্লন কথাটির অর্থ লাল বা প্রিয় পুত্র। লাল রং নয়। লালনপালনও নয়। লালন কর দরবেশ দীক্ষা নিয়ে সাধনায় অগ্রসর হতে হতে দশ হাজার শিষ্যের গুরু লালন শাহ্ ফকির হয়ে একশো ষোল বছর দেহধারণ করেন। লোকে বলে সাঁইজী। তাঁর সমাধির পর আশি বছর কেটে গেছে। কুষ্টিয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে এখনো তাঁর অসংখ্য শিষ্য। তাঁদের মুখে অজস্র গান। কিন্তু জোর করে বলতে পারা যায় না যে সব কটি গান অবিকৃত বা অবিমিশ্র বা সাচ্চা।

বাউলরা তত্ত্বকথা শোনান না। যা শোনাতে চান তা গানরূপে গেয়ে যান। সে সব গান আগে থেকে রচনা করেন না, ভাব আসার সঙ্গে সঙ্গে সুরের ঝরণা থেকে ঝরে পড়ে। ঝরণার জলকে বেঁধে রাখলে সে জল হয় বদ্ধ জল। সেইজন্যে তাঁরা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত গানগুলিকে লিখে রাখেন না। যারা শোনে তারা মনে রাখে ও আর দশজনকে শোনায়। সেই দশজন শোনায় আরো একশো জনকে। এমনি করে শ্রুতিসূত্রে সে সব গান দেশময় ছড়িয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে এমন কথা কি বলতে পারি যে গানের প্রত্যেকটি শব্দ বা প্রত্যেকটি বাক্য বা আদি রূপটি শতবর্ষ ধরে একই রকম থাকে ? লালন

শাহ্ তাঁর মরণের পূর্বরাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করে রাত পাঁচটার সময় বলেন, "আমি চললাম।" সেদিন ১৭ই অক্টোবর ১৮৯০।

আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে লালন তাঁর দীক্ষার পর থেকে প্রায় একশো বছর ধরে অবিরাম গান রচনা করে গেছেন। গানের সংখ্যা হাজার দশেক তো হবেই। কিন্তু এখন যা লোকমুখে শোনা যায় তা হাজার খানেকও নয়। ক্রমেই তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যাতে বেবাক লোপ না পায় তার জন্য লিখে রাখা শুরু হয়েছে তাঁর মৃত্যুর সময় থেকেই। কিন্তু লিখবে যারা তারাও তো নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত চাষী বা তাঁতী শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান। কোনো প্রামাণিক পাণ্ডুলিপি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। যা পাওয়া গেছে তা নকল বা নকলের নকল। কথা যদি বা উদ্ধার করা যায় সুর উদ্ধার করা আরো কঠিন। লালনের সাক্ষাৎ শিষ্য কেউ বেঁচে নেই। শিষ্য পরম্পরার মধ্যে তাঁর গানের সুর সন্ধান করতে হবে ও রেকর্ড করে রাখতে হবে। বাউলের গান লোকসংগীত নয় যে জনসাধারণের কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যাবে। বাউলের গান হচ্ছে সাধনসংগীত, সাধক ভিন্ন আর কেই বা তাকে ধরে রাখবে! বাউল সাধকের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। আশঙ্কা হয় যে বাউলের গান আর বেশী দিন স্রোতের জলের মতো বহতা থাকবে না। অগত্যা বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখতেই হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী উদ্যোগী হয়েছেন জেনে আমি আনন্দিত। লালন দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

যতদূর জানা যায় লালনের জন্ম ১৭৭৪ সালে। রামমোহনের পর তিনিই দ্বিতীয় বাঙালী যাঁর দ্বিশতবার্ষিকী পালন করে আমরা ধন্য।

(১৯৭৫)

॥ ২ ॥

লালন ফকিরের পুরো নাম লালন শাহ্ দরবেশ। লোকমুখে লালন সাঁই দরবেশ। তাঁর গুরু ছিলেন সিরাজ শাহ্ দরবেশ। লোকমুখে সিরাজ সাঁই দরবেশ। দরবেশরা সুফী সাধক। তাঁদের সাধনা আরব ইরান থেকে ভারতে এসে পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা ও পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিবেণীসঙ্গম রচনা করেছে। ত্রিবেণীতে কেউ কারো বৈশিষ্ট্য হারায়নি। পরস্পরকে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ না করেও সুফী সাধক হয়েছেন। দরবেশ দীক্ষা নিয়েছেন। বহু মুসলমান স্বধর্ম রক্ষা করেও বৈষ্ণব কবিতা ও গান লিখেছেন। সহজিয়াদের দেহতত্ত্ব উভয় সম্প্রদায়ের সাধকরা আপন করেছেন। এইভাবে যে সেতু গড়ে উঠেছে তারই নাম বাউল সাধনা। বাউলদের ধর্ম মানুষের ধর্ম। তার প্রকৃষ্ট পরিচয় লালন ফকিরের গান।

লালনের মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে কুষ্টিয়া শহরের অদূরে। তাঁর শিষ্যদের

মতে তাঁর বয়স তখন একশো ষোল বছর। তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন না, মুখে মুখে গান বেঁধে শোনাতেন। সেসব গান তিনি লিখে রাখতেন না। লিখে রাখাটা বাউলদের রীতি নয়। তাঁদের বিশ্বাস প্রতিদিন নতুন প্রেরণা আসবে, নতুন গান উৎসারিত হবে। যেমন ঝরণার জল। তাকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখলে সে বন্ধ জল হবে। বহতা স্রোত হবে না। এই কারণে লালনের অসংখ্য গান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শেষের দিকে তাঁর শিষ্যরা নিজেদের জন্যে কিছু কিছু গান লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তার কতক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। 'গোরা' উপন্যাসের উদ্ধৃত সেই 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়' লালনেরই রচনা। রবীন্দ্রনাথ লালনের অনেকগুলি গান 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া 'রিলিজন অভ্ ম্যান' বক্তৃতায় লালনের গানের উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু কী জানি কেন লালনের নামের উল্লেখ নেই।

লালনের শিষ্য প্রশিষ্য প্রধানত পূর্ববঙ্গে। সেখানে তাঁর গানের সমাদর গ্রামে গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর গানের আদর আছে। কিন্তু লালনশাহী ফকির বোধহয় নেই। কিছুদিন আগে কুষ্টিয়া ও যশোর থেকে জনাকয়েক লালনশাহী ফকির এসেছিলেন। তাঁদের একজন হিন্দু। বাউলের সঙ্গে তিনিও বাউল। কিন্তু হিন্দু সমাজ ত্যাগ করেননি। লালনশাহীদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু। লালন ছিলেন হিন্দু মুসলিম ভেদবুদ্ধি অতীত। তিনি কখনো বলতেন না তিনি হিন্দু কি মুসলিম। তিনি ছিলেন মানুষ। বাউলদের বাণী 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ।' যেমন চণ্ডীদাসের বাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

(১৯৮৩)

গ্রামোফোন কোম্পানী লালন জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'লালন ফকিরের গান' নামে একটি রেকর্ড প্রকাশ করেন। এটি তার মলাটে মুদ্রিত পরিচিতি। পরিবর্তিত।

ফকির লালন শাহ্

একচল্লিশ বছর আগে আমি কুষ্টিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি। কিন্তু এখনো তার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ওখানকার বন্ধুরা আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করেন। যাঁরা আমাকে দেখেননি, যাঁদের আমিও দেখিনি, তাঁরাও আমাকে চিঠি লেখেন বা বই পাঠিয়ে দেন। এমনি একখানি বইয়ের নাম 'ফকির লালন শাহ্'। লেখক অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম। ইনি গত তেইশ বছর ধরে লালন শাহ্ ফকির তথা বাউল সাধনা সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। ছেঁউড়িয়ার লালন একাডেমির ইনি পরিচালক।

ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়া এখনো বিদ্যমান। এইখানেই ১৮৯০ সালে

তাঁর মৃত্যু হয়। 'হিতকরী' পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে যে নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় "মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেরাম নামও দরকার হয় নাই। হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে একটি ঘরের ভিতর তাঁর সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে তাহার জন্য শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যগণের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মানিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, লালন শাহ্ ফকির মুসলমান ছিলেন না। নামটা হিন্দুর মতো বলে কি তিনি হিন্দু ছিলেন? না, হিন্দুও ছিলেন না। তিনি দুই সম্প্রদায়ের বাইরে তৃতীয় এক সম্প্রদায়-ভুক্ত। যার নাম বাউল সম্প্রদায়। শীতল, মানিক ইত্যাদি নাম হিন্দুরও হয়, মুসলমানেরও হয়। মুসলমানদের এ রকম নাম আমি অজস্র শুনেছি। কিন্তু 'সা' অর্থাৎ 'শাহ্' পদবী হয় দরবেশদের। আখড়ায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা সিরাজ সাঁই দরবেশের শিষ্যের শিষ্য। সিরাজ সাঁই লালনকে যে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেটা দরবেশ দীক্ষা। ইসলামী দীক্ষা নয়। লালনকেও বলা হতো লালন সাঁই। কুষ্টিয়ায় আমার আপিসে এক কেরাণী ছিলেন। ধর্মে মুসলমান। বছর কয়েক আগে তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লালনের উল্লেখ ছিল 'সাঁইজী' বলে। 'সাঁই' শব্দটি 'স্বামী' শব্দেরই প্রাকৃত রূপ। যেমন 'গোসাঁই' শব্দটি 'গোস্বামী' শব্দের। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর একটি গানে লালনকে বলেছেন 'লালন গোসাঁই'। 'গোসাঁই' পদবী মুসলমানের হয় না। হিন্দুর হয়, কিন্তু লালন বাস করতেন যাঁদের নিয়ে তাঁরা হিন্দু বলে পরিচিত ছিলেন না।

লালনকে যখনি জিজ্ঞাসা করা হতো তিনি হিন্দু কি মুসলমান, তাঁর কোন্ জাত, কোন্ বংশ, কোথায় জন্ম তিনি এড়িয়ে যেতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশো ষোল। এর থেকে অনুমান করা যায় তাঁর জন্ম ১৭৭৪ সালে। এটাও অনুমান, প্রমাণ নয়। কারণ, সেই যে একশো ষোল বছর সেটাতে হিসাবে ভুল থাকতে পারে। কেই বা নিজের বয়স ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারে? জন্মসাল নিয়েই যখন অনিশ্চয়তা তখন জন্মস্থান সম্বন্ধে কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যায়? লালন তো নিজে কিছু বলতেন না। তেমনি পিতার নাম সম্বন্ধেও তিনি নীরব। করীম সাহেব একটি দলিলের সন্ধান পেয়েছেন। সেটি ১২৮২ সালের। তখন লালনের বয়স আনুমানিক একশো ছয় বছর। এই দলিলে লালনের নাম লেখা ছিল শ্রীযুক্ত লালন সাঁই। পিতার নাম মৃত সিরাজ সাঁই। সাকিন ছেঁউড়িয়া। পিতার নাম কেউ জেনে শুনে মিথ্যা লেখে না। তাহলে ধরে নিতে হয় যে সিরাজ সাঁই ছিলেন লালন সাঁই-এর পিতা। কিন্তু লালনের গানে সিরাজ সাঁই পিতা

নন, গুরু। এখানে মনে রাখতে হবে যে, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পিতৃপরিচয় দেওয়া নিষেধ। দরবেশরা যদিও সন্ন্যাসী নন তবু তাঁদেরও পিতৃপরিচয় কেউ জানেন না, তাঁরাও জানান না। গুরুপরিচয়ই তাঁদের বেলা পিতৃপরিচয়। দলিলে পিতার নাম দিতে হয় বলেই পিতার স্থলে গুরুর নাম দেওয়া হয়েছে। এটা তো সহজেই বোঝা যায় সাঁই পদবী বংশ পদবী নয়। হেরিডিটারি নয়। গোস্বামী পদবী হেরিডিটারি হতে পারে। স্বামী পদবী তেমন নয়। অনুসন্ধান করে সিরাজের বংশ তালিকায় লালন বলে কারো নাম পাওয়া যায়নি।

করীম সাহেবের অনুমান লালন বা সিরাজ কোনোটিই প্রকৃত নাম নয়, দুটিই ছদ্ম নাম। হতে পারে গুরুদত্ত নাম। কিন্তু তা হলেও পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থেকে যায়। পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থাকলে কুল পরিচয়ও অজ্ঞেয়। "তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়ার ভৌমিক বংশীয়রা ইঁহার জ্ঞাতি। ইহার কোনো আত্মীয় জীবিত নাই।" উদ্ধৃতিটা 'হিতকরী' থেকে। দশ বছর পরে খান্ সাহেব আবদুর ওয়ালি বঙ্গের অ্যান্থ্রোপলজিকাল সোসাইটির জার্নালে ইংরেজীতে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতেও ছিল—লালন শাহ ছিলেন সিরাজ শাহের শিষ্য ও কায়স্থ বলে বিদিত। কায়স্থের সন্তান দরবেশ দীক্ষা নিয়ে ফকির হওয়া আর ইসলামী দীক্ষা নিয়ে মুসলমান হওয়া একই কথা নয়। ওড়িশার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ফকিরমোহন সেনাপতির আদি নাম ছিল ব্রজমোহন। বাল্যকালে নানা আধিব্যাধিতে তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছিল, তাই তাঁর পিতামহী তাঁকে পীরদের কাছে নিয়ে যান। কথা ছিল তিনি যদি আরোগ্য হন তো ফকির হবেন। আরোগ্যের পর তিনি বরাবরের মতো ফকির হন না, বছরে কয়েকটা দিন ফকির হয়ে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য পীরদের দিতেন। নামটাও সেই থেকে ফকিরমোহন। ফকিরমোহনের জন্মের প্রায় সাত দশক পূর্বে লালনের জন্ম। সেকালের প্রথা একালে নেই বলে আমরা এসব কথা ভাবতেও পারিনে। 'হিতকরী'র নিবন্ধ ১৮৯০ সালের। তারপরে আরো আট দশক কেটে গেছে। এতদিনে লালনের জ্ঞাতি বলে কথিত ভৌমিকরাও আর নেই। নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না লালন কায়স্থবংশোদ্ভব ছিলেন কি-না।

'হিতকরী'তে লালনের জন্মস্থানের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ওয়ালি সাহেবের প্রবন্ধে ছিল। সিরাজ ও লালন উভয়েরই জন্ম নাকি হরিশপুরে। ওয়ালি সাহেব যখন লেখেন তখন লালন বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হতো একশো ছাব্বিশ। তার মানে ওয়ালি সাহেব জানতেন একশো ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা। কী করে জানলেন? লোকমুখে শুনে থাকলে তাঁর জ্ঞান অভ্রান্ত নয়। লিখিত প্রমাণের কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আরো পঁচিশ বছর পরে বসন্তকুমার পাল 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখেন লালনের জন্মস্থান ভাঁড়ারা। তার মানে বসন্তকুমার পাল জানতেন একশো একান্ন বছর আগেকার কথা। কেমন করে জানলেন? লোকমুখে শুনে থাকলে তাঁর

জ্ঞানও অভ্রান্ত নয়। লালন সাঁই যে দলিল সম্পাদন করেছিলেন তাতে তাঁর জন্মস্থান দেওয়া ছিল না। বাসস্থান লেখা ছিল ছেঁউড়িয়া। লিখিত প্রমাণ না থাকায় আমরা জোর করে বলতে পারিনে কোন্‌খানে তাঁর জন্ম, কবে তাঁর জন্ম, কোন্ বংশে তাঁর জন্ম, জন্মসূত্রে তিনি হিন্দু কি মুসলমান। শুধু এইটুকুই আমরা জানি যে তিনি বাস করতেন ছেঁউড়িয়ায়, তাঁর পরিচয় ছিল শাহ্ ফকির বা সাঁই ফকির, তাঁর গুরুর নাম সিরাজ শাহ্ বা সিরাজ সাঁই। গুরুগৃহ হতে পারে হরিশপুর। কিন্তু তার থেকে ধরে নেওয়া যায় না যে শিষ্যগৃহও হরিশপুর। ভাঁড়ারার পক্ষেও জনশ্রুতি থাকা সম্ভবপর। বসন্তকুমার পাল নাকি তাঁর জ্ঞাতিদের সন্ধান পেয়েছিলেন।

করীম সাহেবকে আমি বলব যে গবেষণায় এর কোনো সুরাহা হবে না। সাধু ও সাধকদের সম্বন্ধে তাঁদের তিরোধানের পর কতরকম কিংবদন্তী ডালপালা মেলে। জাল পুঁথিও লেখা হয়। সবচেয়ে ভালো 'হিতকরী' পত্রিকার নিবন্ধটিকেই তথ্যভিত্তিক বলে মেনে নেওয়া। তা ছাড়া লালনের নিজের জবানীতে যা তাঁর গানে প্রকাশ পেয়েছে তাও সত্য বলে মেনে নিতে হবে। "লালন বলে আমার আমি জানি না সন্ধান।" আর "লালন সে জাতের ফাতা ঘুচিয়েছে সাত বাজারে।"

বাউল ফকিরদের কাজ ছিল হিন্দু-মুসলমান দুই সাধনার নদীতে সেতুবন্ধন। এ কাজ শুরু করেছিলেন নানক, কবীর প্রভৃতি সন্তরা। কবীর যে কী ছিলেন, হিন্দু না মুসলমান, এখনও পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত নন। নানা পণ্ডিতের নানা অনুমান। এই যে সেতুবন্ধনের ঐতিহ্য এটা বিশুদ্ধ ইসলামী বা বিশুদ্ধ সনাতনী হিন্দু ঐতিহ্য নয়। লালন ফকিরকে শুদ্ধ করে হিন্দুও করা যাবে না, 'পাক' করে মুসলমানও করা যাবে না। দেশভাগের আগে কারো মাথায় এ খেয়াল চাপেনি। তবে পাকিস্তান নামক ইসলামী রাষ্ট্রের উদয়ের পর ওপারের মুসলমানদের মধ্যে সেতুবন্ধনের পরিবর্তে সেতুভঙ্গের মনোবৃত্তি লক্ষিত হয়। সকলের মধ্যে নয় অবশ্য। লালনকে নজরুলকে দুই ধর্মের মাঝখান থেকে সরিয়ে একধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে গেলে এঁদের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্যকে বিকৃত করা হয়। সুখের বিষয় করীম সাহেব লালনকে মুসলমান প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হননি। তিনি নিরপেক্ষ থেকেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ ইতিমধ্যে নজরুলকে যেভাবে খাঁটি মুসলমান প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে লালনের বেলাও সেই রকম হলে আশ্চর্য হবার কী আছে? তা যদি হয় তবে তাঁর ইসলামী গানগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। অন্যান্য গানগুলিরও সুফী ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। সুফী প্রভাব নিশ্চয়ই লালনের মতো বাউল ফকিরদের সাধনায় সক্রিয় ছিল। কিন্তু তাঁদের সাধনার একটা বড়ো অঙ্গ মানুষতত্ত্ব।

দেহতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। আর বাউলদের মানুষতত্ত্ব ঠিক মানবতত্ত্ব নয়। মানুষ বলতে বাউলরা যা বোঝে তা মানব নয়। মানুষ বা মনের মানুষ অচিন পাখীর মতো খাঁচার ভিতর আসা যাওয়া

করে। আরশীনগরে পড়শীর মতো বসত করে। বাউলরা মানুষকে যে স্থান দেয় তা অন্যেরা দেয় ভগবানকে। ওদের ধর্মকে ঈশ্বরবাদ বা ভক্তিবাদ বলা শক্ত। "এই মানুষে আছে রে মন যারে বলে মানুষ রতন"। তিনি যদি ভগবান হয়ে থাকেন তাহলে মানুষ ভগবানের ইমেজ নয়, ভগবানই মানুষের ইমেজ। অথচ এটা মানবিকতাবাদ বা নিরীশ্বরবাদও নয়। মানবিকতাবাদ বা নিরীশ্বরবাদ মিস্টিসিজম থেকে দূরে। বাউলদের মানুষতত্ত্ব মিস্টিসিজম থেকে দূরে নয়। লালন ফকির যেখানে শ্রেষ্ঠ সেখানে তিনি মিস্টিক। তাঁর কথাগুলি সহজ, কিন্তু যা তিনি বলতে চান তা ধরাছোঁয়ার অতীত। এই মিস্টিসিজম রবীন্দ্রনাথে বর্তেছে। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথও বাউল। অধ্যাপক ডিমক তাঁকে শ্রেষ্ঠ বাউল বলেছেন। লালনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে তিনি লালনের মিস্টিসিজমের উত্তরাধিকারী।

(১৯৭৭)

পুনশ্চ ঃ

শ্রীবসন্তকুমার পাল জনাব আবুল আহসান চৌধুরীকে লিখেছিলেন—

"আউল বাউল দরবেশ সাঁই,
সাঁইয়ের উপরে আর নাই।

অর্থাৎ লালন শাহ্ সাধনার উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

(১৯৭৮)

দরবেশ লালন সাঁই

চার বছর আগে একদিন বাংলাদেশে থেকে একখানি বই আসে। নাম 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। সম্পাদক আবুল আহসান চৌধুরী। প্রকাশক কায়সুল হক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা। দু'জনেই আমার প্রীতির পাত্র। কবি কায়সুল হকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলা উপলক্ষে ১৯৫৩ সালে। আর আবুল আহসানের পিতা ফজলুল বারী চৌধুরীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ১৯৩৫-৩৬ সালে যখন আমি কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। আর আবুল আহসানের মাতুল কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৩৩ সালে যখন আমি ঢাকায় শিক্ষারত সাব-জজ ও সহকারী দায়রা জজ। পরে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুতায় পরিণত হয়। আবুল আহসানকে আমি ঢাকায় দেখি, যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বার বার তিনবার সেদেশে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হই।

স্মারকগ্রন্থটি বাংলাদেশে প্রকাশিত হলেও যাঁদের রচনা তাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাঁদের অনেকেই অবিভক্ত বঙ্গের অধিবাসী বা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক ও

ধর্মে হিন্দু। এটাই স্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো, নজরুল ইসলামের মতো, লালন শাহ্ ফকিরও অবিভাজ্য। আর তিনি নিজেই তো নিজের সম্বন্ধে গেয়েছেন—

"সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন ভাবে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।"

স্মারকগ্রন্থটি হাতে আসার আগে আমার এইটুকু জানা ছিল যে লালনের আখড়া কুষ্টিয়া মহকুমার ছেঁউড়িয়ায়। কবে তাঁর জন্ম, কবে মৃত্যু, কখনো খোঁজ নিইনি। চমকে উঠি স্মারকগ্রন্থের মলাটে 'দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী' দেখে। ভিতরে মুদ্রিত 'দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী (১৭৭৪-১৯৭৪)।' লালন তাহলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দুই শতক পূর্বে। পাতা উল্টিয়ে দেখি তাঁর তিরোভাব হয় ১৮৯০ সালে। তখন তাঁর বয়স ১১৬ বছর। এরূপ দীর্ঘজীবী পুরুষ যে দুর্লভ এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? তাই বলে কেন লালনের মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যে প্রকাশিত 'হিতকরী' পত্রিকার লিখিত সাক্ষ্যকে অকারণে অবিশ্বাস করব? মানুষ অত দিন বাঁচে না, এই যদি হয় সংশয়ের হেতু তবে এর নিরসন হয় সম্প্রতি প্রকাশিত অন্য একখানি গ্রন্থ পাঠ করলে। বইখানির নাম 'মনের কথা অনেক কথা'। প্রণেতা রাইচরণ দাস। প্রকাশক গ্রন্থ-গৃহ, কলকাতা। গ্রন্থের সম্পাদক রাইচরণ দাসের দৌহিত্র প্রখ্যাত সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ। কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট উকিল রাইচরণ দাস ছিলেন 'হিতকরী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

'হিতকরী'র নিবন্ধ ১৮৯০ সালে লিখিত। তার ৩৪ বছর বাদে ১৯২৪ সালে রচিত 'সেনগ্রামের চিকিৎসা' নামক প্রবন্ধের শেষের দিকে রাইচরণ দাস বলছেন ঃ

"আমি আজ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে উপনীত। আমাদের গ্রামের যাহারা বেশী বয়সে মরিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ বসু, হাবাসপুরের দীন সরকার, সেওরিয়ার লালন ফকির প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আনন্দ বসু ১১০, লালন ফকির ১১২, দীন সরকার ১০৩ বৎসর বয়সে মরিয়াছেন। একালে আর অত বয়সে মরিতে দেখি না।"

রাইচরণ দাসের এই উক্তি পরের মুখে শোনা গালগল্প নয়। এটা একজন বিশিষ্ট উকিলের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে লেখার চার বছর গরমিল। যদি তিনিই হয়ে থাকেন 'হিতকরী' পত্রিকার নিবন্ধকার। আবুল আহসানের যতদূর মনে হয়, ওটি রাইচরণ দাসের রচনা। তবে কুমারেশ ঘোষের মতো আমি অতটা নিশ্চিত নই যে ওটা আর কারো নয়, রাইচরণের লেখা। নিবন্ধটিতে লেখকের নাম দেওয়া ছিল না। সে সময় 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলে ছিলেন। আবুল আহসানের মতে রচনাটি মীর সাহেবের না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। লালনের মৃত্যু ১৭ অক্টোবর। আর ঐ সংখ্যা 'হিতকরী' প্রকাশিত হয় ৩১শে

অক্টোবর। লালনের মৃত্যুর পর পরই নিবন্ধকারের ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় উপস্থিতির ইঙ্গিত নিবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। আমি ওটি পাঠ করে আবুল আহসানের সঙ্গে একমত হয়েছি। তিনি বলেন, 'যতদূর মনে হয়'। আমিও বলি, 'যতদূর মনে হয়'। যতদূর মনে হওয়ার আরো একটা কারণ, কতকগুলি প্রয়োগ হিন্দু লেখকরাই করে থাকেন। যেমন 'মানবলীলা সম্বরণ'।

যাই হোক, চৌত্রিশ বছর বাদে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মানুষের স্মৃতিভ্রমও ঘটতে পারে। তাই ১১৬ না হয়ে ১১২ হওয়া সত্যের অপলাপ নয়। যেটাই সত্য হোক না কেন, লালনের জন্ম ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে। রামমোহন রায়ের বেলাও জন্মসালের গরমিল লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিশতবার্ষিকী যদি রামমোহনের বেলা অশুদ্ধ না হয়ে থাকে তবে লালনের বেলাই বা কেন হবে? বাংলাদেশ চার বছর আগে লালনের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী পালন করেছে। এখানেও আর কেউ না করুক গ্রামোফোন কোম্পানী করেছে। 'গান্ধর্বী' করেছে। বর্ধিত আকারে করার কথা ছিল অপর একটি প্রতিষ্ঠানের। বাংলাদেশ থেকে লালনপন্থী বাউল আনিয়ে নেবার আয়োজন মাঝপথে থেমে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আকস্মিক প্রয়াণে। আবার আমরা উদ্যোগী হয়েছি। হয়তো ১৯৭৮ সালেই কলকাতায় লালন দ্বিশতবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে পালিত হবে।

লালনের জন্মসাল নিয়ে প্রশ্ন নিছক সংশয়বাদীদের মুখেই শোনা যায়। এদের উপর ছেড়ে দিলে এঁরা কোনদিনই তাঁর জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করবেন না। কিন্তু লালনের জন্মস্থান নিয়েও তর্ক উঠেছে। লালনের মৃত্যুর দশ বছর বাদে বম্বের জার্নাল অব দি অ্যানথ্রোপলজিকাল সোসাইটিতে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক বাংলা সরকারের রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্টের খান সাহেব আবদুল ওয়ালি। তিনি বলেন,

"Another renowned and that most melodious versifier, whose dhuyas are the rage of the lower classes and sung by boatmen and others was the far famed Lalan Shah. He was a disciple of Seraj Shah and both were born at village Harishpur, Sub-Division Jhenidah, District Jessore. Having travelled long and made pilgrimages to Jagannath and other shrines, and met with all sorts of devotees he at last settled at Mouza Siuriya near the sub-divisional head-quarters of Kushtia (Nadia). Here he lived, feasted, sang and worshipped and was known as Kayastha and here he died some ten years ago. His disciples are many and his songs are numerous." (Journal of the Anthropological Society, 1900, Vol V, No 4)

উদ্ধৃতিটি অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম প্রণীত 'ফকির লালন শাহ' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। প্রকাশক লালন একাডেমী, ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া,

বাংলাদেশ। প্রকাশকাল, ১৯৭৬। করীম সাহেব লালন একাডেমির পরিচালক। লালনের জন্মস্থান সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একদিকে আবদুল ওয়ালি সাহেবের ১৯০০ সালের ইংরেজী প্রবন্ধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হরিশপুর, ঝিনাইদহ যশোহর। অন্যদিকে বসন্তকুমার পালের ১৩৩২ সনের শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের উপর স্থাপিত ভাঁড়ারা, থানা কুমারখালী, মহকুমা কুষ্টিয়া, জেলা নদীয়া। বসন্তবাবুর রচনাকাল আবদুল ওয়ালি সাহেবের রচনাকালের সাতাশ বছর পরবর্তী। বসন্তবাবুর সঙ্গে যাঁরা একমত তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পণ্ডিতে পণ্ডিতে দ্বন্দ্ব।

সিরাজ সাঁইয়ের জন্মস্থান হরিশপুর, তাই বলে কি ধরে নেওয়া যায় যে, লালন সাঁইয়ের জন্মস্থানও হরিশপুর ? সেইজন্যে কারো কারো মতে লালন শুধু শিষ্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুত্র। একটি দলিল পাওয়া গেছে। সেটি ১৮৮০ সালের ১৯শে জানুআরি তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত। তার বয়ান নিচে দেওয়া গেল—

"পাট্টা গ্রহীতা—শ্রীযুত লালন সাঁই, পিং মৃত সিরাজ সাঁই, জাতি মুসলমান, পেশা ভিক্ষা ইত্যাদি। সাকিন ছেঁউড়ে, পরগণা ভ্রাহিমপুর, ইস্টাসন ভলকো, সাবরেজিস্টারি কুমারখালী।"

করীম সাহেব বলেছেন লালন শাহ শৈলকুপা থানার এলাকাধীন পরগণা ফতেজঙ্গপুর এলাকাধীন পরমানন্দপুরে একটা আখড়া বাড়ি নির্মাণের জন্য কয়েক বিঘা জমি কেনেন। এই দলিলে তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করেন।

দলিলে পিতার নামই উল্লেখ করা হয়। গুরুর নাম নয়। অথচ বাউল ফকির সন্ন্যাসীদের পিতৃনাম করতে বাধা আছে। সাধারণত এঁরা কেউ দলিল সম্পাদন করেন না। লালন করেছিলেন। তাঁকে তাই পিতার নামের স্থলে গুরুর নামই উল্লেখ করতে হয়েছিল। এটুকু মেনে না নিলে আমাদের উল্টো বিপদে পড়তে হয়। দরবেশদের সঙ্গে নারী থাকলেও তাঁদের সন্তানাদি হয় না। সাঁই পদবীটা এমন একটা পদবী নয় যা কেউ পুত্রকে দিতে পারে বা কেউ পিতার কাছ থেকে পেতে পারে। এটা গুরুশিষ্য পরম্পরার ইঙ্গিত করে, পিতাপুত্র পরম্পরার নয়। লালন যে সিরাজের পুত্র ছিলেন এর পোষক প্রমাণ তাঁর হাজার হাজার গানের একটিতেও নেই। আর পেশা যাদের ভিক্ষা ইত্যাদি তারা সংসারী মানুষের মতো সন্তান সৃষ্টি করতে যাবেই বা কেন ? লালন যে সম্পত্তি খরিদ করেছিলেন সেটা তাঁর শিষ্যদের নিয়ে থাকবার আখড়ার জন্যে। তাঁর ছেঁউড়িয়ার আখড়াও ছিল সেইরূপ সম্পত্তি।

'হিতকরী' পত্রিকার নিবন্ধেই তো রয়েছে, "আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। সম্প্রদায়ের ধর্মমত অনুসারে ইঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শিষ্যদের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে, বাউল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়।"

দলিলের বয়ানের ঐ অংশটির উপর নির্ভর করে লালনকে সিরাজের পুত্র বলা চলে না। সুতরাং সিরাজের মতো তাঁরও জন্মস্থান যে হরিশপুর এটা প্রমাণ করতে হলে আরো অনুসন্ধান করতে হবে। এখন পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা জোরালো প্রমাণ নয়। তাই করীম সাহেবের ধারণা লালনের জন্ম হিন্দু পরিবারে, যদিও পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বী না হওয়াতে তাঁর 'মুসলমানী' বা 'খাতনা' হয় না।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে সিরাজ সাঁই তাঁকে দরবেশ দীক্ষা দিয়ে সাঁই বা শাহ্ ফকির করে নিয়েছিলেন। অথচ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেননি। তার প্রয়োজনও ছিল না। দরবেশদের মধ্যে হিন্দুও আছেন। ফকিরদের মধ্যেও তাই। তেমনি বাউলদের মধ্যে মুসলমানও আছেন। এসব সম্প্রদায়কে হিন্দুরাও হিন্দু সমাজে নেয় না। মুসলমানরাও মুসলিম সমাজে নেয় না। সন্তানাদি না হলে সমাজের শাসনও খাটে না। এসব সম্প্রদায়ের ধর্মমতও শাস্ত্রশাসিত নয়। শাস্ত্রের বাইরে, সমাজের বাইরে যাদের স্থিতি তাদের বেলা ধর্মান্তরীকরণের প্রশ্নই ওঠে না। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে হলে শরীয়তী মুসলমানের কাছে যেতে হয়। শরিয়তীরা বরাবরই লালনবিরোধী।

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার ১৯৫৪ সালের সংস্করণ থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি—

'FAKIR, a term generally used in Arabic speakihg countries for a mendicant dervish (q. v.), is the translitera-tion of an Arabic world meaning "needy person". It refers to men's spiritual need of God, who alone is self-sufficient (Koran xxxv, 15). Although of Muslim origin it has come to be applied in India to Hindus as well largely replacing goswami, sadhu, bhikshu (bhikkhu) bawa and other designations. Fakirs are common to all creeds in India, and in theory they belong to a religious order, but Muslim orders do not profess celibacy and the Hindu and other orders do not enforce it,' (Encyclopaedia Britannica, 1964, vol. 9, Page 42)

'DERVISH, in the middle east is a member of a Muslim religious fraternity, whether mendicant or not, resembling in some respects a Christian monastic order. The fraternities arose within Sufism (q. v.), which is in origion religion at an individual level, the single soul seeking its own salvation ; occasionally such an individual would gather round himself a band of devotees under instruction, who shared his life and religious practices……Besides the dervishes resident in the community

there are many lay membets (including women), both classes now being largely drawn from the lower levels of society…' (Encyclopaedia Britannica, 1964, Vol. 7, Page 279)

যথাস্থানে সুফী মার্গ সম্বন্ধেও প্রবন্ধ আছে। কিন্তু উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। দরবেশরা সুফী মার্গের সাধক। সুফী গুরুদেব পদবী হয় শাহ্। চলতি বাংলায় সাঁই। এদেশে বহিরাগত সুফী ধারার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আর একটি ধারা। সেটি এদেশের নিজস্ব। সহজিয়ার মর্মকথা চণ্ডীদাস বলে গেছেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এখানে 'মানুষ' শব্দটির দুই অর্থ। আমরা সবাই মানুষ, আবার আমাদের ভিতরে, বাইরে ও উপরে যিনি বিরাজ করছেন তিনিও মানুষ। মনের মানুষ। অজানা মানুষ। আলেকের মানুষ। অধরচাঁদ। অচিন পাখী। সুফী মার্গের সঙ্গে এখানে মেলে না। সেদিক থেকে লালন হয়তো সুফী দরবেশ নন। বাংলার বাউলরা সেদিক থেকে সহজিয়া সাধক। কিন্তু সেই একমাত্র দিক নয়। আরো একটা দিক আছে। সেটা লীলাবাদী রসের সাধনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে সাধনায় প্রেমাস্পদের প্রেম আস্বাদন করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

তিনটি ধারাতেই লালনের অভিষেক ছিল বলেই তাঁকে কোনো একটির দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। কোনো লেবেলই তাঁর গায়ে বসে না। অথচ তিনি একজন উচ্চাঙ্গের সাধক। 'হিতকরী' পত্রিকার নিবন্ধটির নাম 'মহাত্মা লালন ফকির'। এই বিশেষণটি অযথা প্রযুক্ত নয়। সাধনার দ্বারা তিনি দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও হৃদয় জয় করেছিলেন।

(১৯৭৮)

লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ

লালন ফকিরের শিষ্যদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে লালনের গানের পুঁথিই সুকৌশলে 'গীতাঞ্জলি'তে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং কবিগুরুর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে বাংলার বাউল লালন সাঁই। আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তখন আমাকে একথা বলেন কুমারখালীর ভোলানাথ মজুমদার। সে সময় কুষ্টিয়ার দ্বিতীয় মুনসেফ ছিলেন মতিলাল দাশ, পরবর্তীকালে ডক্টর মতিলাল দাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'লালন গীতিকা'র প্রধান গ্রন্থকার। তিনিও স্বতন্ত্র ভাবে সেকথা শোনেন।

তিনি লিখেছেন, "ভোলাই সার নিকট হইতে গানের পুঁথি আদায় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভোলাই সা বলিল, 'দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে

খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনো উত্তর পাই নাই।' এ কথার সত্যতা কতদূর কে জানে ? কিন্তু ভোলাই কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন।…সে যাহা হউক, বৃদ্ধের অনেক স্তুতি করিয়া কোনও ক্রমে একটি গানের নকল-পুঁথি যোগাড় করিলাম।"

ভোলানাথবাবু আমাকে অনুরোধ করেন, আসল পুঁথিখানি আমি যেন কবিগুরুর কাছ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করি। আসল পুঁথিখানি যে কবির কাছে আছে একথা মেনে নিতে আমার অনিচ্ছা ছিল। এ নিয়ে গুরুদেবকে বিরক্ত করা আমি অসমীচীন মনে করি। কুষ্টিয়া মহকুমায় অবস্থিত শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো যান ১৯২২ সালে। ততদিনে জমিদারির বাঁটোয়ারায় পতিসর পড়েছে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের ভাগে। শিলাইদহে জমিদার হিসাবে তখন তাঁর আর কোনো মর্যাদা নেই। প্রজারা আর তাঁর প্রজা নয়। পরে তো সুরেন্দ্রনাথও দেনার দায়ে শিলাইদহর সম্পত্তি হারালেন। মালিক হলেন ভাগ্যকুলের রায়রা। আমি যখন যাই তখন ঠাকুরবাবুদের পুরাতন কর্মচারীরাই আমাকে শিলাইদহের কাছারি ও খোরসেদপুর গ্রাম ঘুরিয়ে দেখান। তাঁদের চাকরি তখনো যায়নি, যদিও মালিক বদল হয়েছে।

পুরাতন কর্মচারীদের একজন ছিলেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। পরবর্তীকালে ইনি গুরুদেব ও শিলাইদহ প্রসঙ্গে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। দিনকয়েক আগে আমার পুরনো চিঠিপত্রের মধ্যে কুষ্টিয়ার জনাব মহম্মদ গোলাম রহমানের লেখা একখানি চিঠি আবিষ্কার করি, তার সঙ্গে গাঁথা ছিল গোলাম রহমানকে লেখা শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর একখানি চিঠি। শচীন্দ্রনাথ সে চিঠি লিখেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে। তাতে ছিল—

"শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আমাকে তাঁহার আঁকা (৯১৩) কয়েকখানা স্কেচ দিয়েছেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি লালন ফকিরের একটা পেনসিল স্কেচ আঁকিয়াছিলেন, তাহা যে কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

এই স্কেচ ছাড়া আরো একখানা ছবির কথাও শচীন্দ্রবাবুর চিঠিতে ছিল। তিনি এ বিষয়ে রথীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। রথীবাবু সে ছবির কথা স্মরণ করতে পারলেন না। তবে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের জন্যে যখন পুরাতন ছবির বাক্স খোলা হবে তখন সন্ধান নিতে বলেছেন।

নন্দবাবুর আঁকা স্কেচ পরে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লালন-গীতিকা'র মলাটে সে স্কেচই মুদ্রিত। কিন্তু নন্দবাবু তো লালনকে চোখে দেখে আঁকেননি। যতদূর জানা যায়, যা দেখে এঁকেছিলেন সেটিও একটি স্কেচ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা। সম্ভবত শচীন্দ্রবাবু যে ছবির কথা উল্লেখ করেছেন এ সেই ছবি। বাক্সবন্দী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ইতিমধ্যে

উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কেউ বলতে পারে না কবে ও কোথায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনকে দেখেন।

ছবি না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু আসল খাতাখানির কী খবর? এঁর উত্তর পাওয়া যাবে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জবানীতে—

"ছেলেবেলা হইতে দেশের নানা মুসলমান ফকিরের মুখে লালনের গান শুনিয়া আসিতেছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লালনের বিষয় জানিবার জন্য খুবই আগ্রহ হয়। ১৯২৫ সালে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত লালনশাহী ফকির হীরু শাহের সঙ্গে বাড়ি হইতে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া লালনের সেঁউড়িয়া আখড়ায় উপস্থিত হই।···ঐ সময়ে আশ্রমে রক্ষিত একখানা পুরানো গানের খাতা দেখি। উহা নানা প্রকারের ভুলে এমন ভর্তি যে, প্রকৃত পাঠোদ্ধার করা বহু বিবেচনা ও সময়-সাপেক্ষ। আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবি বাবুমশায়' লইয়া গিয়াছেন···লালনের শিষ্যরা আবার সেই গানগুলি বর্তমান খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা আরো বলে যে, সাঁইজীর সেই গানের খাতা পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ অত বড় কবি হইয়া সকলের প্রশংসালাভ করিয়াছেন। তারপর ১৯৩৬ সাল হইতে কুষ্টিয়ায় যখন স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করি তখন লালনের সমস্ত গান পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। তখন সেই খাতাখানি আর একবার দেখিবার প্রয়োজন হইলে আখড়ার তদানীন্তন মালিক ভোলাই শা ফকির বলে যে ঐ খাতা মুনসেফ মতিলালবাবু লইয়া গিয়াছেন, উনি তাহা দেখিতে লইয়া আর ফেরত দেন নাই।···মতিলালবাবু যে খাতা লইয়া যান নাই, সে খাতা লালনের আস্তানাতেই আছে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল। যা হোক, সেই খাতা দেখিবার আবার সুযোগ মিলিল।"

উপেন্দ্রনাথ দেশবিভাগের পর কলকাতায় এসে কোনো এক সূত্রে খবর পান যে, রবীন্দ্রনাথের পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে লালন ফকিরের গান সম্বলিত একখানা খাতা পাওয়া গেছে। ঐ খাতা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে আছে। তখন তাঁর মনে হলো এই বোধ হয় সেই বহুশ্রুত, বহুকথিত সাঁইজীর আসল খাতা। সেই খাতা দেখবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪৯ সালে শান্তিনিকেতনে যান। সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সৌজন্যে খাতাখানা হস্তগত হলে দেখা গেল, এটা সেই নানাপ্রকারের ভুলের নমুনাভরা লালনের আখড়ার খাতাখানির একটি কপি। বেশ বোঝা গেল 'আসল খাতা' সেই একমাত্র খাতা যার নকল রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন, যা মতিলাল দাশ দেখেছেন ও যা উপেন্দ্রবাবুও কয়েকবার দেখেছেন। শচীন্দ্রবাবু বললেন এই হাতের লেখা তিনি ভালোরূপে চেনেন। এটি শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটের এক পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যের। তখন উপেন্দ্রনাথের মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের আখড়া থেকে খাতাখানি সংগ্রহ করে তাঁর এক কর্মচারীকে দিয়ে নকল করিয়ে নেন। পরে ওর থেকে কতকগুলি গান নিয়ে শুদ্ধ করে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা

লালনের আসল খাতা নিয়ে যাওয়ার যে গল্প চলে আসছিল তার মূলে যে বিশেষ কিছুই নেই তা পূর্বে অনুমান করলেও এবার নিঃসন্দেহ হলেন উপেন্দ্রবাবু।

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালনের গানগুলি প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে 'প্রবাসী'র 'হারামণি' বিভাগে। তার মানে ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতির পূর্বে নয়, পরে। বাউলের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ তাঁর বাইশ বছর বয়সের রচনা থেকে প্রমাণ করা যায়। সে বয়সে তিনি 'ভারতী'তে 'বাউল গান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'বাউলের গাথা' নামে একটি গ্রন্থের সমালোচনাও করেছিলেন। কিন্তু বাউল বলতে কি কেবলমাত্র লালন ফকিরকেই বোঝায়? মদন বাউল, গগন হরকরা, বিশা ভূঁইমালী, গঙ্গারাম এরাও তো বাউল। রবীন্দ্রনাথের গানের উপরে বাউল গানের প্রভাবও পড়ে থাকলে এঁদের গানের প্রভাবও পড়ে থাকবে। শুধু লালনের গানের নয়। লালনের যে গানটির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি তিনি 'গোরা'য় উদ্ধৃত করেছেন সেই দুটি পঙ্‌ক্তি তিনি কোথায় কোন্ বাউলের কণ্ঠে শুনেছিলেন তা কেউ জানে না। আখড়ায় রক্ষিত পুঁথিতে সে গানটি পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রভবনে আবিষ্কৃত পুঁথিতেও না। 'প্রবাসী'তেও সে গানটি প্রকাশিত হয়নি। পূর্ণাঙ্গ গানটি উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যই পরবর্তীকালে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। কবিগুরু যদি 'গোরা' লেখার আগে পুরো গানটি না শুনে থাকেন তবে ভণিতা পর্যন্ত না এসে কেমন করে জানতেন যে ওটি লালন ফকিরের সৃষ্টি?

তাছাড়া লালন ফকিরের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ওই গানটি ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর দ্বারা সংগৃহীত কুড়িটি গানেই সীমাবদ্ধ। তাঁর সারাজীবনের প্রকাশিত রচনাবলীতে লালন ফকিরের নাম একবারও উল্লিখিত হয়নি। তারপর এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাউলদের প্রতি তাঁর অনুরাগ সেই পর্যন্ত—ওরা মানুষতত্ত্বের সাধক। বাউলদের সাধনা কেবল কি মানুষতত্ত্বের সাধনা? আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি আরো কয়েকটি তত্ত্বও বাউল গানের বিষয়। আর সেই যে "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী" তার বাকিটা শুনলে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'য় বা অন্যত্র উদ্ধার করতেন কি? তার খানিকটা এখানে বলছি—

"আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপর আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।"

মানুষতত্ত্বের সঙ্গে এর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই যেমন দেহতত্ত্বের সঙ্গে। বাউল সাধকরা অ-ধরকে ধরতে চাইতেন দেহের ভিতরে। লালনের অপর একটি গানে তার সংকেত আছে—

"ধরো রে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে
ক্ষীরোদ মৈথুনের ধারা

ধরো রে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরা
দেখরে সচেতন হয়ে।"

দেহের সাথে দেহের মিলন না হলে মাধুর্যভজন হয় না। আর মাধুর্য-ভজন না হলে মানুষ হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়? এই হলো বাউলদের মৌল জিজ্ঞাসা। এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের মানুষতত্ত্বে নেই। লালনের মানুষ-তত্ত্বে আছে—

"অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।...
এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন
তাই তো মানুষরূপ গড়ল নিরঞ্জন।....."

সেই মাধুর্যভজন কি কামগন্ধহীন? যেমন রজকিনী ও চণ্ডীদাসের প্রেম? লালনের উত্তর, না। এতে কামেরও ভূমিকা আছে। তিনি বলেন,

"শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কাম-রতিকে রাখলে কোথা?
আগে উদয় কামের রতি
রস আগমন তারই সাথী
সেই রসে হয়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ দেখ্ গে তোরা।
মন জানে সেই রসের করণ
না করে সে রস আস্বাদন
জল সেঁচে তাই হয় রে মরণ
কথায় কেবল বাজি জেতা।"

এখানে রস বলা হয়েছে তাকেই যার অন্য নাম প্রেম। রস না হলে খেলা হয় না। আর খেলা বলা হয়েছে যাকে তার অন্য নাম লীলা। লালন বলেন,

"করি কেমনে শুদ্ধ প্রেম রসের সাধন
প্রেম সাধিতে কেঁপে ওঠে কাম নদীর তুফান।.....
বলব কী হইল প্রেমের কথা
কাম হইল প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথা, তথা নাই রে আগমন।"

বাউলরা তাই জোড়ে জোড়ে থাকে। বাউল সাধনা একাকী পুরুষের বা একাকিনী নারীর সাধনা নয়।

এই সাধনা একান্ত দুরূহ। সিদ্ধি ক'জনেরই বা ভাগ্যে ঘটে? আর ঘটলেও তা মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা নয়। লালন বলেন,

"সাধিলে সিদ্ধের ঘরে
শুনিলাম সেও পায় না তারে

মাধুর্যে মুক্তি পেলেও সে ব্যক্তি ঠকে যাবে
এমনি শুনি রে ভাই।"

লালনের জীবনের অন্বিষ্ট ছিল 'এই মানুষে' 'সেই মানুষে'র দর্শনলাভ। কিন্তু তাঁর সে অন্বেষণ কোনদিন সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর আত্মা অপরিতৃপ্ত। তাঁর অন্তরের ক্রন্দন এই গানটিতে যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমন আর কোথাও নয়।

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর
এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে।"

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে এই গানটি কেউ প্রকাশ করেননি তা নয়। এটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী'তে ১৩০২ সালে। পাঠ বিভিন্ন সংগ্রহে বিভিন্ন প্রকার। লালনের প্রায় গানেরই তাই। কেউ তো কখনো লিখে রাখেননি তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন যেমনটি গেয়ে শুনিয়েছেন। লেখার পালা আসার আগেই পাঠ বদলে গেছে শিষ্যদের বা শ্রোতাদের মুখে মুখে। 'আসল খাতা' খুঁজতে যাওয়া বৃথা। 'আসল' কোনোটিই নয়। রবীন্দ্রনাথের নকল খাতায় ছিল ২৯৮টি গান। তাঁর উপর লালনের প্রভাব যদি পড়ে থাকে তবে 'ফাল্গুনী'তে—'গীতাঞ্জলি'তে নয়।

সম্ভবত লালনের সেই খাতার নকল হাতে পেয়ে সেটির থেকে কুড়িটি গান বেছে নিয়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করতে দেবার সময় কবিগুরু 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউলের গান রচনার প্রেরণা পান। হয়তো সেই অন্ধ বাউলও লালন ফকিরের কাল্পনিক প্রতিরূপ। লালনেরও একটি চক্ষু ছিল দৃষ্টিহীন।

লালনের বেশীর ভাগ গান কি ইংরেজীতে যাকে বলে মিস্টিক, না যাকে বলে এসোটেরিক? রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান কখনো কখনো মিস্টিক, কিন্তু এসোটেরিক কদাপি নয়। আর বাউলদের গান বহু স্থলেই এসোটেরিক। তার মর্ম ভেদ করতে পারে দীক্ষিত শিষ্যরাই। বাইরের শ্রোতার কাছে তার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে।

তাই যদি হয় তবে রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল প্রভাব একান্ত সীমাবদ্ধ। লালনের প্রভাব তো আরো কম। যেটুকু তিনি নিয়েছেন সেটুকু ওই মানুষতত্ত্ব। আর সেক্ষেত্রেও মানুষ বলতে তিনি যা বুঝেছেন তা মিস্টিক পর্যায়ে পড়ে, এসোটেরিক পর্যায়ে নয়। বাউলরা বেদ কোরান মানে না, মন্দির মসজিদ মানে না, পূজাপার্বণ রোজা নামাজ মানে না, দেবদেবী অবতার পয়গম্বর মানে না, সাকার বিগ্রহ মানে না, এমন কি ঈশ্বর আল্লাহকেও ডাকে না। তা বলে তারা নিরীশ্বরবাদী নয়। তাদের যিনি সাঁই তিনি আলেক মানুষ বা অলখ মনুষ। সকলের অন্তরেই রয়েছেন। অন্তরেই তাঁকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উপলব্ধিও তাই। এই পর্যন্তই

বাউলদের সঙ্গে তাঁর মিল। বাউল এই অর্থে তিনিও একজন। অধ্যাপক ডিমক তো বলেন, রবীন্দ্রনাথই বাউলদের শিরোমণি। কথাটা ভুলও নয়, ঠিকও নয়। ঠিক নয় এইজন্য যে, বাউলের সাধনাকে স্বীকার না করলে শুধুমাত্র তত্ত্বগতভাবে বাউল হওয়া যায় না। থিয়োরিই যথেষ্ট নয়। চাই প্র্যাকটিস। বাউলদের প্র্যাকটিস কি রবীন্দ্রনাথ আপনার করে নিয়েছিলেন? না, সেখানে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।

লালন ফকিরের গান রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়ে সুধীমহলে সম্বর্ধনা লাভ করে। কিন্তু লালনের নাম তিনি এর আগে বা পরে একবারও উল্লেখ করেননি। বাউলদের কথা যখনই বলেছেন তখনই বলেছেন নাম-নির্বিশেষে। যেন বাউলদের সকলের একই বাণী, একই বিষয়। অথচ শুধু লালন ফকিরই শতখানেক বছর ধরে গান বেঁধেছেন হাজার হাজার। আর বিচিত্র প্রকার। সুফীভাবের, বৈষ্ণবভাবের, সহজিয়া ভাবের, বিশুদ্ধ ইসলামী ভাবের গানও কি তিনি কম গেয়েছেন? বিশ্লেষণ করলে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধারাও নজরে পড়ে। একদা বৌদ্ধদের দেশ ছিল বাংলাদেশ। বাউলদের ভাষায় তার রেশ থেকে গেছে।

লালনের গান প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর দেহরক্ষার দুই সপ্তাহের মধ্যে 'হিতকরী' পত্রিকায় ৩১শে অক্টোবর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে ১৩০২ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়। প্রবন্ধের নাম 'লালন ফকির ও গগন'। লেখিকা সরলা দেবী। 'ভারতী' ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা। সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। লালনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে থাকলে প্রবন্ধটিতে উল্লেখ থাকত। কবি নিজেও সে কথা তাঁর লেখায় বা বক্তৃতায় উল্লেখ করতেন। লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের কথা কবির জীবিতকালে শোনা যায় নি। পরে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শিলাইদহের শচীন্দ্রনাথ অধিকারীই এ বিষয়ে নির্ভর-যোগ্য তথ্য নিরূপণের অধিকারী। 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তিনি 'লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ' নামে লালনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দেন তা পরে প্রত্যাহার করেন। কাহিনীটি তিনি শুনেছিলেন বরকন্দাজ হায়দার মিঞার কাছে। হায়দার সম্ভবত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' বলতে গিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' বলেছিলেন। দু'জনেই তো 'বাবুমশায়'। লালনের স্কেচ এঁকেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

কেন রবীন্দ্রনাথ নয় তার সোজা উত্তর লালনের মৃত্যুর সময় কবির বয়স ছিল উনত্রিশ আর লালনের একশো ষোল। অন্তত একশো বারো। সাক্ষাৎ-কারটি রবীন্দ্রনাথের ক'বছর বয়সে ঘটেছিল তা কেউ বলেনি। যদি তেইশ বছর বয়সে ঘটে থাকে তবে তখন লালনের বয়স একশো দশ বা একশো ছয়। লালন সে বয়সে কোথাও গেলে ঘোড়ায় চড়ে যেতেন। পায়ে হেঁটে যেতেন না। ছেঁউড়িয়া আর শিলাইদহ পাশাপাশি গ্রামও নয়। মাঝখানে গোরাই নদী ও কাঁচা রাস্তা। এত ক্লেশ স্বীকার করে লালন মোলাকাৎ করতে যাবেন কেন? কবি কি সেই বয়সেই বিশ্বকবি? না, বঙ্গবিখ্যাতও না। বাউলরা অন্যের

লেখা কবিতা পড়ে না। মোলাকাৎ করতে গেলে যেতে হয় কবির সঙ্গে নয়, বাবুমশায়ের সঙ্গে। হায়দার বরকন্দাজ নাকি বলেছিল, "আজ সকালে ছেঁউড়ের প্রজারা দরবার করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই লালন ফকির ছিল।" হায়দারের এ ধারণার কারণ এক বৃদ্ধের ফেলে যাওয়া সাপমুখো লাঠি নাকি লালন ফকিরের। হায়দারের কথা সত্য হলে প্রপিতামহর বয়সী অথর্ব এক বৃদ্ধকে এক তরুণ জমিদার পরের দিন আবার হাজির হতে বলেন! তাঁর কণ্ঠে কোন্ কোন্ গান শোনেন তাও নাকি হায়দারের মনে ছিল। কিন্তু কবে মনে ছিল? যবে রবীন্দ্রনাথও আর নেই। মাঝখানে কেটে গেছে খুব কম করে ধরলেও একান্ন বছর।

শিলাইদহে ষোল সতেরো জন প্রজা দরবার করতে আসে। তাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধও এসেছিল। তার কোন দরকার ছিল না। কোন রকম বক্তব্য বা জিজ্ঞাসাও ছিল না। সে শুধু নীরবে তিন চার ঘণ্টা ধরে দুটি চোখ ভরে জমিদারকে দেখেছিল। তাঁর মুখের কথা শুনছিল চুপটি করে। কিন্তু এমন চমৎকার খোশগল্পটি প্রত্যাহার করে শচীন্দ্রবাবু আমাদের গুলিপ্রিয় দেশ-বাসীকে হতাশ করেছেন। তার আগে তিনি অনেক অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, "এই সত্য কাহিনীটির নায়ক রবীন্দ্রনাথ না হতে পারেন। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই সাঁইজীর ঐভাবে আলাপ হয়েছিল।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাঁইজীর স্কেচ এঁকে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো একখানা গান পর্যন্ত লিখে নেননি। গানের খাতা সংগ্রহ করেন শিষ্যদের কাছ থেকে, কে জানে কতকাল পরে। এসব বিবেচনা করলে কাহিনীটিকে রবীন্দ্রজীবন থেকে বাদ দিতেই হয়। লালনজীবন থেকেও। দু'জনেই যে যার গগনে দীপ্যমান। তদ্দিনে একজন অস্তাচলগামী, অপরজন উদয়াচলে আসীন। কিন্তু দুই জ্যোতিষ্কের সাক্ষাৎকার প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ লালনের জন্য দুটি মহৎ কাজ করে গেছেন। একটি, তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'র যোজনা। যদিও তখন তিনি জানতেন না যে গানটি লালন ফকিরের। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পূর্বে আর কেউ এটি আদ্যোপান্ত ও ভণিতাসমেত সংগ্রহ করেননি। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের অমর উপন্যাস 'গোরা' লালনের একখানি গানকেও অমর করে দিয়েছে।

আর একটি কাজ, অক্সফোর্ডে দেওয়া বক্তৃতায় কবিগুরু আবার সেই 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'র ইংরেজী তর্জমা যোজনা করেছেন। সেইটেই বাউলসাধনার মূল সুর। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্মে'রও মর্মবাণী। সেটি যে লালনের রচনা একথা বোধ হয় তখনো তাঁর অজানা। তাই লালনের নাম উল্লেখ না করে বলেন,

"This village poet evidently agrees with our sage of the Upanishad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the unknown Being; and yet this poet like

the ancient sage does not give up adventure of the Infinite, thus implying that there is a way to its realisation."

উপনিষদের ঋষির সঙ্গে 'পল্লীকবি'র তুলনা করে লালনকে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে অমর করে দিয়েছেন। ফলে লালন সম্বন্ধে শিক্ষিত শ্রেণীর ঔৎসুক্য বেড়ে গেছে। তিনি এখন আর নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের সাঁইজী নন। তিনি এখন উন্নত মানের সাধক, গায়ক ও কবি। এর পরে হয়তো শোনা যাবে যে তিনি একজন শরিয়তী মুসলমান, নৈষ্ঠিক হিন্দু, সদাচারী গৃহস্থ, আজন্ম ব্রহ্মচারী, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু তাঁর গানগুলি যদি বেঁচে থাকে তবে তাঁর প্রকৃত পরিচয় তারাই বহন করবে। গান যে বেঁচে থাকবেই, এটা ধ্রুব।

'ছন্দ' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথ লালনের নাম উল্লেখ না করে তাঁর ভাষার প্রশংসা করেছেন। ভাষার নমুনা যা দিয়েছেন তাতে লালনের নাম ভণিতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। ভাষার বিচারেও লালন ফকিরের গান কবিগুরুর নিকষে উত্তীর্ণ।

"ভাষার শব্দে অর্থ আছে, সুর আছে। অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, সুরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দে যা বোঝায় 'ওয়াটার' শব্দেও তাই বুঝি, কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেইরূপ সৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা ভাষার আপন সম্বল, পণ্ডিতেরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তাঁরা অর্থের মহাজন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার স্পন্দন নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে,
সে কি আর জপে মালা!
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।…
ওরে লালন ভেড়োর লোক দেখানো
মুখে হরি হরি বলা।'

আর একটি—

'এমন মানব জনম আর কি হবে
যা কর মন ত্বরায় কর, এই ভবে।…'

এই ছন্দের ভাষা একঘেয়ে নয়। ছোট বড় নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজেঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলার সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যেই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।……

এই যে বাংলা বাঙালীর দিনরাত্রির ভাষা এর একটা মস্ত গুণ—এ ভাষা

প্রাণবান। এইজন্যে সংস্কৃত বল, ফারসী বল, ইংরাজি বল, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। হিন্দী ভাষারও সেই গুণ। যারা হেড পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়েনি তাদের একটা লেখা তুলে দিই।

'চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কী রঙ্গ সাঁই দেখছ সদায়
বসে নিগম ঠাঁই।…'

প্রাকৃত বাংলাকে গুরুচণ্ডালী দোষ স্পর্শ করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।"

কবির দেওয়া তিনটি উদাহরণই লালনের রচনা।

(১৯৭৮)

লোকসাহিত্যের সন্ধানে

আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমি ছিলুম রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। সেখানে লোকসংগীতের সন্ধানে এসে উপস্থিত হন শান্তিনিকেতন থেকে ডক্টর আরনলড বাকে। হল্যাণ্ডের অধিবাসী, রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। রবীন্দ্রসংগীতের নোটেশন লিখে বিখ্যাত।

আমি সংগীতের লোক নই, সাহিত্যের লোক। কিন্তু লোকসংগীতের কথাগুলো সাহিত্যের অধিকারভুক্ত। সুতরাং আমিও লোকসংগীতের অধিকারী। সাহিত্য কখনো সম্পূর্ণতা পেতে পারে না যদি লোকসাহিত্য তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। আমি সেইজন্যে লোকসাহিত্য তথা লোকসংগীতের অনুরাগী। নওগাঁতে দেখি আরো একজন আছেন যিনি লোকসংগীতের সন্ধানে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। ইতিমধ্যে 'হারামণি' নামে একখানি সংগ্রহও প্রকাশ করেছেন। ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নওগাঁতে ইনি স্কুল সাব ইনস্পেক্টার। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে বেড়ান ও সেই সুযোগে লোকসংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। ইনি তখন অখ্যাত ছিলেন, এখন স্বনামধন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

বাকে সাহেব আসছেন শুনে আমি মনসুরউদ্দীন সাহেবকে পাকড়াই। তিনি একদিনের নোটিশে কোথা থেকে পাকড়াও করে নিয়ে আসেন এক ফকির ও তার ফকিরনীকে। ফকিরের গলা ভালো নয়। তিনি নীরব থাকেন। ফকিরনী একটার পর একটা গান গেয়ে শোনান আর বাকে সাহেব সেসব তাঁর যন্ত্র দিয়ে রেকর্ড করে নেন। তখনকার দিনে টেপ রেকর্ডার ছিল না। যন্ত্রটা সেকেলে। ফকিরনীর সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর বিদেশে চালান গেল, আমরা কেউ তাকে ধরে রাখতে পারলুম না। তবে তাঁর গানের কথাগুলি মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সযত্নে লিখে রাখেন ও প্রকাশ করেন। 'হারামণি' খণ্ডে খণ্ডে

বেরোয়। এতদিনে তার অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ফকিরনী ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাঁর প্রথম গানটি ছিল সার্বজনীন।

"প্রেম করো, মন, প্রেমের মর্ম জেনে
প্রেম করা কি কথার কথা রে
গুরু লহ চিনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের শিরোমণি
এক মরণে দু'জন মলো রে
প্রেমপূর্ণ প্রাণে।"

পরের লাইনগুলি মনে পড়ছে না। তার ভাব ছিল এই যে, প্রেমের তারে বাঁধা ছিলেন মোহাম্মদ আর আপনি খোদা।

অনুমান করতে পারি গানটি সুফী তথা বৈষ্ণব ভাবের সমন্বয়সূচক। তার গায়িকা কে তা তো জানা গেল, কিন্তু রচয়িতা কে তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ গানের শেষে কোনো ভণিতা ছিল না। সে সময় আমার ধারণা ছিল না সেই একই গান আমি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অবিভক্ত বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি শুনতে পাব। তবে তার মুসলিম অংশটি বাদ দিয়ে। চণ্ডীদাস ও রজকিনীকেই প্রেমের আদর্শ বলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রবাদ আছে যে, তাঁরা যেমন জীবনে একসঙ্গে ছিলেন তেমনি মরণেও একসঙ্গে গেছেন।

আরো দশ বছর পূর্ব হতেই লোকসংগীত সংগ্রহে তৎপর ছিলেন মনসুরউদ্দীন সাহেব। এই কর্মের প্রবর্তনা পান তিনি 'প্রবাসী' থেকে। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালন ফকিরের গান পড়ে। 'প্রবাসী'তে সেকালে 'হারামণি' বলে একটি বিভাগ ছিল। তাতে কোনো মাসে একটি, কোনো মাসে একাধিক লোকমুখে প্রচলিত গান বা কবিতা বা ছড়া প্রকাশিত হতো। যাঁরা সংগ্রহ করে পাঠাতেন তাঁদের নাম ছাপা হতো। তাঁদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নেতা ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, যোগ দিতেন আরো অনেক। একদিন রাজশাহী কলেজের ছাত্র মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের নামও 'প্রবাসী'র 'হারামণি' বিভাগে স্থান পায়। তিনিও সংগ্রহ করেছিলেন লালন ফকিরের একটি গান। এমনি করে হয় লোকসংগীত সংগ্রহের কাজে তাঁর হাতেখড়ি। ছাত্রজীবন থেকে এই তাঁর নেশা। এ নেশা তিনি পঞ্চান্ন বছর পরেও ছাড়তে পারেন নি।

শুরু হয় লালন ফকিরকে দিয়ে। লালনের আস্তানা ছিল নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায়। পদ্মার অপর পারেই পাবনা জেলা। যেখানে মনসুর-উদ্দীনের নিবাস। লালনের শিষ্যরা নদীর দুই পাড়েই ছড়ানো। লালনের দেহত্যাগের ত্রিশ বছর পরেও তাঁর অসংখ্য গানের দেশজোড়া প্রভাব ছিল। মনসুরউদ্দীন কেবল লালনের নয়, অন্যান্য বাউল ফকিরদের গানও লিপিবদ্ধ করেন। শুধু বাউল ফকিরদের নয়, সাধারণ গৃহস্থঘরের বৌ-ঝিদের গানও

লিখে নেন। এ ছাড়া চাষী, মাঝি প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গানও টুকে রাখেন। লোকসংগীত বলতে কেবল আধ্যাত্মিক সংগীত বোঝায় না। আধ্যাত্মিক নয় এমন অনেক বিষয়ের আগ্রহ চিরকাল ছিল, আছে ও থাকবে। আগ্রহ থাকলে সৃষ্টিও থাকে। তবে সৃষ্টি যারা করে তারা মুখে মুখে করে। সাধারণত তারা নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত। তাদেরও একটা প্রবহমান ঐতিহ্যস্রোত আছে, সেই স্রোতের সঙ্গে তারা তাদের সৃষ্টির ধারা মিলিয়ে দেয়। কেউ রামায়ণ মহাভারত বা বেদ পুরাণ পড়ে না। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের কাব্য তো নয়ই। তাদের বিদ্যার দৌড় বড়জোর বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী অবধি।

কিন্তু বিদ্যা নয়, সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তাদের সম্বল ও তাদের সম্পদ। তাদের সেই উপলব্ধির মধ্যে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও পড়ে। তা না হলে লালন ফকিরের গান এত গভীর ভাবের হতো না। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল তার থেকে সুর আহরণ করেছিলেন তা নয়, ভাব আহরণও করেছিলেন। লালন যদিও সর্বাধিক পরিচিত, তবু আরো কয়েকজনও কম গভীর বা কম মৌলিক নন। মদন বাউল, গগন হরকরা, বিশা ভুঁইমালী, পাগলা কানাই, গঙ্গারাম প্রভৃতির মধ্যে কে যে হিন্দু আর কে যে মুসলমান তা বোঝা শক্ত। আর হিন্দু হলেও কে যে স্পৃশ্য আর কে যে অস্পৃশ্য। যদি বলি মদন আর কানাই মুসলমান তাহলে সেটা আশ্চর্য শোনাবে। আর গঙ্গারাম যে নমঃশূদ্র ছিলেন এটা আমি ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছেই শুনেছি। তবে এ বিষয়ে আমার স্মৃতি হয়তো নির্ভরযোগ্য নয়। মোটের উপর বলতে পারা যায় হিন্দু যাঁরা তাঁরাও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর নন, মুসলমান যাঁরা তাঁরাও তথাকথিত আশরাফ নন। দুটি একটি ব্যতিক্রম বাদে। শাস্ত্র, শাস্ত্রীয় আচার, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ বা হজ এঁদের মতে বৃথা। লোকাচারও তাই।

যে ঐতিহ্য এঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে, এঁরাও বাঁচিয়ে রেখেছেন যাকে, সে ঐতিহ্য বৌদ্ধ, সহজিয়া, হিন্দু, বৈষ্ণব তথা মুসলিম সুফী মার্গের। সেসব মার্গেরও পন্থভেদ আছে। লালনের ছিল দরবেশ দীক্ষা। তা বলে সব ফকিরের দরবেশ দীক্ষা নয়। দরবেশ দীক্ষা হিন্দু সাধকেরও ছিল। তাতে তাঁর জাত যেত না। আর গেলেই বা কী! যে যার নিজের আস্তানায় থাকতেন সমাজের নাগালের বাইরে। গানই ছিল নেশা ও পেশা। বাউল আপন মনে গান করত, যারা শুনত তারা যে যা পারে দিত। সারাদিনে সে যা সংগ্রহ করত তাই দিয়ে তার আস্তানা চলত। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করত না। একই মনোভাব তার রচনার বেলায়। তার গান হচ্ছে বহতা নদী। বহতা নদীকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখলে তার জল আর তাজা থাকে না। তাজা জল যদি চাও তো বেঁধে রাখতে যেয়ো না। বাউলের তাই পুঁথিপত্র নেই। নোটবই নেই। ওরা কেউ সে কাজ করবে না। অন্য কেউ যদি করে তবে যে তারা অনুমোদন করে তা নয়। আমি শুনেছিলুম ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সংগ্রহে অসংখ্য বাউল গান আছে। সেসব তিনি প্রকাশ করছেন না। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা

করি, কারণটা কী ? তিনি বলেন, মানা আছে। এসব গান যাঁদের রচনা তাঁরা সাহিত্যিক নন, সাধক। তাঁরা গোপনেই থাকতে চান। প্রকাশ্যে আসতে চান না। তাতে তাঁদের সাধনার ক্ষতি হয়।

যাই হোক, আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষিতিমোহনবাবু একদিন নিজের থেকেই বলেন, "আচ্ছা আপনাকে একদিন দেখাব।" সেই দ্বিতীয় একদিনটা আসার আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর সংগ্রহের খাতাগুলোর কী হলো জানিনে। সেসব যদি বিশ্বভারতীতে দান করা হয় তাহলে সন্ধানীরা সেইখানেই সন্ধান পাবেন। প্রকাশ করা সম্বন্ধে রচয়িতাদের যে আপত্তি সেটা জীবিতকালে সাধনার বিঘ্ন ঘটাত। দেহরক্ষার পরে কি আর সে কারণটা খাটে ? ক্ষিতিমোহনবাবু নিজেই 'প্রবাসী'র সেই 'হারামণি' বিভাগে বিগত বাউলদের গান প্রকাশ করেছিলেন। তাদের একজনের নাম গঙ্গারাম। গঙ্গারামের একটি গান আমি ক্ষিতিমোহনবাবুর মুখেই শুনি। মনসুরউদ্দীন সাহেব সেটি 'প্রবাসী' থেকে নিয়ে পুনরায় প্রকাশ করেছেন।

"পরাণ আমার সোঁতের দীয়া
(আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে !)
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার
আন্ধার নিশুইত ঢালা,
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরের
মালা (গো)
(তারার তলে কেবল চলে
নিশুইত রাইতের ধারা)
সাথের সাথী চলে বাতি,
নাইগো কূলকিনারা (গো)..."

ভণিতায় গঙ্গারামের বা অন্য কারো নাম নেই। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে ক্ষিতিমোহনবাবু গঙ্গারামেরই নাম বলেছিলেন।

এখন, কথা হচ্ছে, এমন সুন্দর রচনা লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল কি না। আমাদের মতে নিশ্চয়ই উচিত ছিল। এর জন্যে সংগ্রাহক ক্ষিতিমোহন সেন, সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও পুনঃপ্রকাশক মনসুরউদ্দীন মহাশয়দের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অন্যথা এ জিনিস লোকমুখেই ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যেত। তার চেয়ে বিপদ, বিকৃত হতো।

সাহিত্যিক সৌন্দর্য আছে বলেই আমরা এসব গান সংগ্রহ করতে ও প্রকাশ করতে দেখলে আনন্দিত হই। ইতিমধ্যে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ও শিষ্যরা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন। সংগ্রহের ও প্রকাশের প্রয়াস বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এতে যোগ দিয়েছেন স্বনামধন্য বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস। দেখা যাচ্ছে বাউলদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটার আশংকার চেয়ে তাঁদের বাণী ঘরে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদটাই আরো জোরদার। তবে এর সমস্তটাই যে সাহিত্য একথা যেন কেউ না মনে করেন। লোকসাহিত্যের জন্যে কোনো আলাদা মাপকাঠি

নেই। সাধনার দিক থেকে যেটা শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যের দিক থেকে সেটা হয়তো তেমন নয়।

মনসুরউদ্দীন সাহেব রাশি রাশি বিবাহের গান সংগ্রহ করেছেন। সেসব মেয়েদের মুখে শোনা। মনে হয় মেয়েদেরই রচনা। অনায়াসেই একে নারী-সাহিত্য বলা যায়। উচ্চস্তরের সাহিত্যে নারীর প্রবেশ বেশী দিনের নয়। মহিলা সাহিত্যিকরা ভয়ে ভয়ে লেখেন। পাছে পাঠকের চোখে হেয় হন কিংবা পরিবারের লোকনিন্দার কারণ হন। নারীহৃদয়ের অকপট উক্তি বিশ্বসাহিত্যেই বা কতটুকু ব্যক্ত হয়েছে ! অথচ লোকসাহিত্যে আমরা যেসব মেয়েলী গান পাই সেসব উল্লেখযোগ্য শিল্প বা সাহিত্য না হলেও প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম। কোন আদিকাল থেকে তারও একটি ধারা বয়ে আসছে পুরুষ রচিত লোক-গাথার পাশাপাশি। কেউ লিপিবদ্ধ করেনি। করার সময় এসেছে। করলে পরে হিসাব করা সহজ হবে সাহিত্যের ভাণ্ডারে নারীর দান কতখানি।

লোকগীতিকা, লোককাহিনী, ছড়া, রচনা, প্রবাদ প্রভৃতির ব্যাপক অনুসন্ধান ও উদ্ধার দিন দিন আরো জরুরী হয়ে উঠছে। এর একটি কারণ তো এগুলির সম্ভবপর বিলোপ। লিখে না রাখলে, টেপ রেকর্ড না করলে কেবল মুখে মুখে এগুলি আর কতকাল চলিত থাকবে বা অবিকৃত থাকবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, লোকসাহিত্য তথা লোকসংগীতের প্রবহমান ঐতিহ্য যে আর কতকাল বহতা থাকবে সেটাও অনিশ্চিত। স্রষ্টা যারা তারা যদি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে, আখড়া বা আস্তানাগুলো যদি লোকাভাবে লুপ্ত বা অর্থাভাবে ধ্বংস হয়, বাউলকে বা বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দেবার জন্যে যদি কেউ না থাকে, তাহলে মঙ্গলকাব্য যেমন আর রচিত হচ্ছে না তেমনি লোকসাহিত্য বা লোকসংগীতও আর মুখে মুখে তৈরী হয়ে উঠবে না। চাহিদা থাকলে যোগানও থাকে। কিন্তু সেটা হবে কৃত্রিম বাউল গীতিকা বা কৃত্রিম ভাটিয়ালী গান। আজকাল আমরা যা সাধারণত শুনতে পাই তাতে কৃত্রিমের ভাগই বেশী। তার চেয়ে ভালো অকৃত্রিমের সন্ধান ও সংরক্ষণ।

কিন্তু এ কাজ করবে কারা ? দারুণ আয়াসসাধ্য কর্ম। উপযুক্ত কর্মীর অভাব। যারা ব্রতী হয় তারা খাঁটি ও ভেজালের পার্থক্য ধরতে পারে না। দূরে না গিয়ে কাছে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট হয়। যা কিছু সোনার মতো দেখতে তার সবটাই সোনা নয়।

(১৯৭৭)

পরিশিষ্ট

১। মহাত্মা লালন ফকির

[এ যাবৎকাল প্রাপ্ত লালন সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যাবলীর মধ্যে পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। লালনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৯০ সালের ৩১শে অক্টোবর (বাং ১২৯৭ সালের ১৫ই কার্তিক)-এর 'হিতকরী' পত্রিকার ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে (পৃঃ ১০০-১০১) "মহাত্মা লালন ফকির" নাম দিয়ে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা তথ্যবহুল, প্রামাণিক ও সুলিখিত। "মহাত্মা লালন ফকির" নিবন্ধে লালন শাহের জীবনী সম্পর্কে যে তথ্য-সংকেত পাওয়া যায়, গবেষণার দ্বারা তা পরবর্তীকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে প্রদত্ত লালন জীবনের ইঙ্গিতটি সামান্য হলেও তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। এই নিবন্ধ থেকে ব্যক্তি ও সাধক লালনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 'হিতকারী'র এই নিবন্ধ সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (ভারতী, ভাদ্র ১৩০২)। পরবর্তীকালে লালন গবেষণায় পথিকৃৎ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল তাঁর "মহাত্মা লালন ফকির" গ্রন্থে 'হিতকরী'র এই নিবন্ধটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন।

'হিতকরী'তে প্রকাশিত কোনো নিবন্ধেই লেখকের নাম থাকতো না। (আমি যতগুলো সংখ্যা দেখার সুযোগ পেয়েছি, অন্ততঃ তার মধ্যে নেই)। সম্ভবতঃ মীর মশাররফ হোসেন এবং কুষ্টিয়ার উকিল রাইচরণ দাস (যিনি একাধারে 'হিতকরী'র সহ-সম্পাদক ও এজেন্ট ছিলেন) অধিকংশ সময় এই নিবন্ধগুলি লিখতেন। ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যার হিতকরীতে তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। নিবন্ধ তিনটি যথাক্রমে—(১) 'জমিদার', (২) 'মহাত্মা লালন ফকির' ও (৩) 'ইনকম ট্যাক্স'। 'মহাত্মা লালন ফকির' নিবন্ধে লালন শাহের জীবন, সাধনা ও সঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। এটিও যে কার রচনা তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে যতদূর মনে হয় এটি রাইচরণ দাসের রচনা। এই ধারণার সঙ্গত কারণও আছে। রাইচরণ দাস লালনের পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও রাইচরণ দাসের সঙ্গে লালনের যোগাযোগ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'কুষ্টিয়ার উকীল বাবু রাইচরণ বিশ্বাস, কুমারখালির খ্যাতনামা হরিনাথ মজুমদার ও তাঁহার ফিকিরচাঁদের দলস্থ লোকেরা লালনের অনেক গান ও জীবনের অনেক ঘটনা জানেন……।"[১] সাহিত্যরসিক রাইচরণ দাস কুষ্টিয়ার একজন আইন-জীবী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল কুষ্টিয়া শহরের মধ্যস্থিত আমলাপাড়ায়।

১। ভারতী : ভাদ্র—১৩০২ ; পৃঃ ২৮১

এই স্থানে 'রাইচরণ ব্যারাক' এখনো তাঁর স্মৃতিচিহ্ন বহন করে আছে। রাইচরণ দাসের পারিবারিক পরিবেশ ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার বিশেষ অনুকূল। তাঁরই দৌহিত্র শ্রীকুমারেশ ঘোষ বর্তমানে পশ্চিম বাঙলার একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও সাময়িকপত্রসেবী। আমলাপাড়া থেকে ছেঁউড়িয়ার দূরত্ব খুব বেশী নয়—এক মাইল থেকে সওয়া মাইল মতো হবে। অতএব রাইচরণের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা এবং ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় তাঁর যাতায়াত খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 'মহাত্মা লালন ফকির' নিবন্ধ পড়ে জানা যায় লেখকের সঙ্গে লালনের ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় ছিল। এ বিষয়ে নিবন্ধকার বলছেন, 'ইঁহাকে (লালন) আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র উল্লেখানুযায়ী লালনকে প্রত্যক্ষদর্শী এই বক্তা যে রাইচরণ দাস তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অপরদিকে মনে হতে পারে নিবন্ধটি মীর মশাররফের রচনা কিনা। এরই প্রেক্ষিতে বলা যায় সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসে লালনের মৃত্যুর সময় মীর সাহেব টাঙ্গাইলে ছিলেন। তাই রচনাটি মীর সাহেবের না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। লালনের মৃত্যুর পরই নিবন্ধকারের ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় উপস্থিতির ইঙ্গিত নিবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। লালনের মৃত্যু হয় ১৭ই অক্টোবর আর ঐ সংখ্যা 'হিতকরী' প্রকাশিত হয় ৩১শে অক্টোবর। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে উপকরণ সংগ্রহ করে নিবন্ধ রচনার জন্য ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন সমধিক। এই সময়ের মধ্যে মীর সাহেবের কুষ্টিয়ায় উপস্থিতি ও নিবন্ধ রচনা সম্ভবপর নয়। 'মহাত্মা লালন ফকিরের' গদ্যও মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরচনার অনুরূপ বলে মনে হয় না।

তবে মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গেও লালনের পরিচয় ছিল। এই পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় সতীশচন্দ্র মজুমদারের "কুড়নো সঙ্গীত" গ্রন্থে। কাঙালের সঙ্গে লালনের পরিচয়ের সূত্রে ধরেই সম্ভবতঃ লালনের সঙ্গে মীরের আলাপ-পরিচয়। মীর বাউলগান রচনায় কাঙাল হরিনাথের দ্বারাই প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। মীর রচিত বাউলগানে কাঙালের প্রভাবই অধিক ও সরাসরি। তবু লালনের গান যে তাঁর মনে ছাপ ফেলেনি —হৃদয়ে দাগ কাটেনি একথা কে বলবে! মীরের দুয়েকটি গানে লালনের গানের প্রভাব ও মিল আবিষ্কার করা যায়। মীর সাহেব একাধিকবার ছেঁউড়িয়া এসেছেন। মীরের জন্মগ্রাম লাহিনীপাড়া ছেঁউড়িয়ার যথেষ্ট নিকটবর্তী গ্রাম। এ দুটি গ্রামই কুমারখালি থানার মধ্যে অবস্থিত। মীর সাহেবের 'সঙ্গীত লহরী'-র একটি গানে লালন ফকিরের নাম পাওয়া যায়। গানটির অংশবিশেষ হলো এই—

"আরে ভাই না পাই দিসে, কলির শেষে,
কিসে কার মন মজেছে।
ফিকিরচাঁদে, আজবচাঁদে,

রসিকচাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগল কানাই,
লালন গোঁসাই, সব সাঁই এতে হার মেনেছে।"[১]

মীরের আত্মজীবনীতে লালন ফকিরের কোনো উল্লেখ আছে কিনা বলতে পারি না……

লালনের মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত 'হিতকরী'র এই সংখ্যাটি বহুদিন যাবৎ ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রক্ষিত ছিল। আখড়ার পরিচালকরা কাগজটি আগ্রহী পরিদর্শকদের দেখাতেন। লালন-শিষ্যরা 'হিতকরী'র এই বিবরণীর সত্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ বিষয়ে বসন্তকুমার পাল লিখেছেন: "তাঁহার (লালন) শিষ্য ভোলাই সাহ ও পাঁচু সাহের নিকট শুনিলাম 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সাঁইজীর বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল উহা সর্বৈব সত্য।"[২] 'হিতকরী'র এই সংখ্যাটি বহুদিন পূর্বেই আখড়া থেকে অপহৃত অথবা নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে 'হিতকরী'র এই দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আলী আহমদ সাহেবের সৌজন্যে পাওয়া গেছে। 'হিতকরী' পত্রিকাসহ মীর সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থ ও মূল্যবান কাগজপত্রগুলো অতি সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখে-ছিলেন মীর সাহেবের প্রপৌত্র জনাব মীর তফাজ্জল হোসেন (বাচ্চু মিয়া)। মূলতঃ তাঁর দূরদৃষ্টি, ঐতিহ্যবোধ ও সাহিত্যপ্রীতির কারণেই এই অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষা পেয়েছে। 'হিতকরী' থেকে 'মহাত্মা লালন ফকির' নিবন্ধটি এখানে হুবহু প্রকাশ হলো।

আবুল আহসান চৌধুরী]

লালন ফকিরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য; শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকেও তিনি কম ভালবাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতানুসারে ইঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে কিন্তু

১। সঙ্গীত লহরী (১৮৮৭ ইং): পৃঃ ৬৪; ৮৯ নং গান
২। মহাত্মা লালন ফকির; পৃঃ ২

সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে, বাউল-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মত বিশ্বাস অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবা ও বাউলের দলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই। পরদার ইঁহাদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎ নিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে। বাউল, সাধুসেবা ও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটি গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান-জননের পথ এককালে রুদ্ধ। "শান্ত-রতি" শব্দের বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট ভাব বুঝায়, ইহারা তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারেখারে যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশী কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই।

শিষ্যদিগের ও তাহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকিরের বিচার হইতে পারে না। তিনি এ সকল নীচ কার্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম-জীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকির বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা "সাঞ" এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নোমাজ করিতেন না। সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদবিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণবধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ-সাধনের কথা ইঁহার মুখে শুনা

যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। লালন ফকির নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন, ইনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন ; বস্তুতঃ তাহা নহে ; ইনি সংসারী ছিলেন ; সামান্য জোতজমা আছে ; বাটীঘরও মন্দ নহে। জিনিসপত্রও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার রাখিয়া মরিয়া যান। ইঁহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা (মহোৎসব) দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্য ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সঙ্গীত ও আলোচনা হইত। তাহাতে তাঁহার ৫/৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে, না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ, লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমনকালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকির হয়েন। ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে ১৭ই অক্টোবর প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাতপায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন করিতেন ; মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এই সময়ের রচিত কয়েকটি গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইঁহার সহিত ধর্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্বে রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন, "আমি চলিলাম।" ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার (হয়) নাই। হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্যে শিষ্যমণ্ডলী অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মানিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন

ভাল লোক আছেন। ভরসা করি, ইঁহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না, লালন ফকিরের অসংখ্য গান সর্বত্র সর্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহার নাম, ধর্ম, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলেম না এই নজরে।
কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার্‌রে ॥—

২। মানবিকবাদ প্রসঙ্গে

হিউমানিজম একটা বিদেশী শব্দ। সেটার পারিভাষিক শব্দ হিসাবে মানবতা-বাদ বেশ কিছুদিন থেকে চলছে। আমার মতে সেটা ঠিক নয়। মানবতা এসেছে হিউমানিটি থেকে, হিউমান থেকে নয়। হিউমান থেকে যেটা আসতে পারে সেটা মানবিকতা। হিউমান হচ্ছে মানবিক। হিউমানিজম হচ্ছে মানবিকবাদ।

রেনেসাঁসের সময় থেকেই হিউমানিজম কথাটার একটি বিশেষ অর্থে প্রচলন। তার আগে ঈশ্বরই ছিলেন স্রষ্টা পিতা বিধাতা। যে কোনো বিষয় জানতে হলে ঈশ্বর থেকেই আরম্ভ করতে হতো। তিনিই আদিকারণ। জ্ঞানের জন্যে পাঠ করতে হতো ঈশ্বরবাক্য। বাইবেল। ঈশ্বরতত্ত্ব বা থিয়োলজি ছিল পরম পঠনীয়।

রেনেসাঁসের সময় থেকে থিয়োলজির অধ্যাপকদের থেকে আলাদা করে ফিলোজফির অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয়। বিদ্যার্থীরা বাইবেল না পড়ে গ্রীক দর্শন পড়ে। ফিলজফি শব্দটা তখনকার দিনে কেবল দর্শন অর্থে নয়, বিজ্ঞান অর্থেও ব্যবহার করা হতো। ফিলজফি বলতে বিজ্ঞানও বোঝাত। পরে ন্যাচারাল ফিলজফি অর্থাৎ বিজ্ঞানের জন্যে আলাদা একটা অধ্যাপকপদ সৃষ্টি হয়। তারপর ন্যাচারাল ফিলজফিও নানাভাগে বিভক্ত হয়। ততদিনে সায়েন্স কথাটা তার স্থান নিয়েছে। লোকে জানেই না যে এখন যার নাম সায়েন্স আগেকার দিনে তার নাম ছিল ফিলজফি। "স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক ব্যাপার আছে যা তোমার ফিলজফির স্বপ্নের অতীত", হ্যামলেটের এই উক্তিতে ফিলজফি হচ্ছে বিজ্ঞান।

থিয়োলজি চারশো বছর আগে যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। তার আর বৃদ্ধি নেই। অপরপক্ষে ফিলজফি তথা বিজ্ঞান এখন বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তার নাগাল পাবার জন্যে এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অসংখ্য বিভাগ। বিজ্ঞান ছাড়াও বিশ্ববিদ্যার আরো একটা ভাগ আছে।

তাকে বলা হয় হিউমানিটিজ। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি তার এলাকায় পড়ে। এ ছাড়াও আছে আইন ও আইনের যা মূলতত্ত্ব। বিশ্ববিদ্যার এখন সীমাপরিসীমা নেই। মানুষকে সবকিছু জানতে হবে, তার মধ্যে আবার মনস্তত্ত্ব ও মনোবিশ্লেষণও পড়ে। এই যে সব কিছু জানতে চাওয়া এটা কেবল বিশ্ববিষয়ক নয়, মানববিষয়কও বটে। কে এমন আছেন যিনি বলতে পারেন যে মানব সম্বন্ধে আদি অন্ত তাঁর জানা। মানব বলতে দৃশ্যত একটি প্রাণী বোঝায়, যে প্রাণী অমর নয়। কিন্তু তাই যদি হবে তো হোমারের ইলিয়াড বা বাল্মীকির রামায়ণ অমর কেন? মানুষকে কি কেবল প্রাণ দেওয়া হয়েছে, তাকে দেওয়া হয়েছে ধ্যানও। প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের বিনাশ হয় না। তার থেকে আসে কত কী নতুন সৃষ্টি।

মানবিকবাদের প্রতিষ্ঠানভূমি মানব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা। সে অনুসন্ধিৎসা মানুষকে দেশবিদেশে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। দেশ-বিদেশ আবিষ্কার করিয়েছে। আবিষ্কার করিয়েছে কতরকম প্রাণী ও প্রাণী নয় এমন বস্তু। আবিষ্কার করিয়েছে গণিতশাস্ত্রের ও পদার্থবিজ্ঞানের কতরকম সূত্র। আবিষ্কারের সঙ্গে পাল্লা রেখেছে কতরকম উদ্‌ভাবন। ফলে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে। তা বলে যে সব সময় ভালোর জন্যে বদলেছে তা নয়। দুঃখের বিষয় অনেক সময় খারাপের জন্যেও বদলেছে। মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে বিভবের জন্যে, ক্ষমতার জন্যে। তাও যদি সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে পারা যেত। তা তো নয়। মানুষের ধর্মবুদ্ধির চেয়ে তার স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হয়েছে। কিন্তু বরাবর যে এরকম হবেই এমন কোনো কথা নেই। মানুষ তার স্বার্থবুদ্ধিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার বিস্তর প্রমাণ জমেছে। তার ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও হৃদয়বত্তা তাকে মহৎ করেছে, যদিও সে হয়তো ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

মানবিকবাদী বিদ্যায়তনগুলিতে থিয়োলজির অধ্যাপনা ক্রমশ অচল হয়ে এসেছে। ঈশ্বর এষণার জন্যে মানবিকবাদীদেরও আগ্রহ নেই। তাঁদের এষণার বিষয় বিশ্ব ও বিশ্বের অভ্যন্তরে মানব। জীবনের কোনো অংশই তাঁদের কাছে বর্জনীয় নয়। এটা মন্দ, ওটা অশ্লীল, সেটা কুৎসিত, অতএব সাহিত্যে বা দর্শনে বা বিজ্ঞানে পরিত্যাজ্য এ রকম ফতোয়া তাঁরা মানবেন না। যা কিছু মানবিক বা মানবসংক্রান্ত তাই জলচল। যা কিছু জাগতিক বা জগৎসংক্রান্ত তাই আলোচনাযোগ্য।

মানবিকবাদ একে একে অনেকগুলো বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। কিন্তু এখনো সব ক'টা খুলতে পারেনি। তাই অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে তার অবিরাম সংগ্রাম। মার্কসবাদী মানসেও বিস্তর ইনহিবিশন। সমাজকে রূপান্তরিত করলেও মনের গহনে লুকানো থাকে সত্যের মুখোমুখি হতে অনিচ্ছা, অনীহা বা আতঙ্ক। শ্রেণীশূন্য সমাজ যে ফ্রয়েডকে সত্যদর্শী বলে স্বীকার করবে এমন কোনো নিশ্চিতি নেই। রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতো তারও নিষিদ্ধ গ্রন্থের বা চিত্রের বা সঙ্গীতের তালিকা থাকতে পারে। সামাজিক রূপান্তর

ঘটলেই যে সব ক'টা বন্ধ দুয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে এটা এখন পর্যন্ত অপ্রমাণিত। বরং এইসব রূপান্তরিত সমাজেই মানবিক অনুসন্ধিৎসার চারদিকে লক্ষ্মণের গণ্ডী। শাস্ত্র বদলে গেছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় অভ্রান্ততা তেমনি বদ্ধমূল। আবিষ্কৃত তথ্য যদি উপমার সঙ্গে খাপ না খায় তো তথ্যই ভুল। ডগমা কখনো ভুল হতে পারে না। সুতরাং সত্যের জন্যে সন্ধান পুরাতন সমাজের মতো নতুন সমাজেও দোষাবহ। সেকালে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। একালে হয়তো গুলি করে মারা হয়। কিংবা পাঠিয়ে দেওয়া হয় মানসিক রোগের চিকিৎসাগারে।

মানবিকবাদ থেকে ঈশ্বরকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যিনি জ্ঞানবুদ্ধির অতীত—তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান কেমন করে সম্ভব। যিনি অনির্বচনীয় তাঁর সম্বন্ধে উক্তি কেমন করে গ্রাহ্য। এ যেমন একপক্ষের কথা, তেমনি অপরপক্ষের কথা হলো মানবিক অনুসন্ধান থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিলে অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ বা সংকীর্ণ হতে বাধ্য। সেটাও তাহলে একটা বন্ধ দুয়ার যেটা অনুসন্ধিৎসুকে খুলতে দেওয়া হবে না। মানবিকবাদের বন্ধ দুয়ার মুক্তির আদর্শ কেনই বা আপনাকে আপনি সঙ্কুচিত করবে। পাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায় এই আশঙ্কায়। না, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন তথ্যের আলোয় পুরাতন ধারণা সংশোধন করতে হবে। নিরীশ্বরবাদই যে মানবলব্ধ সত্যের শেষ কথা তা নয়। শেষ কথা বলে কোনো কথা নেই।

আধুনিক যুগের হিউমানিজম প্রধানত জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। অতীতেও একপ্রকার মানবিকবাদ ছিল যার প্রবক্তা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সাধক। যেমন চণ্ডীদাস। যিনি বলেছিলেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" অতীতের সেই মানবিকবাদ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পরম্পরাগত বাউল সহজিয়া সাধনার মর্মবাণী। এ সাধনা মানুষের উপরে বা মানুষের বাইরে কারো অস্তিত্ব আছে কিনা জানতে চায় না। যদি কেউ থাকেন তবে "এই মানুষে আছে সেই মানুষ"। তাঁকে পুঁথিপত্রে মন্দিরে মসজিদে বা পুণ্যতীর্থে খুঁজতে হবে না। খুঁজতে হবে মানুষের নিজের ভিতরেই। এটা কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতো বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্বেষণ নয়। এর পদ্ধতি অন্যবিধ। এইসব সাধকরাও কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে চান না। শেষ কথা বলে আপ্তবাক্য বলেন না।

এক বৈষ্ণবী, সেও বাউল, একবার আমাকে বলেছিল, "বাবা, মানুষই একমাত্র সত্য। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। এই মানুষই রাম হয়ে রাবণকে মেরেছিল। এই মানুষই রাবণ হয়ে সীতাহরণ করেছিল। এই মানুষই কৃষ্ণ, এই মানুষই কংস। এই মানুষই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা। এই মানুষই সব।"

গ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
মূল্য পাঁচ টাকা
রচনাকাল ১৯৬১-৬২
উৎসর্গ—আচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু
প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৯ (এপ্রিল ১৯৬২)
প্রবন্ধ সমগ্রে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে, লেখকের ওই সংস্করণের ভূমিকা মূল গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া হলো।

গান্ধী

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩
প্রচ্ছদে গান্ধীর ছবি, প্রচ্ছদশিল্পী কারও নাম নেই।
মূল্য ষোলো টাকা
রচনাকাল ১৯৬৮-৬৯
উৎসর্গ—শ্রীমতী লীলা রায়
প্রিয়তমাসু
প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৭৬ (অক্টোবর ১৯৬৯)
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯০ (আগস্ট ১৯৮৩)

এখানে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে। লেখকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা মূল গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া হলো।
মূল গ্রন্থ পঁচিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কোন পরিচ্ছেদ-শিরোনাম নেই। পরিশিষ্টে স্থানপ্রাপ্ত নিবন্ধগুলির সূচীপত্র এরূপ ঃ গান্ধীত্ব / ক্ষুরধার পন্থা / দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ / মহাকাব্যের নায়ক / অগ্নিপরীক্ষা।

টলস্টয়

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীমতী লীলা রায়
মূল্য বার টাকা মাত্র
গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে লেখা।
উৎসর্গ—অশোককুমার ও তৃপ্তি রায়
দু'জনের হাতে
প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৮৭
এখানে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে, লেখকের ওই সংস্করণের ভূমিকা মূল গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া হলো।

লালন ও তাঁর গান

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—রবীন বল
শৈব্যা পুস্তকালয় ঃ প্রকাশন বিভাগ
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩
প্রচ্ছদে বাউল ও তার বাদ্যযন্ত্রের ছবি। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই।
মূল্য দশ টাকা

(ভারত সরকারের সহায়তায় স্বল্প মূল্যের কাগজে মুদ্রিত)
রচনাকাল ১৯৭৮
উৎসর্গ—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
বন্ধুবরেষু
প্রথম প্রকাশ—বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফেব্রুআরী, ১৩৮৭
তৃতীয় সংস্করণ—লালন ফকির ও তাঁর গান নামে মিত্র ও ঘোষ থেকে চৈত্র ১৩৯৮
এখানে গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে। গ্রন্থে লেখকের যে ভূমিকা-দুটি ছিল তা মূল গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া হলো।
মূল গ্রন্থে লেখকের নিবন্ধগুলি ছাড়াও লালনের চল্লিশটি গান ছিল। এখানে স্বাভাবিক কারণেই গানগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।
গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধগুলির সূচীপত্র এরূপ ঃ লালন তিরোধান শতবার্ষিকী / লালন স্মরণ / লালন জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী / লালন স্মারক / অবিস্মরণীয় লালন / ফকির লালন শাহ্ / দরবেশ লালন সাঁই / লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ / লোকসাহিত্যের সন্ধানে / মানবিকবাদ প্রসঙ্গে।

———